বিষাদবৃক্ষ

বিষাদবৃক্ষ

করুণা প্রকাশনী / কলকাতা-৯

—এক—

বাড়ির পেছন দিকের শেষ প্রান্ত থেকে যে সরু খালটি বয়ে যেত, তার সাথে আমাদের সম্পর্ক ছিল একান্ত শারীরিক। দুপাশে বাড়িঘর গেরস্থালি আগান-বাগানের মাঝখান দিয়ে তার গতি লীন হত গিয়ে বড় খালে। বড় খালটিও ওরকমভাবেই গিয়ে পড়ত এক নদীতে। সেই নদীতে জাহাজ, ইস্টিমার চলত। বড় খালে বিশমণি পঁচিশমণি নৌকো চলত ; জাহাজ, ইস্টিমার কিছু আসত না। আর পিছনের খালে চলত শুধু ডিঙি নৌকো। কিন্তু তথাপি এই খাল আমাদের বড় আত্মীয় ছিল। আমরা বলতাম 'পিছারার খাল'।

পিছারার খালটি আমাদের বাড়ির সীমান্ত-চিহ্নের গড়খাল। আমাদের ভাষায় গড়খাই, অর্থাৎ কিনা পরিখা। না, আমাদের বাড়িটি কোনও রাজবাড়ি নয় যে তার পরিখা থাকবে। তবে আকার-আয়তন এবং আয়োজনে এক সময়কার রাজকীয় মহিমার ঘোষক অবশ্য। বংশলতিকায়ও একটা কিংবদন্তি আছে এ রকম যে, কে-এক রাজা হর্ষসেন নাকি আমাদের বীজপুরুষ। সে মরুক গে। পিছারার খালটি বাল্যে আমাদের খুবই প্রিয় ছিল। দুপুর গড়িয়ে বিকেল নামার আগেই বড় খালের জল হুড়মুড় করে, ঢুকে পড়ত এই গড়খালে। তখন আমরা, এ বাড়ির 'ছাওয়াল পানরা' উদোম উলঙ্গ হয়ে সেই থৈ-থৈ জোয়ারের ঘোলাটে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে হুটোপুটি করতাম। সে সময় তর্জনকারী গার্জেনরা দিবানিদ্রায় মগ্ন থাকতেন। তাই জলক্রীড়ায় বিশেষ বিঘ্ন হত না আমাদের। আমাদের হুটোপুটির জন্য ছোট ছোট মাছেরা, কুঁচো চিংড়ি, ডোগরি, মলান্তি, কর্কিনা বা ভাঁটারা লাফালাফি করত। জোয়ারের জলের সঙ্গে তারাও ঢুকে পড়ে স্রোতের বিপরীতে এগোতে চেষ্টা করত।

তবে গার্জেনরা যে আমাদের একেবারে 'ধম্মের ষাঁড়' করে ছেড়ে দিতেন তা নয়। একজন পালনদার আমাদের সদা সতর্ক চোখে রাখার জন্য এবং অতিরিক্ত উদ্দণ্ডপনা সংহত করার জন্য থাকতই। সেই মানুষটির নাম জানকীনাথ। গৌরবর্ণ, বেঁটেখাটো চেহারা, কুচকুচে কালো কোঁকড়ানো চুল এবং একজোড়া পাকানো গোঁফের অধিকারী জানকীনাথ পুজো-পার্বণে বাড়ির 'মণ্ডবী'গিরি করত। পুজোর আয়োজন করা, পাঁঠা বলি দেওয়া, ধূপতিনৃত্য এইসব করত সে। অন্য সময়ে আমাদের দঙ্গলকে সংযত রাখা ছিল তার দায়িত্ব। অসামান্য গল্প করতে পারত জানকীনাথ। আমরা ডাকতাম জান্‌দা বলে।

গড়খাইটির পরিসর কম ছিল, কিন্তু গভীরতা খুব একটা কম ছিল না। দৈর্ঘ্যেও চারটি, বা বলা চলে পাঁচটিই গ্রাম জুড়ে তার দৌড়াদৌড়ি ছিল। এমনিতে ছোট ডিঙিনৌকোই চলত বেশি, কিন্তু প্রয়োজনে বড় আট-দশমণি নৌকোও পিছারার খাল অবধি এসে যেত অবাধে। দক্ষিণের 'মহাল' থেকে যখন এইসব মালবাহী নৌকোগুলো ধানমান, কলা-কচু, মিষ্টি আলু, গিমি কুমড়োর পসরা নিয়ে বড় খালে এসে ঢুকত, তখন জান্‌দা তার মধ্যে অপেক্ষাকৃত ছোটগুলোকে রাস্তা দেখিয়ে পিছারার খালে ঢোকাত। গড়খাই-এর এই ঘাট থেকেই কামলা, লস্কর, মাহিন্দরেরা সেইসব সামগ্রী গোলাঘরে এনে তুলত। এগুলো ছিল আমাদের বিশাল পরিবারের সম্বচ্ছরের আহার্য। গিমি কুমড়োকে আমাদের ওখানে বলা হত 'যোমচাইলতা'। আস্বাদে অতি কুৎসিত প্রায় অভোজ্য এই সব্জিটি বিশালকায় মিষ্টি আলু সহযোগে নৈমিত্তিক আহারের প্রধান অবলম্বন ছিল সেসব দিনে আমাদের। এর সঙ্গে আর একটি শস্যও আসত। তা হল 'খেসারির ডাইল'। ভাল জিনিস বলতে আসত খেজুর গুড়ের নাগরি, নারকেল ইত্যাদি। আখের গুড়ও আসত প্রচুর। জমিদারির উপজ শস্যসামগ্রী। অতএব এর সবই শ্রদ্ধেয় ভোজ্য, এ রকম এক বিশ্বাস বোধ করি কর্তাদের ছিল, আর আমরাও ওই খাদ্য খেয়ে দিব্য ডাগুর হচ্ছিলাম।

পিছারার খাল গ্রামের পশ্চিম দিকের একটা বড় খাল থেকে বেরিয়ে পুব দিকের বড় খালে মিশেছিল। আমাদের দিক থেকে উজানে পশ্চিমের দিকে এই ছোট খালের পথ ধরে এগোলে একটা ছোট সুন্দর বাগান ছিল। সেখানে অনেক ফুল আর ফলের আয়োজনের সঙ্গে একটি লোভনীয় কামরাঙার গাছও ছিল, যার ফল দারুণ মিষ্টি। ঐ বাগানের মালিক নগেন ডাক্তারমশাই তাঁর প্রাতঃ এবং বৈকালিক কৃত্যাদি ঐ গাছটার তলায় বসেই সারতেন। আমরা পিঠোপিঠি তিন ভাই আমাদের সীমানার একটা বাঁশঝাড়ের আড়ালে দাঁড়িয়ে পরম আহ্লাদে তাঁর কৃত্যের তাবৎ প্রয়াস দেখতাম। তিনি অবশ্য আমাদের দেখতে পেতেন না। আমরা তিনজন বঁড়শি নিয়ে ঐ দুটি সময়েই ওখানে চিংড়ি মাছ ধরার জন্য যেতাম।

তখনকার দিনে ঐসব অঞ্চলে পায়খানাঘর বলে কিছু ছিল না। একমাত্র আমাদের বাড়িতেই পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য আলাদা-আলাদা পায়খানা ঘরের ব্যবস্থা ছিল। অন্যান্য বাড়িতে ছিল পায়খানা-গাছ। অর্থাৎ তাদের ইত্যাদি করণের জন্য কোনও খাল বা বেড়ের ওপর একটি আড়াআড়ি গাছের ডাল থাকলেই হল। মহিলাদের আব্রুর জন্য সুপারি পাতার ঘেরাটোপ। নগেনমশাইয়ের কোনও আব্রুর প্রয়োজন হত না। তাঁর বয়স তখন সপ্ততি অতিক্রান্ত প্রায়, অতএব তিনি তখন দ্বিতীয় শৈশবে। এ সময়ে মনুষ্যের গোপন বা লজ্জা বিষয়ক কিছুই বোধে থাকে না।

পিছারার খালের মহিমা অনেক। যখনকার কথা বলছি, তখন পঞ্চাশের কাল। সদ্য 'আণ্ডাফাটা' রাষ্ট্রটি অথবা বলা ভাল রাষ্ট্র দুটি, নেহাত নাবালক। আণ্ডাফাটা কথাটি বললাম বটে, তবে এই রাষ্ট্র দুটি আদৌ অণ্ডজ নয়। জরায়ুজই। এ কারণেই

পাঁচ'ছ বছর বয়স হওয়া সত্ত্বেও তাদের নাড়িকাটার রক্ত বন্ধ হচ্ছিল না। সর্বকালীন রক্ত বন্ধের জন্য নানান জড়িবুটি ব্যবহার করা হয়েছিল বটে, কিন্তু উভয় শিশুরই নাড়িতে সময়ে অসময়ে ঘা বিষিয়ে উঠে রক্ত পুঁজ নিঃসৃত হতে শুরু করে, যা অদ্যাবধি বন্ধ হয়নি। সাল পঞ্চাশ-একান্নর সময়ে, এ রকম এক ব্যাপক রক্তপাতে উভয় রাষ্ট্রের পথ-ঘাট-মাঠ বড় পিচ্ছিল হয়। পিছনের পরিখা যে পলায়নের উত্তম বন্দোবস্ত, সে তত্ত্ব সেন রাজকুলজ লক্ষ্মণসেনদেবের সময় থেকেই আমরা জানি। মানে কিনা, 'পাছ দুয়ার দিয়া পলাইয়া যাওনের লাইগ্যাই' রাজা, জমিদার, তালুকদারেরা একটি পিছারার খাল রাখতেন। শত্রুর আসার পথ সামনের দিক দিয়েই হয়। অতএব পিছারার পলায়ন পথ মজবুত চাই, তা জলপথ হোক বা স্থলপথ। এর আরও একটি হেতু এই যে "যদি বাড়ির মাইয়া লোকগো কোনও কারণে কোথাও যাওন লাগে তো হেয়া" লোকচক্ষুর আড়ালে আব্রু রেখেই ঐ পিছারার খালে লাগানো ডিঙি বা কোষা, কিংবা সামর্থ্যানুযায়ী অনুরূপ জলযানে চড়েই তো যেতে হবে। আমাদের খালটির ক্ষেত্রে এই হেতুই প্রধান।

আমাদের মা, জেঠিমায়েরা বাপের বাড়ি যাবার সময় ঐ পিছারার খাল থেকেই নৌকোয় উঠতেন। তখন সে-এক কাণ্ড। অমুকবাবুর বৌ বাপের বাড়ি যাবেন। সে কি সামান্য কথা? সে এক যাত্রা বটে। এমনিতে অমুকবাবুরা বৌদের তত্ত্ব-তালাশ 'ঘন্টা' করতেন। কিন্তু বৌ বাপের-বাড়ি যাবেন, সে-এক আভিজাত্যের প্রশ্ন। সে বিষয়ে আয়োজন রাজকীয় না হলে চলবে কেন? দেশে গাঁয়ে তো তাহলে সম্মান থাকে না। একটি এ রকম 'যাওনের' কথা স্মৃতিতে আছে। তখন আমার বয়স বড়জোর পাঁচ-ছয়। আমার দুই মামাতো দাদার বিয়ে। বাড়িসুদ্ধ নেমন্তন্ন। চাকর-বাওন, অতিথ অইব্যাগত এবং পুরোইত বেয়াকের যাওন চাই। এমত বিধি। অতএব সাজ সাজ রব। আমার মা নয়াবৌ বা সোনাবৌ। তিনি বাপের বাড়ি যাবেন। তাঁর দুই ভাইপোর বিয়ে। আমাদের দেশের কথায়—'জোড়া বিয়া'। কিন্তু সঙ্গে যায় কে? বাবা যেতে পারেন না। কেন কিনা 'সামান্য ইস্তিরীর ভাইপোয়গো বিয়া', এক্ষেত্রে ছোটবাবুর 'যাওন' খুবই দৃষ্টিকটু। তবে এতটা পথ, নৌকোয় যাওয়া,—একজন তো চাই। অতএব জানকীনাথ চরণদার। সঙ্গে একজন থাকলে আর কথা কী? বিপদে আপদে 'ওই তো' আছে। বাবুর যাওয়ার দরকার নেই। আর ছোটবাবুর 'যাওন' বেশক অসৈরণও। মাইনসে কইবে কী? মাইনসে এসব ক্ষেত্রে আড়ালে 'মাইগ্যারুদা' অর্থাৎ 'মাউগ যার আরাধ্যা বলে' সাধারণত রগড় করে। তায় এই স্ত্রী দ্বিতীয় পক্ষ। সে-এক বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার হবে।

তো নয়া বৌ তাঁর ভাইপোদের বিয়েতে যাবেন বাপের বাড়ি, সে এক উৎসব। তাঁর সাথে এটা ওটা পাঠাতে হবে। কুটুমবাড়ির নানা তত্ত্বতাবাস। এত বড় বাড়ির বৌ, কেউ কিছু 'তিরুডি' না ধরে। যাত্রামঙ্গল হয়, দিনক্ষণ তিথি নক্ষত্র দেখে। তারপর নয়া বৌ তাঁর পুষিপোনা, কাখেরডি কোলেরডি সমেত পিছারার খালের ঘাটের থেকে নৌকোয় চাপেন। যেন তাঁর 'ছুরাৎ' ইতরজনের নজরে না আসে। সে এক সময় গেছে।

বাড়ির আভিজাত্য তখন তিনতলার ছাদ্ ছাড়িয়েও প্রায় বারো হাত উঁচু। সে কারণে যাত্রাকালে পুরোহিত মন্ত্র হাঁকেন—ধেনুর্বৎস্যা প্রযুক্তা পুষ্পমালা পতাকা, তার পরেই যাত্রা শুরু হয়।

সেইসব দিন গত হলে একটা সময় আসে যখন 'ভদ্দরলোক' হিন্দুর 'মাইয়া মাইনসের বেয়াক ছুরাৎ, বেয়াকের দ্যাহা শ্যাষ'। তখন দাঙ্গার কাল, হোগাউদ্‌লা মাথায় ঘোমডার সময়। কিন্তু আমাদের বাড়ি তো বড়বাড়ি, জমিদারবাড়ি। গ্রাম গাঁয়ের মানুষেরা বলে জমিদার। তখনও ঠাটবাট, সোয়া হাত জুতা ইত্যাকার অনুষঙ্গ লোপ পায়নি পুরোটা। তখন যদি সোনাবৌ, বড়বৌ বা কোনও মহিলার বহির্গমন প্রয়োজন হয় তবে তাদের 'ছুরাৎ' সাধারণ্যে প্রকাশ সঙ্গত হয় না। কেন?—না, 'ছোডোলোকেরা য্যান্ হ্যারগো ছুরাৎ 'না দ্যাহে' এ রকম একটা মানসিকতা।

এইসব কথাই পিছারার খালের কথা। কিন্তু সে কথা এতই পুরনো আর বাসি হয়ে গেছে যে তাতে কারোরই আর প্রয়োজন নেই। এখন সে পিছারার খালও নেই, খালের ঘাটও নেই। নেই সেই বৌরাও, যারা ঐ ঘাট থেকে নৌকোয় চড়ে নৌকোর ছাউনির ফোকর দিয়ে খালের দুধারের আশ্‌শেওড়া, নলখাগড়া, হোগলা, ছৈলা ইত্যাকার উদ্ভিজ্জ দেখতে দেখতে বড় খালে গিয়ে পড়ত। বড় খালে পড়ে তাদের বিস্তৃতি হত। সেই বড় খালের পাড়ে ছিল এক জোড়া রেনট্রি। যাদের কথা ক্রমান্বয়েই আসতে থাকবে। এই খাল এবং এই বৃক্ষ নিয়েই তো এই আলেখ্য।

কিন্তু সেইসব বৌ-এরা আজ আর নেই। জীবন সেখানে কেবল কিছু অসমাপ্ত স্বপ্নের ছাই ছড়িয়ে রেখেছে। এমনকি তাদের অস্থিকণাও সেখানে নেই। থাকবে কী করে? তাদের দেহ কি সেই ভূমিতে সৎকার হয়েছে? তারা কোথায় কোন্ বিদেশ বিভুঁইয়ের রেললাইনের পাশে হঠাৎ গজিয়ে-ওঠা কোন্ কুঁড়েঘরে অথবা কোনও বস্তির কোন্ অন্ধকার ঘরে, কিংবা দণ্ডকারণ্য বা আন্দামানের কোন্ অপরিচিত আকাশের নীচের অপরিচিত ভূমিতে তাদের দেহশেষ মিলিয়ে গেছে তার কি কোনও খোঁজ আছে? অথচ এইসব সোনা, ছোট বা বড়, মেজো, সেজো, ন' বৌদের তো কথা ছিল চন্দন কাঠের চিতেয় চড়ে 'সগ্‌গে' যাবার। কপালের নির্বন্ধ সেই সৌভাগ্য থেকে 'ভাগ্যিমানী' বৌগুলোকে বঞ্চিত করলে তাদের অস্থি আর কোথায়ই-বা পাওয়া যাবে?

—দুই—

মানুষের শিকড়বাকড় নিয়ে মানুষকে যেন খোঁজখবর করতেই হয়। পিছারার খালটিই যে আমার বা আমার মতো মানুষদের শিকড়ে বরাবর জল সিঞ্চন করে গেছে সে কথা বুঝতে পারি যখন সেই স্রোতস্বিনীর স্মৃতি প্রতিনিয়ত আমাকে ধ্বস্ত করে চলে। পূর্বোক্ত সব বিচার সত্ত্বেও বড় খাল আর পিছারার খাল আর তার তীরস্থ দুই মহা বৃক্ষ। এরাই আমার স্মৃতির তাবৎ অনুকণাসহ এক অনিবার্য, সতত চৈতন্যময় এবং অসম্ভব মেদুরপ্রবাহ, যা আমাকে শয়নে, জাগরণে, স্বপ্নে অথবা বিশ্রম্ভে কখনওই ত্যাগ

করে না। পিছারার খাল আমাকে যেন ক্রমশ এক বড় খালে নিয়ে ফেলে এবং বড় খাল, অনেক নাকের জল, চোখের জল করে একসময় এক অনিবার্য নদীর রহস্যময়তায় আমাকে পৌঁছে দেয়। সেখানে, আমার তখনকার আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী এক স্বপ্নসম্ভব যান্ত্রিক জলযানের আসার কথা থাকে, যে আমাকে গর্ভস্থ করে যন্ত্রণাময় এই অভিশপ্ত বদ্ধতা থেকে মুক্ত করে নিয়ে যাবে এমন এক ভূখণ্ডে যেখানে আমার কোনওরকম অসম্মান থাকবে না। আমি একজন মুক্তপ্রাণ, সহজ মানুষ হব। কিন্তু সেই জলযান এলেও, তার গর্ভস্থ আমি ভূমিষ্ঠ হই অন্য এক অসম্মানের ঘাটে, যেখানে কোনও মানুষই কাউকে চেনে না। কিন্তু সে তো অনেক পরের কথা।

কিন্তু এই খালের মাহাত্ম্য এমন যে—সে না থাকলে, জোয়ারের জলের যে এক অসীম রহস্য আছে, হাজারো বার্তা আছে এবং তা যে আমাদের মতো অজ্ঞ গ্রামীণ শিশুদের শরীর ও মনে এক যাদু আচ্ছন্নতার আবেশ সৃষ্টি করে তা জানার অন্য কোনও উপায় তখনকার মতন প্রায় আদিম জগতে থাকে না। এই খালেই তো সুদূর দক্ষিণ অঞ্চল থেকে, সুন্দরবনের গভীর অরণ্য থেকে, ঘাসি নৌকোয় নানান শস্য সম্ভার নিয়ে ঐ সব মানুষ আসত, যাদের নাম রহমান সর্দার, ছনুমির্ধা, গগন বাঘমারা বা এরকম আরও কত অদ্ভুত সব মানুষ। তারা ভিন্ন পৃথিবীর। তারা অতি সহজ সরল আবার অতি ভয়ালও। পিছারার খালের সুবাদে তাদের সাথে আমাদের পরিচয়। তারা যে কত সংবাদ আমাদের বলত, তার কি কিছু শেষ আছে? আমাদের ঐ সবুজ গ্রহখণ্ডটিতে তখন বহির্জগতের খবর আদৌ বিশেষ পৌঁছোতো না। পোস্ট আপিস একটা ছিল বলে, কখনও কখনও সাতদিনের একটা বাসি সস্তা খবরের কাগজ হাতে আসত। তাতে তখন কোরিয়ার যুদ্ধ, হিটলারের শেষ তথ্য বা লিয়াকত আলী খানের বাতকর্ম বিষয়ক কিছু খবর থাকত। আমাদের বড় বৈঠকখানায়, বাড়ির বড়বাবু দরাজকণ্ঠে তা পাঠ করে গ্রামের সব মানুষদের মোহিত করে দিতেন। তাঁরা মাঝে মাঝেই এসে বড়বাবুকে শুধোতেন, বাবু কাগজে ল্যাখছে কি? মেজাজ অনুযায়ী জবাব পেতেন তাঁরা। ল্যাখছে? ল্যাখছে খুব খারাপ। বেয়াকে সাবধান হও। খুব খারাপ দিন আইতে আছে।—এরকম ভাবে কখনও তাঁদের সংবাদ তৃষ্ণা মেটানো, মেজাজ ভাল থাকলে কিছু পড়ে শোনানো। ব্যাস, জগতের সংবাদের সাথে তোমার ইতি।

কোরিয়ার যুদ্ধ তখনও মেটেনি। মাঝে মাঝেই আকাশ পথে শ্রেণীবদ্ধ মার্কিনি যুদ্ধ বিমানগুলোকে পরিক্রমা করতে দেখতাম আমরা, বাড়ির খোলা ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে। তারা সংবাদের আভাসই শুধু দিত, কোনও সঠিক বার্তা বলত না। বড়বাবু গাঁয়ের লোকেদের বার্তা দিতেন, 'বোজ্লানি, অবস্থা খুব সঙ্গীন।' এমত সময় একদিন একটি বাসি কাগজের খবর, 'জমিদারী প্রথা বিলুপ্তি করণ আইন অচিরেই চালু হইতেছে।' জনৈক মিঞাসাহেব এই খবরের নির্যাস নিয়ে বড়বাবুর দরবারে হাজির। তাঁর জিজ্ঞাসা, 'বড়বাবু বড়বাবু, খবরের কাগজে কয় কী?' বড়বাবুর চট্‌জলদি জবাব, 'কয় তো খুব খারাপ।'

: হেয়া ক্যামন?

: কাগজে কয় পাকিস্তানে 'দারি' রাখা চলবে না।

: অ্যাঁ? অ্যাতো মেন্নত করইয়া পাকিস্তান হাসেল অইল আর মোরা দাড়ি রাখথে পারমু না?

এখন 'দাড়ি' আর 'দারি'র উচ্চারণ পার্থক্য এ অঞ্চলে সম্ভব হয়না। বড়বাবু তাই খেলিয়ে যান—'না, দারি আর রাহন যাইবে না, এরহমই ল্যাখছে।' মিঞা তখন দিশাহারা। তাঁর বক্তব্য,—'তয় এ পাকিস্তান লইয়া মোরা কি করমু?' জেঠামশাই বলেন, 'হে কতা আমি কমু? জিগাও তোমাগো মুরুব্বীগো। আয়চ্ছা কও দেহি এই যে পাকিস্থান পাইলা হেথে তোমাগো কতহানি মুশকিল আসান অইলে? কদম, তুমিই কও, তুমিতো লীগের একজন মাতব্বর এহানে।'

কদম মাথার জিন্নাটুপিটি খুলে খানিকক্ষণ টাক চুলকে নেয়। বলে, আজাদি তো পাইলাম। এহন কেরমে কেরমে হগ্গলই অইবে।

: অইবে?

: অইবে না ক্যান? এহন আমাগো পোলাপানেরা সরকারি চাকরি আশন পাইবে, ডাক্তার ইনজিনিয়ার অইবে। নাকি কয়েন?

বড়বাবু বলেন, শোনতে খারাপ শোনায় না, তয় যবে বিবি ডাঙ্গর অইবে, তবে মিঞায় গোড় লইবে, আমার হইছে হেই চিন্তা। যা অউক্, তোমরা পাকিস্থান যহন পাইছ, ফাউকাও। তয়, আমি ভাল ঠেকি না।

মধ্যস্বত্বভোগীদের, বিশেষত আমাদের পরিবারের বা তার থেকে আরও ক্ষুদ্র ভগ্নাংশে যেসব মধ্যস্বত্বভোগী আছে তাদের সমূহ সংকট। তাদের মধ্যস্বত্বের খাজনার পরিমাণের ব্যাপারটা অঙ্কে আসে না। কিন্তু খাস জমির উপজ তাদের বাঁচিয়ে রাখে। পুরুষানুক্রমে অন্য কোনও আর্থিক ক্রম তাদের নেই। এই খাস জমি যদি তারা নিজেরা চাষ করত তবুও কথা ছিল। কিন্তু তা কী করে হবে? তারা যে জমিদার। জমিদার জমি চষে না। প্রজাপত্তনির প্রজারাই তা চষে। জমিদার ফসলের ভাগ পায়। এই ব্যবস্থার জন্য যখন প্রজা পত্তনি, মধ্যস্বত্ব যায়, তখন খাসজমিও যাবার রাস্তা ধরে। কেননা যে জমিদার বা তালুকদার খাজনারই আধিকারিক নয়, তার আবার খাসের ফসলের অধিকার কী? সে অধিকারও তার কাজে কাজেই যেন লোপ পায়। এক্ষেত্রে জনবল একটা নিয়ামক ব্যাপার এবং প্রজা না থাকলে তা সম্ভব হয়না।

যে মধ্যস্বত্বভোগীর বার্ষিক প্রজাপত্তনির আয় মাত্র হাজার বারশো টাকা, সেও খাসজমি শাসন করত প্রায় দেড়শো থেকে দুশো বিঘা। ফলত, সেও কার্যত একটা তালুকদার। কিন্তু মধ্যস্বত্ববিলোপ আইনে সসেমিরা। একারণে এই আইন পাশ হলে ধস নামে এইসব ছোট এবং মাঝারি মাপের মধ্যস্বত্বভোগীদের সমাজে। তাঁরা তো বড়দের মতো কোনও আগাম ব্যবস্থা রাখেনি। অথচ সম্বচ্ছরের কৃৎকরণ, ঠাঁট-বাট, তাদের অনুকরণেই জারি রেখেছে। দোল, দুর্গোচ্ছব, মাতৃদায়, পিতৃদায়ে দীয়তাং

ভুজ্যতাং-এর ব্যাপারটা যেমন আছে, তেমনই তাঁদের সংসারে পোষ্য আছে বিধবা পিসি, মাসি, বোন ভাদ্দর বৌ এবং তাদের অনাথ পুষিপোনারা। তাদের পালন পোষণের দায়, পিতৃঋণ এবং বিগত কর্তাদের ইদিক সিদিকের বাবদ যে অসুমার হাঁমুখ রয়েছে তা বন্ধ করার আয়োজন, তার উপায় কী হয়? তা রাষ্ট্রও দেখেনা, সমাজও দেখেনা। সমাজ তো তখন দেশভাগের কোঁত্কা খেয়ে সূক্ষ্মশরীর ব্রহ্মস্বরূপ, আছেন কি নেই বোঝা দায়। কিন্তু কৃৎকর্ম না করলে তিনি বড় জাগ্রত হয়ে ধিক্কার দেন।

আবার এই আইনের বলে যে এদেশীয় সামন্ততন্ত্র বিলুপ্ত হল তাও নয়। তার খোলসটা শুধু পাল্টাল। ফলত মধ্যস্বত্বলোপী আইন সাধারণের আর্থিক আরোগ্যে যতটা না কার্যশীল হল, একশ্রেণীর এবং অবশ্যই এক বিশেষ সম্প্রদায়ের ক্লেশ বৃদ্ধি করে অনেক বেশি সমস্যার সৃষ্টি করল। সেই সমস্যা মোকাবিলার সামর্থ্য তো এইসব ছোট মাঝারি মাপের মধ্যস্বত্বভোগীদের ছিলই না, এখন গোটা দেশের সংখ্যালঘুদেরও তা বিপর্যস্ত করে ছাড়ল।

—তিন—

শুনেছি আমার মায়ের বয়স যখন উনিশ, তখন তিনি নববধূরূপে বড় খাল অবধি নৌকোয় এবং সেখান থেকে অন্দর অবধি পাল্কিতে চড়ে এসেছিলেন। বাবার বয়স তখন ত্রিশ। মাত্র বছর খানেক আগে তাঁর প্রথমা স্ত্রী তিনটি অপোগণ্ড রেখে লোকান্তরিতা। আমাদের সেই না-দেখা মায়ের ছবি দেখেছি। অসামান্যা সুন্দরী ছিলেন তিনি। বাবা সেই বছরই জীবনের প্রথম এবং শেষ বারের মতো তালুকদারি তদারকির জন্য 'মহালে' গিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে সেই মা রোগে পড়েন। তাঁর অসুস্থতার খবর বাবাকে পাঠানো হয়নি। চিকিৎসাদিও তেমন করানো হয়নি। বাড়ির অন্যান্য মহিলারা অসুখটাকে স্বামীবিরহজনিত ন্যাকামি বলে নাকি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেছিলেন। এসব কথা আমার মায়ের কাছ থেকে শোনা। সেই আগের মায়ের বয়স তখন একুশ। শেষ পর্যন্ত যখন খবর পেয়ে বাবা বাড়ি এলেন, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। আমার সেই মায়ের তখন বাক্শক্তি রহিত হয়ে গেছে। শুধু চোখ দিয়ে টপ্টপ্ করে জল পড়ছিল। তারপরই শেষ। স্বাভাবিক কারণেই ঘটনার তীব্রতা এবং আকস্মিকতায় বাবা স্তব্ধ মূক হয়ে গিয়েছিলেন।

পরিজনদের প্রতি তাঁর ক্ষোভ এবং অভিমানও হয়েছিল প্রচুর। কিন্তু তাঁর তিনটি মাতৃহারা সন্তানকে তো ঐ পরিজনদের ভরসায়ই রাখতে হবে, এ কারণে চুপচাপ থেকে গেলেন। মায়ের কাছে শুনেছি যে বাবা নাকি এ সময় রাতের পর রাত জেগে থেকে আমাদের ছোটবৈঠকখানার জানলা দিয়ে সেই আগের মায়ের চিতার দিকে তাকিয়ে থাকতেন। মনে মনে বলতেন, যদি কিছু বলার থাকে বলে যাও। আমি ভয় পাব না। এসব কথা বাবা আমার মাকে বলেছেন। বাবা নাকি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, আর বিয়ে করবেন না। বাড়িতে জনবলের অভাব নেই, অতএব ছেলেমেয়েদের মানুষ

করার কোনো অসুবিধে হবার কথা নয়। বাবা খুবই রোমান্টিক স্বভাবের ছিলেন। বাস্তব জ্ঞান বিশেষ ছিল না। তাঁর সন্তানদের মানুষ করার দায় আমাদের কোনও পিসিমা মাসিমা কাকিমা জেঠিমাই গ্রহণ করতে পারলেন না। কারণ তাঁরা নিজেরাই সন্তান সম্পদে একেক জন গান্ধারী। বিশাল পরিবার, কে কারটা দেখে। তাঁরাই এক সময় বলতে শুরু করলেন, আহা কয়কি, বিয়াডা করবে না ক্যান? বয়সটাই বা কি? হেয়া ছাড়া পোলা মাইয়া গুলা দ্যাহনেরও তো এট্টা মানুষ চাই। অতএব রোমান্টিকতার সঙ্গে 'পোলাপানগুলা' মানুষ করার বাস্তবতায় সংঘাত লাগে এবং তাদের কষ্টই প্রাধান্য পায়। ছোটটার বয়স তখন এক, তার আগেরটি কন্যা, বয়স আড়াই এবং বড়টি পাঁচ বছরের। এদের প্রতি ক্রমবর্ধিত অনাদর এবং তৎকালীন একান্নবর্তী মধ্যস্বত্বভোগী পরিবারের মানুষদের আচার অভিচার বড় স্থূলতায় ক্রূরতায় প্রকাশ পায়। অতএব বাবা আমাদের মাতৃদেবীকে অনুগৃহীত করেন। এ যুগে হলে বলা যেত অনুগ্রহটি পুরুষের তরফে নয়, নারীর তরফেই হয়েছিল। আমার মায়ের ভাগ্যদোষ, নারী স্বতন্ত্রতার আধুনিক মন্ত্র সেই যুগে তাঁর কানে পৌঁছোবার কোনও ব্যবস্থা ছিল না।

বিবাহ পরবর্তী দিবসে নৌকাযোগে আগমন কালে বাবা তাঁর সদ্যোঢ়া যৌবনবতী পত্নীর কানে যে মন্ত্র দেন, তা বেশ মহোদাদর্শোচিত। সন্তানত্রয়ের মধ্যে বড় দুটিকে বলা হয়েছিল, তাদের মায়ের অসুখ করেছিল বলে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এখন বলা হল, তাঁকে বাড়ি নিয়ে আসা হচ্ছে। অতএব বধূ যেন বাড়িতে ঢোকার পর নববধূসুলভ আচরণ একেবারেই না করেন। এমত আভাস অবশ্য সম্বন্ধ করার প্রাক্কালেই তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। কেউ কেউ এমন আভাসও দিয়েছিলেন যে, এইসব কারণেই তাঁরা তালুকদার হওয়া সত্ত্বেও মায়ের মতো একটি গরিব ঘরের কন্যাকে বধূ করে আনছেন। এসবই আমার পরবর্তীকালে শোনা কথা এবং মায়ের কাছেই। কিন্তু আশ্চর্য তিনি যখন এসব কথা বলতেন, তাঁর আচরণে কোনও ক্ষোভ প্রকাশ পেত না। যেন এসব খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। এছাড়া এইসব সমস্যা সমাধানের আর উপায়ই বা কি ছিল? মায়ের ভাবটি ছিল এ রকমই। অথবা, 'তয় এ্যারা করবেইবা কি?'

বাবা অভিনয়াদি বিষয়ে পারঙ্গম পুরুষ। বাড়িতে রঙ্গমঞ্চ নিয়ে নাটকাদি করে থাকেন। এ কারণে নৌকোয় বসে নবোঢ়াকে যথাসম্ভব প্রয়াতা পত্নীর সজ্জায় সজ্জিত করতে তাঁর প্রচেষ্টার ত্রুটি ছিল না। তথাপি তাঁর পঞ্চবর্ষীর জ্যেষ্ঠ পুত্রটি নাকি 'হাসপাতাল' থেকে ফিরে আসা এই মাতৃকাকে দর্শন করে 'না, এ আমার মা না' এরকম অভিমানে ফুঁসে উঠেছিল। বাকিদের অবশ্য এ সত্য উদ্ঘাটন করতে বেশ কিছুকাল সময় এবং উপযুক্ত সাহচর্য দরকার হয়েছিল। আমাদের মায়ের কপালে নতুন বৌ হওয়া, অতএব, সম্ভব হল না। তাঁর আগমনে বাড়িতে কোনও মঙ্গলবাদ্য বাজল না। এমন কি ব্যাপক হুলুধ্বনিও নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কারণ মাতৃহারা শিশুরা যেন ব্যাপারটি বুঝতে না পারে। তারা যেন হঠাৎ কোনও আন্তরিক আঘাত না পায়।

আমাদের কর্তাদের এইসব ব্যবস্থাপনা বিষয়ে আমি কোনও মন্তব্য করব না। আমি শুধু ঘটনাগুলি মায়ের কাছে যেমনটি শুনেছি, তেমনটি বলছি। তবে কর্তাদের এই প্রচেষ্টায় আদৌ কোনও সুফলই যে পাওয়া যায়নি তাও জেনেছি। এই মা যে তাদের নিজের মা নন, তা বলে দেওয়ার জন্য বাড়িতে স্পষ্টবাদী, স্পষ্টবাদিনীদের সংখ্যা আদৌ অপ্রতুল ছিলনা। এখন আমি ভাবি, একবছরের শিশুটি যখন এই মায়ের স্তন শোষণ করে কিছুমাত্র মাতৃরস সেখানে না পেয়ে তার সদ্যোত্থিত দু-একটি দুধ-দাঁতের দ্বারা তাঁকে দীর্ণ করত এবং তাঁর মুখের দিকে বোবা চোখে তাকিয়ে থাকত, তখন সেই দৃষ্টির মধ্যে হতাশা দেখে আমার মা শারীরিক এবং মানস যন্ত্রণায় কি মূক কান্নাটাই না কাঁদতেন। কিন্তু কোনও নারীই তাঁর এই যন্ত্রণার প্রতিকারের জন্য সেখানে ছিল না। যদিও ঐ অঞ্চলে শিক্ষিতা নারীর আদৌ অভাব ছিল না। আড়াই বছরের খুকিটির তখন পুতুল খেলার বয়স সবে শুরু। তাই সে বড় বেশি তলিয়ে ভাবে না। এই মা তার কাছে খুব একটা অপছন্দেরও নয়, পরও নয়, উপরন্তু এই মায়ের আদর তথা উপঢৌকনও প্রচুর। তাই সে কোনও সমস্যা সৃষ্টি করে না। কিন্তু এহেন স্থিতাবস্থায় একান্নবর্তীর স্বার্থীরা তুষ্ট থাকেন না বলে নানাবিধ কথা বাতাসে ভাসে এবং যে যেমন অর্থে পারে তেমনই ভাষ্য করে। শিশুরা অতএব বড়দের অসভ্য অসভ্য বুদ্ধিতে বুদ্ধিমান হবার শিক্ষা পেতে থাকে। ইতিমধ্যে বছর ঘুরতে না ঘুরতে আমার সহোদর জ্যেষ্ঠ ভূমিষ্ঠ হলে ক্রমশ এই অসভ্যতা আরও বাড়তে থাকে এবং আমার অভাগিনী জননী তাঁর গর্ভজাত প্রথম সন্তানকে প্রকাশ্যে আদর আহ্লাদ পর্যন্ত করতেও সক্ষম হন না। কেননা একের আদর অন্যের অনাদর হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। আমার মা এই পরিবারে না নববধূ হিসেবে সম্মান পেলেন, না প্রথম মা হওয়ার গৌরব বোধ করলেন। কিন্তু অহোভাগ্য, একসময় আমার মা সবার সব ভ্রূকুটি এবং বিদ্রূপ তুচ্ছ করে এই তিনটি অমাতৃক শিশুর মাতৃত্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং পারিপার্শ্বিক তাবৎ হীনতাকে তুচ্ছ করার মতো রুচিবোধেব পরিচয় দেন।

নাটক করা, ফুটবল খেলা ছাড়াও বাবার আরেকটি অভ্যেস ছিল। সেটি পদ্যরচনা করা। আমার মাকে বিয়ে করার পর বাবা দীর্ঘকাল বোধ করি এক দ্বন্দ্বে ভোগেন। একথা মায়ের কাছে নানান গল্প-কথা শুনে এবং বাবার কবিতার খাতা পড়ে ধারণা হয়েছে। মাকে যে তিনি বঞ্চনা করেন নি পদ্যগুলোতে তার যেন কৈফিয়ৎ শব্দিত। মায়ের বিয়ের কথাবার্তার শুরুর থেকেই যে ঢাক ঢাক গুড়গুড় গোপনভাব শুরু হয়েছিল, তার একটা ধারাবাহিকতা শেষ পর্যন্ত সর্বার্থসিদ্ধকারী আদর্শায়নে স্থিতি পায়। মা, সামান্য গৃহস্থ ঘরের কন্যা, পিতৃহীনা, শিক্ষাদীক্ষায় নিতান্ত দীনা, উপরন্তু অত্যন্ত আত্মনিবেদনকারিণী। নিজস্বতা বা স্বকীয় সত্তা বলে কোনও বোধই নেই। তাঁর সেই তদ্‌গতপ্রাণতা, এই পরিবারের প্রয়োজনের নিমিত্তে আয়োজিত আদর্শায়নের এক অসম্ভব উর্বর ভূমি হিসেবে গ্রাহ্য হয় এবং মা অত্যন্ত কৃতজ্ঞতায়ই যেন সেই ভূমি হন। কৃতজ্ঞতা এ কারণে যে তিনি গরিব ঘরের কন্যা আর এই বাড়িটির একটি রাজকীয় আভিজাত্য আছে।

মায়ের কথা ও কাহিনী এবং তাঁর এই পরিবারে প্রতিষ্ঠা লাভের যে ব্যাখ্যান তাঁর কাছ থেকে আমি শুনেছি তাতে মনে হয়েছে, যেন তিনি একদলা নরম মাটি এবং তাঁকে এক ইচ্ছেমতো গড়ন দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। মা-ও সেমতো তৈরি হতে পেরে কৃতকৃতার্থা হয়েছেন। তাঁর সামনে একারণে একটি অসম্ভব রম্য আদর্শ প্রতিমুহূর্তে উপস্থিত করা হত। সেই আদর্শকে অতিক্রম করার বা বিরুদ্ধাচরণ করার শক্তি কিংবা শিক্ষা তাঁর ছিল না। তিনি প্রকৃতই বড় দীনা রমণী ছিলেন। চূড়ান্ত আত্মনিবেদনে, প্রায় ক্রীতদাসীর মতো সেই আদর্শকে বিশ্বাস করে তাঁর সেবার জগৎটা তৈরি করে নিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, এই সাধনায় তিনি সফলও হয়েছিলেন। বাবা নিজের দ্বন্দ্বের কারণে অথবা বিবেক দংশনের জ্বালা জুড়োতে এ সময় বেশ কয়েকটি পদ্য লেখেন। সেসব পদ্যের নির্গলিতার্থ একদিকে যেমন তাঁর প্রথমার বিদেহী আত্মার উদ্দেশে বেশ কিছু কৈফিয়ৎ যা তাঁর সন্তানত্রয়ের উপর নজরদারির প্রায়োজনিকতা বিষয়ে সরব, অপরদিকে দ্বিতীয়ার প্রতি কর্তব্যপরায়ণতা, নারীর আত্মত্যাগ এবং নানাবিধ আদর্শ উচ্চারণে বড়ই সমৃদ্ধ। তথাপি পিতৃদেব যে সারাটি জীবন এক অপরাধবোধ নিয়েই কাটিয়ে গেছেন তা সম্যক দেখেছি।

মায়ের ক্ষেত্রে বিষয়টি অন্য চমৎকারিত্বের নমুনা। বাড়িতে স্থানীয় কোনও শিল্পীর আঁকা আগের মায়ের একখানি পোর্ট্রেট শোবার ঘরের দেয়ালে সুন্দর ফ্রেমে বাঁধানো। ছবির সামনে ঈষৎ বাড়ানো ঐ ফ্রেমেরই একটি কাঠের বর্ধিত অংশ যার উপর কিছু অর্ঘ্য বা উপচার নিবেদন করা যায়। বাবার বাক্‌শৈলীতেই হোক বা মনুষ্যের অগোচর স্ত্রীচরিত্রের কোনও গহন কার্যকারণেই হোক আমাদের মা তাঁর সতীনের প্রতি বড়ই ভক্তিমতী ছিলেন। স্মৃতি এক্ষেত্রে প্রায় পাথর প্রমাণ। যেহেতু এসব নিজেই স্বচক্ষে দেখেছি। মা ঐ ছবির সামনে সকালের এবং বিকেলের চায়ের কাপটি পর্যন্ত নিবেদন না করে স্বয়ং গ্রহণ করতেন না। অন্যান্য ভোজ্যাদির তো কথাই নেই।

এর অনেক দিন পর, বাবা মারা গেলে, মা নিতান্ত যখন নিঃসঙ্গ, তখন তাঁকে একটি বাঁধানো খাতা কিনে দিয়ে বলেছিলাম, মা, সবসময় কান্নাকাটি না করে তোমার যা মনে আসে এই খাতায় লিখে রাখ। এমন একদিন আসবে যখন তুমিও তো থাকবে না, তখন এই খাতা তোমার হয়ে আমাদের সাথে কথা বলবে। আর দেখবে লিখতে শুরু করলে তোমারও একটা অন্যভাব আসবে। তুমি স্মৃতিচারণ করতে করতে এক সময় তোমার পরম আকাঙ্ক্ষার ধনকেও খুব কাছে পাবে। মা বলেছিলেন, আমি তো প্রায় নিরক্ষর। আমি কী তা পারব? বলেছিলাম নিশ্চয় পারবে। যেমন পারবে তেমন লিখবে। ভুল ধরার তো কেউ নেই। কিন্তু তিনি যে এই বুঝদেওয়া কথাটিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন তখন তা বুঝিনি। এখন এই লেখা রচনা করতে বসে, তাঁরই এক হাত-বাক্‌সো থেকে বেরোল সেই খাতা। বলাবাহুল্য এ-খাতা এখন আমাদের কাছে এক বহুমূল্য ধন। তা সেখানে তিনি যা লিখেছেন তার কিছু উদ্ধৃতি বর্তমান ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিনি লিখেছেন—

'বরিশালের ভাটিয়া গ্রামে আমার জন্ম। বাড়ির নাম কবিরাজ বাড়ি। দেড় বছর বয়সে আমার বাবা মারা যান। আমার দাদার তখন সাত বছর বয়স। দিদিকে বাবাই বিবাহ দিয়া গিয়াছিলেন। আমার জ্যেঠতুতো ভাইয়েরাই আমাদের ভরণপোষণ করতেন, দাদার লেখাপড়ার খুব মাথা ছিল না। এবং কেহই সেরকম দৃষ্টিও দেয় নাই। মা অনেক দুঃখ করিয়া পরে আমার মামা সত্য প্রসাদ সেনের বাসায় ওকে রাখিয়া আসিলেন। তিনি মায়ের পিস্‌তুতো ভাই ছিলেন। বেশ পয়সা ছিল তার। তাই মা অনেক বলিয়া দাদাকে তাঁহার বাসায় রাখিয়া আসিলেন। সেই মামার অভিভাবকত্বে সে ছিল। দেখাপরা দুরের কথা তাহারা দাদার সাথে খুবই খারাপ ব্যবহার করিত। দাদা রোজ বাজার করিত, রোজ তাহাদের জামা কাপড় সাবানকাচা করিত, সকলের জুতা ব্রাশ করিত, বিছানা করিত, কয়লা ভাঙ্গিত, ঘর ঝাঁট দিত। মায়ের কাছে দাদা এসব কিছুই জানায় নাই। মা একবার মামাকে লিখিয়াছিলেন ও কিছু রকম লেখা পড়া করে কি না। তাহার উত্তরে মামা লিখিয়াছিলেন তোমার ছেলের লেখাপড়ায় মোটেই মন নাই। ওর কিছুই হইবে না। আমি ভাবিয়াছি ওকে একটা দোকান করিয়া দিব। ১৫ টাকা দিয়া কি দোকান (নাকি তিনি) করিয়া দিয়াছিলেন। (মজার কথা) সেই দোকানের মাল তাহারা বাকী আনিয়াই নাকি দোকান নষ্ট করিয়া দিল।...পলতা মহালক্ষ্মী কটন মিলে আমার জ্যেঠতুতো ভাই (দাদা) উইভিং মাষ্টার ছিলেন। তিনি ওকে মিলে ঢুকাইয়া দিলেন। এতদিন পরে মা একটু নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন দাদার জন্য। আমি তখন বড় হইয়াছি। মার সবসময়েই চিন্তা কী করিয়া বিবাহ দিবেন, কীরকম পাত্রে দিবে।

'আমার গার্জিয়ান ছিলেন আমার জ্যেঠামহাশয় এবং জেঠতুতো ভাইয়েরা। তাঁহারা যে সম্বন্ধ দেখিতেন, তাহা দ্বিতীয় পক্ষেই দেখিতেন। কারণ টাকা পয়সা যাহাতে কম লাগে।

'মা একদিন বলিয়াছিলেন, যে আসে তাহাকেই তোমরা মেয়ে দেখাইও না। উহাতে মেয়ের দুর্নাম হয়। অথচ (তাহারা) দেনাপাওনার জন্যই ফিরিয়া যাইত। কিছুদিন পরে কেওরার (আমাদের বাড়ির) সম্বন্ধ এল। এখান হইতে ৬।৭ বার দেখতে গেল। ফটো তুলিয়া ওদের বাবাকে দেখাইল। ওদের বাবা একখানা কাগজে একটা প্রশ্ন লিখিয়া দিয়াছিলেন "এখানে আসিলে প্রধান কর্তব্য কী" আমি উত্তর লিখিয়াছিলাম শ্বশুর শ্বাশুরীর সেবা করা, মাতৃহীন শিশুদের পালন করা।" আমাকে যাহা বলিবার বিবাহের রাত্রিতেই সব বলিয়া দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন "তুমি ওদের মায়ের ফটো পুজো করবে এতে আমি খুব সুখী হব। ভাতে যদি পোড়া লাগে, তবু আমার ছেলে মেয়ের আব্দার আগে রক্ষা করবে। আমার ছেলেমেয়ের কাছে আমিও না (অর্থাৎ তুচ্ছ)।"

'বিয়ের দিন রাত্রেই বলেছিলেন আজ তোমাকে নিয়ে যাব। আর কোনওদিন তুমি এখানে আসতে চাইবে না। তুমি ১৯ বছর তোমার মায়ের কাছে ছিলে। যখনই দেখিতে ইচ্ছা হইবে, তখনই তাঁহাকে আনিয়া দেখাইব। আজ যদি আমার ছেলেমেয়েরা তোমার

সঙ্গ করিয়া শান্তি পায়, সেটাই তোমার শান্তি। আমি ঠিক সেই ভাবেই চলিয়াছি। বলিতেন আমি ওদের মাকে কিছুতেই ভুলিতে পারিব না। তুমি ইহাতে দুঃখ পাইও না। আমি বলিতাম তুমি তাঁহাকে ভুলিও না। তাঁহাকে মনে রাখিয়াই আমাকে ভালবাসিও তাহাতেই আমি সুখী হইব।

'বিবাহের ২/৩ দিন পরেই দেখিতাম, বিছানায় বসিয়া কাঁদিতেছেন। আমি যখন শুইতে যাইতাম রাত্রে যেন প্রায়ই এরকম দেখিতাম। আমি তখন কী বলিয়া তাঁহাকে বুঝাইব। কিছুই বুঝিতাম না। একেবারে চুপ করিয়া থাকিতেও পারিতাম না। ভাবিতাম তিনি হয়ত মনে করিবেন আমার দুঃখ দেখিয়া কী ও অভিমান করিয়া থাকে? আমি বলিতাম দুঃখ করিয়া যখন লাভ নাই, তখন এত কাঁদাকাটা করিও না। আমাকে যখন জীবনের সাথী করিয়াছ, তখন তোমার দুঃখের কথাগুলি আমার কাছে বল, কিছুটা তোমার দুঃখের ভাগ আমিও বহন করি। তুমি হয়ত মনে করিতেছ, আমি এসব কথা শুনিলে দুঃখ পাব। কিন্তু আমি তো প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছি তোমার দুঃখের ভাগ নেওয়ার জন্য। নুতন করিয়া তোমাকে কোনো শান্তি আমি দিতে পারিব না সেটা আমি জানি। কিন্তু অশান্তি তোমার করিতে পারিব এটাতো ঠিকই। কারণ যেভাবে তুমি চলিতে চাও, সেখানে বাঁধা দিলেই অশান্তি হবে। তোমার ছেলেমেয়েকে আদর যত্ন যদি না করি সেটাও তোমার অশান্তি হবে। তখন তিনি বলিয়াছিলেন একথা তুমি ঠিকই বলিয়াছ লাবণ্য। যে কোনওরকম অশান্তি এবং অসুবিধা হইলে স্ত্রীর কাছে আসিয়া যে রকম আশ্রয় পাওয়া যায়, সেরকম আর কোথাও পাওয়া যায় না। আমি আজ নিরাশ্রয়, তোমার কাছে আশ্রয় নিলাম। তখন আমার কাছে কাঁদিতে কাঁদিতে বাচ্চুর মা (অর্থাৎ তাঁর সতীন) সম্পর্কে অনেক কথা বলিয়াছিলেন।

'বলিয়াছিলেন আমি আমার বাবার একমাত্র ছেলে এবং এক বিশাল সম্পত্তির অধিকারী। কিন্তু (এরা) আমার লীলার সহিত (সতীন) যে ব্যবহার করিয়াছে সেটা আমি লিখিয়া রাখিলে একটা ইতিহাস হইত। আমার মা বোন এবং তাঁদের সহায়তায় অন্যেরাও তাহার সব সময় দোষ খুঁজিয়াছেন। আমার মনে হয় এদের অত্যাচারই তার এত তাড়াতাড়ি মৃত্যুর কারণ।

'তাই তোমাকে বলিতেছি তুমি (এদের) সৎমা হইয়া সংসারে ঢুকিযাছ তোমার উপর আরও অত্যাচার হইবে। এজন্য তুমি মন খারাপ করিও না। হয়ত আমিও তোমার খোঁজ খবর সব সময় নিতে পারিব না।'

সে যুগের প্রেক্ষিতে কথাগুলি বড়ই মনোমুগ্ধকর। কিন্তু আজকের বিচারে 'মা' নামক সেই ব্যক্তি'র কী মূল্যায়ন আমরা করব তা ভেবে পাইনা।

একদিন এই নিবেদন রহস্য ভেদ হল। মায়ের কাছে জানতে চেয়েছিলাম। এর অর্থ কি? এসব কেন? তখন অনেকটা বড় হয়েছি। মাও পরিণত বয়স্কা এবং সম্পূর্ণ গৃহিণী। বলেছিলেন, এর অর্থ বোঝানো বড় শক্ত। আমার মনের মধ্যে সেই প্রথমদিন থেকেই একটা কথা ঘুরপাক খাচ্ছে যে, দেখ, তোমার ঘর, তোমার সংসার, তোমার ছেলেমেয়ে

সব আমি দখল করে বসেছি। তোমার স্বামীও এখন আমার। তুমি আমার অপরাধ নিও না। আমি তোমার কাজই করে যাচ্ছি। নচেৎ আমি কেউনা, কিছুনা। তোমার ইচ্ছার মধ্যেই আমি ঢুকে পড়েছি।—মায়ের এই মানসিকতার কোনও পরিবর্তন তাঁর জীবৎকালে কোনওদিন দেখিনি। আমাদের পিছারার খালের দুই পারে কোনও ব্যক্তির দ্বিতীয় পক্ষে এমন কি তৃতীয় পক্ষেও বিবাহ কিছু কম ছিল না। কিন্তু সে সব স্থলে প্রয়াতার প্রতি জীবিতার মনোভাব যেসব শব্দে উচ্চারিত হত তার উল্লেখ না করাই ভাল। আবার সেসব ক্ষেত্রে প্রয়াতার সন্তানদের দুর্গতির কথাও বেশ মনে আছে। একারণে আমার মাকে অনেক বড় মাপের একজন মানুষী হিসেবেই স্মরণ করি, শুধু মা হিসেবে নয়।

তিনি লিখেছিলেন '...আমার নিজের মনে হয়, আমি খুব অসহিষ্ণু ছিলাম না, ঝড় ঝাপ্‌টা ঝামেলা আমার জীবনে কম আসে নাই, কিন্তু সবই আমি হজম করিয়া নিয়াছি। সাময়িক হয়ত কিছু সময় আমি দুঃখ পাইয়াছি, কিন্তু ঘরে অশান্তি না হয়, এ চেষ্টা আমি সব সময়ই করিয়াছি। কারণ এ জিনিষ (অশান্তি) আমি বেশী সময় সহ্য করিতে পারিতাম না।

'আমার (আজ) মনে হয়, আমার দাম্পত্য জীবনটা অনেকের চাইতেই একটু অন্য রকম ছিল। অনেক (অত্যাচার) সহ্য করিয়া যাহা পাইয়াছিলাম সে জিনিস বোধহয় সকলের ভাগ্যে জোটে না। আমি শান্তি পাইয়াছিলাম।'

মা আমাদের বাড়িতে নববধূ হিসেবে গৃহীতা হননি বটে। তবে একসময় গোটা গ্রামের মানুষদের কাছে সোনাবৌ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। পিছারার খালের বৈকালি জোয়ারের সময় তাঁকে আমি সাঁতার কাটতে দেখেছি, সে ছবি মনে আছে। আমার স্মৃতি চৈতন্যে এখনও দিব্য টাটকা ঐসব ছবি ধরা আছে যে তাঁর সাথে গাঁয়ের সোমত্ত মেয়ে-বৌরা কেমন হুটোপুটি করে জল খাবলাতো আর কলকলি জোয়ারি জলের সাথে সখীপনা করত। আজও আমার বুকের মধ্যে এইসব অলেখা আয়োজন এক ব্যাপক জমি জুড়ে যেন তাম্বু গেড়ে বসে আছে, আর যখনতখন সেই তাম্বুর ছাউনি থেকে বেরিয়ে এসে গান ধরছে—

আগো ধ-লা জল
ভালোনি আছে গো আমার
বাপ ভাই সকল
মোর বাপেনি চিন্তায় মোরে
ভাই এরা চঞ্চল?
আগো ধলা জল।

এ গান কবে শুনেছিলাম, আমার মা-ই গেয়েছিলেন কিনা আজ আর তা মনে নেই। তবে ছড়া কেটে কেটে এখনও তারা ঐ তাম্বুর ভেতর থেকে নাচতে নাচতে বেরিয়ে আসে, বলে 'ধলা জল জোয়ারের পানি—কোন দূরের থিকা আইছেন জানি,—তারা নি জানেন মোর বাপ-ভাই-এর কুশল। ধলা জলের মেলা কথা, যে বোজে তার বাজে ব্যথা, মুই বাপ সোয়াগী মোরও পরাণ নিত্য টলোমল।'

এ কারণেই পিছারার খালের ঐ 'ধলা' জলের আখ্যান। সোনাবৌ, বৌ হয়ে আসার পর, আর কি চট্ জলদি এই খালের উজানী সোঁতা, যে সোঁতা তাকে বাপের বাড়ির সোঁতাখালে নিয়ে যাবে, তা দেখেছেন? দেখেননি। একারণেই বৈকালে গা ধোয়ার সময় তাঁর তাবৎ কথা তো ঐ ধলা জলের সাথেই হত। যে ধলা জল তাঁর বাপের বাড়ির ঘাট ছুঁয়ে এসেছে। বৌদের বাপের বাড়ি যাওয়া যে ঝকমারির তা তো সবাই জানেন। তা সেকালেও যেমন একালেও কিছু কম নেই। কিন্তু একালে জোয়ারের 'পানি' ছুঁয়ে কোনও বৌ কি বাপের বাড়ির স্পর্শ পায় বা পেতে চায়? জানিনা।

আমার মা সোনাবৌ-এর 'গঙ্গাজল' লক্ষ্মীমণি বোষ্টমি 'খ্যানে অখ্যানে' তাঁকে দেহতত্ত্বের পদ শোনাত—

কারবা খাঁচা কেবা পাখি
কারে আপন কারে পর দেখি
কার লাগিবা ঝুরে আঁখি

তখন, মায়ের যেমন ভাব ছিল, তিনি কি এ গানেই তাঁর গঙ্গাজলের তত্ত্বের প্রত্যুত্তর করতেন—

নাইওর না গেলাম মুই
বছর বারমাস
ও মোর না পুরিলও মনের সাধও
না মিটিল আশ
মুই না দেখি বাপের মুখ
না দেখি ভাই ধনের সুখ
মুই না হেরি মায়েরও দুঃকও
পাণে হা হুতাশ

ধলা জল পিছারার খালে ধেয়ে এসে ঢোকে, আবার ধেয়ে নেমে যায়। সোনাবৌ যতক্ষণ গা ধোয় তাঁর শান্তি। কি? না, তাঁর বাপের বাড়ির পিছারার সোঁতা ধরে অনেক বড় বড় খাল, নদীনালা পেরিয়ে এই পিছারার খালে এসে তাঁকে শীতল করছে এই জল। সব আত্মজনের স্পর্শ মাখানো এই জল। এই বোধের নির্যাস নিয়েই বোধ হয় গহন বাংলার ভাটিয়ালি জগৎ জয় করে। কিন্তু সে যেথায় করে করে। সে কি তার এই বাণী নিয়ে সাধারণ্যে পৌঁছেছে? পৌঁছোয়নি। সে কারণে আমার মায়ের গান এই উপমহাদেশে কেউ শুনল না, জানলও না, ভাবলও না। আমার মায়ের মতো মায়েরা সবাই কোথায় যে হারিয়ে গেল?

—চার—

আমাদের ছোটবেলায় যেসব পুকুর আমাদের গাঁয়ে ছিল, সেগুলো আদৌ বদ্ধ জলাশয় ছিলনা। কোনও-না-কোনও খালের সাথে তার একটা সম্পর্ক সূত্র থাকত। এই সম্পর্ক

বা সংযোগ সূত্রটিকে আমাদের ওখানে বলা হত 'জান্'। শব্দটি যদিও বাংলা শব্দ নয়, তথাপি আমরা বাঙ্গাল বা বাংলা হিসেবেই তাকে জেনেছি। 'জান্' অর্থে প্রাণ। পুকুরের বা দিঘির প্রাণ তো ঐ সংযোগ সূত্র বা প্রণালিকাটিই হবে। আমি এমন কোনও দিঘি বা পুকুর বাল্যে দেখিনি যার একটি জান্ নেই।

আমাদের বাড়ির পিছনে একটি বেশ লম্বা পুকুর ছিল। সে যতটা লম্বা, ততটা চওড়া নয়। পিছারার খালের সাথে একটি জান্-এর দ্বারা সংযুক্ত। আমাদের এ বাড়ির বংশপুরুষ, রমাপতি সেন কবি বল্লভের সময়কালের পুকুর এটি। তখন সামনের বড় খাল ছিল হয়ত বিশাল এবং তামাম এলাকা ছিল গোলপাতা, সুন্দরী, গেউয়ার জঙ্গলে আচ্ছন্ন এক বনভূমি। কবি বল্লভ মশায় এ অঞ্চলে যখন প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন, তখন এই পুষ্করিণীর নাকি জন্ম, এবং সেই সময় থেকে আমাদের পরম্পরা শুরু। এসব শোনা কথা, কিংবদন্তি। তবে আমি যা দেখেছি তা বলছি। পুকুরটিতে একটি বাঁধানো ঘাট ছিল। সেই ঘাটের বাঁধানোতা আমার কৈশোরে যেটুকু লভ্য ছিল, তাতে আমার ঊর্ধ্বতন দশম পুরুষের অর্থাৎ কবি বল্লভ মশায়ের দাবি নাকচ করা সঙ্গত• হয় না। পুকুরটি এবং ঘাটটি প্রকৃতই প্রাচীন। তখন পিছারার খালটির 'গতর'ও বেশ হৃষ্টপুষ্ট। কেননা, ভূমি তখনও নবীনা। মহাশয় ছিলেন পার্শ্ববর্তী চৌধুরী জমিদারদের জ্ঞাতি ভাই। যাঁদের জমিনজায়দাদ বাদশাহি বা নবাবি সনদে, তামার পাতে। অনুমান হয় কবিবল্লভ মশাই কোব্‌রেজ ছিলেন। জ্ঞানত এইসব উপাধি কোব্‌রেজদেরই দেখেছি। কিন্তু অত পিছনে গেলে চলবে না। যেটুকু বলতে চাইছি তাই বলি। আমি ঐ ঘাটের ঘাটত্ব দেখেছি কিছু দাঁত বার করা ইটের সারিতে। বড়ই করুণভাবে। তার আকৃতিই তাকে ঘাট বলতে বাধ্য করে শুধু। তবে আসল কথা হচ্ছে ঘাটটি তখনও ছিল, এবং জান্‌টিও ছিল। ঐ ঘাটের উঁচুতে ছিল একটি লিচু গাছ। তারই তলায় মাটি খুঁড়ে, এলেবেলে সামগ্রী দিয়ে রান্নাবাড়ি খেলতাম আমরা, আশপাশ বাড়ির ছেলেমেয়েরা। তখন বোধকরি আমার বয়স পাঁচ পেরিয়েছে কি পেরোয়নি। ক্ষীণ স্মৃতি। পাড়ায় ডাক্তার বাড়ি কোবরেজ বাড়ি বা অমুক বাড়ি তমুক বাড়ির ছেলেমেয়েরা মিলে তখন কাদার পায়েস, কাদার পোলাও, কাদার তরকারি ইত্যাদি দিয়ে সেখানে নিত্য তিরিশ দিন মোচ্ছব করতাম। তখনও কেউ ওখানের চৌহদ্দি ছেড়ে কোথাও চলে যাবে এমন কার্যকারণ ঘটেনি। শুধু মাঝে মাঝে বড়দের কিছু দুর্বোধ্য আলোচনা কানে যেত, 'এহানে কি আর আমরা থাকতে পারমু? কাইলকার দ্যাশ আইজ বিদ্যাশ অইয়া গ্যালে। গান্দি এডা করলে কি?'

আমাদের মধ্যে যারা একটু বয়স্ক বয়স্কা, তারা এক সময় আস্তে আস্তে লিচু গাছ তলার খেলা ছেড়ে অন্য জগতে চলে যেতে থাকে। তখন আমার নজরে কিছু নতুন ঘটনা, এই পিছারার খালের আশপাশের বন বাদাড়ে দৃশ্যমান হতে থাকে, যার অর্থ আমার সম্যক বোধ্য হয় না। যৌনবোধের ব্যাপারটি স্বাভাবিকভাবে যখন আসা উচিত তার একটু আগেই বোধ হয় গ্রামীণ ছেলেমেয়েদের অথবা আমার কৈশোরক কালের

ঐ পরিবেশে এসে থাকে। কারণ অন্য ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রেও তো সেরকমই দেখেছি। যাঁরা মনে করেন পাঁচ থেকে সাত বছরের বালক বালিকাদের যৌনতা বিষয়ে কোনও অনুভূতি বা কৌতূহল থাকে না, তাঁরা বোধকরি স্মৃতি রোমন্থনে অপারগ। এসব বিষয়ে অভিভাবকেরা শিশুদের যত শিশু মনে করেন, তারা প্রকৃতপক্ষে যে আদৌ সে মতো 'বেহেস্তী আদম বা ঈভ' তা কিন্তু নয়। স্বকীয় অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই আমি এমন কথা বলছি। কিন্তু তা কি পূর্ণ যৌনজ্ঞান? তা অবশ্যই নয়।

আমাদের পাশের ডাক্তরবাড়িটিতে অনেকগুলোই যুবতী মেয়ে ছিল। তখনকার রীতি অনুযায়ী সহধর্মিণী যতদিন ফলপ্রসূ থাকবেন, ততদিনই সন্তানোৎপাদন অব্যাহত রাখা পুরুষদের যেন বিধেয় কার্য ছিল। তা শেষের জাতকটির জন্ম সময়ে হয়ত প্রথম জাতিকার যৌবনকাল দীর্ঘ সন্তাপে শেষ হতে চলেছে। পিতার তথাপি ভ্রূক্ষেপ নেই। এখন প্রথম জাতিকা যদি কোনও স্বভাবজ অসৈরণ আচরণ করে, তবে তার দুর্‌দুর্‌ ছিছি। অথচ মা বাপের আচরণকে কেউই অস্বাভাবিক বলে না। ডাক্তার বাড়ির যুবতী মেয়েরা আমাদের বয়সি ছেলেদের যেসব গল্প কথা বলত, তার বেশির ভাগ তাৎপর্যই আমরা বুঝতাম না। তারা কিন্তু বলতেও আনন্দ পেত এবং কখনও কখনও সেই সব গল্পের ব্যাখ্যান তথা তদনুয়ায়ী কৃৎকরণে উদ্যোগী হত। আমরা তখন নিতান্তই শৈশব ছাড়িয়ে কৈশোরে প্রবেশ করতে চলেছি। এই সময়ে, সঠিক স্মরণ করতে পারি না দেশ ত্যাগ করার কার্যকারণ খুব পরিপক্ক হয়েছিল কিনা। তবে দু-একটি পরিবার তখন গ্রাম ত্যাগ করেছে। পাকিস্তান নামক শিশু রাষ্ট্রটির দাঁত নখ ধারালো হয়ে উঠেছে। পিছারার খালের জগতের চৌহদ্দিতে ফাটল ধরেছে। ঐ সময় থেকেই কি আমার ঐ সবুজ ভূখণ্ডের সমাজে অবক্ষয়ের ফাটল ধরে গিয়েছিল? পুরুষ মানুষ, স্ত্রী মানুষ সবাই কেন যে তাদের সীমালংঘন করে একে অন্যের জগতে প্রবেশ করছিল, তা বোঝার বয়স তখনও আমার হয়নি। তবে যেটুকু জ্ঞান তখনও পর্যন্ত অর্জিত, তাতে পরে বুঝেছি, এই কু-আচার সমাজসিদ্ধ নয়। এটা একটা মাৎস্যন্যায়ী ব্যাপার।

আমাদের ঐ বয়সে যুবতীদের রহস্যাচরণ না-বোঝা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু ডাক্তার বাড়ির যুবতীরা যখন গঞ্জ থেকে আসা, তাদের কিছু তথাকথিত মামাদের সাথে ঘুরে বেড়াতো আগানে-বাগানে, তখন তাদের কিছু রহস্যাচরণ যেন আমাদের কৌতূহলের যৌনতার জগতকেই শুধু আলোড়িত করত, যদিও তখন তা আমাদের বোধগম্যতার আওতায় ছিল না। যৌনতা তখনও আমাহেন জনেদের স্বাভাবিক আকর্ষণ নয়। এ বিষয়ে কৌতূহলটাই তখন বাস্তব। যেমন, ঐ বাড়ির একটি মেয়েকে যেদিন আমি একটা তেঁতুল গাছের তলায় তার এক ঐরকম শহুরে মামার সঙ্গে জড়াজড়ি অবস্থায় দেখি তখনও জানি না যে ঐ মামা একজন বিবাহিত পুরুষ। দু-একদিনের মধ্যে শহর থেকে ঐ মামার এক ভাই যখন আমাদের গাঁয়ে এসে ধুন্ধুমার কাণ্ড করে তার দাদাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল, সেই সময়কার আলাপ আলোচনায় বুঝলাম, মামার ব্যাপারটা ঠিক মামাতো নয়।

তাদের ঐ 'শঙ্খবন্ধন' আমার চোখে পড়েছিল। আমার যৌনতার জগৎ, তখন এ রকম ক্রিয়ার বিষয়ে অভিজ্ঞ নয়। আমার মনে হয়েছিল মেয়েটি কিছু অন্যায় করেছে বলে, মামাটি তাকে শাস্তি দিচ্ছে। কিন্তু তা যে নিতান্তই ভুল সেটা বুঝলাম পরে ঐ মেয়েটি যখন আমাকে একগুচ্ছ কাঁটাবহরী অর্থাৎ বৈঁচিফল দিয়ে কড়ার করিয়ে নিতে চাইল যেন আমি একথা কাউকে না বলি। নারী-পুরুষের দৈহিক এই বিশেষ সম্পর্কটি বিষয়ে এই ছিল আমার প্রথম পাঠ। সে ছিল আমার তুলনায় অনেক বড়। অতঃপর এ বিষয়ে সে আমাকে অনেক কথাই বলেছিল। কিন্তু এব পিছনে যে করুণ এবং কদর্য কিছু ব্যাপার ছিল, তা শুনে আমি তখন এবং পরবর্তীকালেও খুবই যন্ত্রণা বোধ করেছি। যথা সময়ে সে প্রসঙ্গ আসবে। এখন খানিক পশ্চাৎ কথা বলে নিই।

শুরুতে যে নগেন ডাক্তার মশাই-এর কথা উল্লেখ করেছি, তাঁকে নিয়েই এই পশ্চাৎ কথা শুরু করা দরকার। মেয়েটির প্রসঙ্গে যে ডাক্তার বাড়ির কথা বললাম, সেই ডাক্তারবাবুর ডাক্তার হওয়া সম্ভব হয়েছিল নগেন মশাই-এর দয়ায়। নগেন মশাই এক সময় ছিলেন এক কিংবদন্তির ডাক্তার। পিছারার খালের সোঁতার পাশেই তাঁর ঘর গেরস্থালি আরোগ্যশালা। দীর্ঘ দেহ, আবক্ষ শুভ্র শ্মশ্রু, গৌরবর্ণ অনিন্দ্যকান্তি পুরুষ; সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত তথা আয়ুর্বেদ বিষয়ে ধন্বন্তরী। যুগানুযায়ী অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা শাস্ত্রেও বিলক্ষণ 'এলেম' এবং চিকিৎসা বিষয়ে নিত্য নতুন উদ্ভাবনা তাঁর নেশা। অন্য নেশার মধ্যে স্বহস্তে প্রস্তুত তীব্র শক্তির 'কোহল'। গ্রাম গ্রামান্তরে রোগীপত্তর যথেষ্ট, কারণ ঐ সব স্থানে কোনওকালেই পাশ করা ডাক্তার ছিল না। নগেন মশাই ছিলেন স্বয়ম্ভু ডাক্তার। কলেজে পাশ করা নন। তবে সবাই বলতেন যে মশাই প্রকৃতই চিকিৎসক ছিলেন। হাতুড়ে নন।

কোহলের ব্যাপারটা ছাড়া তার অন্য দোষ বিশেষ কিছুই ছিল না। দূর দূরান্তরে যেতে তার বাহন ছিল একটি ঘোড়া, নাম 'উড়ইয়াল মহারাজ'। তবে সে নাম নিতান্তই আদর করে রাখা, তার গমনের গতির জন্য নয়। তার এবং তার আরোহীর উভয়ের মেজাজই বেশ গয়ং গচ্ছ স্বভাবের। যখন রোগীর নাভিশ্বাস তখনও তাদের যেমন গতি, রোগীর সামান্য পীড়ায়ও তার কোনও ভিন্নাচার নেই। ভদ্দরলোকের এক কথা। তুমি মরতে বসেছ বলে, আমাদের পগারে পড়ে হাত পা ভেঙ্গে 'দ' হয়ে বসে থাকতে হবে এমন কোনও শাস্ত্রবাক্য নেই। তোমরা তোমাদের মতো চল। আমি আমার মতো। আবার ঘোড়ারও আছে নাকি মালিকের সেই বিশেষ ধাতটি। কোহলের নেশাটি মালিক এবং ঘোড়া উভয়ের। আরোহী যদি দূর পথে রোগী দেখতে যাবার সময়ে এক ঢোক আরক গলায় ঢালেন, ঘোড়া বলে, আমার চাই দুঢোক। ডাক্তার হিসেবে মশায় তার এ দাবি অন্যায্য মনে করেন না। মানুষ আর ঘোড়ার মাত্রা কি কখনও এক হতে পারে। যেমন এক জাত-রাখালকে চিকিৎসা করার সময় মশায় সাধারণ অপেক্ষা তিন গুণ বেশি মাত্রায় ওষুধ দিলে তাঁর এক শাগরেদ, হাহা করেন কি, করেন কি, বলে

চেঁচিয়ে উঠেছিল। তিনি তখন অম্লান বদনে বলেছিলেন, 'অর মাত্রা গবাদি পশুর হিসেবেই ধরতে হইবে। কেননা অর চরিত্রে খুব স্বাভাবিক কারণেই তাদের গুণ অর্শাইছে। বোজলা কিনা, অর দোয়াদশ দণ্ডকাল সোমায়তো গরুগুলার লগেই কাড়ে। হেকারণ অর মাত্রা মনুইষ্যের থিকা অদিক অইবেই—এডা জানবা। ইতর সংসর্গে প্রকৃতি ভিন্ন অয়। এয়া শাস্তর। ভিন্ন প্রকৃতিতে ভিন্ন ভেষজাচার।'

কিন্তু পগারে তাঁরা উভয়েই মাঝে মধ্যে পড়তেন। তখন ঘোড়া বলে 'আমায় তোল' আরোহী বলেন 'আমারে উডা' অনেক সময় রাত কাবার হয়ে যেত এই ওঠা-উঠির পর্বে। ভোর সবেরে সর্বাঙ্গ পঙ্কবিভূষিত হয়ে কন্টকে চর্চিত দেহ, মশায় এবং ঘোড়া বাড়ি ফিরতেন। তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ আমাদের নগেন জেঠিমার শাপশাপান্ত শুনে আমরা বুঝতে পারতাম এতক্ষণে মশায় ফিরেছেন। পাড়ার অবনী কাকু এবং দাস জেঠা, জেঠিমার আওয়াজ শুনে যখন সেখানে যেতেন আমরা বালখিল্যরাও রগড় দেখতে হাজির হতাম। নগেন জেঠা তখন তাঁর উঠোনের বেল গাছটার তলায় আধাচিৎ। ঘোড়াটা অদ্ভুত ভঙ্গিতে তার সামনের ঠ্যাং দুটো বিস্তারিত করে যেন বেশ স্নেহার্ত নয়নে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। অবনী কাকু আর দাস জেঠা এসে শুধোতেন, ও দাদা, আপনের কি অইছে? আপনে গড়াইতে আছেন ক্যান? জেঠিমা বলতেন, অইছে এ্যারগো মাথা। কাইল রুগী দ্যাখথে যাইয়া হারারাইত পগারে পড়ইয়া আছেলেন দুই জোনেই। এহন আইছেন। এই দ্যাহ, এডা খালি।—নগেন মশায় এতক্ষণে চৈতন্যে এসে বলেন, হরিবলরে ভাই, সংসার সকলি জলময়। অবনীকাকু এবং দাস জেঠা বলেন, এডা আপনার অন্যায্য কাম দাদা। এহন বয়স অইছে একটু বোজন লাগে। হেয়া যাউক, কাইল গ্যাছেলেন কৈ?

: কদ্‌মার পোলারে দ্যাখথে।

: হ্যার অইছে কি?

: কইলে বুজবি? প্যাডেতো 'ক' অক্ষর গোমাংস ভাবইয়া হান্দাওই নায় একবন্ন। বুজবি কোন কাফা। তথাপি দুজনেই পীড়াপীড়ি করলে সবিস্তারে কদমের ছেলের রোগ, সেখানে গভীর রাত অবধি বসে থেকে তার চিকিৎসা করণ এবং বিপদ কাটলে তাঁর বাড়ি ফেরার প্রচেষ্টার কথা বলেন। পরে দাস জেঠাকে বলেন, নিজেও তো টুকটাক ডাক্তারির চেষ্টা করতে আছো। আইজ থিকা আমার কম্পাউন্ডারিটা ধর। আখেরে কাম অইবে। আমি একলা আর সামলাইতে পারতে আছি না।

তদবধি দাস ডাক্তার এবং তাঁর বাড়িটা ডাক্তারবাড়ি।

নগেন মশায়ের কাছে কিছুকাল কম্পাউন্ডারি করে এবং তালিম নিয়ে দাস জেঠা একসময় নিজেই একজন ডাক্তার হয়ে বসেন। তখন নগেন মশায় অতিবৃদ্ধ। স্থবির প্রায়। উত্তরাধিকার সূত্রে মশায়ের চিকিৎসার এলাকায় দাস জেঠার দখলদারি হয়। তাঁর ছোট ভাই গঞ্জে একটি বেশ ডাঙ্গর ঔষধের দোকান দিয়ে সেকালে মবলগ দু'পয়সার অধিকারী। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা গাঁয়ের বাড়িতে থাকে, গঞ্জে বাসাবাড়ি করে তাঁর

বাণিজ্য চলে। জেঠা, যাঁকে অতঃপর ডাক্তার জেঠা বলেই উল্লেখ করব, তাঁর ডাক্তারির তাবৎ ওষুধ ছোট ভাই-এর ওখান থেকেই আনেন। একান্নবর্তী পরিবার। এইসব ব্যবস্থাপনায় তাঁদের সংসার তখন স্বাচ্ছন্দ্যের শীর্ষে। ডাক্তার জেঠার বাড়িতে তখন এব্‌লা কাছিমের মাংস তো ওব্‌লা বোয়াল মাছের রগরগা ঝোল। এভাবে চলছিল বড় চমৎকার। আমাদের তখন তাবৎ লীলা খেলার স্থান ও-বাড়ির বিশাল উঠোন। ছোট বৌ বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে কখনো বাড়িতে কখনো গঞ্জের বাসায়। তবে তাঁর বড় অংখার। তাঁর 'সোয়ামি'র ওষুধের দৌলতেই তো ভাসুরের এই রমরম 'প্যাকটিস'। নইলে শুধু ডাক্তারি জানলে আর ক'পয়সা? ভাই 'ছাপ্লাই' দেয় বলেই না মিনি মাঙ্নার ওষুধ, যার এমনি দাম গঞ্জে তিন পয়সা, তা গাঁয়ে বিকোয় তিন আনায়। নেবে তো নাও, না নেবে গঞ্জের থেকে আন। একারণে ছোট বৌ ক্রমশ আত্ম-ভবিষ্যৎ হিসেব করেন। এতগুলো ভাসুরঝি, তাদের বিয়ে যদি 'ছোডো জোনের' ঘাড়ে গস্ত হয় তবে তো তাঁর নিজের এবং সন্তানদের ভবিষ্যৎ 'ফাডা'। তাই একসময় ডাক্তার জেঠার পসার মার খেতে থাকে ও বাড়িতে নিত্য তিরিশ দিন ঝগড়ার সূত্রপাত হয়। ছোট বৌ-এর চাপাগলা তীক্ষ্ণতায় মাত্রা পায়। ডাক্তার জেঠার স্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠ এবং স্বভাবজ 'গাইল খামার' ক্রমশ উচ্চনাদী হয়। কিন্তু সে বিষয়ে পরে আসছি। আসল ব্যাপারটি বলি। ছোট বৌ একসময় গঞ্জে গিয়ে অনড় হন। একদা কোনও একটা ঝগড়ায় ভাসুরকে তিনি সামনাসামনিই বলে ফেলেন, 'ভাসুর না বাছুর'। অতঃপর তাঁর গঞ্জে গমন এবং আলাদা হওন আবশ্যিক হয়।

তখনও ডাক্তার জেঠার পসার এমন কিছু কম নয়। কারণ ও দিগরে ডাক্তার বগ্‌গে আর কেউ নেই। নগেন মশায় অবশ্য তখনও দেহে কিন্তু গৃহে নেই। বৃদ্ধ হয়েছেন। অতিবৃদ্ধ। একমাত্র পুত্র হীরা বাতে পঙ্গু। নাতিদের শিক্ষা-সংস্কার কিছু নেই। সংসার অচল। রোগী পত্তরের অসদ্ভাব। একসময় বাড়িখানা বিক্রি হয়ে যায়। সপরিবারে তখন তাঁদের অবস্থান হয় আমাদের বাড়ির পশ্চিমের দালানে। দালান বলতে এক্ষেত্রে পাকা বাড়ি বুঝতে হবে। একতলা, তিন চারটি কক্ষযুক্ত বাড়ি। আমরা বলতাম পশ্চিমের ঘর। ঘর অর্থে বাড়ি। তবে তা আমাদের চৌহদ্দির মধ্যে এবং দখলে। সেখানে কিয়ৎকাল স্থিতি করে মশায় সপরিবারে গঞ্জের এক আঘাটায়। তারপর আর খবর জানি না।

দাস জেঠা ডাক্তার হিসেবে পসার জমিয়ে ফেলেছিলেন তখন। আগেই বলেছি, ঐ বাড়িটি বাল্যে কৈশোরে অসামান্য আকর্ষণের স্থান ছিল। আকর্ষণের প্রধান হেতু ছিল ঐ বাড়ির একটি বিস্তৃত খেলার অঙ্গন। তখন পঞ্চাশের শুরুয়াৎ। গ্রাম ইতস্তত খালি হয়ে চলেছে। তথাপি যে কয়েকটি পরিবার আছে সেসব বাড়ির ছেলেপুলেরা, আমরা, ঐ অঙ্গনে তখনকার দিনে 'পলাপলি', 'কানামাছি', 'উপেন টি বাস্ক' ইত্যাদি খেলতাম। ডাক্তার বাড়ির মেয়েরা অনেক ধরনের খেলাধুলো জানতো। তাদের মামাবাড়ি ছিল বরিশালের শহর ঘেঁষা কাশীপুর গ্রামে। তারা প্রায়ই মামাবাড়ি যেত, আর ওখান থেকে শিখে আসত ঐসব খেলা। আমরা হরবখত কেন, কখনই মামাবাড়ি

যেতে পারতাম না। ওরা যখন ওদের মামাবাড়ির নানা গল্প, খেলাধূলার খবর আমাদের বলত, বড় হিংসা হত। একটি মজার খেলা, ওদের কাছে শিখে আমরা ওখানে খেলতাম। খেলাটির নাম 'উপেন টী বাক্স'। খেলাটি একটি ছড়ার মাধ্যমে শুরু হত—

উপেন টী বাক্স
রাইটানা ট্যাস্কো
বিবিয়ানা চুলটানা
রাজেনবাবুর বৈঠকখানা।
রাজবাড়িতে যেতে
পানের খিলি খেতে
পানের মধ্যে মরিচবাটা
ইস্কাবনের ছবি আঁটা।*

ছড়াটির বোধ হয় কোনো 'সাহেবি' কৌলীন্য এককালে ছিল। উপেন টী বাক্স এবং রাইটানা ট্যাস্কো কথা দুটির মধ্যে তার আভাস পাই। কথা দুটি বোধ হয় 'চা'-এর প্রচলন কালের কোনও বিজ্ঞাপনি পদ্য থেকে নেওয়া হয়ে থাকবে। 'ওপেন টী বক্সেস/রাইট এণ্ড অ্যাকসেস'-এরকম পাঠেই একমাত্র এর অর্থন্যাস হয়। অবশ্য বাকি পদসমূহের অর্থকরণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

আমাদের মতো নাবালক-নাবালিকা ছাড়াও যারা ওখানে তখন যথেষ্ট ডাঙ্গর, তারাও ঐ বাড়িতে যথেষ্ট ভিড় জমাতো। গঞ্জের মামাদের আকর্ষণের সাথে গাঁয়ের উঠতিদের আকর্ষণের একটা কার্যকরণ সম্পর্ক যে এ ব্যাপারে ছিল, তা পরে বুঝেছি। কিন্তু দাস জেঠার পসার যতদিন শাঁসে জলে ছিল, যতদিন গঞ্জের দোকান থেকে ওষুধের সরবরাহ অব্যাহত ছিল ততদিন এ বাড়িতে এ ধরনের কদাচার শুরু হয়নি। এই বাড়িটি তখন প্রকৃতই একটি গৃহস্থ বাড়ি ছিল। এ বাড়ির মেয়েরা ব্রত, উৎসব, খেলাধুলো এবং সাধারণ ঘর গেরস্থালিতে বড় আনন্দময় জীবন যাপন করত, আমরাও সেই উৎসবের অংশী ছিলাম। সে সময়কার মাঘমণ্ডল, তারার ব্রত, তিল কুচারী ইত্যাদির কথা আজও মনে আছে।

এ বাড়ির সামনের অঙ্গনে আঁকা মাঘমণ্ডলের ব্রত চিত্র আমাদের বড় মোহিত করত। এখনও যেন চোখ বুজলে সেই আল্পনায়িত অঙ্গন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এখনও মাঘের ভোরে ঘুম ভেঙে গেলে যেন শুনতে পাই মাঘমণ্ডলের ঐ 'গৌরীরা' সমস্বরে গাইছে—

যে জল ছোঁয়নালো
কাগে আর বগে
সেই জল ছুঁইলাম মোরা
দুব্বার আগে।

মনে হয়, যেন এক্ষুনি আমরা, পাড়ার ছেলেদের দঙ্গল, ডাক্তার বাড়ির ঐ ব্রতের অঙ্গনের উদ্দেশে ছুট লাগাব। দাস জেঠা সেখানে আমাদের সবার জন্য বাঁশ পাতার

*ছড়াটির অবশ্য অঞ্চলভেদে পাঠান্তর আছে। তবে, আমাদের ওখানে এটিই চালু ছিল।

অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে রেখেছেন, যাতে আমরা আগুন পোহাতে পারি। গৌরীরা এক্ষুনি আমাদের বলবে, 'তোরাও আমাগো লগে গা'।—আমরা সেসব দিনে অবশ্যই গাইতাম ওদের সাথে। নচেৎ ওরা যখন 'আম কাঁঠালের পিঁড়ি' ভাসাবে, তখন তো আমাদের নাম বলবে না, বা অন্য সময় পরণ কথার গল্পও বলবে না। ব্রতশেষে রোজ তারা কাঁঠালের কুসীর নৌকো ভাসিয়ে গাইত—

আম কাঁঠালের পিঁড়িখানি
গঙ্গাজলে ভাসে
আমার ভাইধনেরা
সেই পিঁড়িতে বসে।

আমরা তখন তাদের অনুরোধ করতাম, আমাদের নাম আলাদা আলাদা করে বলতে। তারা তখন গাইত—

আম কাঁঠালের পিঁড়িখানি
গঙ্গাজলে ভাসে
আমার ভাই অমুক
সেই পিঁড়িতে বসে।

সেই বয়সটায় মেয়ে পুরুষের বিভাজন থাকে না। সে কারণে আমরা নির্মল শৈশবের অকৃত্রিম আনন্দের আস্বাদ পেতাম।

কিন্তু এ বাড়ির সবচেয়ে বড় দোষ যেটা ছিল, তা হচ্ছে মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে কত্তাদের উদাসীনতা। ডাক্তার জেঠার ছ'জন মেয়ের মধ্যে শুধু বড় জনেরই বিয়ে হয়েছিল। তখন তার বয়স অনেক। সে অবশ্য দেশের বাড়িতে থাকত না। মামাবাড়ি না কোথায় যেন থাকত এবং সেখান থেকেই তার বিয়ে হয়েছিল। মেজো মেয়ের বিয়ে যখন হল তখন ডাক্তারের পড়ন্তকাল প্রায়। কোনোরকমে নমো নমো করে বিয়ে। তারপরে আরও চারজন। তাদের সবারই বিয়ে থা এক সময় হয়েছিল, কিন্তু স্বজাতির মধ্যে নয়। ডাক্তারের তখন অবস্থা একান্তই খারাপ। ঐ সময়েও নিম্ন জাতীয় লোকেরা উচ্চ জাতীয় কন্যা বিবাহ করলে কন্যাপণ দিত। ডাক্তার জেঠা পরবর্তী এই চার মেয়ের বিয়েতেই কন্যাপণ নিয়েছিলেন। যতটুকু সমাজ তখনও এ অঞ্চলে অবশিষ্ট ছিল, সেই সমাজ তাঁকে এ জন্য রেয়াৎ করেনি। কিন্তু জেঠার উপায় ছিল না।

প্রথমত ছোট বৌ গঞ্জে স্থায়ী হলে তাঁর ঔষধ সরবরাহে বাধা পড়ে। দ্বিতীয়ত তখন গ্রাম শূন্য-প্রায়। ডাক্তার জেঠা বৃদ্ধ হয়েছেন, দূর দূরান্তরে যেতে পারেন না। রোগী পত্তরের অসদ্ভাব। তাই কোনরকমে মেয়েদের একটা গতি করলেন, যেমন ঘরেই হোক। কিন্তু এ অনেক পরের কথা। প্রকৃত সমস্যা শুরু হয়েছিল, যখন ছোট ভাই যিনি গঞ্জের বাজারে বাসা বাড়ি নিয়ে থাকতেন, হঠাৎ করে মারা যান। তিনি মারা যেতে ঔষধের সরবরাহ একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। উপরন্তু কিছুদিন বাদে দোকানের একটা বন্দোবস্ত করে, ছোট বৌ তাঁর পুত্র-কন্যা নিয়ে এসে বাড়িতে হাজির। তখনও

জেঠার চার মেয়ের বিয়ে বাকি। দুটি ছেলে নিতান্ত শিশু। ছোট বৌ গঞ্জের বাসা বাড়িটি রেখে দিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে গিয়ে থাকতেন। মহিলা বাইরের মানুষদের সাথে অত্যন্ত নম্র ভদ্র ব্যবহার করতেন। কিন্তু বাড়িতে ক্রমশ হয়ে উঠলেন রণরঙ্গিণী। এখন সংসারের মূল ক্ষমতা তাঁর নিজের হাতে। দোকানে কর্মচারী রেখে কাজ চালান। মাসে একবার দুবার গিয়ে, একে তাকে দিয়ে হিসেব পরীক্ষা করিয়ে কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নেন। এসবই ঠিক ছিল। কিন্তু একদা তাঁর জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন হলে, তিনি দেখলেন যে সংসারে ঝগড়া করাটাই কিছু পরমার্থ নয়। বরঞ্চ কাঁচা মাংস কাঁচা পয়সা আনে। তিনি অতএব পয়সাকে আরাধ্য করলেন কাঁচা মাংসের বিনিময়ে। পয়সায় পয়সা ব্যবসায়ের মাধ্যমে আনার বুদ্ধি তাঁর ছিল। এক্ষণে কাঁচা পয়সার দিকে তাঁর নজর পড়ল। চোখের সামনে ভাসুরঝিদের মধ্যে তিনটি বেশক কাঁচা মাংসল যুবতী। সুতরাং তাঁর মনে বাণিজ্যবৃত্তির উদ্যোগের আবহসঙ্গীত বেজে উঠল—

আয়লো অলি কুসুম তুলি
বাবুর বাগানে।

ছোট বৌ দেখলেন, ভাসুরঝিরা বেশ ডাগর ডোগর ডব্‌কা। তাদের তখন 'কান্ত কাল্গুন, কাম দারুণ' অবস্থা। গ্রামের উঠতি যুবকেরা আসে, গল্পসল্প করে, তাদের লালা ঝরে। ঝরে ভাসুরঝিদেরও। কিন্তু চেনা জানার মধ্যে তখনও এমন কিছু সুবিধে সুযোগ তৈরি হয়নি যে, 'ঐ দেহমূলে অনঙ্গ মথিব অঙ্গেরও লইব সাদ' এমত প্রকরণে স্বীয় 'পিরীতি'-র আখর টানবে কেউ। তখনও পিছারার খালপাড়ের জগতের ততটা দীনদশা হয়নি। ছোট বৌ হিসেব করলেন, গঞ্জের লোকেদের কে চেনে, এই পিছারার খালধারে? তিনি অকালে বিধবা হলে, যেহেতু তাঁর একটি সুন্দর আয়ের সংস্থান ঐ ঔষধের দোকানটি ছিল তাই অনেক অবস্থাপন্ন ভাই জুটে গিয়েছিল তাঁর যারা তাঁকে ঐ গঞ্জের শহরে দেখভাল করত। অতএব, একসময় তিনি ভাবলেন যে তাঁর এইসব ভায়েরা যদি গ্রামের বাড়িতে মাঝে মধ্যে আনাগোনা করে, তবে গাঁয়েও তার প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায় এবং কিছু অনিবার্য কার্যকারণ সংঘটনে দুটো পয়সাও বাড়তি আয় হতে পারে।

আমি ছোট বৌ-এর বাসাবাড়িতে বেশ কয়েকবার ইতিপূর্বে গিয়েছিলাম। আমাদের তখন তালুকদারির জীবন শেষ। নানা ফন্দি-ফিকির করে সংসারের অন্ন জোটানোর কাজ করতে হত। তার মধ্যে একটি কাজ ছিল জঙ্গল থেকে শটী তুলে এনে, পরিষ্কার করে টিনের আক্‌সায় ঘষে জলে থিতান করে করে পালো তৈরি করা। এপারে এসে শটীফুড বলে একটি বালখাদ্যের নাম শুনেছি। বোধহয় সেই বস্তুটি আমাদের সেই শটীর পালো। বস্তুটি বার্লি জাতীয়। যতদূর জানি, এখনও চাষে আসেনি, নিতান্ত জংলা। কিন্তু আমাদের এলাকায় তার স্বাভাবিক সৃজন অসুমার ছিল। আমরা একসময় এই বস্তুটিকে আর্থিক রোজগারের জন্য আশ্রয় করেছিলাম। অনেক ক্লেশের সেই পালো নিয়ে আমাকে শৈশবের সেই সব দিনে যখন গঞ্জে বিক্রি করার জন্য যেতে হত, তখন ঐ ছোট বৌ-এর বাসা বাড়িতে আমি কখনও কখনও রাত্রি যাপন করতাম।

'পালোটা' তিনিই কিনে নিতেন ওজন করে। কিন্তু সে ওজনের মা-বাপ থাকত না। বাড়তি মাপটুকুকে তিনি বলতেন, এটুক আর মাপার কি আছে, বোঝতেই পারতে আছি, দিদি এটুক আমারে খাইতে দিছেন। মহিলা ছিলেন এমনই এক হিসেব-নিকেশের মানুষ।

ছোট বৌ-এর বাসার সামনের গলির মধ্যেই ছিল বেশ্যাপল্লী। তাঁর জানলায় বসে ঐ পল্লীর লীলাখেলা দিব্য দেখা যেত। ওঃ কি ভয়ানক হুল্লোড়ই না সেখানে হত এবং কত রকমের চরিত্রই না সেখানে দেখা যেত ! মনে আছে, একজন, 'হোৎকা' মোটালোক সেখানে যেত। আমি তখন প্রায়ই 'পালো' বিক্রি করতে গঞ্জে যেতাম এবং ঐ ছোট বৌ-এর বাসা বাড়িতে রাত কাটাতাম। সন্ধে হলেই আমি, ওদের জানলাটির ধারে চুপটি করে বসে থাকতাম। ছোট বৌ মাঝে মধ্যেই এসে জিজ্ঞেস করত, 'ওয়া এত দ্যাহকি অ্যাঁ? ওয়া দেহন নাই। ওয়া অসইব্য।' কিন্তু আমি দেখতাম ঐ হোৎকা লোকটি এসেই হাঁক পাড়ত, 'বিলাই, বিলাই, ওমোর বিলাই, আয়ো, হারমনিয়ামডা বাইর কর।' বিলাই এসে হারমোনিয়াম বের করে দিয়ে নিজের কাজে চলে যেত। সেই মাতাল তখন গাইতে বসত—

প্রেম একবার এসেছিল নীরবে—

মদালস কণ্ঠে সে অনেকক্ষণ ধরে এই সঙ্গীত সাধনা করত। ছোট বৌ বোধ করি, তাঁর এই প্রতিবেশীদের নিত্যকর্ম সন্দর্শনে কর্মপন্থা স্থির করে থাকবেন। তারপর থেকেই গাঁয়ের বাড়িতে তাঁর ভাইদের অর্থাৎ এ বাড়ির মামাদের আগমনের সূত্রপাত হয়। ছোট বৌ এভাবে তাঁর রোজগারের পথ প্রশস্ত করেন। আমরা যারা শহর-গঞ্জ বা নগর জীবনের তেমন খবর রাখতাম না তারা সেকারণেই এ বাড়ির বিষয়ে ততটা দুশ্চিন্তিত ছিলাম না। কিন্তু এসব ঘটনা বেশিদিন চাপা থাকে না। শহরের যেসব মধুপায়ীরা এখানে নিয়মিত এসে থাকত, একসময় তাদের পরিবারস্থ লোকেরা এসে হুজ্জোত বাধিয়ে দিল। এদের মধ্যে বেশির ভাগ লোকই ছিল বিবাহিত। অতএব তাদের আত্মজনেরা এসে এই মামাত্ব ব্যাপারটার ইতি করে দিলে ছোট বৌ-এর ঈদৃশ ব্যবসা চোট খায় এবং তিনি একসময় গঞ্জে ফিরে যান।

অবাক কাণ্ড এই যে আমাদের গ্রামের কর্তাব্যক্তিরা এ ব্যাপারটা নিয়ে কিছুমাত্র আলোড়ন করলেন না। তাঁরা যে এরকম একটা অনৈতিক কর্মকাণ্ডকে প্রশ্রয় দিতেন তা নয়। তবে তখনকার আর্থিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় পরিবস্থা তাঁদের করে তুলেছিল অসম্ভব উদাসীন। তাঁরা শুধুমাত্র নিজেদের আহার, বস্ত্র সংগ্রহ এবং দৈহিক সুরক্ষা ব্যতীত সমাজ জীবনের কোনও দায়দায়িত্বের প্রতিই মনোযোগী ছিলেন না। কোনও বিষয়েই যেন তাঁদের মন ছিল না।

—পাঁচ—

আমার এই আলেখ্যের জন্য সময়কাল হিসেবে আমি ন্যূনাধিক দশ বছরের মতো একটা পরিসর নিয়েছি। সেই দশ বছর সময়কালটি উনিশশো একান্ন-বাহান্ন থেকে উনিশশো

বাষট্টি-তেষট্টি পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সময়টায় আমি শৈশব, কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনের দরজায় সবে পা দিয়েছি। পাকিস্তান তখনও শিশু রাষ্ট্র। আমার অভিজ্ঞতার দৌড় পিছারার খালের চৌহদ্দি থেকে শুরু করে বরিশাল শহর পর্যন্ত। অতএব, এমন দাবি করি না যে এ আলেখ্য তদানীন্তন গোটা পূর্ব পাকিস্তানের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমাজেতিহাস। আঞ্চলিক অবস্থা বর্ণনা করার জন্য আমি শুধু পিছারার খালের দুধারের দু-একটি পরিবারকে বেছে নিয়েছি এবং আমার ব্যক্তি হিসেবে বেড়ে ওঠার আলেখ্য দিয়ে তখনকার সংখ্যালঘুদের অবস্থা বর্ণনা করতে চাইছি। আমার পরিবার ওখানে যেহেতু নানা কারণে একসময় গুরুত্ব পেয়েছিল, সেকারণে তার নানাবিধ আখ্যান আমি অবলম্বন করেছি। বিশেষত একটি ঘোষিত সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে, আমার মতো একটি সংখ্যালঘু সমাজের কিশোরের কী ধরনের সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে পথে চলতে হয়েছিল তারই আলেখ্য এটি। তালুকদারি মধ্যস্বত্বভোগীদের তখন নাভিশ্বাস। রব উঠেছে মধ্যস্বত্বলোপ আইন পাশ হচ্ছে। সরকার ইতিমধ্যেই জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করেছে । ফলে আমাদের বাড়িতে দীয়তাং ভুজ্যতাং-এর দিন গত। খাওয়াদাওয়ার মূল বস্তু অর্থাৎ ধান-মান-কলা-কচু গুড় মরিচ ইত্যাদি তখনও ছিল। কিন্তু রসনাতৃপ্তিকারী আহার নিতান্ত অপ্রতুল। হলেও কালে ভদ্রে বা পূজা পার্বণে।

আমার ডাক্তার বাড়িতে যাতায়াতের অন্যতম আকর্ষণ ছিল এই যে সেখানে গেলেই 'দুর' 'কাছিম' বা 'কাডউয়ার' মাংসের মুখরোচক কিছু-না-কিছু পাওয়া যেত। আর একটা আকর্ষণ ছিল ডাক্তার জেঠার সংগ্রহের কিছু বই পুস্তক। আমাদের বাড়িতে একটা ঘরে প্রচুর বই পুস্তকের আয়োজন ছিল। বাড়ির চাকরবাকরেরা আমাদের পড়তি কালে ঐ সব বই-পত্তর বান্ডিল বান্ডিল বাজারের মুদিখানায় বেচে দিত সের দরে। এটা তাদের আয়ের একটা বাড়তি উৎস। এসব ঘটনা আমার জ্ঞান হওয়ার অনেক আগে থেকেই চলে আসছিল। এদিকে নজর দেওয়ার মতো কেউ ছিল না। তখন আমাদের বই-ই প্রায় ভিক্ষে করে আমাকে পড়তে হচ্ছিল। ডাক্তার জেঠা ঐসব চাকরদের কাছ থেকে পছন্দমতো কিছু বই সংগ্রহ করে রাখতেন। ভাগ্যিস তিনি সেসব রেখেছিলেন। তাইতো ওগুলি তখন পড়তে পেতাম। এ কারণে ডাক্তার জেঠার প্রতি কি যে কৃতজ্ঞ ছিলাম ! এভাবেই বিজয়বসন্ত, স্বর্ণলতা, অমর গ্রন্থাবলী, নারায়ণ চন্দ্রের গ্রন্থাবলী, ছেলেদের মহাভারত, রামায়ণ, বাঁধানো প্রবাসী, বঙ্গবাণী, ভারতবর্ষ, বঙ্গদর্শন ইত্যাকার কত বই-ই না পড়েছি, তাঁর সংগ্রহ থেকে নিয়ে। বলতেন—'মুই কেউরে কৈলম বই দিনা। তয় এইসব বই তোমাগোই তো, হেকোরন তোমারে দেওনে দোষ নাই। পড়বা, ফেরত দেবা।' বাবাকে বলতেন—'অর পড়াশোনায় মতিগতি বেশ ভাল। অরে এট্টু ইস্কুলে দেন।' কিন্তু কে কাকে ইস্কুলে দেয়? সামন্ত বিক্রমের যে তখন নাভিঃশ্বাস সে কথা আগেই বলেছি। এই নাভিঃশ্বাসের কারণে তাঁদের রুচিরও বিকৃতি ঘটতে শুরু করেছে। বাড়ির ছেলেমেয়েদের কোনও ব্যাপারেই তাঁদের

চিন্তাভাবনা নেই। শিক্ষা তো দূরস্থান। তাঁদের দুটো জিনিসই তখন আছে। একটি অতি প্রাচীন ধ্বংসোন্মুখ অট্টালিকা এবং সেই অট্টলিকার প্রতিটি ইটের খাঁজে সাজানো এক কিংবদন্তির আভিজাত্য। কত কঠিনভাবেই না সেই সময় আমরা এই মিথ্যে আভিজাত্যের মূল্য দিয়েছি, সে ইতিহাস বর্ণনা দুরূহ।

আমার বাড়ির কর্তারা সে সময়টায় যে জীবনযাপন ধ্রুব করে নিয়েছিলেন, সেইসব খুঁটিনাটি এ বয়সেও অসম্ভব গ্লানি আর মনঃপীড়ার কারণ। মধ্যস্বত্বলোপ আইন তখন জারি হয়। ইতিপূর্বের দাঙ্গার প্রকোপ এ সময় স্তিমিত থাকলেও, সংখ্যালঘুরা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দুর্ভাবনায় ক্রমশ পশ্চিমবাংলার দিকে চলমান। যাঁরা চলে যাচ্ছেন, তাঁদের ভদ্রাসন, সাজানো বাগান, বাঁধানো ঘাট এবং পুরুষানুক্রমের তাবৎ ঐতিহ্য তথা সঞ্চিত সম্পদ পরিত্যাগ করে কিংবা নামমাত্র দামে বেচে দিয়ে দেশত্যাগ করছেন।

আশপাশ মুসলমান গ্রামগুলিতে যথেষ্ট উচ্চবিত্ত মুসলমান পরিবার বিশেষ ছিল না। মাঝারি মাপের যারা তারাই এখন সব ছেড়ে যাওয়া হিন্দুদের সম্পদ নিয়ে নিজেদের ঘর এবং জীবন সাজাতে চেষ্টা করছে। এই সময়টা থেকে বড়, মাঝারি এবং কিছু ছোট কৃষক পরিবারও ছেড়ে-যাওয়া হিন্দুর সম্পত্তির পড়ে-পাওয়া চৌদ্দ আনায় বেশ সচ্ছল হয়ে ওঠে। রাতারাতি তাদের বাড়িঘরদোরের চেহারা বদলে যেতে থাকে এবং তারা বেশ হোমড়া-চোমড়া হয়ে দাঁড়ায়। আমার এই উজানি খালের সোঁতার এক কিনারেই ছিল আমাদের এলাকার ইস্কুলটি। তিনটি গ্রামের নামের আদ্যক্ষর নিয়ে ইস্কুলের নাম। ছাত্ররা ছিল বেশির ভাগ হিন্দু। মুসলমান জোতদার এবং তালুকদারদের ছেলেরাও কেউ কেউ সেখানে পড়তে আসত দূর দূর গ্রাম থেকে। একান্নর দাঙ্গার পর থেকে ইস্কুলটি আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যায়। এই ইস্কুলটি বন্ধ হওয়ার সাথে আমাদের এলাকার ভদ্রহিন্দু গৃহস্থদের দেশ ত্যাগের সম্পর্ক আছে। সেসব দিনের কথা স্মরণ করতেও বড় কষ্ট হয়। পাশাপাশি প্রায় হাত ধরাধরি করে তিনটি গ্রাম যেন তিনটি বোন। তিনটি গ্রাম মিলে একটি একক। তখনকার দিনে এখানে একটি উচ্চবিদ্যালয়, একটি বালিকা বিদ্যালয়, সেলাই শেখার ইস্কুল, ফুটবল খেলার জন্য একটি সুদৃশ্য মাঠ, দুটি বনেদি বাড়িতে দুটি অভিনয়-মঞ্চ — কি নেই সেখানে? হাই ইস্কুলের অসামান্য একতলা বাড়িটির একটি কক্ষে চমৎকার একটি লাইব্রেরি। সে এক সাজানো স্বর্গ যেন। প্রত্যেক মানুষই তার গ্রাম বা শহরকে ভালবাসে, কিন্তু আমার পিছারার খালের দুধারের এই তিনটি গ্রামের তুল্য সুসজ্জিত এবং সম্পন্ন গ্রাম আমি আর দেখিনি।

ইস্কুল, বাজার, দোকান, ইত্যাদি যেমন সেখানে সাজানো ছিল, তেমনি ছিল লোকায়ত দেবদেবীদের 'থান' যেখানে ঋতুকালের বিভিন্ন সময় মেলা বসতো। সেই মেলায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই উৎসব আনন্দে ভরপুর থাকত। কামেশ্বরী মন্দির, পঞ্চদেবতার থান, গলুইয়া খোলা ইত্যাদি স্থানসমূহের বিশালাকার বৃক্ষাবলির নীচে চৈতি গাজনের সময় বা অন্য উপলক্ষে মেলা বসতো। সে এক অপূর্ব

সমারোহ। নীল গাজনের সময়ই এই উৎসবটি হত বর্ণাঢ্য। নিম্নবর্ণীয় হিন্দু চাষিরা এইসময় আসত শিবের গোটা পরিবারটির সাজে সজ্জিত হয়ে। বিশেষ বিশেষ গেরস্থবাড়ির প্রশস্ত অঙ্গনে ঢুকেই মোষের শিং-এর শিঙায় ফুঁ দিয়ে চাষি শিব তার আগমন বার্তা জানাত। তার সাথে গৌরী, লক্ষ্মী-সরস্বতী, কার্তিক-গণেশরা, দল ভারি হলে নন্দীভৃঙ্গি, নারদ, পর্বত এরাও থাকত।

প্রথমেই হাতের জ্বলন্ত 'পাঁজাল'টির মধ্যে একমুঠো ধূপধুনো দিয়ে নারদ গোটা অঙ্গনটি পরিক্রমা করে নিত। মুখে আবৃত্তি করতে থাকত—

ধূপ ধরণ ধূপতি ধরণ
ঘোর অন্ধকার
যতদূর ওঠে ধোঁয়া
গগন মণ্ডলে
তথা হইতে মহাদেব
লামেন ক্ষিতি তলে।

মায়েরা, বাপরা, সগলে আসইয়া হাজির হয়েন।

ঘরের দরজায় বুড়াশিব গুষ্টি গোত্তোর লইয়া।
দেইখ্যা শুনইয়া দেবেন দান হরষিত হইয়া।।
তিরভুবনের স্বামী আইছেন ভিক্ষুতের রাজা।
গেরোস্তের কইল্যানে বাজুক ডম্বরুর বাজা।।

—সাথে সাথে শুরু হত মহাদেবের গালবাদ্য ববম্ ববম্ এবং ডম্বরুর ডিমি ডিমি ডিমি ডিমি। গোটা গ্রামের ছেলেমেয়ে বৌরা সব এসে হাজির। নারদের উৎসাহ বেড়ে যেত। শিব থাকত অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে। গোটা পরিবার তখন তাকে ঘিরে নাচ এবং গান গাইত—

ক্ষিতিতলে মহাদেবের
অবতরণ হইল।
এবার মহাদেবের নামে সবে
হরিহরি বল।
ভাঙ ধুতুরা গাজা মাজা
থাহে যদি ঘরে
সাজাইয়া গুজাইয়া দেও
মহাদেবের তরে।
নারদের ঝুলিতে দেবেন
মুড়া মুড়া চাইল।
ত্যাল দেবেন ঘেরতো দেবেন
মুসুরীর ডাইল।

ত্যাল ঘেরতো দিয়া মোরা
কি ব্যাঞ্জন বানামু।
কান পাতইয়া হোনেন গীত
হক কতাই কমু।।
উইস্থা ভাজা খাইতে মজা
ঘেরতেরি সোম্বার।
আরে গরম গরম ভাজা খাইতে
লাগে চোমোৎকার।।

বলভাই, গেরস্তের কইল্যানে হরি হরি বল। শিবো শিবো বল। মা জননী অন্নদেও মা। খ্যাতে ফসল নাই, গোলায় চাউল নাই। অকালে হে কারনে জেরবার পরাণ। বাবা ভোলা মহেশ্বর কয়, অন্নপুন্না ফ্যান্ চায়। এ আকালে করমাগো গরীবের তেরাণ।

— এইসব কথা-ছন্দের মধ্যে কখনও ঢাক ঢোল কাঁসি বাজে, কখনও নাচ গান হয়। গানের মধ্যে প্রধান থাকে শিব গৌরীর বিয়ের কথা, শিবের বার্ধক্য, গৌরীর দুর্ভাগ্য, তাঁদের সংসারে অনটনের কোন্দল। অঙ্গনে যাঁরা শিবের 'গুষ্টি' সেজে এসেছে সবাই বহুরূপী। বিগত পূজার সময়কার দুর্গা ঠাকুরদের রঙ করা পাটের ফেসোর চুল, দাড়ি এইসব নিয়ে রঙ চঙ যা জুটেছে তাই দিয়ে বহুরূপী সেজে সবাই নাচ-গান করে। দান চায়। ছাইভস্ম মাখা জটাধারী বাবা ভোলানাথ ভিক্ষে চায়। নারদ ঝোলায় ভরে। সব মিলিয়ে যদিও দৈন্যদশার প্রদর্শনী, তথাপি এরই মধ্যে রঙ্গরসও কম থাকে না। হঠাৎ পর্বত বেরিয়ে আসে দলের মধ্য থেকে। নারদ তার মামা। দেখ্ না দেখ্ মামা ভাগ্নেতে জোর 'কাজইয়া' লেগে যায়। পর্বত বলে, ঠাকুর তোমার স্যাবক নারদ মোর মামা। তমো কই, ও চুৎমারানীর পোয় আসলেই ছ্যাচ্ড়া। অর নেইয়ৎ সাইদ্যের পাপিষ্ট। যদি জিগাও ক্যান? তো কই—

মামার ঝুলির মইদ্যে ঝুলি।
গেরস্তানি অন্ন দে খায় বুলবুলি।।

আসলে মামায় একছের চোর। 'বৌ নাই ঝি নাই, এলহা এট্টা প্যাট। তমো দ্যাহ যুইত্তো বোন্দে (গোপনে) করে ল্যাট ঘ্যাট।' মোরা প্যাডের জ্বালায় ভিক্ষা করতে বাইর অইছি আর হে লাংচুনীর পোয়, হেই ভিক্ষার চাউল লইয়া এদার ওদার করে। মুই কই ঠাহুর তুমি এ্যার বিহিত কর।

অতএব, দাতা গৃহস্থ এবং শিব স্বয়ং, নারদের ঝুলি তালাশ করে চুরির মাল বের করে। চাষিশিব বলে, তোরে আইজ থিহা ত্যাইজ্য করলাম। তুই মোর ধারের থিহা যা গিয়া। যেহানে পার হোগামারাইয়া খা গিয়া। নারদ একথায় ভীষণ 'কোদ' করে। এ একেবারে 'ক' র ফলায় 'ও'কার 'ধ'—কোদ। বলে এ্যাতোবড় কতা? তয়মুই চললাম। কতায় কয়—

য্যার লইগ্যা করলাম চুরি
হেই কয় চোর?

তয়, আইজ থিহা দলাদলি
তোর লগে মোর।।
থাকতা কৈলাসে, খাইতা
ভাঙ্ ভোঙ গাজা।
মোরইনা দৌলতে অইলা
ভিক্ষুতের রাজা।।
তিরভুবন ভরমিয়া
আনি এডাওডা।
কারণ অকারণে ঘডাও
নিত্য নতুন ল্যাডা।।
আইজ থিহা পিথগান্ন
তোর লগে মুই।
মায়রে লইয়া আলাগ অইলাম
হোগামারা তুই।।

একথায় মহাদেবের টনক নড়ে। সতত নেশা ভাঙ্গে বিভোর। অচল শরীর। সংসারটা বস্তুত নারদের ভিক্ষাতেই চলে। ছেলেরা তো অকম্মার ঢেঁকি। এসব ভাবনায় ভাবিতা হয়ে 'জগন্মাতা' সংসারের আর দশজন মায়ের মতই, সবাইকে তুচ্ছ করে নারদের কাছে যাওয়ার প্রস্তুতি করেন।

প্রতিবছর নীলগাজনের শিব, তার পরিবার সহ পরিক্রমার প্রাক্কালে প্রথম আবির্ভাব ঘটাতো আমাদের হাইস্কুল বা আমরা যাকে বড় ইস্কুল বলতাম তার সামনের মাঠে। হেডমাস্টার মশাই-এর কাছ থেকে তারা আগেভাগে অনুমতি নিয়ে রাখত। তিনি তাদের বলে দিতেন যে, তারা যেন আদিরসাত্মক লীলাখেলার কীর্তন সেখানে না দেখায়। তারাও অবশ্য তাঁর আদেশ অনুযায়ী সঙ যাত্রাব অভিনয়াদি সেখানে করত। 'লেইজারের' সময় তারা সেখানে বেশ খানিকক্ষণ মহড়া দিয়ে বের হত গ্রাম পরিক্রমায়। তারা যেহেতু আগেভাগে, হেডমাস্টার মশাই-এর অনুমতি নিয়ে নিত, আমরা জানতে পারতাম, অমুক দিন লেইজারের সময়, ইস্কুলের মাঠে নীলগাজনের সঙ হবে। ছাত্র-শিক্ষক সবাই সেই সঙ দেখার জন্য জমায়েত হতাম।

কিন্তু গেরস্ত বাড়িতে, এইসব শালীনতা রক্ষার দায় এই সঙেদের উপর চাপানো যেত না। সেখানে তারা বিশেষ বিশেষ পরিবার এবং ব্যক্তির দোষগুণ নিয়ে সঙ করত। এই সঙেব মাধ্যম অবশ্যই গান এবং কথকতা। ব্যাপারটি ঠিক নাটকও নয়, প্রহসনও নয়। আবার যে শুধু গ্রামীণ খেউড় তাও নয়। এর মধ্যে অনেক কিছুই থাকত। গেরস্থরা, হরগৌরী কোন্দলের আদিরসাত্মক বর্ণনে, এদের উপর কোনও বিধিনিষেধ আরোপ করতেন না। গেরস্থের অঙ্গনে এক একদিন অপরাহ্নে এইসব নীল গাজনিরা উপস্থিত হয়ে, তাদের লীলাখেলা দেখাত। গেরস্থবাড়ির স্ত্রী-কন্যারা, এমন কি কর্তারাও এইসব

অভিনয়াদির বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান পুনরভিনয়ে দেখার জন্য তাদের উৎসাহিত করত। দলের অধিকারী মশায়, কত্তাগো মা বুইনেগো যেমন আইজ্ঞা, এমত উচ্চারণে, গৌরীকে একটু খেপিয়ে তখন আসরে নামতেন। গৌরী তখন শিবের নানাবিধ চারিত্রিক দোষত্রুটি নিয়ে শোরগোল তুললে নারদ কিন্তু বেবাক বিভেদ ভুলে শিবের পক্ষ নিত। এই নিয়ে চূড়ান্ত রগড়। তখন নারদ, না মায়ের, না বাপের। নারদ তখন এক উদ্ভট গান জুড়ে দিত—

ও তোরা গৌরি দেখবি আয়
শিবের বাসি বিয়া অয়
আর বুড়া বররে দেখিয়া গৌরি
কান্দিয়া ভাসায়।

নারদ বলে, -—

'তুমি যদি সতি সাদ্ধি এক মোন এক পেরাণ। তয় ক্যান্ বুড়া বরেরে দেইখ্যা ব্যাকুলিত মন। এই বরের লইগ্যাতো তুমি তপেস্যা করিলা। এহন ক্যানও কর কোন্দোল বুড়া বুড়া বল্ইয়া।।' নারদের কথায় গৌরির হয় সাংঘাতিক লাজ, সে গায়—

মোর মনে বেচাল নাই
বেচাল হের মন
গঙ্গারে দেইখ্যা ক্যান্
ফাউকায় বদন?
কোন দেব হইয়া
মস্তকে ধরে গাঙ্
কোন দেব হইয়া
নিত্য খোঁজে লাঙ্?
একবার মরলাম মুই
তাহার অপবাদে।
অবশেষে জপেতপে
ফ্যালাইলাম ফাঁদে।।
তমো দ্যাহ তিলোচন
আড় দিকে চায়।
ব্যালগাছ দেইখ্যাও তার
কুভাব মনে আয়।।
মুই যদি সব্বজনের
আদিমাতা হই।
মোর ঘরে নিত্যদিন
ভিক্ষা মাগবি তুই।।

এইসব রঙ্গরসে নীলগাজনের লীলা খেলা হত। তবে এরা সবচেয়ে জম্পেশ আসরটি বসাত ডাক্তার বাড়ির উঠোনে। আশপাশ দশবাড়ির মেয়েমদ্দ তখন সেখানে উপস্থিত। হরগৌরীর কোন্দল বাদ দিয়ে তখন শুরু হত ঐ বাড়ির কোন্দলের বিন্যাস। এর কারণটা আগেই বলেছি। এ বাড়ির মেয়ে বৌ-এরা সারাদিনই ঝগড়ায় শুধু বাড়ি নয়, গোটা গাঁ-ই মাথায় করে রাখত। ভোর থেকেই মহড়া শুরু হত তার। ভাষার ব্যাপারে জেঠি, খুড়ি এবং মেয়েদের কারুরই কোনও বাছবিচার ছিল না। ডাক্তার জেঠা তখন তাঁর রোগী পত্তর নিয়ে ব্যস্ত। অথবা বাজারে গিয়েছেন, বেলা বারোটায় শোনা যেত তাঁর হুঙ্কার। ঐ সময় হয় রোগী দেখা শেষ, নয় তিনি বাজার থেকে ফিরেছেন। ওরে ওওও চুৎমারানীরা, তোরা থামবি?—তখন ক্রমশ তাঁর কণ্ঠ উচ্চ এবং মহিলা মহলের গলা খাদে। তবে ভাষা সবাই একই শব্দবন্ধে ব্যবহার করতেন। ডাক্তার জেঠা সম্পর্কনির্বিশেষে সবার প্রতি সমবিচার করতেন এবং তাদের সম্ভাব্য অথবা অসম্ভাব্য উপপতিগণের অক্ষমতা বিষয়ে পুনঃ পুনঃ আপশোস প্রকাশ করতেন। নীলগাজনের সঙওলাদের এসব অজ্ঞাত ছিল না। পাড়া প্রতিবেশীরা বলা বাহুল্য এই ঢপের কেত্তনে সাতিশয় রগড় উপভোগ করত।

পৌষমাসের দিনগুলোতে ছিল প্রকৃত আনন্দের উৎসব। পিঠেপুলি, খেজুর রসের পায়েস তো ছিলই। এই সময় নিম্নবর্গীয় চাষি, বিশেষত যারা গতরখাটা এবং ভূমিহীন মানুষ, তারা, মাগুনে বের হত। উপলক্ষ কুমির পূজা। আমাদের পিছারার খালের ধারে ধারে তারা মাটির কুমির বানাত। লেজটার উপর একটা কেয়াপাতার করাত থাকত লম্বালম্বি। মাথার উপর দুটো বড় জল-শামুক বসিয়ে চোখ বানানো হত। কুমিরগুলো এমনভাবে বানানো হত যেন তারা সদ্য খাল থেকে উঠে এসেছে। পূজার শেষে, কুমিরগুলোকে বলি দেওয়া হত খণ্ড খণ্ড করে। এই পূজাকে বারোবাঘের পূজাও বলা হত। বারো বাঘের এক বাঘ কুমির।

কুমির, বাঘ, কাঁকড়া ইত্যাদি লোকায়ত পূজা বহুকাল আগের থেকেই সম্ভবত আমাদের এইসব অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। জলজঙ্গল এবং বন্য জীবজন্তুর সাথে লড়াই করে এই ভূমি আবাদ হয়েছিল। তখন জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ, সাপকে নিয়ে বারোবাঘ। এই পূজার উৎসবটি তথাকথিত ভদ্রসমাজে প্রচলিত ছিল না। শীতের এই সময়টায় গেরস্থের নতুন ফসল কাটা হয়েছে। খাটুয়া মানুষদেরও হাতে বিশেষ কাজ নেই। তাই এই উৎসবটি উপলক্ষ করে গেরস্থের গোলা থেকে কিছু সংগ্রহ করা। সন্ধের সময় জনা দশবারো লোক এসে গেরস্থের আঙ্গিনায় ধ্বনি দিত, 'ঠাকুর কুলাই ভো'। ব্যস্ অমনি সবাই ছুটে এসে অঙ্গনে জমা হত। তারা ছড়া বলত, বারোবাঘের ছড়া—

আইলাম লো সরণে
লক্ষ্মীদেবির বরণে
লক্ষ্মীদেবি দিবেন বর

চাউল কড়ি বিস্তর
চাউল না দিয়া দিবেন কড়ি
শ্যাষ কাডালে সোনার লড়ি
সোনার লড়ি রুপার বাড়া—

শুরুয়াৎটি অন্য ভাবেও হত। যেমন—

আইলাম লো লডইয়া
হস্তির পিডে চড়ইয়া
হস্তি গেলরে
হস্তি গেল বেগমপুর
বেগমপুরে কি কাজ করে
রাজার মায়না খাইয়া বাচে—

এরকম সব ছড়া বলার পর শুরু করত বারোবাঘের পরিচয়। তাও ছড়া করেই বলত। এইসময় নানা ধরনের অশ্লীলতা প্রযুক্ত বাক্য পদের ব্যবহার করত তারা। তবে গেরস্থ গেরস্থানিরা তাতে কোনও দোষ তো ধরতেনই না উপরন্তু মজা উপভোগ করতেন প্রচুর। অবশ্য প্রকৃত অর্থে এগুলোকে ঠিক অশ্লীল বলা হয়ত সঙ্গতও হয় না। এখানকার এবং বিশেষত এইসব মানুষদের ভাষা শব্দপদ এরকমই। তারা ছড়া কাটত—

এক বাঘরে
এক বাঘ ছৈলা গাছে
মুত্ইয়া দিল রে
মুত্ইয়া দিল ভ্যাদামাছে—
অথবা
এক বাঘের রে
এক বাঘের কপালে সিন্দুর
পোলা বিয়ায় রে
পোলা বিয়ায় ঝাপউয়া ইন্দুর।

উচ্চবর্ণীয় বা বর্গীয় মানুষদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন করার কোনও উপযুক্ত মঞ্চ ছিল না এখানে। সম্বচ্ছর তাদের অন্যায়, অত্যাচার, অবহেলা মুখ বুজে সহ্য করে যাওয়াই ছিল নিম্নবর্ণীয়/বর্গীয় মানুষদের পরম্পরা। কিন্তু ভিতরে ভিতরে ক্ষোভ, দহন তো নিশ্চয় থাকত। সেইসব ক্ষোভের প্রকাশ ঘটত এইসময় নীলগাজনের সঙের এবং বারো বাঘের ছড়ায়। তখন তারা ব্যক্তিবিশেষকে এবং কখনো কখনো সমাজকেই বিদ্ধ করত তাদের ছড়ার মাধ্যমে। তার প্রকাশভঙ্গি হয়ত সব সময় নির্দিষ্ট অন্যায় অত্যাচারকে সরাসরি নির্দেশ করত না, তবে তা যে চরিত্রগত ভাবে প্রতিবাদী এবিষয়ে সন্দেহ নেই। মজার ব্যাপার এই যে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের সামনাসামনি এইসব ব্যঙ্গ বিদ্রূপ বর্ষিত হলেও, এ নিয়ে কোনও বিতণ্ডা বা প্রতিশোধাত্মক পরিবস্থার সৃষ্টি হত না।

যেন এক অলিখিত নিয়মে নিম্নবর্ণীয়/বর্গীয়রা এই অধিকার ভোগ করত। দু-একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি খোলসা হবে। যেমন—

এক বাঘরে এক বাঘ ডাক্তার বাবু
ছোডো বৌ-এর রে
ছোডো বৌ-এর খামারে কাবু

এক বাঘ রে এক বাঘ অবনী স্যান্
ছাইছে বইয়ারে ছাইছে বইয়া খায় ফ্যান্।

এক বাঘ রে এক বাঘ হিমাংশু গোপ্ত
হোগায় হ্যার রে
হোগায় হ্যার তিনডা গত্ত

এক বাঘ রে
এক বাঘ সতীন স্যান্
বুদ্ধি দিয়ারে বুদ্ধি দিয়া ভাঙ্গে ঠ্যাং।

এইরকম ভাবে যার যার উপর তাদের ক্ষোভ আছে অথচ প্রতিবাদ করার সাহস সামর্থ্য নেই, তাদের উপর এক হাত নেওয়ার প্রবণতা এইসব ছড়ায় লক্ষণীয়। অমার্জিত ভাষা, বিকৃত উচ্চারণ, যা শুধু ভাষার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই নয়, বরং উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে তাকে যতটা স্থূলতায় নেওয়া যায় তাই যেন এইসব মানুষদের প্রচেষ্টা ছিল। প্রতিবাদের এও একটি ধরন বলেই বোধ হয়। কিন্তু তার ভিতরে রগড় বা আনন্দ করার প্রবণতা যতটা, অসম্মান করার প্রচেষ্টা ততটা থাকত না।

এই রকম সব ছড়া বলে গেরস্থদের খুশি করে তারা সিধে পেত চাল, ডাল, আনাজ, পয়সা এবং শেষ তক আবার 'ঠাকুর কুলাই ভো' বলে চলে যেত। কিন্তু এরই মধ্যে এক চোরাস্রোতে এই সব আনন্দের উৎসগুলো শুকিয়ে আসছিল। কিন্তু তখনও পিছারার খাল আর বড়খাল পাড়ের সেই বৃক্ষ দম্পতি সহর্ষেই বিরাজমান ছিল।

— ছয় —

আমাদের গ্রামের বক্সীবাবু ছিলেন আমাদের বড় ইস্কুলের হেডমাস্টার মশাই। তখনকার দিনের বি.এ. পাশ। দশগ্রামের মানুষের সম্মান পেতেন তিনি। তাঁর বাড়িঘর বাগান বিলাস, ঘাটলাওলা পুকুর—এত চমৎকার সাজানো যে একবার দেখলে আর ভোলা যায় না। তাঁর ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ায় সব আদর্শস্থানীয়। বক্সীবাবুই ঐ ইস্কুলের সর্বেসর্বা। তিনি ইস্কুলটিকেও রেখেছিলেন তাঁর বাড়ির বাগানটির মতো পরিচ্ছন্ন। পাশের মুসলমান গাঁয়ের তালুকদার সাহেব তাঁর দোস্ত। বাড়ির বাঁধানো পুকুরঘাটে বিকেলে তাদের নিয়মিত আড্ডা। তালুকদার বলতেন : বক্সীবাবু, মুই যদ্দিন আছি, আপনের কোন চিন্তা নাই। আপনেরা এহানেই থাকবেন। ইস্কুলের কাম য্যামন চলতাছে, চলবে। বক্সীবাবু বলতেন, না চিন্তা আর কি? খালি মাইয়ারা বড় অইছে।

চাইরদিগে যা শুনি মনে ভয়তো এট্টু লাগেই। তালুকদার বলতেন, না ভয়ের কারণ নাই। আপনের মাইয়া আমার মাইয়া জুদা না। ইনসাল্লা. যদি কোন হারামীর পোয় মোর মায়গো দিকে তাহায়, হ্যার ক্যাল্লাডা দুফাঁক করইয়া দিমু। —বক্সীবাবু একথায় কতটা আশ্বস্ত হতেন সঠিক জানি না, অনুমান করতে পারি যে খুব একটা হতেন না। কারণ ইতিমধ্যে আশপাশের বেশ কয়েকটা বনেদি পরিবার, যেমন উকিলবাড়ি, চাটুজ্জে বাড়ি, গাঙ্গুলি বাড়ি সবাই কখন যেন বাড়ি তালাবন্ধ করে বা কেউ কেউ কোনও তালেবর মিএল সাহেবদের দেখাশোনা করার দায়িত্ব দিয়ে ওপারে কিছু ব্যবস্থা করতে গেছেন। অবশ্য তারা সবাই সপরিবারেই গেছেন। তাদের ছেলেপুলেরা বহু আগে থেকেই 'কইলকাতায়' চাকুরিজীবী। সেখানে তাদের একটা অগতির গতি ঠাই ছিল। এমন কি নগেন মশায়ও যখন বাড়িঘর বিক্রি করে গঞ্জে এবং সেখান থেকেও কোনও আঘাটায় উধাও হলেন তখন আমার কাছে সব কিছু যেন অন্ধকার বোধ হতে লাগল। কোথাও টিনের চালা, কাঠের ফ্রেমের সুন্দর বাড়িগুলির ভিতগুলো পড়ে আছে। সামান্য পয়সায় কিনে অথবা জবর দখল করে সেইসব টিন, কাঠ, বাড়ির আশপাশের গাছপালা সব তুলে নিয়ে, কেটে নিয়ে ঘরের ভিতটাকে যেন একটা চিতার আকৃতি দিয়েছে। সেদিকে তাকালেই বুকের মধ্যে দুমড়ে ওঠে। আবার কোনও কোনও বাড়িতে ঘর আছে, কিন্তু সেখানে মানুষেরা নেই। মাটির ভিতগুলোর কোথাও ইঁদুর গর্ত করে মাটি টাল দিয়ে রেখেছে, কোনও স্থান দিয়ে হয়ত কোনও চোর সিঁদ কেটে ঢুকে ঘরের এটা ওটা নিয়ে গেছে। সেই বাড়িগুলো হয়েছে আরও ভীতিপ্রদ এবং করুণও। সেগুলোর পাশ দিয়ে যখন যাতায়াত করতাম বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের 'পদচিহ্ন' গ্রামের ছবিটা ভেসে উঠত। রাতে সেসব ঘরে আর আলো জ্বলে না। তুলসী মঞ্চে সন্ধেবেলায় কেউ প্রদীপ জ্বেলে শঙ্খ বাজায় না, অথবা সকালে গাছের গোড়ায় জল দেবার কেউ নেই। একসময় এইসব কৃৎকর্ম দেখতে দেখতে ঐ শৈশবেই তো একটা অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। ঐ সব বাড়ির ছেলেপুলেরা খেলার মাঠে আর খেলতে আসে না নগেন মশায়ের বাড়ির চত্বরে। যেখানে আমাদের 'দাড়িয়াবান্দা', 'হাডুডু' ইত্যাদি খেলার 'কোর্ট' 'খাড়া' থাকত, সেখানে রতনদা, কাঞ্চুদা, তৈয়ব, নাজির এরা হাঁক দিলে যেমন আর সব বাড়ি থেকে পিল পিল করে ছেলেরা এসে হাজির হত, এখন দেখছি, তাদের সংখ্যা ক্রমশ কমে যাচ্ছে। তারা হঠাৎ হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে যাচ্ছে।

আগে নগেন মশায়ের বাড়ির ঐ চত্বরে কাঞ্চুদা, রতনদায়েরা হাঁক দিত—

লোন্‌তা এক

লোন্‌তা দুই

লোন্‌তা তিন—

এরকম 'লোন্‌তাদশ' পর্যন্ত এটা ছিল খেলতে আসার জন্য আওয়াজ। নগেন মশায়ের বাড়ির ভিতটা যখন 'চিতা' হল, আর কিছুদিন পর থেকেই আমাদের ঐ ক্রীড়াস্থানে 'লোন্‌তা'য় আর কেউ সাড়া দেয়নি।

তালুকদার তখন উঠতি। পৈতৃক জমিজমা যা ছিল, তা নিয়ে মধ্যবিত্ত-প্রায় একরকম সচ্ছল জীবনযাপন করছিলেন। চারটি ছেলে। বেশ পড়াশোনা করে দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল। বড়টি তখন চাকরি করে। ভাল পরিবার। এসময় তালুকদার বক্সীবাবুর সঙ্গে কিনা কি কথাবার্তা করলেন জানিনা। একদিন দেখা গেল, বক্সীবাড়ির ঘর-দরজা, বাগান পুকুর সব পড়ে আছে। তারা নেই। তদবধি তালুকদার সেই বাড়ির স্বত্বাধিকারে বহাল। বক্সীবাবুর বাড়ির সৌষ্ঠব তখন তার মঞ্জিলে। তার লাইব্রেরির বইপত্তর বড় ইস্কুলের বইপত্তরসহ আলমারি সব তার গরিবখানায় আস্তে আস্তে গস্ত। অজুহাত খুবই জোরদার। 'নচেৎ চোরে দাউরে নিয়া বেয়াক যদি নষ্ট করে?' তবে সেসব বই পুস্তক ঐ পরিবারের কলেজগামীদেরও কারোর যে অধ্যয়নে আসেনি তার সাক্ষী আমি অন্তত ছিলাম। তালুকদার এবং তার সন্তানেরা পড়ে পাওয়া আঠেরো আনার দখলদারি লাভ করেছিল বটে, কিন্তু সংস্কৃতি বা রুচি শুধু অকস্মাৎ লব্ধ- সম্পদের সাহায্যে অর্জিত হয়না। তার জন্য নির্দিষ্ট ঐতিহ্য চাই অথবা এক কষ্টকর সাধনা। এই তালুকদারদের ক্ষেত্রে তার কোনওটাই ছিল না। তারা ভেবেছিলেন যে বক্সীবাবুর আয়োজন সমূহ তুলে নিয়ে যদি তাদের মঞ্জিলে জমায়েত করেন, তাহলেই বক্সীবাবুদের ঐতিহ্যগত বা সাধনালব্ধ সংস্কৃতিতে 'তালিবান এলেমবান' হবেন। কিন্তু বক্সীদের ঐ ব্যাপারটি 'ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন লভ্য'। এর জন্য যে সাধনার নির্দিষ্ট অনেকগুলি সিঁড়ি পার হওয়া দরকার সেকথা তাদের জানা ছিল না।

তালুকদারের তখন আর্থিক আয়ের উৎসও তরতর করে বাড়ছে। বক্সীদের নানান সম্পদ, জমিজিরাত, বাগানের নারকেল সুপারির আয় তালুকদারের রোজগারে আনায় টাকা জুগিয়ে যাচ্ছে। এ সময়ে তারা একটি দোনলা বন্দুকও নিয়ে নেন। মেজ ছেলে বন্দুক নিয়ে যখন তখন, যত্রতত্র পাখি শিকারে যায়। আমরা মাঝে মাঝেই বন্দুকের 'গুড়ুম' আওয়াজ শুনি। বড় খালধারের রাস্তা ধরে হাতে দু-চারটে হরিয়াল, ঘুঘু বা হট্টিটি পাখি ঝুলিয়ে তালুকদারের মেজ ছেলে আমাদের সবাইকে তাক্ লাগিয়ে চলে যায়।

এই সময় তার কলেজের পরীক্ষা শেষ। অখণ্ড অবসর। দু-একজন সহপাঠীর সাহচর্যে তাই ইস্কুলটি চালাবার দায়িত্ব নিয়েছে সে। কিছু একটা করা দরকার। তার বন্ধু হরমুজ আলীও এ ব্যাপারে খুব উদ্যোগী। তারা ইস্কুলটা নষ্ট হতে দিতে চায় না। কিন্তু ছাত্র নেই। হিন্দুরা দেশ ছাড়ছে নাগাড়ে। সাধারণ মুসলমান এবং নিম্নবর্গীয় হিন্দুদের সন্তানেরা কদাচিৎ ইস্কুলে আসে মাঠের কাজ শেষ হলে। মাসখানেক, মাসদুয়েক বড়জোর তাদের সময় বা উৎসাহ, তারপর ইস্কুলটা খাঁ-খাঁ করতে থাকে শ্মশানের মতো। তালুকদারের ছেলেরা এবং কিছু হিন্দু মুসলমান মুরুব্বি শ্রেণীর মানুষেরা অসম্ভব নস্ট্যালজিয়াগ্রস্ত হয়েও এই শূন্যতা ভরাট করতে পারেন না। আগের অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা কোনও মতেই সম্ভব হয়না। একসময় তাই ভগ্নোদ্যম হয়ে চাকুরির চেষ্টায় তারা শহরে পাড়ি দেয়। আমার মতো হতভাগ্য ছেলেরাই শুধু পিছারার খাল

পারের চৌহদ্দিতে এক নিঃসীম শূন্যতার মধ্যে গুমরোতে থাকি আর পরিপার্শ্ব নিঃশব্দে নষ্ট হতে থাকে।

মনে আছে কিছুদিন আগেও এরা সবাই, তফসীর মিঞা নামে একজন পল্লী উন্নয়ন অফিসারের সহায়তায় চাঁদতারা ক্লাবের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আমরা হিন্দু-মুসলমান কিশোরেরা সেই ক্লাবের মেম্বার হয়ে বেশ কিছুদিন গ্রামগুলোর ডোবা, পুকুর, দিঘিগুলোকে কচুরিপানা মুক্ত রাখার প্রচেষ্টা নিয়েছিলাম। কিন্তু যেসব বাড়ি তালা বন্ধ, একজনও প্রাণী নেই, সেসব বাড়ির পুকুর, দিঘি, বাগান ইত্যাদি যে খুব বেশিদিন পরিষ্কার রাখা যায় না, এ কাণ্ডজ্ঞান অনেক পরে আমাদের হয়েছিল। অবশ্য এতে যাঁরা ঐ সব সম্পত্তির সদ্য মালিক হয়েছিলেন, তাদের লাভ হয়েছিল মেলা। একসময় ক্লাব বন্ধ হয়ে যায়, তফসীর মিঞা, অপেক্ষাকৃত জনবহুল এলাকায় তার আপিস উঠিয়ে নেন। এ ভদ্রলোক সত্যিকারের একজন উদারপ্রাণ মহৎ মানুষ ছিলেন। অন্য যাদের কথা বললাম, তাঁরাও কেউ খারাপ মানুষ ছিলেন না। তবে পরিস্থিতিটাই ছিল তখন অন্য ধরনের। সেজন্য তালুকদারের ছেলেদের বা তাদের অনুগামীদের সবাইকে দোষ দিতে পারি না। সদ্য আহৃত স্বাধীনতা. হিন্দু-সমাজের উচ্চবর্ণীয়দেব প্রাক্তন ভেদাচারের যন্ত্রণা, যৌবনিক প্রদাহ প্রশমনের সহজ উপায় এবং সর্বোপরি প্রতিশোধ স্পৃহাজনিত রিরংসা—যা প্রতিনিয়ত পত্র-পত্রিকায় প্রচারিত সংবাদালেখ্য থেকে আহৃত, তার প্রকোপ এড়ানো এদের পক্ষে খুব সহজ ছিল না।

পিছারার খালের আশপাশের হিন্দু সমাজটি তখন একেবারেই ভেঙে গিয়েছিল। ফলে অবশিষ্ট হিন্দু অধিবাসীদের মধ্যে একটা নৈতিক অধঃপতন আস্তে আস্তে পরিলক্ষিত হতে থাকে। পারিবারিক শাসন আল্‌গা, অভিভাবকেরা উদাসীন, ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদীক্ষার কোনও ব্যবস্থা নেই, বিবাহের বয়স অতিক্রান্তা মেয়েদের বিয়ে-থা দেওয়া হচ্ছে না। সে এক মাৎস্যন্যায়ী অবস্থা। এরকম সময়ে বন্দুকধারী কোনও সুঠাম সুবেশ যুবক যদি কোনও পরিত্যক্ত বাড়ির পুকুরঘাটের পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে, ভরদুপুরে পাখি শিকারের উদ্দেশ্যে বিচরণ করে, তবে গ্রামীণ যুবতীদের পক্ষে সহজ অবগাহন যেমন সম্ভব হয়না, তেমনি সম্ভব হয়না স্বকীয় অসহায় যৌবনের প্রদাহকে চোখের সামনের সুবেশ যুবকের আকাঙ্ক্ষার চাউনি থেকে, আশ্লেষ থেকে এবং সম্ভোগ থেকে রক্ষা করবার। আবার এ-দাহ কদাচ জাতি বিচার করে। তাই যা ঘটবার তা ঘটেই, আর সেই সংঘটন জন্ম দেয় অন্য এক প্রদাহের যাকে আমরা, বিশেষ করে এইসব ক্ষেত্রে, সাম্প্রদায়িক ব্যভিচার বলে এতকাল গণ্য করে এসেছি। তালুকদারের মেজ ছেলে অথবা তারই বয়সি অন্য কোনও মুসলমান যুবক যদি আমার গ্রামের কোনও যুবতীর সঙ্গে তার সম্মতিতে একদিন সহবাস করেই থাকে, তাহলেও ঘটনাটির বিন্যাস এরকমই হয়।

এরকম দু-একটি ঘটনা তখন আমি দেখেছি। কিন্তু যে যুবতীটি শহর থেকে আসা তথাকথিত মামাদের সাথে সম্পর্ক করতে পারে, সে যদি কোনও মুসলমান যুবকের

সঙ্গে একদিন সম্পর্ক করেই বসে, তাতে কি? কাজটি যে সামাজিক বিচারে অবৈধ, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সে তো উভয়ত। কিন্তু তাতে যে অনেক কিছু, সে জ্ঞানও আমার ততদিনে হয়েছে। যুগ একটা ব্যাপার এবং তখন সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি ব্যাপারটাকে করে তুলেছিল আরও জটিল।

বক্সীবাবু ব্যাপারটি বুঝেছিলেন বলেই একদিন তালুকদারকে বাড়িঘর আগান-বাগান দেখার দায়িত্ব দিয়ে এক ভোররাতের আলো আঁধারিতে সবার অলক্ষ্যে গ্রামত্যাগ করেন। ভয় পেয়েছিলেন তিনি। কেলেঙ্কারির ভয়। তার মেয়ের বয়স তখন পনেরো। চারদিকের নানান ঘটনাবলির খবরে দুশ্চিন্তা মনে ছিলই। কিন্তু তখনও দেশছাড়ার কথা তিনি ভাবেন নি। কারণ, অন্যান্য স্থানের মতো আমাদের পিছারার খালের চৌহদ্দিতে দাঙ্গা, খুন খারাবি বা অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি ঘটেনি। যাহোক, একদিন এখানে একটি ঘটনা ঘটে। বক্সীবাবুর মেয়ের বয়সি একটি মেয়ে একটি মুসলমান ছেলের সাথে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় ধরা পড়ে। স্থানটি নির্ধারিত হয়েছিল একটি 'পাইত্রা বনে'। মেয়েটি যুগী সম্প্রদায়ের। ছেলেটির নাম আবুল। অতঃপর ইস্কুলের বিভিন্ন শ্রেণীতে রব ওঠে, আবুল যুগী পাইত্রাবনে। এখন এই ঘটনাটির সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে গিয়ে সমাধানের কাণ্ডজ্ঞান কারোর না হওয়ায়, বিষয়টি মাত্রা পেল—'মোছলমানের পোলা আবুল অমুক যুগীর বয়স্থা মাইয়াডারে পাইত্রাবনে টানইয়া নিয়া বেইজ্জত করছে। এ হালার দ্যাশে আর জাত ধম্ম মান ইজ্জত কিছুই রইল না'। এই সময়টিতে পূর্ব-পাকিস্তানের হিন্দুদের জাতধর্ম বড় 'নাজুক' ছিল। সামান্য কারণেই তা ভেঙে পড়ত। কারণ তারা সংখ্যালঘু।

অন্য পক্ষে মিঞাপুত্ররা, যারা উঠতি, তারা হিন্দুদের এই সামাজিক অবক্ষয়জনিত অবস্থাটির যথাসাধ্য সদ্ব্যবহার করতে কিছুমাত্র ত্রুটি করছিল না। একথায় কেউ আপত্তি জানালে উপায় নেই, কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায় নিজস্ব সমাজে মেয়েদের সাথে সহজ মেলামেশায় অভ্যস্ত ছিল না বলে হিন্দু মেয়েদের প্রতি বড়ই আকাঙ্ক্ষী ছিল। কারণ এরা আদৌ পর্দানশিন ছিল না এবং তাদের কাপড়চোপড় পরার ধরনটিও ছিল আলাদা। আর একবার এ-কথাটি পাঠক পাঠিকাদের উদ্দেশ্যে জানাই, যে, এই পর্যবেক্ষণের পটভূমি আমার পিছারার খালের চৌহদ্দির জগৎটিই, যেখানে আমার দৃষ্টিকোণ মধ্যবিত্ত হিন্দুসমাজের মধ্যে বেড়ে ওঠা একটি কিশোরের এবং প্রতিবেশী মুসলমান সমাজের অধিকাংশ অত্যন্ত সাধারণ শ্রেণীর। তাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার তখনও নিতান্ত সামান্য।

সে যাহোক, মানুষের যৌনতার আতিশয্যের নানাবিধ কারণের মধ্যে পোশাক আশাকের 'ঢঙ' বোধহয় একটা প্রধান কারণ। অন্তত এক্ষেত্রে মুসলমান যুবকদের সেরকমই ভাব দেখেছি। পরে, একটু বড় বয়সে দু-একজন মুসলমান বন্ধুও আমাকে এ-বিষয়ে বলেছে। হিন্দু বাঙালি মেয়েদের 'ডেরেস দিয়া' শাড়ি পড়ার জন্য তাদের যে অতিরিক্ত যৌন তাড়না ঘটে, তা তারা পরিষ্কার ভাবেই আমাকে বলেছে। ব্যাপারটি বিপরীত ক্রমেও এরকমই মনে হয়েছে আমার। কেননা আমিও তখন ও-খানেই বয়োপ্রাপ্ততায় 'দামড়া' হচ্ছিলাম। আমার যৌনতাবোধের ইতিহাসও অনুরূপই। সেখানে

মুসলমান মেয়েদের সালোয়ার কামিজ জাতীয় পোশাক, যা হিন্দুদের সমাজে তখন ব্যবহারে ছিল না, আমার মতো হিন্দু ছেলেদের অসুবিধে ঘটাত। আমাদের গ্রামের প্রান্তিক অবস্থানে যে পোড়ো বাড়িটি দাশের বাড়ি নামে খ্যাত ছিল, সেখানে উপনিবেশকারী মুসলমান পরিবারটির সাবেহা, রেহানারা তাদের পোশাকে আমার মতো হিন্দু কিশোর বা যুবকদের যৌনতায় সেসব দিনে যে অসম্ভব তাড়নার সৃষ্টি করত সেকথা অস্বীকার করা সত্যের অপলাপ।

বক্সীবাবু, 'আবুলযুগী পাইত্রাবনে' এমত ধ্বনি শুনে, প্রথমেই ধাক্কা খেলেন এই ভেবে যে, তাঁর মেয়েও ঐ বয়সি। অতএব, আর এখানে থাকা বোধহয় সঙ্গত হয় না। তিনি বিচক্ষণ শিক্ষিত লোক। হয়ত বিচার বিবেচনায় অনেক কিছুই গ্রহণ করতে সক্ষম, কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাঁর চিন্তন বিশ্বের সাথে তো সহযোগিতা করবে না। বিশেষত নিমজ্জমান সমাজে মানুষ বড় অবুঝ হয়। তারা তখন কোনও সমস্যার কার্যকারণ বিচার করে না। তিনি বুঝেছিলেন নিশ্চয়ই যে, এই গ্রামীণ সুখ, সম্পদ এবং বর্ণাঢ্য জীবনযাপনের এখানেই ইতি। অতএব, 'অন্য কোথা, অন্য কোনও খানে' জীবনের তরী ভেড়াতে হবে। আবুল এবং ঐ যুগী মেয়েটি তার ইস্কুলেরই ছাত্রছাত্রী ছিল। তার এতাবৎকালের শিক্ষকতার জীবনে এ ঘটনা একেবারেই নতুন, যা তাঁর চিন্তায় কখনওই আসেনি।

কিন্তু ঈদৃশ ঘটনা যুগের পর যুগ ধরে ঘটে আসছে। ইতিহাসে হিন্দু এবং মুসলমানের প্রেম বা যৌন সম্পর্কের ঘটনা বিগত প্রায় হাজার বছরের পারস্পরিক সহাবস্থানে কখনও ঘটেনি এরকম তথ্য আমার জানা নেই। আবার তার সবটাই যে জবরদস্তি এরকম কথাও কোথাও পাইনি। এক্ষেত্রে প্রেম এবং যৌন সম্পর্ককে প্রায় সমার্থক অর্থে ব্যবহার করার জন্য হয়ত অনেক আধুনিকপন্থীরা মূর্ছা যেতে পারেন, কিন্তু আমার কৈশোরক অভিজ্ঞতায় পিছারার খালের ব্রহ্মাণ্ডে বিষয়টির ভিন্নতা, সামাজিক ব্যবহারে অথবা চিন্তনে আমি কখনওই উপলব্ধি করিনি। দুটি বিষয়কেই একক ধারার রকমফের বলেই জ্ঞাত হয়েছি।

বক্সীবাবুর অবস্থাটা অন্য। যদি বলি, তিনি বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন করে তাঁর ঐ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, তাও বলা যায়। আবার ঐ সিদ্ধান্ত না নিলেও সেই সময় যে ব্যাপক আন্দোলন করে এমন কু-আচার রোধ করবেন এমন ক্ষমতাই বা তাঁর কোথায়? অতএব, সহজপন্থা, 'য পলায়তি, স জীবতি'। বক্সীবাবু শুধুমাত্র একজন শিক্ষক নন। তিনি বিপদে-আপদে মধ্যবিত্ত হিন্দুদের এমন কি মুসলমান সমাজের মানুষদেরও আশ্রয় ছিলেন। অতএব তাঁর দেশত্যাগ ব্যাপারটি একটি অতি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হিসেবেই সবাই গ্রহণ করল। তার দেশত্যাগের সাথে সাথে আমার পিছারার খালের জগৎ তার আধুনিকতার প্রবেশের পথটিই হারিয়ে ফেলল। আমাদের এই অঞ্চলটি দেশের অত্যন্ত গভীরে অবস্থিত হলেও তার একটি চমৎকার আধুনিক বিকাশক্রম ছিল। এই বিকাশ ধারাটি দেশভাগ, তথা বিশেষ বিশেষ মানুষদের দেশত্যাগ জনিত কারণে প্রতিহত না হলে,

যে একটি চমৎকার সাংস্কৃতিক স্থান হিসেবে পরিণত হতে পারত, সে বিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ নেই। বক্সীবাবুকে নিয়েই এত কথা বললাম বটে, কিন্তু তিনি যে একাই এই বিষয়ে দায়ী তা নয়। মধ্যবিত্ত অন্যান্য পরিবারগুলিও এই একই দোষে দোষী। এখানকার সাধারণ সমাজ কি হিন্দু, কি মুসলমান, এঁদের উপর বড়ই নির্ভরশীল ছিল। এরা দেশ ছাড়লে, তাদের স্থায়িত্বও অনির্দিষ্ট হয়ে পড়ে।

তালুকদারদের মতো মানুষেরা, উকিল বাড়ি, বক্সী বাড়ি বা অনুরূপ অনেক বাড়ির সাজানো সম্পদ লাভ করে সাময়িক কিছুকাল ভোগ করেছিল বটে, কিন্তু সে ভোগ স্থায়ী হল না। তাদের মধ্যে বক্সীবাবুদের মতো পারিবারিক রুচির পরম্পরা ছিল না। তাছাড়া, এইসব গৃহস্থরা পুরুষানুক্রমে এই সম্পদ অর্জন এবং ভোগ করেছেন গৃহস্থ সুলভ সংরক্ষণে। নতুন দখলকারীরা, যেহেতু এই সম্পদ অর্জন করেনি, তাই তাদের ভোগে গৃহস্থের সংরক্ষণ ছিল না। তারা ফল ফুরোলে গাছগুলো কেটে বিক্রি করে। পুকুর সেঁচে সব মাছ ধরে নিয়ে সে সব স্থানে ধানের ক্ষেত করতে লাগল এবং এভাবে গোটা অঞ্চলটাই লক্ষ্মীছাড়া রূপ ধারণ করল। বড় খাল-পারের বৃক্ষ দম্পতি এইসব দেখে-শুনে কেমন যেন মৌন হতে থাকল।

— সাত —

এইসব কথাই একান্নর দাঙ্গা এবং তার পরবর্তী দশকের কথা। সব স্মৃতি স্মরণে আনতে পারি না। তথাপি যেমন মনে আছে বলে যাই। দাঙ্গার ধকল তখনও চলছে। মাধবপাশার 'মৃদি' জমিদারদের বাড়িতে যারা আশ্রয় নিয়েছিল, গুণ্ডারা বাড়ি অবরোধ করে এক বীভৎস গণহত্যার অনুষ্ঠান করে তাদের প্রত্যেককে কোতল করেছে। মানপাশা, মুলাদি ইত্যাদি গ্রামে ব্যাপক গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে। রাষ্ট্রনেতারা কেউ তা বন্ধ করতে পারেন নি। লোকমুখে এই সব ঘটনা আরও অতিরঞ্জিত হয়ে পিছারার খালের জগতে পৌছেছে এবং তার দু'পারের হিন্দুগ্রামগুলোতে আখেরী ভাঙ্গন শুরু হয়েছে। চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশধরেরা হতবীর্য, হৃত সম্পদ। হতবীর্য এবং উদাসীন তাদের অধীনস্থ জমিদার কুলের তখনকার বংশধরেরা, যাঁরা তখনও মধ্যস্বত্বের মোহে সাত পুরুষের ভিটে আঁকড়ে বসে। বস্তুত, এঁদের কোনও যাবার জায়গায়ও ছিল না। বড়দরের ভূস্বামীরা সময়মতই সুবিধেজনক আশ্রয়ে পাড়ি দিয়েছিলেন।

কিন্তু তখনও আমার পিছারার খালের উজানি সোঁতায় জোয়ার ভাঁটা খেলছে, দক্ষিণের সুন্দরবন অঞ্চলে আমাদের যে 'মহাল', যেখান থেকে ধান, মান, কলা, কচু, কুমড়া আর গুড়ের নাগরীগুলো যে ঘাসি নৌকোগুলোর গর্ভ থেকে সোজা গোলা ঘরে পৌছোত তার প্রবাহ বন্ধ হয়নি। তখনও যথানিয়মে শ্রাবণ সংক্রান্তির ভরাগুলো পাঁঠা বোঝাই করে সেই সুদূর দক্ষিণ থেকে বর্ষার থৈ থৈ নদীপথ ধরে আসত। মনসা পূজার বলির পাঁঠা। মনসা পূজা প্রায় বাড়িতেই হত এবং বলিও হত। আবার এই ভরার আগমন অব্যাহত থাকত আশ্বিনের দুর্গাপূজার প্রাক্কাল পর্যন্ত। আমাদের

বাড়িতে মনসা পূজা থেকে শুরু করে কালীপূজা পর্যন্ত যত পাঁঠার প্রয়োজন সব এই মনসা পূজার সপ্তাহখানিক আগেই শ্রাবণ সংক্রান্তির ভরায় এসে যেত। এই ভরা বা ঘাসি খানাবাড়ির পিছারার ঘাটেই লাগত।

ভরার চরণদার এবং এই সব পাঁঠাদের সংগ্রাহক ছনু মিরধা পিছারার খালের ঘাটে নেমে, সরাসরি আমাদের পাকের ঘরের ছাইচে দাঁড়িয়ে আমার মাকে জানান দিত, তার কয়জোন খাওনদার। মা তদনুরূপ ব্যবস্থা নিতেন। সেই পাঁঠাগুলো ভরা মুক্ত হলে, যথানিয়মে যুধিষ্ঠির বিশ্বাস ওরফে পাঁঠা বিশ্বাস, তাদের নিয়ে পাঁঠা সেরেস্তায় দাখিল হত। সেখানে খানাবাড়ির ভুঁইমালি কাত্তিক, 'কাউফ্লা পাতা, কাডাল পাতা' ইত্যাদি পাঁঠাদের আহারের নিমিত্ত জোগাড় করে রাখত। ছনু মিরধার তখন ছুটি অর্থাৎ আরামের সময়। সে শুধু 'ধরধবইয়া ফসসা, কিন্তু কেচরীকাডা একখান লোঙ্গী আর এউক্কা ফুডা ফুডা গেঞ্জি পরইয়া বেয়াক কাম তত্ত্ব তালাশে ব্যস্ত।' বলাবাহুল্য, এই বস্ত্র দুটিই তার এবছরের পূজা উপলক্ষে প্রাপ্য। পাডা বিশ্বাসের জন্য একজোড়া গামছা ও লোঙ্গী এবং পাতার জোগানদার কাত্তিকার এক জোড়া মাডা এবং একজোড়া গামছা। পাডা বিশ্বাস এবং ছনু মিরধার লোঙ্গী মাডা হলে চলবে না। সে কারণ, হয় ফাক্ড়া ফুকড়ি, নয় কেচরীকাডা লোঙ্গী তাদের চাই। মাডা অর্থে মার্কিন থানের কাপড়ের খণ্ড, যা লুঙ্গির মতো করে পরা যায়। যুধিষ্ঠির এবং ছনুর পছন্দের 'রোঙডা আসমানী বা নীল।' কার্তিকার কোনও পছন্দের ব্যাপার থাকতে পারবে না বলে ঐ কোড়া রঙের মাডা। এই প্রথা বহুকালাবধি চলে আসছে।

যখনকার কথা বলছি তখন দাঙ্গার বা গণহত্যার তীব্র বিভীষিকা আমাদের কর্তাদের বিধ্বস্ত করলেও, অথবা আমাদের পিছারার খালের দুপাশের বক্সী, উকিল, গুপ্ত, বাড়ুজ্জে চাটুজ্জে বা গাঙ্গুলিরা দেশ ত্যাগ করলেও আমাদের এলাকার প্রান্তবর্তী যুগী, নাপিত, কামার, কুমোর, নমশূদ্ররা, তখনও যেন কি এক আশার ওপর নির্ভর করে নিশ্চিন্তই ছিল। মহালের প্রজারা আমাদেব পরিবারের কর্তাদের সাথে কখনওই এমন আচরণ করেনি, যাতে মনে হতে পারে যে তারা এইসব দাঙ্গা বা গণহত্যার ব্যাপারে কখনওই অংশ গ্রহণ করে আমাদের মতো পরিবারগুলোকে কোতল করতে পারে। বস্তুত তাদের কাছে দাঙ্গা, দেশভাগ, মানুষের অস্থির অসহায়তায় আশ্রয় খোঁজা, এগুলোর কোনও সঠিক খবরও বোধহয় ছিল না। তারা সকলেই মধ্যস্বত্বীয় আশ্রয়ের এবং নিয়মের দাস। প্রত্যন্ত দক্ষিণ পূর্ব সমতটের শিক্ষাদীক্ষা অথবা আধুনিকতার ন্যূনতম প্রসাদের অধিকারী নয় এরকম প্রায় আদিম প্রকৃতিসম্পন্ন মানুষ তারা। আমার এবং আমার মতো কিশোরদেরও বিস্ময় লাগত এদের সরল, আদিম এবং ভবিষ্য চিন্তাবিহীন জীবন-যাপন দেখে। আমাদের কর্তারা বোধকরি এদের এই গতানুগতিক জীবনধারার পরম্পরা দেখে আশ্বস্ত ছিলেন যে, এভাবেও চলতে পারে এবং তারা এই কুগ্রহের প্রভাব কাটিয়ে, পুনরায় দোল-দুর্গোচ্ছব, মোচ্ছব, পুণ্যাহ এবং ইত্যাকার যাবতীয় ইত্যাদি ইত্যাদি যথানিয়মে ভোগ করতে পারবেন। তারা দেশভাগ, জমিভাগের বিষয়টি বোধ করি

সম্যক অনুধাবন করেন নি। সে যাই হোক আমি আমার কাহিনীতেই প্রত্যাবর্তন করি। কাহিনী হয়ত তত্ত্বের স্বরূপ বাৎলে দেবে।

এসব পোশাক-আশাকে সজ্জিত পাড়া বিশ্বাস, ছনু মিরধা, কাত্তিকা ভুঁইমালী আমাদের ঐ বিশাল চৌদ্দবিঘার আয়তনের খানাবাড়িতে যখন ঘুরে বেড়াত, তখন বর্ষা শেষ হয়ে, শরৎ নামত আমাদের ঐ পৃথিবীতে। তখন উঠোনের জল, যা কিনা ভরাকোটালে গোটা এলাকায় দখলদারি জারি করে ছিল, তা নামতে শুরু করলে মুথা ঘাস, মধুকুপী এবং দূর্বাদের শিকড় আর গোড়াগুলি বাদামি থাকা সত্ত্বেও ডগাগুলি সবুজাভ হত। তখন, শালুক ফুলগুলো মাঠে, পুকুরে বা পগারে অসামান্য ঔজ্জ্বল্যে ঝক্‌মক্ করে উঠত এবং গৃহস্থের বাগানে স্থলপদ্মের কুঁড়িগুলি ফুটে ওঠার আকাঙ্ক্ষায় আকুলি-বিকুলি শুরু করত। আমাদের নিত্য তিরিশ দিনের চাকর ফটিক, তার চাঁই, বুচনই হোচা ইত্যাদি মাছ মারার সামগ্রীগুলোকে, আমাদের সামনের কুমোর বাড়ির বড় আমগাছটা থেকে ঝুলে পড়া শ্যামলতা দিয়ে নতুন করে বেঁধে সব পুকুরের জান্‌গুলোয় আর উজানি সোঁতার বহতাগুলোতে পেতে রেখে আসত, যার ভিতর নানা জাতের মাছেরা ঢুকে পড়ে আর বেরোনোর পথ পেত না। এই সব মানুষেরা তখনও আদৌ জানতেই পারেনি হয়ত, যে পৃথিবীতে ইতিমধ্যে প্রভূত রক্তপাত ঘটে গেছে এবং এখানে যে এখনও তা ঘটেনি তা নিতান্তই আকস্মিকতা।

তখনও আমরা কিশোরেরা যারা সেই পিছারার খালের বহতায় ছিলাম, তারা শারদী নিশির শেষের প্রহরে ঐ সব মাছ, ভাদ্দর-আশ্বিনের তাল, তথা নানা জাতির ফুল-ফল নিয়ে ঘরে ফিরতাম। সাথে নিয়ে আসতাম আরও সব সামগ্রী। কাছিমের ডিম, পথের ধারে অসহায় ভ্রাম্যমাণ দুর, যা কাছিমেরই স্বগোত্রীয় এক প্রাণী, হোগলের গুঁড়ি এইসব। মা এইসব সামগ্রী দিয়ে আমাদের নানান সুভোজ্যের ব্যবস্থা করতেন।

জীবন তেতো বোধ হতে শুরু করল আমার আশপাশের বিশেষ বিশেষ মানুষদের অকস্মাৎ অন্তর্ধানের সময় থেকে। তার বৃত্তান্ত আগেই বলেছি। বক্সীবাবু চলে গেলে বাকি হিন্দু ভদ্রলোক গেরস্থরা বুঝলেন যে ইস্কুল আর চলবে না। তাদের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা করারও আর কোনও উপায় থাকবে না। সেই সময়টি বড় কঠিন সময়। দাঙ্গা নিয়ে ভয় থাকলেও, ভদ্রলোক গৃহস্থেরা, স্থানীয় মুসলমানদের বিষয়ে বিশেষ চিন্তিত ছিলেন না। তারা বিশ্বাস করতেন যে এরা এমন কোনও কিছু করবে না যাতে তাঁদের মান ইজ্জতের উপর কোনও কালিমা লিপ্ত হতে পারে। কিন্তু পরিস্থিতি ততটা সরল বোধহয় ছিল না। পারস্পরিক বিশ্বাসহীনতার বাতাবরণ, একটা স্তরে তৈরি হয়ে গিয়েছিল। গৃহস্থ কন্যা-বধূরা তাঁদের রাখাল, বাগাল, ভাতুয়াদের পর্যন্ত সমীহ করতে শুরু করেছিলেন, যদিও তারা কোনও অপকর্ম কোনও দিনই করেনি। কিন্তু বাড়ির আধপাগল, হাবা অথবা কমবুদ্ধিসম্পন্ন দাসীরা হঠাৎ করে কেন যে গর্ভিণী হতে শুরু করল, তার কার্যকারণ সকলকেই ভাবিত করল। তাঁরা এইসব ঘটনার মধ্যে ভবিষ্যতের

পটে এক অনিবার্য অশনি-সংকেত যেন দেখতে পেলেন। এর পর কি তাঁদের কন্যা-বধূদের পালা? এরকম এক বিচার স্বাভাবিকক্রমে তাঁদের মাথায় ভর করল।

আমাদের বাড়িতে অনেক চাকর এবং দাসী ছিল। সেকালে বাড়ির কর্ত্রীরা, সাধারণত দাসী-চাকর বহাল করতেন একটি নির্দিষ্ট হিসেবে। পারুল নামের দাসী যদি তার দুই ছেলে নিয়ে 'কাঁচারাঁড়ি' হয়, তবে নিঃসন্তান এবং বিপত্নীক বিপিনের তার সাথে একত্রে 'গোলাঘরের' অন্দরে থাকায় কোনই 'আফত্য' ছিল না। তারা সেভাবেই থাকত। একারণে একটাই অঘোষিত চেতাবনী ছিল যে, এই ব্যবস্থায় পারুলের কখনওই অন্তস্থ হওন গ্রাহ্য হবে না। কেননা, তাহলে 'পুইণ্যের সংসারে পাপ ঢোকবে'। 'এই পুইণ্যের' সংসারের কর্ত্রী ছিলেন আমাদের বুড়ি পিসিমা, যাঁর সাত বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল এবং এগারো বছর বয়সে 'রাঢ়ী' হয়ে একান্ন সালের দাঙ্গার পর তাঁর ভ্রাতৃ নাতিনাতনিদের নিয়ে দেশত্যাগ করেন। বুড়ি আমার বাবা-জেঠার পিসিমা। আমরা তাঁর নাতি। কিন্তু আমরাও পিসিমা বলেই ডাকতাম। ডাকত দেশের সব মানুষ। এমন কি সরকারি সায়েব সুবোরাও। কি ব্রিটিশ, কি পাকিস্তানি, অথবা কি ওদেশ কি এদেশ সবাই পিসিমা বলেই ডাকত তাঁকে এবং কারুরই ক্ষমতা ছিল না তাঁকে এড়িয়ে যাওয়ার। কিন্তু সে কথা পরে আসবে, এখন তাঁর 'পুইণ্যের' সংসার বিষয়ে যা বলছিলাম, তাই বলি। এই সংসারটি কেন যে 'পুইণ্যের' সংসার, বড় হবার পর তা আর বোধগম্য হয়নি। ঐ বয়সে অবশ্য সরল বিশ্বাসে একে এক অসামান্য পুণ্যের সংসার বলেই বিশ্বাস করেছি। কেননা, এ বাড়িতে দোল, দুর্গোচ্ছব, দীয়তাং ভুজ্যতাং-এর যেমন ব্যবস্থা ছিল তেমন ছিল কিছু কিংবদন্তির প্রচলন যা ঐ বুড়ি পিসিমাই বোধ করি করেছিলেন। তাঁর দাদা অর্থাৎ আমার ঠাকুর্দা মশাই ছিলেন এই শাক্ত পরিবারে ব্যতিক্রমী পুরুষ। তিনি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মশায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং তিনি যখন গোস্বামীজির কৃপা লাভ করেন তখন গোস্বামী মশাই ব্রাহ্মসমাজের আচার্যত্ব পরিহার করে সনাতন 'অজপা' মন্ত্রের একজন গুরু। ব্রাহ্মদের সাথে তাঁর কোনই সম্পর্ক নেই। তখন তিনি আর প্রবর্তক বিজয়কৃষ্ণ, নন, তাঁর পরিচয় তখন জটিয়াবাবা, যিনি অদ্বৈতবংশীয় গোস্বামী, সনাতনপন্থী। ঠাকুর্দা মশাই এই গোঁসাইজির শিষ্য। তাঁর ধর্মপ্রবণতা তখন এতই উচ্চ মার্গীয় যে তিনি অন্দরমহল পরিত্যাগ করে বহির্বাটিতে একটি আশ্রমগৃহ নির্মাণ করে তাকে ফল, পুষ্প, কুটির এবং সুদৃশ্য তড়াগে সজ্জিত করে তথায় সাধন ভজন করতেন। কিংবদন্তি ছিল এই যে তিনি তখন মহাপুরুষ। তাঁর আশ্রম গৃহে কেউ যখন-তখন প্রবেশ করতে গেলে, তিনি নাকি বলতেন, একটু দাঁড়াও, ওরা আছে, ওরা যাউক তারপর আইও। ওরা বলতে সাপ খোপ জাতীয় প্রাণী যারা তাঁর কোনও ক্ষতি করত না, শুধুমাত্র তাঁর সৎসঙ্গ পাওয়ার জন্য আশ্রমে প্রবেশের রাস্তায় আড়াআড়ি, নাকি অলম্বুষের মতো শুয়ে থাকত। তিনি হাততালি দিয়ে তাদের সরে যেতে নির্দেশ দিলে, তারা সরে যেত এবং কুটিরে প্রবেশেচ্ছুরা তখন যেতে পারত। এছাড়া আরও অনেক কিংবদন্তিই ছিল। এইসব কারণে এই বাড়ি 'পুইণ্যের সংসার'। শুধু ঠাকুমা নাকি

বলতেন, 'এঃ সাধু? অমন সাধু অনেক দেখছি। সাধু যদি অয় হ্যার এ্যাতো পোলাপান অয় কেমনে?' ঠাকুমা নাকি ঠাকুর্দাকে এমন বলতেন। একথা মায়ের কাছে শুনেছি। বুড়ি পিসিমার বড় দেমাগ ছিল তাঁর বাপ ভাই-এর 'পুইণ্যের সংসার' বিষয়ে। কিন্তু সেখানেও বুড়ির এক অসামান্য কৌশল দেখে, এ সংসারের 'পুইণ্যতা' বিষয়ে খুব একটা বিশ্বাস তৈরি হয়নি। তিনি একদিকে ঝি চাকরদের স্থায়ী করণের জন্য, তাদের যেমন কিছু ইদিক উদিকের সুযোগ দিতেন তেমনই একারণে কোনও আতান্তর ঘটলে ভয়ঙ্কর কঠিন ব্যবস্থা নিতেন। তাঁর মানসিকতার এই বৈপরীত্যের কারণ বোধ হয় তাঁর নিজস্ব আজীবন যৌন কৃচ্ছ্রসাধনার বহিঃপ্রকাশ। নচেৎ তাঁর মতো একজন বিবেচক মহিলার আচরণ এরকম হওয়ার কোনও কারণই নেই। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করি। ইতিপূর্বে যে পারুলির কথা বলেছি, সে কোনও দিনই অন্তস্বত্বা জনিত কোনও সমস্যা সৃজন করে নি। কিন্তু যে রাক্ষুসি সময়ের অনুলিপি এই আলেখ্য, তখন, এই সমস্যা ঘটতে শুরু করল বাড়ির হাবা, পাগলা-ঝিদের নিয়ে। এই সব মেয়েরা আমাদের পিছারার খালের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অপবর্গীয় এবং অপবর্ণীয় সমাজের প্রতিবন্ধী মেয়ে। বুড়ি পিসিমা এদেরকে বড় স্নেহে এবং মমতায়ই আমাদের বাড়ির ব্যাপক কর্মকাণ্ডে কোথাও-না-কোথাও লাগিয়ে দিতেন। তারা বাসন মাজত, উঠোন ঝাঁট দিত, ঘরবাড়ি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার কাজে থাকত। দুবেলা, দুমুঠো অন্ন পেত এবং সামান্য বস্ত্র। তাই ছিল তখনকার রীতি। নগদ পয়সা-কড়ির ব্যবস্থা এদের ক্ষেত্রে ছিল না, থাকা সম্ভবও ছিল না হয়ত। বাড়ির দাপটের সময় এইসব ঝি-চাকরানিদের কোনওরকম বেচাল কেউ দেখেনি। নীরদসি বাবুর অভিজ্ঞতায় যেসব কাহিনী আমরা জেনেছি, সে রকম স্বভাবের মানুষ, আমি অন্তত আমাদের পিছারার খালের জগতে দেখিনি। দাঙ্গা পরবর্তী কালে আমাদের বাড়ির 'পাগলি' ঝি ধবলী হঠাৎ অন্তস্থা হয়ে ব্যাপক সমস্যার সৃষ্টি করলে আগে যেমন বলেছি, সব গৃহস্থেরা প্রমাদ গণে। ভাবে এরপর কার পালা? এবং ঐ সময়ের কারুর গৃহে যুবতী কন্যা থাকলে, স্বাভাবিক কারণে, যে বিভীষিকার উদ্ভব হয়, তখনকার সামাজিক প্রেক্ষায় তা উপেক্ষা করা চলে না।

আমি ধবলীর ব্যাপারটা অবশ্যই একদিন আমাদের 'পিছারার' পুকুরের ধারে একটি জঙ্গলে প্রত্যক্ষ করেছি। পাশের মুসলমান গ্রামের 'ছালাম' নামক একজন যুবক আমাদের পাগলি ধবলীকে যে ভোগ করছে, তা আমি দেখেছি। তারই কিছুকাল পরে ধবলী গর্ভিনী হয়। ধবলী পাগলি। কিন্তু, তা বলে পঞ্চশর তাকে বিদ্ধ করবে না এমন কোনও প্রাকৃতিক নির্দিষ্ট নির্বন্ধ নেই। নীরদসি মশাই, শুধু এসব ক্ষেত্রে, মধ্যবিত্ত তথা উচ্চবিত্তদের কামবিলাস বিষয়ে পাঁচ কাহনে বলতে পারেন। কিন্তু আমার ঐ ভূখণ্ডে দেশভাগ পরবর্তী প্রতিটি প্লবতার কালে অপবর্গী/বর্ণীয়রা কি আচরণ করেছে তার আলেখ্য বর্ণনা করেন নি। পাপ কোন্ স্তর অবধি পৌঁছেছিল, তিনি সম্ভবত, তা দেখেন নি। তিনি শুধু কাব্যের মধ্যে সমাজচিত্র দেখে, বাঙালির কাম ও প্রেমের তুল্য মূল্যে মনোযোগী হয়েছেন, সর্বসাধারণ

বাঙালির সুযোগের সদ্ব্যবহার দেখেন নি। দেখার কথাও নয়, কারণ, তিনি কিশোরগঞ্জ ছেড়েছিলেন নাকি দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে। দেশ ভাগ এবং দাঙ্গার প্রাক্কালে, আমি দেখেছি, বাঙ্গালির কাম শৌর্য কতই না ব্যাপক। ছালামও অপবর্গী/বর্ণী সমাজেরই লোক। কিন্তু তাতে কি একটা জনগোষ্ঠীর চারিত্রিক বিচার চূড়ান্ত ভাবে করা যায়? আমার মনে হয়, এক ব্যক্তি যদি শতজীবী কেন, সহস্রজীবীও হন, এমত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তাঁর পক্ষে করা যৌক্তিকভাবে সঙ্গত হয় না।

এ ধরনের ঘটনা ক্রমশ ঘটতে থাকলে, আমার পিছারার খালধারের মানুষেরা, অনির্দেশ যাত্রায় ক্রমশ আরও সচল হতে থাকে। অতঃপর যাদের আর কোনও উপায়ই নেই, তারাই শুধু সেখানে মাটি কামড়ে পড়ে থাকে।

এই সময়কার নানাবিধ কর্মকাণ্ড আমার ঐ পিতামহী পিসিমার ক্ষমতার মূলাধারে নাড়া দেয়। প্রথমটি ধবলীর অন্তঃসত্ত্বা হওন। এতাবৎকালে অনেক যুবতী ঝি, এ বাড়িতে কর্মরতা ছিল। কেউ কোনওদিন তাদের এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করেনি। কিন্তু আজ ধবলী অন্তঃসত্ত্বা এবং সে পাগল। পাগল না হয়ে অন্য কেউ হলে তাকে দূর করে দেওয়া সে যুগে কিছু কষ্টকর ছিল না। কিন্তু একজন পাগলিকে কি দূর করে দেওয়া যায়? বিশেষত ঐ রকম এক আসন্ন প্রসবকালে? কিন্তু এই ঘটনার অভিঘাতে বাড়িসুদ্ধ সবাই রীতিমতো স্তম্ভিত। পিসিমা বললেন, 'অর কোনও দোষ নাই, তমো, বাড়ির ইজ্জতটারে তো রাহন চাই।' বস্তুত, বুড়ি পিসিমা কোনও যৌন বিশৃঙ্খলাই সহ্য করতেন না। তাঁর ধারণা ছিল এই বাড়িতে এমত 'পাপ' কখনওই ঘটবে না। কিন্তু তার ঘেরাটোপ এবং শাসনশৃঙ্খলা ভেদ করে যে তাঁর নাতনিদেরই কেউ কেউ প্রতিবেশী কোনও যুবকের সাথে প্রেম প্রেম খেলা করত তা বোধ হয় তাঁর নজরে ছিল না। পরে দেখেছি এরও অধিক পাপের কারণ, এ বাড়িতে ঘটেছে এবং তা পিসিমার 'পুইণ্যের' সংসারের কোনও ক্ষতি করতে পারেনি। বোধহয় সেসব ঘটনার খবর পিসিমা জানতেই পারেন নি। সে যা হোক ধবলীর বিষয়ে পিসিমা বড়ই কঠোর হলেন। আমার জেঠামশাই যদিও খুব একটা দয়ার শরীর মানুষ ছিলেন না তথাপি তিনি বলেছিলেন, পিসিমা, তোমার আশ্রয়ে, বিড়ইল, কুকুর, হাঁস, পাড়া-ছাগলও তো আছে? আছেনা?

: হঃ হেয়া থাকপে না ক্যান?

: হেগুলা বিয়ায় না?

: বিয়াইবে না ক্যান? জীবের জীবধম্ম, মা ষষ্ঠী হ্যারগো কিরপা করলে তো এসব হওনই উচিত। বিড়ইল মা ষষ্ঠীর বাওন, ঘরের পোষ্য। এ্যারা পায় পায় হাটবে, ল্যাঙ্গে ঠ্যাঙ্গে থাকপে, তয়তো গেরস্তের আহ্লাদ।

: তয় ধবলীরে খেদামু ক্যান?

: ও বড়নসু, তুই কও কি? ও যে মনুষ্য, মাইয়ামানুষ, রাড়ি?

: না, পিসিমা, তুমি যা যা কইলা, হয়ত ও হেয়ার বেয়াক কিছুই, তয়, ও মনুষ্য না। ও এট্টা পশু। ওর কোনও বোধই নাই। অর ভাল মন্দ জ্ঞেয়ান নাই।

: কিন্তু মাইনসে কইবে কি?

: মাইনসে অনেক কিছুই কয়, কইবেও। কিন্তু অর এই অবস্থাও তো মাইনসেই করছে। নাকি কও? ছোটকর্তা বললেন, দাদায় যা কইছেন, ঠিকই কইছেন, পিসিমা। অরে এ অবস্থায় খেদান যায় না। হেডা ধম্ম না।

কিন্তু পিসিমা, এ বিচারে সন্তুষ্ট হলেন না। বাবাকে বললেন, বড় নসুর স্বভাবটা শাক্ত স্বভাব কিন্তু তুই আমিতো একই গুরুর শিষ্য। আমরা তো, গোঁসাইজির ধারায় আছি। তুইও এমন কথা কও? বাবা বললেন, পিসিমা, আমার মনে অয় সাধন পথে তুমি একটুও আগাও নায়। তোমার মন এহনও অহংকারে মত্ত।

: এ্যার মইদ্যে তুই অহংকার দেখলি?

: দেখলাম বলইয়াই কই—তোমার উচিৎ এই অহংকার ত্যাগ করা। নাহংকারাৎ পররিপু। তোমার দাদায় এ কথা পাথরে লেহাইয়া তোমারে দিছেন। তুমি তোমার সিংহ পালঙ্কের আসনে সেই পাথর রাখছ। রোজ হেয়ার পূজাও কর। তোমো কই, তোমার অহংকার আছে।

পরে বুঝেছি, বাবা বুড়ির আজীবন সংযম রক্ষার জন্য এক বিশেষ অহংকারের কথাই তাঁকে বলতে চেয়েছিলেন। বাবা একটি বিশেষ ঘটনার কথাও উল্লেখ করেছিলেন। বলেছিলেন, গোঁসাইজি কিন্তু নিজেও এই দাহ থিকা মুক্তি পায়েন নাই। আর হে কথা নিজের মুহেই তিনি ব্যক্ত করইয়া গ্যাছেন। তুমি তেনার হে বিভ্রাটের বিষয় জাননা?

: হেয়া ক্যামন, হেনায় তো মহাপুরুষ জিতকাম। হেনার আবার এমত বেভ্রাট কি?

এর উত্তরে বাবা তাঁকে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনের একটি বিশেষ ঘটনার কথা বলেছিলেন। গোঁসাইজি নিজেই এই কথা তার প্রিয়শিষ্য এবং ডায়েরি-লেখক কুলদা ব্রহ্মচারীকে বলেছিলেন। তখন তিনি প্রবর্তক বিজয়কৃষ্ণ। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে আচার্যের কাজ করছেন। একদা এক উপাসনা সভায় গোঁসাইজি ভাষণ দানকালে একটি অষ্টম বর্ষীয়া বালিকাকে দেখেন। তাকে দেখে তিনি এতই মোহিত হন যে ক্রমশ এই মোহ তাঁকে তীব্রভাবে কাতর করে ফেলে। এমন কি তিনি, সভাশেষে, নাকি বেশ কিছুটা পথ, সে বালিকাটির পিছু পিছু অনুসরণ করেছিলেন, প্রায় তার বাড়ির কাছাকাছি পর্যন্ত গিয়ে। অকস্মাৎ আত্মবুদ্ধি ফিরে এলে, তিনি নিজের এই আচরণকে ধিক্কার দিতে দিতে প্রত্যাগমন করেন। বাসায় ফিরে তিনি এই অর্থহীন ক্লেদ থেকে মুক্ত হবার জন্য একটি গান রচনা করেছিলেন। তার শুরুয়াৎ ছিল—

মলিন পঙ্কিল মনে
কেমনে ডাকিব তোমায়
পারে কি তৃণ পশিতে
জ্বলন্ত পাবক যথায়।

এই কাহিনীটি শোনাবার পর বাবা খুব কাতরভাবেই পিসিমাকে বলেছিলেন—ধবলীর ব্যাপরডা তুমিও যদি না বোজো, তয় এ সংসারে বোজবে কেডা?

পিসিমা তথাপি ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেন নি। সে কারণেই, তাঁর বয়স্থা নাতনিদের কেলেংকারির হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে, দেশত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর দেশত্যাগের সাথে সাথে আমাদের বাড়ি এবং পিছারার খালের জগতের তাবৎ কিংবদন্তির দিনগুলোর অবসান হল। লোককথা, লোক-পার্বণের বারমাসের তেরো অনুষ্ঠানও অতঃপর লুপ্ত হয়ে গেল। পিসিমা-বুড়ির বিষয়ে পরে আরও কিছু বলে প্রসঙ্গটি শেষ করব। আমরা তখন এক অন্য সংস্কৃতির সাথে মুখোমুখি দ্বন্দ্বে। এই দ্বন্দ্বকে আজকের বিচারে আমি আর সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব বলতে পারিনা। এই দ্বন্দ্বই বাঙালি সংস্কৃতির সাথে শাসক পাকিস্তানিদের জঙ্গি ইসলামি জগাখিচুড়ি সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব, যা পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলনে পরিণতি পায়। কিন্তু এই সময় এই চাপিয়ে দেয়া সংস্কৃতির লক্ষ্যস্থল ছিল শুধুমাত্র মধ্যবিত্ত তথা তাবৎ হিন্দু সংখ্যালঘুরা। যেহেতু হিন্দু সমাজ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজ বলে পরিচিত তথা প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেকারণে চাপিয়ে দেওয়া এই জগাখিচুড়ি সংস্কৃতির আক্রমণের প্রথম ধাক্কাটা তারাই অনুভব করে। কিন্তু এর সাথে সশস্ত্র দাঙ্গা এবং দেশভাগের অন্যান্য কুফল মিশ্রিত হয়ে ব্যাপারটা এমন এক পর্যায়ে যায় যে ব্যাপক মধ্যবিত্ত হিন্দুসমাজ কোনও গণতান্ত্রিক প্রতিরোধে না গিয়ে ভারতের মাটিতে উদ্বাস্তু হয়ে ত্রাণ খোঁজে। যে কয়জন মুষ্টিমেয় হিন্দু মধ্যবিত্ত এই বিপরীত সংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াই জারি রাখেন, তাঁরা কিছুকাল গত হলেই মুসলমান ছাত্রসমাজ ও বুদ্ধিজীবীসমাজের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ব্যাপক প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুলতে সক্ষম হন। কিন্তু সে শহর নগরে। গ্রামগুলো ক্রমশ ধ্বংসই হতে থাকে এবং আর কোনওদিনই মাথা তুলে দাঁড়ায় না। কিন্তু সেকথা থাক। সেসব কথা সমাজবিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের কথা, তাঁরা তা করবেন। আমি পিছারার খালের কথাই বলি।

— আট —

পিছারার খাল এবং সর্বং সহিষ্ণু ঐ কুলপতি বৃক্ষ দম্পতি এলেকায় সেই সময়টিতে দাঙ্গায় সমূলে বিনাশ হওয়ার চাইতেও, ভয়াবহ ছিল যুবতী মেয়েদের লুণ্ঠিতা বা ধর্ষিতা হওয়ার আশঙ্কা। তখন গোটা দেশেই ধর্ষণ, লুণ্ঠন ইত্যাকার অনৈতিক কাজগুলো যেন খুব সাধারণ স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আবার অন্যদিকে, যে-কোনও প্রকার যৌন আচরণই তখন বলাৎকার হিসেবে গৃহীত হচ্ছিল, যদি তার পাত্রী হিন্দু এবং পাত্র মুসলমান সমাজের হত। এ বিষয়ে একটি চূড়ান্ত অভিজ্ঞতার কাহিনী বলব। তখনও আমি বয়ঃসন্ধির কাছাকাছিও পৌছাইনি। একটি নিছক সাধারণ যৌনতার ঘটনাকে, হয়ত তাকে প্রেমই বলা যায়, আমি দেখেছি ধর্ষণ হিসেবে আখ্যায়িত হতে। ঘটনাটি আদৌ ধর্ষণ ছিল না। ছিল আপোশের। তখন আমার যা বয়স, তাতে স্বাভাবিক

যৌনতা, ধর্ষণ, প্রেম ইত্যাদি বিষয়ে আলাদা আলাদা পরিষ্কার ধারণা ছিল না। একটা স্থূল ধারণাই শুধু এ বিষয়ে আমার ছিল, যা বাড়ির পুবোনো চাকরবাকর, বা গ্রামের কোনও উঠ্‌তি মুখফোঁড় দাদার কাছ থেকে রপ্ত।

ভদ্র গৃহস্থেরা গ্রাম ছাড়লেও, পিছারার খালের চৌহদ্দির অপবর্গী, অপবর্ণীয়রা তখনও দেশ ছাড়ার কথা ভাবছিল না। তখনও যুগীপাড়া, নাপিত পাড়া, ধোপা, কামার, কুমোর এবং নমশূদ্রেরা গ্রাম ছাড়তে শুরু করেনি। আমাদের তথাকথিত 'ভদ্দর লোকদের' ভিটেতে সাঁজ সবেরে শেয়াল ডাকলেও ওদের এলাকাগুলো বেশ সরগরম ছিল। তারা তাদের জাতকর্ম বেশ চালিয়ে যাচ্ছিল। তখনও পানবরজগুলো পাটকাঠির ঘেরাটোপে পানপাতার সবুজ বহতা বজায় রাখছিল। যুগীরা হলুদ, নীল, লাল এবং ফলসা শাড়ি বুনোনে ব্যস্ত থাকত। কামারশালায়, দিনরাত হাপরের শব্দ এবং 'নেহাইএর' তপ্ত লোহার পাতের উপর হাতুড়ির দমাদ্দম আঘাতের শব্দ আমরা বাড়ি থেকেই শুনতে পেতাম। আমাদের 'ভদ্দরলোকদের' বাড়িগুলো শূন্য হলেও ওদের অঞ্চলে তার কোনওই প্রভাব তখনও দেখা যায়নি। তারা তখনও বেশ দিব্য গ্রামীণ সুখেই গেরস্থালির রস উপভোগ করছিল। সারাদিনমান পরিশ্রম করে সন্ধেবেলায়, খোল, কর্তাল, বাঁশি নিয়ে তাদের কীর্তনের দল গেয়ে চলছিল, তাদের আবহমানের পদাবলি—

গৌর একবার এসো হে
তুমি আসিলে আনন্দ হবে
নিরানন্দ দূরে যাবে—
গৌর একবার এসো হে—

তারা গৌরাঙ্গ ভক্ত ছিল সবাই। সহজ সরল সাধারণ মানুষ তারা। গৌর, নিতাই, শচীমাতা, এবং বিষ্ণুপ্রিয়াকে ইষ্ট হিসেবে নিয়ে বহুকাল ধরে তাদের এই ধারা তারা বজায় রেখে চলেছে। এর সাথে সমান্তরালে চলেছে সব লোকায়ত দেবদেবীর পূজা। এরা সবাই মূলত সংকীর্তনের ভক্ত, তাই গৌর, নিতাই, অদ্বৈত, শ্রীবাসাদির অনুগামী। সারাদিন কাজকাম, সন্ধেবেলা হরিনাম। আমি আজও বনমালী যুগীর কাঁপানো কণ্ঠের সেই কীর্তন ভুলতে পারিনা—

সংকীর্তনের শিরোমণি
দ্বিজমনি দ্বিজ রাজো হে—

এছাড়া তারা আরও এক কীর্তনের আসর করত এসময়। সেই আসরের নাম 'তেন্নাথের মেলা'। এই আসরের নাম মেলা, শুধুমাত্র কীর্তন নয়। গরিবগুর্বোদের অসহায়তার কথা ভেবেই যেন কোন্ সুজন এই সরল মেলা কীর্তনটির সৃজন করেছিলেন। আমাদের বাল্যকালের ঐ সময় এর বেশ ব্যাপক প্রচলন হয়েছিল। এই উৎসবে খরচ মাত্র তিন পয়সা। প্রায় ব্রত কথার মতোই এই অনুষ্ঠান। 'তেন্নাথ বা ত্রিনাথ'। 'বেম্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের' সম্মিলিত রূপ। তাঁর কৃপায় 'হারাইয়া যাওয়া গাই' ফেরৎ পাওয়া যায়। 'বাঁজা গরু ডাকে'

এবং গর্ভিণী হয় এবং আরও সব অসম্ভব অসম্ভব কাণ্ড ঘটে, যা কৃষি এবং পশুপালনকারী মানুষ্যদের সমস্যা বিষয়ক। এই তেন্নাথ গোঁসাই-এর মহিমা একটা সময় থেকে এদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করলে, দাঙ্গার পরবর্তীকালে এখানকার অবশিষ্ট মধ্যবিত্তরাও তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করে। বাড়িতে 'মানত' করা হত 'তেন্নাথের' মেলার। বনমালী, লালু, যদুনাথ ইত্যাদিরা তাদের সংকীর্তনের দল নিয়ে এসে তখন এই 'তিন পয়সার পালা' গেয়ে যেত। এক পয়সার পান সুপারি, এক পয়সার বাতাসা, আর একপয়সার গাঁজা—এই হল পূজার উপকরণ। বনমালী দেবনাথ গাইত—

আমার ঠাকুর তেন্নাথ গোঁসাই
কিছুই না সে চায়
এক পয়সার গাজা পাইলে
ডুগ্‌ডুগি বাজায়।

এইরকম সহজ সরল কীর্তন-প্রাণ মানুষ ছিল এরা। এই কীর্তনীয়াদেরই একজনের মেয়ে পুতুল, অল্পবয়সি বিধবা যুবতী। তার মেয়ে কুসুমের বয়সও তখন তেরো চৌদ্দ। মা মেয়ে দুজনকেই তখন মনে হত দুই বোন। পুতুল অকালে বিধবা হয়ে, মেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ি, যেমন সাধারণত হয়ে থাকে। আমাদের বড় খালের যেখানটি থেকে পিছারার খালটির শুরু বা শেষ, তার বেশ কিছু উজানি বহতা পেরিয়ে এগোলে, ডানদিকে হিন্দুদের, তো বাঁদিকে মুসলমানদের গাঁ। জানিনা, এই উজানি খালটি কোনো এক সময়—হিন্দু মুসলমানদের আলাদা স্থায়িত্বে স্থাপনের জন্য কাটা হয়েছিল কিনা। অথবা প্রাকৃতিকভাবে তৈরি এই খালটিকে এই উভয় সমাজ সীমান্ত চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করেছিল।

পুতুলদের গ্রাম যুগী পাড়াটি কিন্তু মূল খালের ডান দিকের হিন্দুদের এলাকায় নয়। সেটি খালের একটি বাঁকে এসে বাঁদিকেই পড়েছে। যুগীদের এক ফালি মহল্লা পিছারার খালের সাম্প্রদায়িক চিহ্নটিকে যেন বিদ্রূপ করেই তাদের পাড়াটিকে বাঁদিকের ঐ স্থানটিতে আটকে রেখেছে। অনধিক শ'দেড়েক গেরস্থালি নিয়ে এই যুগীপাড়া। তাদের কাজকাম কাপড় বোনা, প্রতিদিন সকাল সন্ধেয় তাদের ঠকাস্‌ঠক্ ঠকাস্‌ঠক্ শব্দ আমাদের বাড়ির ছাতের উপর থেকেও শুনতে পাওয়া যেত। কখনও পাড়া বেরুনি পারুলি দাসী কখনও-বা ধরনী বুড়ি ছোট ধোপানির সাথে বেড়াতে গিয়ে তাদের 'টানাপোড়েন' 'রঙ্গোলা' অথবা 'ষাট চল্লিশে'র কাজ দেখতাম। তাদের কেউবা নাথ, কেউবা দেবনাথ এইসব পদবীর। এই যুগী বা যোগীদের সাথে, নাথ যোগীদের কোনও সম্পর্ক আছে কিনা তখন তা বিচার করিনি। বোধ করি ছিল। কেননা তাদের সমাজ, সামাজিকতা ভিন্ন ধরনের ছিল, আর নামের সাথে উপাধিগুলো ছিল নাথ বা দেবনাথ। দেবনাথ হল তারাই, যারা পৈতে নিত এবং আমরা তাদের 'যুগীর বাওন' বলতাম। তাদের পারেরই একদল লোক ছিল জোলা। তারাও কাপড় বুনত। রঙ্গোলা করত। তাদের বাড়ির তাঁতের ঠকাস্‌ঠক্ শব্দও আমরা শুনতে পেতাম। সে শব্দ যুগীবাড়ির

শব্দের সাথে মিশেই এসে পৌঁছোতো আমাদের ছাতে। এরামাত্র কয়েক পুরুষ আগেকার তাঁতি ইত্যাকার জাতির ধর্মান্তরিত মুসলমান। তখনও গোপনে তাদের 'বুত্‌পরস্তি' চলে। নামের পদবীগুলোও পাল্টায়নি। কেউ মল্লিক কেউ বিশ্বাস, কেউ মণ্ডল বা শিকদার। সবই পেশাদারি নবাবদত্ত পদবী। জাত বোঝার উপায় নেই পদবী দেখে। তবে সবারই মূলাধার অপবর্ণীয় হিন্দু সম্প্রদায়। পুতুল এদেরই মেয়ে। হিন্দু সমাজের। কাসেমও এদেরই ছেলে। মুসলমান সম্প্রদায়ের। এই কাসেম এবং পুতুলের মধ্যেই প্রেম।

কাসেমদের বাড়ি আর পুতুলদের বাড়ির মাঝে একটি ছোট নালা খাল, পিছারার খালটির সাথে এসে মিশেছে সেটি। কাসেমদের পদবী মল্লিক। এই কাসেম একদা পুতুলকে নিয়ে ভেগে যায়। পুতুল তখন বত্রিশ তেত্রিশ বছরের যুবতী বিধবা। এই নিয়ে গোলযোগ। কাসেম পুতুলয়ে বাইর করইয়া নেছে। কিন্তু এ ব্যাপারে পুতুলের যে ইচ্ছার আদৌ অভাব ছিল না, সেকথা কেউই বিচার করল না। তারা কিছুদিন শহর গঞ্জে কাটিয়ে দরিদ্রতা নিবন্ধন বহুকালের পরিত্যক্ত দত্তবাড়ির ভূতুড়ে গৃহে এসে হাজির হয়। না পুতুল তার সমাজে যেতে পারে, না কাসেম। পুতুলের সমাজের বিচার সে 'কাচা রাড়ি' হয়েও মুসলমানের ছেলের সাথে 'বাইর অইয়া গেছে' অথবা হ্যারে ফুস্‌লাইয়া নেছে, আর কাসেমের সমাজের বিচার, 'হে কলমা না পড়াইয়া এট্টা নাপাক হিন্দু বেওয়ার লগে জেনা করছে।' এক্ষেত্রে কাসেম যদি পুতুলকে কলেমা পড়িয়ে শুদ্ধ করে নিয়ে ভোগ করত, তাতে তাদের কোনওই গুণা হত না, বরং এক মহাপুণ্যের কাজ হত এবং এরকম 'হাদিস' অবশ্য আছে যে পুরোপুরি 'সাদি' না করেও আওরৎদের গ্রহণ করা যায় কিছু বিশেষ প্রকরণে। পশুকে যেমন 'হালাল' করে ভক্ষণ করা 'জায়েজ', তেমনি আওরৎদেরও হালাল করে নেওয়া প্রতিটি মোমেন মুছলমানের 'পাক্‌-কর্তব্য'। কাসেমের সমাজের বিচারে পুতুল হালাল নয়। হারাম। তাকে হালাল করতে হলে, কলেমা পড়িয়ে অর্থাৎ 'লাই লাহা ইল্লালাহ মহম্মদ্‌ উর রসুলুল্লা' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়ে নিতে হবে, নচেৎ তার সহিত সহবাস করা না-পাক্‌। কিন্তু যৌন-বুভুক্ষা 'কলেমা' বা 'যদিদং হৃদয়ং তব' ইত্যাদি মন্ত্রের জন্য থোড়িই অপেক্ষা করতে পারে। বিশেষত যখন সেখানেও নানা 'ফ্যাক্‌ড়া'র মোকাবিলা করতে হয়। এ কারণে উভয় সম্প্রদায়েই এক ব্যাপক গোলযোগের সূত্রপাত হয়। দত্তদের পুরোনো পোড়োবাড়িতে বসবাসকালে তাদের অবস্থা দাঁড়ায় অতি করুণ। তাদের তখন অন্ন জোটে না। উভয় সমাজই তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে। দিন মজুর কাসেম খেতে খামারে কাজ পায় না। কোনও গৃহস্থই কাজ দেয় না বলে সে প্রায় 'একঘরে' হয়ে আছে। কাসেম খেটে খাওয়া মানুষ, সা-জোয়ান চেহারার মস্ত মরদ। পুতুল ছিপছিপে চেহারার বছর বত্রিশের আচুক্‌কা সুন্দরী যুবতী। 'আচুক্‌কা' সুন্দরী বলতে আমাদের ওখানে যাদের বোঝানো হত তারা শাস্ত্রসম্মত এমন কি দেশাচার সম্মত সুন্দরীও নয়। শাস্ত্রসম্মত সুন্দরীদের কথা বাদ দিই। এখানে তার প্রয়োজন নেই। কিন্তু দেশাচার সম্মত সুন্দরীদের কথাটি না বললে আচুক্‌কা

সুন্দরীর ব্যাপারটি বোঝা যাবে না। দেশাচার সম্মত সুন্দরীরা হবে ‘ফস্‌সা ধলা, গড়ন পেডন গোলগাল লগতইয়া। মাথায় থাকপে আষারইয়া ম্যাগের ল্যাহান ক্যাশ, যা পাছা বাইয়া ঠ্যাঙ্গের লোছ অর্থাৎ গোছ ছাড়াইয়া লামে। হ্যারা লাল পাড়ইয়া শাড়ি পড়া, সব্বদা লক্ষীলক্ষীভাব।’ ‘আচুক্কারা’ তা নয়। ‘হ্যারগো চৌউক্কেরভাবই আলাক্, চ্যাহারায় ছ্যামড়া চ্যাতানইয়া ম্যাকমেকী। হ্যারগো দ্যাখলেই বেয়াকের মুহের থিহা নজর আগে পড়ে বুহে। সামনা দিয়া হাডইয়া যাওনের সোমায়, হ্যারগো পাছালাড়া দ্যাকলে, পুরুষতো পুরুষ, তোলানইয়া খাসি বলদাডাও ফাৎ ফাৎ করইয়া দীগ্‌গ শোয়াষ ছাড়ে।’ ইংরেজিতে এই বর্ণনা বা ব্যাখ্যানা হয়ত একটি বাক্যে বা শব্দেই হত। শব্দটি ‘সেক্‌সি’। এরা ছিল প্রকৃতই ‘সেক্‌সি’ চেহারার।

পুতুলের প্রসঙ্গে এতসব সাতকাহন এল। এদের দেহের গড়ন এবং গতরের ‘লগইত্’ দেখেই আমাদের দেশের মহিলারা ধারণা করতেন যে এরা সাধারণত অধিক ‘ম্যাকমেকি যুক্তা’ হবে। পুতুল যে তার ম্যাকমেকির জন্যই অথবা দারিদ্রের কারণে কাসেমের মতো এক হাম্‌উয়া জুয়ান শ্যাহের লগে বাইর অইয়া গেলে একথার প্রচারও চাপা পড়ে গেল। শুধু সবাই জানল, ‘মোছলমান যুবক কর্তৃক’, অসহায়া হিন্দু যুবতী বিধবার শ্লীলতনাহানি। পুতুলের দারিদ্র বা অসহায় যৌবনের পরিত্রাণ বিষয়টি কোনও সমাজেরই স্বীকৃতি পেলনা।

এ বিষয়ে সর্বাধিক ক্ষিপ্ত ছিল কাসেমের বাপ। তার ক্ষিপ্ততার কারণ ভিন্ন। তার ছেলে কোন্ হিন্দু মাগীর সাথে ‘জেনা’ করেছে, তা তার প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। বাপবেটা উভয়েই একই জীবিকার মানুষ। হিন্দু গেরস্থ বাড়িতে, কাঠকাটা, বাগান দেখভাল করা, নারকেল, সুপারি পাড়া, চাষের কাজ, ইত্যাদি ব্যাপারে জীবিকা অর্জন করত তারা। এই ঘটনায় হিন্দু বাড়ির কাজ কাম তারা আর পাচ্ছিল না। তার বাপের রাগ সেকারণে। এদিকে পুতুল আর কাসেমের অন্ন জোটা ভার। কাসেম তখন তার প্রেমের দায় শোধ করছে। তারা তখন থোড়-কচু এডা-ওডা খেয়ে দিন গুজরান করছে। এর মধ্যে একদিন বাপ সেই দত্তদের হানাবাড়িতে চড়াও হয়ে ধুন্ধুমার কাণ্ড বাঁধিয়ে বসে। পুতুল ছিল একা। কাসেম গেছে খাদ্যের সন্ধানে এদিক ওদিক কোথাও। পুতুল সামনের বয়ে যাওয়া খাল থেকে জল তুলতে গেছে। এ বাড়ির সামনের খাল হলেও এটিই আমার সেই পিছারার খাল। এমত সময় এপারে পুতুল আর ওপারে কাসেমের বাপ। মল্লিক রোগা ঢ্যাঙঢ্যাঙা চেহারা হলেও হাঁক ছাড়ে আলী আলী বলে। গলায় বেদম জোর। সে হাঁক্ পাড়ে, মাগী তোর এত খাউজ কিয়ের অ্যাঁ? তার হাতে একখানা কুড়ুল, যা তার নিত্য দিনের রোজগারের হাতিয়ার। মল্লিক হঠাৎ খালপারে পুতুলকে দেখে ভীষণ খেপে যায়। কারণ বেশ কিছুদিন ধরে তার কামধান্দা কিছুই জোটেনি। সবাই বলে, না মল্লিক, তোমাগো আর কাম দিতে পারলাম না। সবাই তাকেও অবিশ্বাস করতে শুরু করেছে। যেন সেও তার ছেলের মতো একটা কাণ্ড ইচ্ছে করলেই করতে পারে। মল্লিক বলে, মাগী এই কুড়ুইল দিয়া তোর ম্যাকমেকীর ফলনাতা হরমু, বোজজো?

তোর ম্যাকমেকীর গোড়ায় মুই ঢেহির মুষল দিয়া ধান ভান্‌মু। তোর এ্যাত্তো খাউজ যে মোর পোলারে বিভ্‌ভুলা কর?

এসব ভাষা আমাদের অঞ্চলে আকছার ব্যবহার হত তখন। কেউ কিছু মনে করত না। তো এই সব চেঁচামেচি হুড়াঙ্গামায় আশপাশ গ্রামের সব মানুষজন এসে হাজির। মনে আছে, ঐ ভিড়ের মধ্যে পুতুলের মেয়ে কুসুমও ছিল। সে বড় করুণ চোখে তার মাকে দেখছিল। একথা এখনও ভুলিনি। তার চোখে ভয় এবং ঘৃণা। বয়স আমার তখন যাই হোক, আমি অনেক কিছুই তখন বুঝতে আরম্ভ করেছি। খালের উভয় পারের মুরুব্বিরা, হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে ঐ দত্তদের বাড়ির সামনেই এক সালিশির ব্যবস্থা করলেন। এরা অবশ্য কেউই উচ্চবর্ণীয় সমাজের নন। যাঁরা যুগী সমাজের তাঁরা বলছেন, মোগো মাইয়াডাবে বাইর করইয়া নেছে তোমাগো পোলায়। মুসলমানরা বলছেন, হুইজ যদি হোগা লাড়া দে হেলে হুতা হান্দে ক্যামনে? এমন এক বিন্যাসে সভার আলোচনা শুরু হয়। মল্লিকের পক্ষে যারা, তারা পুতুলের দোষ বর্ণায় আর পুতুলের স্বজাতিরা বলে, 'মোগো, রাড়ি মাইয়াডারে কাসেমইয়া বাইর করইয়া নেছে।' এইসব গণ্ডগোলে সালিশি যখন প্রায় চৌপাট তখন কোনও এক অন্ধকার প্রান্ত থেকে যেন পুতুল বেরিয়ে আসে। তার পরনে কালো নরুণ পাড় আধাচ্ছিন্ন ধুতি, যা গরিব বিধবারাই শুধু আমাদের ওখানে পরত। হাতে দুগাছা পেতলের চুড়ি। অনাহার অনিদ্রা এবং দুশ্চিন্তায় জীর্ণশীর্ণ শরীর। এখন তাকে আচুককা কেন, কোনও সুন্দরীই বলা চলে না। সে খুবই সসংকোচে সামনে আসে এবং বলে, 'আফনেরা এহানে য্যারা য্যারা আছেন, বেয়াকের ধারে কই, মোরে আর মোর ঐ মাইডারে দুগ্‌গা ভাত দেওয়ার কেউ আছেন এহানে? মোগো ভাত জোড়েনা। মোর বাপ জেডারাও এহানে হাজির। হ্যারাও মোগো দুমুইড খাওন দেতে পারে না। হ্যারগো নিজেগোই জোড়েনা তো দেবে ক্যামনে?' নিতান্ত অসহায়ার মতোই সে সভার সামনে দাঁড়িয়ে সেদিন তার আর্জি পেশ করেছিল। আমার স্মরণ আছে, দত্ত বাড়ির বেলগাছটার তলায় দাঁড়িয়ে আমি এই করুণ দৃশ্য দেখছিলাম। আমার সাথে আরও অনেক ছেলেপুলে রগড় দেখতে গিয়েছিল সেখানে। কিন্তু আমার কাছে শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা আর রগড় থাকেনি। পুতুল বলে যাচ্ছিল, 'দেবেন কেউ মোগো, দোবেলা দুগ্‌গা ভাত?' দুই সমাজের কোনও মুরুব্বীই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি সেদিন। শুধু ছিলা ছেঁড়া ধনুকের মতো সোজা মরদ সেই কাসেম বলেছিল, 'মুই দিমু। লও, তুমি আর তোমার মাইয়ারে লইয়া মুই গঞ্জে যাইয়া থাহুম, তোমার মাইয়া মোরও মাইয়া ইন্‌সাল্লা। গঞ্জে মোগো ভাত কাপুরের অবাব অইবে না।' কিন্তু মেয়ে কুসুম বলে, 'মুই যামুনা। শ্যাহের ভাত মুই খামুনা। এ্যারা মোর কেউনা, কেউনা। মুই মরুম মরুম, মোর কেউ নাই কিচ্ছু নাই'—এইসব বলতে বলতে সে কোথায় উধাও হয়ে যায়। পুতুলের উদ্যতপ্রশ্ন মখ তার বকের কাছে নুয়ে পড়ে।

ঐ বয়সেও একটা বিষয় আমার মতো বয়সিদের কাছেও পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে পুতুল শুধুমাত্র পিরীতের জন্যই কাসেমের সাথে বেরিয়ে যায়নি। তার এবং তার মেয়ের ক্ষুধা একটা বড় সমস্যা ছিল তার কাছে। মেয়েটা কিন্তু মায়ের এই ব্যাপারটাকে মেনে নিতে পারল না। কেননা সামাজিক যে শিক্ষায় সে তখন গড়ে উঠছে সেখানে 'শ্যাহেদের' সব কিছুই খারাপ। উপরন্তু এই তাঁতী যুগীদের বা অন্যান্য অপবর্ণীয় মনুষ্যদের সমাজ তখনও দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হবার পরিক্রমা শেষ করেনি। জোলা এবং যুগীদের মূল সমাজ একই দৃষ্টিতে দেখে। কিছুই ভেদাচার করে না। সে কারণেই বোধকরি যুগীরা জোলাদের একেবারেই সহ্য করতে পারে না, কেননা তারা জাতিত্যাগী হয়ে মোছলমান হয়েছে। এখানে একটা অভিমানের ব্যাপার আছে। সমাজতাত্ত্বিকেরা ভাল বুঝবেন। কিন্তু আমি ব্যাপারটা এরকমই দেখেছি। এটা নিকিরী এবং জিওলী বা জেলেদের মধ্যেও আছে। তারা যেন পরস্পরকে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। আবার যদি কখনও কার্যকারণ জেনে পরস্পরের সাথে মিলমিশ হয়ে যায়, তখন তারা অন্য মানুষ হয়ে যায়। তখন তারা একজোট হয়ে কাজিয়া করে।

এর পরে ঐ সালিশির সূত্র ধরেই একদিন পুতুল আর তার মেয়ে আমাদের এলাকা ছেড়ে উধাও হয়ে যায়। শুনেছি তার কে এক খুড়শ্বশুর তাকে নবদ্বীপের কোনও এক বাবাজির চরণাশ্রিতা করে দিয়ে এসেছিল। এভাবেই কুসুমের সমস্যার বোধ হয় সমাধান হয়েছিল।

পুতুলের বা তার মেয়ের পরে কী হয়েছিল কোনওদিন আর জানতে পারিনি। তবে কাসেম যে তাকে বের করে নিয়ে ভোগ করেছিল, এ জ্বালা তাঁতী পাড়ার মানুষদের এক মানসিক সমস্যা এবং অবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলেছিল এবং এ প্রদাহ বহুকাল বহতায় ছিল। যদিও সবাই বুঝেছিল যে পুতুল স্বেচ্ছায়ই কাসেমের সাথে গেছে, কিন্তু উচ্চনীচ বর্ণ নির্বিশেষে সাধারণ সিদ্ধান্ত দাঁড়িয়েছিল এই যে, ও জাতের বিশ্বাস নেই। তাদের শাস্ত্র, সমাজ সব কিছুই হিন্দুদের উল্টো। হিন্দুরা লেখে বাঁ-দিক থেকে ডাইনে, ওরা লেখে ডাইনে থেকে বাঁয়ে। হিন্দুরা আগে তেতো খায় শেষে মিষ্টি আর তাদের নিয়ম আগে মিষ্টি পরে তেতো। হিন্দুরা কলাপাতের সামনের দিকে ভাত রেখে খায়, ওরা খায় উল্টোদিকে রেখে। তারা মামাত, খুড়তুতো ইত্যাদি সম্পর্কের মধ্যে সাদি নিকা করে সে এক অতি কু-আচার। এই রকম নানাধরনের কথা তখন খুব শুনতে পেতাম। আগেও যে এসব মন্তব্য শুনিনি তা নয়, তবে এখন তার সাথে যুক্ত হল পুতুলের ঘটনার মতো ঘটনা। অতএব জাত ধর্ম আর থাকে না।

ধবলী এবং পুতুলের ঘটনার মধ্যে তফাৎ থাকলেও এরকম আরও কিছু ঘটনা ক্রমশ ঘটতে থাকলে আমার পিছারার খালপারের অপবর্ণীয় মানুষেরাও যেন তাদের দেশ, ভূমি এবং এতকালের আশ্রয়ের বিষয় আস্থাহীন হয়ে পড়ে। তারা এক অনির্দেশ যাত্রায় ক্রমশ উদ্যোগী হতে থাকে। এর আগের প্লবতায় গ্রামগুলো বনেদি পরিবারগুলোকে হারাচ্ছিল, এখন সাধারণ মানুষগুলো পর্যন্ত বাস্তু ত্যাগ করতে শুরু করল। একটি ঘটনায়

এই গ্রামগুলোতে একটা ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি হল। যদিও এই ঘটনাটিই ঐ আতঙ্কের জন্য একমাত্র দায়ী নয়। সে ছিল নিতান্তই এক বোঝার ভুল। কিন্তু যে সময়ের কথা বলছি, তখন এই ভুল বোঝানোও একটা কায়দা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যেহেতু তাতেই লাভ। তাতেই ভূমি সম্পত্তি অর্জন করার পথ সহজ হয়।

— নয় —

আমাদের পার্শ্ববর্তী একটি গ্রাম। নাম বাউলকান্দা। সেখানকার অধিবাসীরা সবাই মুসলমান। তথাপি গ্রামের নাম কেন যে বাউলকান্দা সে এক প্রশ্ন। সেখানকার একজন প্রতাপশালী মিএরা, নাম গাজি। গাজি সাহেবের সম্পর্কে খ্যাতি ছিল তিনি দাঙ্গা বিরোধী এবং হিন্দু প্রেমী। একান্নর দাঙ্গার সময় গাজি একটি বাহিনী গঠন করেছিলেন, একথা আমার মনে আছে। লাঠিধারী এই বাহিনীর সংখ্যা ছিল নাকি এক হাজার। গাজি সাহেব আমার পিতৃদেবকে 'গুরুদেব' বলে ডাকতেন এবং পিতৃদেব তাকে শিষ্য বলে। এই গুরু-শিষ্যে বেশক্ দিলচস্পী আমি দেখেছি। এ বিষয়ে একটি গল্পকথা, যা ডাক্তার জেঠার কাছে শুনেছিলাম, এই সুযোগে বলে নিই। বাবা এবং গাজি কেন পরস্পরের গুরু শিষ্য, তার কার্যকারণ সেই গল্পকথায় নিহিত আছে। গাজি যৌবনে নাকি একটু বেশি বেপরোয়া ছিলেন। বাউলকান্দার পার্শ্ববর্তী, অন্য একটি গ্রাম, রণমতিতে, নীলুঠাকুর নামে একজন ব্রাহ্মণ তাঁর এক শাগরেদকে নাকি একবার বেধড়ক ঠেঙ্গিয়েছিল। তার অপরাধ, সে এক ডাকাত দল তৈরি করে এদিক-ওদিকে কিছু উল্টোপাল্টা কাজ করেছিল। এই ব্যাপারটা, আমাদের ওখানকার রীতি অনুযায়ী অনৈতিক। নিজেদের চৌহদ্দির মধ্যে ডাকাতির হাঙ্গামা করা কোনওমতেই সমর্থনযোগ্য নয়। নীলু বিশেষ সূত্র ধরে ব্যাপারটা জেনে তাকে ঠ্যাঙায়। কেন? না, তুই নিজ এ্যালাকায় ক্যান্ হুইজ্জত্ করবি? তোর এট্টা কাণ্ডজ্ঞেয়ান নাই। তার কাণ্ডজ্ঞানের অভাব কেন হয়েছিল, অতটা জানবার সময় এবং ধৈর্য নীলুর ছিল না। কিন্তু একারণে গাজি তাকে এক 'রণললকার' দিয়ে বসে। রণললকার বলতে রণহুঙ্কার। নীলু বাবার কাছে এসে জানায় যে গুরুদেব যদি 'এ্যার এট্টা বিহিত না করেন, তয় নীলু ঐ গাজইয়ার গোয়ায় আস্থা একখান খাজুর গাছ হান্দাইয়া—তিমুনির মাতায় খাড়া করইয়া রাখফে'।

ডাক্তার জেঠা বলেছিলেন যে এ বিষয়ে একটা সালিশি সভা নাকি বসেছিল আমাদের বড় খাল পাড়েব রেন্ট্রি গাছটার নীচে। বড় খাল পাড়ে দুটো রেন্ট্রি গাছ ছিল। একটা খালের মধ্যে ঝুঁকে, তার গোছাটা ফুলিয়ে পথিকজনের বসার স্থান করে রেখেছিল। আর একটা খাল থেকে একটু পাড়ের দিকের বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে শ'দুয়েক বছর ধরে বোধহয় ছায়াবিস্তারী এক ব্যাপক ব্যবস্থাপনায় তাবৎ পথিক মনুষ্যদের শোয়া, আরাম, বিশ্রাম এবং সভাসমিতি ইত্যাদির নিমিত্ত এক আচ্ছাদন তৈরি করে রেখেছিল। তো ঐ রেন্ট্রির নীচে নাকি সালিশির ব্যবস্থা। বিরোধের নিষ্পত্তিকল্পে বাবাকে মুরুব্বি করলে বাবা খুব সহজ সমাধানে বিবাদের নিষ্পত্তি করেন।

ডাক্তার জেঠা বলেছেন, হে এক কাণ্ড। তোমার বাবায় তো, দুইজনেরই গুরু। অথচ হ্যারগো মইদ্যে বিরোদ। তো আমাগো এই তিন গেরামের তিনজোন বুজুর্গেরে বিচারে নেওয়া অইলে। মোরা ভাবি, এই বুজি দাঙ্গা লাগে। না হেয়া লাগলেনা। তোমার বাবা এট্টা নিময়বন্দো করলেন কায়দা করইয়া। হেহানেই আসল ফ্যাচাংডা মারইয়া রাখলেন। তয় এট্টু বেশি ঝুঁকিও নেছেলেন, একতা কমু। বাবা নাকি নিয়মবন্দ করেছিলেন যে রণাঙ্গনে পরপর শায়িত তিনগাছা লাঠি থাকবে। দুই বিরোধী প্রথম একে অন্যের সাথে লড়বে। পরে তারা আলাদা আলাদা গুরুর সাথেও লড়বে এবং সর্বশেষ উভয়ে একসাথে গুরুকে স্পর্ধা জানাবে। যদি তাদের কেউ ব্যক্তিগতভাবে অথবা যৌথভাবে গুরুকে পরাজিত করতে পারে তবে আখেরি বিজয়ী চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গুরু জারি করবে। আর গুরু যদি উভয়কেই পরাস্ত করেন, তবে তিনি যা বলবেন তা উভয়কেই মানতে হবে।

পরস্পর স্পর্ধায় নীলু হারে। বাবা গাজীকে 'উল্লাস' দেন। দ্বিতীয় লড়াই-এ গাজি আলি আলি বলে গুরুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার মুহূর্তকালের মধ্যেই হাতের লাঠি খোয়ায়। লাঠি তখন প্রায় চৌদ্দ হাত দূরে পড়ে মাটি খায়। গাজি লাঠি তুলতে যাওয়ার মুহূর্তে, গুরুর লাঠি দেয়াল হয়ে দাঁড়ায় তার সামনে। তখন নীলু বিপুল বিক্রমে গুরুর পশ্চাৎ থেকে আক্রমণ করতে গিয়ে বাঁ-কাঁধে বেদম আঘাত পায় প্রায় এক অজ্ঞাত প্রহারে। তথাপি দুই শিষ্য একযোগে এক অসম আক্রমণে গুরুকে 'তমেচা' করলে গুরু অবহেলায় তাদের 'শির' নিয়ে নেন। ফলত গাজি আর নীলু গুরুর পা ছুঁয়ে কসম খায় যে আর কোনওদিন তারা বেয়াদবি করবেনা।

বাবার সাথে গাজির নাকি এর পর থেকেই গুরুশিষ্য সম্বন্ধটি পাকা হয়। গাজি বলেছিলেন, গুরুদেব, এছলামে আল্লাহ্ পাক্ ছাড়া 'কদমবুছি' নাজায়েজ। ক্যান্? না, 'লাহুক্মা ইল্লাহ্ লিল্লাহ্। আল্লার কোনও শরীক মোরা মানিনা। আল্লাহ্ ছাড়া, কাউরেই মোরা সেজদা করিনা। কিন্তু গুরুদেবরে য্যান্ কদমবুছি নাকরাডা গুণার ঠেহে। বাবা বলেছিলেন নিজের ইমান বজায় রাকফি। আমার আড়ুর নীচে হাত দিবিনা। আমি এ্যামনেই তোরে আশীর্বাদ করমু। গাজি বাবাকে সম্মান জানাতেন হাঁটু ছুঁইয়েই।

এই সময় পোস্ট আপিসের একজন পোস্টমাস্টার এসে স্থায়ী হয়েছিলেন আমাদের ওখানে। আমাদের খানাবাড়ির মধ্যেই এই পোস্টাপিসটি। তাঁর নাম ছিল কাসেম মাস্টার। পশ্চিম পাকিস্তানি সিন্ধি জাতীয় মানুষ। উর্দু এবং ফারসিতে দখল ছিল তাঁর। বাবার শখ হয়েছিল কাসেম মাস্টারের কাছে উর্দু ফারসি শিখবেন। তো, কিছুকাল শিখলেনও। যখন পিছাবার খালের চৌহদ্দির মানুষ নানা সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসে কম্পমান, তখনও কাসেম বাবাকে উর্দু তালিম দিচ্ছেন, বলছেন, এইসব তুচ্ছতার পাশ কাটিয়ে আপনি শুনুন শায়ের বুজুর্গরা কি গেয়েছেন। আপনি কি এই হিংস্রতার জন্য দুশ্চিন্তিত হচ্ছেন? তাহলে শুনুন বলি, এ কিছু নতুন নয়। মানুষের মধ্যে মহব্বত থাকলে এ সবকিছুই তুচ্ছ হয়ে যেত। মানুষের কোনও দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা থাকতনা। কিন্তু তামাম

হিন্দুস্তান পাকিস্তানের কোথাও মানুষের মধ্যে প্রেম মহব্বত কিচ্ছু নেই। এরা সবাই, আপনি, আমি ধ্বংসের মুখে পড়েছি। দুশ্চিন্তা করে এর কোনই সুরাহা হবে না। বরং আমি একটি শের বলছি শুনুন—

বাহার আয়ি গুলোঁ গুলফাম লেকর্
হাম ঝুমে উও তুমহারা নাম লেকর।
ঘটাকালি যো ছায়ি
হাম ইয়ে সমঝে
উও আয়া হ্যায় তেরা প্যায়গম্ লেকার।
বড়া রুতবা মিলা হামকো জাঁহামে
তেরা প্যার কা ইলজাম লেকর।

কাসেম মাস্টার হরবখত এই সব শের বলতেন। এই শেরটি আবৃত্তি করে তিনি বাবাকে বলেছিলেন, আপনি হয়ত ভাবছেন এ রকম এক সংকটকালে এই প্রেমের কবিতা কেন। আপনি এক্ষেত্রে শুধু নারী পুরুষের মহব্বতের তাৎপর্যটি না ধরে ব্যাপক মানুষের ভালবাসার ব্যাপ্তিতে এর অর্থ করুন। সেখানেও, আমাদের মানুষের প্রতি ভালবাসার জন্য সবচেয়ে বড় পুরস্কার মিলেছে বদনাম। 'প্যারকা ইলজাম' প্রমের বদনামী। আপনি হিন্দু আমি মুসলমান। আপনাকে যদি আমি মহব্বত করি তার জন্য আমার সমাজ আমার বদনাম করে। আপনার ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই হয়। জনাব, এ এক ধরনের 'জাহিলিয়াৎ' অন্ধকার। এই 'জাহিলিয়াৎ' মানুষকে ধ্বংস করে। গাজি কাসেম মাস্টারকে খুব সম্মান করতেন। বলতেন, আপনে এল্‌হা থাহেন, রান্ধ্‌ইয়া খায়েন। মোর বাড়িতে আইয়া থাহেন, মোরা আপনের দেখভাল করুম। কিন্তু কাসেম রাজি হতেন না। বলতেন, আমার একটাই শখ। সারাদিন সরকারি কাজকাম খেদমৎ। অবসরে জনাবালির সাথে একটু শের শায়েদী নিয়ে আলাপ বৈঠক। কাসেম মাস্টার বাবাকে জনাবালি (জনাব আলি) বলে সম্বোধন করতেন। একা মানুষ, বিবাহাদি করেননি। নিজের কাজ আর পড়াশোনা নিয়ে থাকতেন। চমৎকার বাংলা বলতেন এবং তার মধ্যে আমাদের ওখানকার আঞ্চলিক টান বা শব্দবন্ধ থাকত না। মার্জিত পরিশীলিত মানুষ। জীবনে যেটুকু শিখেছেন বড় যত্ন করে, ভালবেসেই শিখেছেন। ধর্ম নিয়ে কোনও বাতিক ছিল না তাঁর। বাবাকে বলতেন, আপনাদের সোহ্‌হং তত্ত্বের মতই ইস্‌লামের বিকাশে একতত্ত্ব বা বিশ্বাস এসেছিল। একজন মানুষ বলেছিলেন— 'আন্‌অলহক্'। এই অপরাধে তাঁকে টুকরো টুকরো করা হয়েছিল। কিন্তু প্রবাদ এই যে তার প্রতিটি টুকরোই চিৎকার করে বলেছিল আন্‌অলহক, আন্ অল হ্ক। আমিই সেই, আমিই সেই। জনাব, আমারও মনে হয় সব মানুষই সেই অর্থাৎ চূড়ান্ত সত্ত্বা। কিন্তু একথা প্রকাশ্যে বলার মতো সাহস আমার নেই। আমার মনে হয় শেষ পর্যন্ত আপনারা কেউ এখানে আর থাকতে পারবেন না। হায় আপশোস।

এই সময়েই ঐ ঘটনাটি, যে কথা বলছিলাম, তা ঘটে এবং গাজিকে 'প্যার কা ইলজাম্'-এর ভাগী হতে হয়। বাবাকেও। এবার ঘটনাটি বলি, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত

থেকে তখন দাঙ্গা, ধর্ষণ, খুন এবং অগ্নিসংযোগের সব ভয়াবহ কাহিনী লোকমুখে প্রচারিত হচ্ছে। সংখ্যালঘুরা ত্রস্ত, ভীত, আতঙ্কিত। এমত এক পরিবস্থায় যদি গাজি তাঁর হাজার আনসারকে নিয়ে অকস্মাৎ 'আল্লাহ আকবর' ধ্বনিতে কোনও হিন্দু এলাকায় হাজারো টর্চের আলোয় উদ্ভাসিত করে ব্যাপক কোলাহলে প্রবেশ করেন এবং তাঁরা যে সংহার বা ধ্বংসের জন্য নয়, বরং রক্ষকের ভূমিকায়ই এমত কার্যে এসেছেন, এ কথা যদি পূর্বাহ্নে কারুর জানা না থাকে, তবে ঐ পরিবেশে মানুষের অবস্থা কি হয়? এ দৃশ্য যদিও আমি অনেক ছোট বয়সেই দেখেছি, কিন্তু আজও ভুলিনি।

তখনও বেশ কিছু পরিবার আমাদের ঐ পিছারার খালের পৃথিবীতে ছিল। যারা দেশ ছাড়বে কি ছাড়বে না, ছাড়লেও কোথায় গিয়ে ঠাঁই পাবে, এরকম এক দোদুল্যমানতায় ছিল। সবাই মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থ। কারুর পেশা চিকিৎসা, কেউবা ইস্কুল মাস্টার, আবার কেউবা যজন-যাজন নিয়ে আছেন। প্রত্যেকের বাড়িতেই এক আধটা যুবতী অথবা আধা যুবতী কন্যা রয়েছে। আমাদের বড় খালের ব্রিজটার উপর থেকে একহাজার টর্চের তীব্র দ্যুতি এবং তৎসহ ব্যাপক ধ্বনি 'আল্লাহ আকবর' যদি শোনা যায়, এলাকার অন্দর-কন্দরের কারুরই সন্দেহ থাকে না যে 'শত্রু' আক্রমণ করেছে। কেননা তখন যারা দাঙ্গাকারী তারাও 'পরম করুণাময় আল্লাহতায়লার' নামেই 'নারাএ তক্‌দীয় আল্লাহু আকবর' এই ধ্বনি সহযোগেই ব্যাপক সন্ত্রস্ততা সৃষ্টি করত। তাদের জন্য এ ছিল এক জ্বিহাদ বা ধর্মযুদ্ধ। কিন্তু এ তো ধর্মযুদ্ধ বা কোনও যুদ্ধই ছিল না। যুদ্ধ হয় দুই দলে। এখানে সশস্ত্র একদল নিরস্ত্র দলকে 'কোতল' করছে। এটা তো যুদ্ধ নয়, গণহত্যা। গাজির দল এক নিশীথে এরকমই একটা মহড়ার ব্যবস্থা করলে, সব পাড়া প্রতিবেশী বিপন্ন আতঙ্কে উর্দ্ধশ্বাসে আমাদের বাড়ির দিকে ছুটে আসতে থাকে। প্রতিবেশী পুরুষেরা তাদের গৃহ সম্পদ আগলে থাকেন এবং মেয়েদের সুরক্ষিত করার জন্য আমাদের বাড়ির দোতলায় তাদের জমায়েত করেন। এখন বাড়িতে পুরুষ বলতে এক বাবা, আর বাবাকে যিনি বাল্যে দেখাশোনা করার জন্য এসে গোটা জীবন এখানেই যাপন করেছিলেন সেই মানুষটি, যাঁকে আমরা জেঠা বলে ডাকতাম। নাম পতাকি দাস। সবাই বলত পতাকি সাধু। জেঠা চিরকুমার হিসেবেই কুলদা বেহ্মচারীর আদলে জীবন কাটিয়ে একসময় তাঁর সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করেন। তিনি কুলদা ব্রহ্মাচারীর শিষ্য ছিলেন। বাড়ির যারা চাকরবাকর ছিল তারা কোথায় যে গা-ঢাকা দিয়েছিল তার হদিশ করতে পারিনি! তবে জেঠা বলেছিলেন, আমি দোতলায় যামুনা। কেউ যদি কাটতেই আয়, আগে আমারে কাটতে অইবে, হ্যার পর যা করার করবে। বাবা সবাইকে উপরে তুলে দিয়ে, একখানা রামদা নিয়ে, নীচের দরদালানে পায়চারি, করছিলেন। টর্চের দ্যুতি যতই নিকটবর্তী হচ্ছিল এবং কোলাহল তীব্রতা পাচ্ছিল বাবা, বুড়িপিসিমার চেঁচামেচিতেই হোক বা শেষ প্রতিরোধের খাতিরেই হোক, একতলা থেকে দোতলায় ওঠার সিঁড়ির পথে রামদা হাতে দাঁড়িয়েছিলেন, এ চিত্র এখনও আমার স্মৃতিতে অম্লান। বুড়ি পিসিমা তখন, গোঁসাই গোঁসাই নারায়ণ মধুসূদন

জনাৰ্দ্দন ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণরতা, তথা বাবার উদ্দেশ্যে, 'ও নসু তুই উপরে আয়, ওরে তুই একলা কি করবি', ইত্যাদি বচনরতা। আনসার বাহিনী তখন আমাদের উঠোন ছেয়ে ফেলেছে। টর্চের আলো সারা বাড়ি আলোকিত করেছে। দোতলায় তাবৎ মহিলাকণ্ঠের আর্তনাদ। কেউ কারুর কথা পর্যন্ত বুঝতে পারছে না। বাবার বক্তব্য উপরে উঠে কি হবে? বড়জোর ঘটনাটা একটু আগে পরে হবে, এইতো।

এরই মধ্যে একটা আওয়াজ শোনা গেল, 'গুরুদেব'। সমবেত কণ্ঠে তখন মহিলাদের আর্তনাদ—'নাআআ—তুমি যাবানা। তোমারে ওরা কাডইয়া ফ্যালাইবে।' বাবা খুবই স্থির শান্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, 'যদি কাটতেই আইয়া থাকে, তো গেলেও কাটবে, না গেলেও কাটবে, তয় মনে অয় হেসব কিছু না, গলাডা য্যান গাজির লাগতে আছে'। এরপর বাবা দরদালান পেরিয়ে নেমে গিয়েছিলেন আমাদের বিস্তীর্ণ উঠোনে, হাতে রামদা। অন্দরের দোতলায় তখন পরিত্রাহি চিৎকার। হঠাৎ তার মধ্যে বাবার উচ্চকণ্ঠে তিরস্কার শোনা গিয়েছিল। তিনি ঐ মুহূর্তে একটি অত্যন্ত আপত্তিকর শব্দও ব্যবহার করেছিলেন, হারামজাদা বেইমান এবং তৎসহ একটি প্রচণ্ড চড়ের শব্দও শোনা গিয়েছিল। বাবা তাঁর অনুগামীদের অনেক সময়েই আহ্লাদ করেও হারামজাদা বলতেন। এ এক সামন্তরীতিও বটে। কিন্তু ঐ পরিস্থিতিতে কোনও মুসলমানকে হারামজাদা বা বেইমান বলা যে কি পর্যন্ত হঠকারিতা, তা যারা ঐ সমাজের রীত কানুন জানেন, তারা সম্যক বুঝবেন। বাবাকে গাজি ভালই জানতেন, তাই এ নিয়ে কোনও উত্তেজনা হয়নি। তিনি শুধু আপশোস করে বলেছিলেন, আগে খবর দেওয়া সম্ভব অয়নায় গুরুদেব, এ কসুর মাফ করেন। তয় মুই কৈলম বেইমানি করতে আই নাই। খবর পাইছেলাম আইজ গাবখানের ওপার থিকা একদল জালিম এ বাড়িতে হামলা করবে। হেয়ার মোকাবেলা করতেই আইছেলাম। আপনেগো এই তকলিফের লইগ্যা মোরে মাফ করেন। সবাইকে আশ্বস্ত করে গাজি সদলে চলে গিয়েছিলেন। ব্যাপারটা মধুরেণ সমাপয়েৎ হলেও আমাদের বাড়ির ও গাঁয়ের সম্মিলিত ভীতাত্রস্তা নারীকুল এবং সাধারণ পুরুষেরা কিছুতেই একথা বিশ্বাস করল না যে, এরা প্রকৃতই আমাদের সংরক্ষণের জন্য এসেছিল। সবাই বাবাকে বলছিল, গাজি হৌক আর যে হৌক, আপনে যে গেলেন—যদি এট্টা কোপ দিয়া বইথে? বাবা বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, অরা কিন্তু কোপটা দেয় নায়।

কিন্তু ঘটনাটা অবিশ্বাসকে আরও তীব্রই করেছিল। এই ঘটনার পর পিছারার খালের আশপাশে আবার ব্যাপক দেশত্যাগের হিড়িক পড়ে যায়। পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি বাড়ে। দুই রাষ্ট্রের সম্পর্কের অবনতির প্রভাবও আমার পিছারার খালের বিশ্বকে চূড়ান্ত 'ভেদে'-র অন্ধকারে নিক্ষেপ করে। তখন সেখানে প্রকৃতই 'আইয়ামে জাহিলিয়াৎ' বা অন্ধকার যুগ কায়েম হয়। যারা এই নতুন জাহিলিয়াৎ কায়েম করছিল তাদেরকে বহুবহুকাল আগে নবী মোহাম্মদ সতর্ক করে দিয়েছিলেন। একদল মানুষ পৌত্তলিক বা অংশীবাদী বলেই তাদেরকে শাসন বা হত্যা করার অধিকার যে আল্লাহ্ নবী বা

অপর কাউকে দেননি, আল্ কোরআনে তার সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে। 'আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তবে তারা অংশী স্থাপন করত না এবং তোমাকে তাদের জন্য রক্ষক নিযুক্ত করিনি। আর তাদের অভিভাবক তুমি নাও। এবং তারা আল্লাহকে ছাড়া যাদের ডাকে তাদের তোমরা গালি দেবে না, কেননা তারা (তাহলে) আল্লাহকেও গালি দেবে।' এর পরেও ধর্মের নামে, জ্বিহাদের নামে 'জাহিলিয়াত' কায়েম করা হয়েছিল এবং গাজির মতো মানুষ থাকা সত্ত্বেও তারাই প্রভুত্ব কায়েম করেছিল। একথার ব্যত্যয় নেই।

বাবা গাজির আন্তরিকতায় এবং সদিচ্ছায় সন্দেহ করেন নি। তথাপি তাঁর অহমিকায় আঘাত লেগেছিল। এতদিন যাদের রক্ষা করেছেন, শাসন করেছেন, অনুগ্রহ করেছেন, আজ যদি তাদেরই ভরসায় প্রাণ, মান, ইজ্জত রক্ষা করার কথা ভাবতে হয় তবে তার থেকে অসম্মানের আর কিবা থাকে। এর থেকে গাজি বোধ হয় একাজটা না করলেই ভাল হত, এ রকম একটা বিচার বাবার ছিল। তার দিক থেকে সদর্থক হলেও গাজির এই কাণ্ডটি আমার পিছারার খালের জগতে এক ব্যাপক আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল। ঐ সময়টাতে আমাদের ওখানের কোনও হিন্দুই মনে করত না যে কোনও মুসলমান, দাঙ্গা বিরোধী, হিন্দু-উচ্ছেদ বিরোধী হতে পারে। তাদের বিশ্বাসে ওখানকার তাবৎ মুসলমানকেই, তারা শত্রুর পর্যায়ে বিবেচনা করত। হিন্দুদের মুসলমানদের প্রতি অপ্রীতি আমি শিশুকাল থেকেই দেখেছি। এইসব মুসলমান কোনও উচ্চবর্ণীয় বা বর্গীয় নয়। এরা বেশিরভাগ সাধারণ চাষি শ্রেণীর। সবাই সামন্ত সংস্কৃতির মানুষ। অতএব কি মুসলমান, কি নমশূদ্র সকলকেই উচ্চবর্ণীয় হিন্দু সমাজ সমবিচারে নিয়েছিল। আমাদের ওখানের মুসলমান এবং নিম্নবর্ণীয় মানুষেরা উচ্চবর্ণীয়দের কাছে কোনও দিনই ভাল ব্যবহার পায়নি। তারা সকলেই চাষা এবং সেকারণে তুচ্ছ, এই ছিল তাদের পরিচয়। তবে নমশূদ্ররা নিজস্ব গোষ্ঠীবদ্ধতায় একসময় নিজস্ব জমি স্ব-শাসনে রেখে, সচ্ছল গার্হস্থ্য জীবনের সুখ ভোগ করতে সক্ষম হয়েছিল। মুসলমান সাধারণেরা আমাদের ওখানে বেশির ভাগই ভূমিহীন চাষি হিসেবেই জীবন যাপন করত। তাদের তেমন কোনও গোষ্ঠীবদ্ধতা বা সংহতি ছিল না যে তারা সাধারণ চাষি গৃহস্থের মতো স্বাভাবিক সচ্ছলতার ভোগী হয়। ইসলাম এ-দেশে কায়েম হওয়ার পরে তারা যখন সেই ধর্মে আশ্রয় নেয়, তখন শুধু ধর্মীয় সাম্যই তারা পেয়েছিল। অন্য কিছু নয়। এসবই শিকড়ের ঘুণের ব্যাপার। ব্রাহ্মণ্য ভেদাচারের প্রতি বিদ্বেষবশত তারা একদা বৌদ্ধ আশ্রয়ে গিয়েছিল। সেই আশ্রয়কে যখন ব্রাহ্মণ্যতা গ্রাস করে তখন ইসলাম তাদের ত্রাণের অঙ্গীকার দিয়েছিল। কিন্তু একসময় দেখা গেল তারাও ব্রাহ্মণ্যতার ভেদাচার রপ্ত করে তাদেরকে অন্ত্যজই করে রাখল। কিন্তু ধর্মের সাম্য নামক মাদকটি তাদেরকে সম্মোহিত করেই রেখে দিল অনির্দিষ্ট কাল ধরে। আজও সেই মাদকের প্রভাব কাটেনি। পাকিস্তান কায়েম হবার পর এই মাদকতার তীব্রতা রাষ্ট্রীয় মদতে ব্যাপক প্রসার লাভ করলে তারা একটা রাস্তা অবশ্য পেয়েছিল। যদিও সেই রাস্তাই তাদের প্রকৃত মুক্তির পথ

আদৌ ছিল না। আমার পিছারার খালের আশপাশের বিপর্যয়ের কারণ সেটিই। তারা ভেবেছিল এভাবেই হয়ত তাদের মুক্তি হবে, তারা জমি জিরাত সাচ্ছল্য গার্হস্থ্য পাবে। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখেছি তা তারা পায়নি। তারা এখনও যেই তিমিরে সেই তিমিরেই।

হিন্দুদের জমি জিরেত বাগান পেয়েছিল তারাই, যাদের কিছু ছিল। যারা ভূমিহীন, তারা পায়নি, তারা তাদের শ্রম ব্যয় করেছিল, যেমন বহু আগের কাল থেকে তারা করে এসেছিল, এখানের ভূমি হাসিল করার জন্য। হিন্দুদের পরিত্যক্ত ভূমি আবাদ করার কাজও তাদেরই করতে হয়েছে, তবে মালিক তারা হতে পারেনি। এরা সাময়িকভাবে কিছুটা বখরা পেয়েছিল, কায়েমিস্বত্ব কিছুই পায়নি।

পিছারার খালের ঐ অঞ্চলের বিনষ্ট হওয়ার পেছনে দাঙ্গা, লুঠ, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি ব্যাপারের কোনও ভূমিকা ছিল না। ছিল এইসব সংঘটনের বিভীষিকা। গাজির কাজটি এ ব্যাপারে একদল স্বার্থান্বেষীর কাজেই লেগেছিল শুধু। আতঙ্কের কারণে দেশ ছেড়ে সবাই তখন পলায়মান। তাদের মনে ভীতি শুধু প্রাণের জন্য নয়। যদি মেয়েদের বেইজ্জত হতে হয়। তাদের যদি টেনে নিয়ে যায়। দাঙ্গা না ঘটিয়ে দাঙ্গার ভীতিকে কাজে লাগিয়ে স্বার্থপূরণের কায়দা নিয়েছিল আমার পিছারার খালের প্রতিবেশী সম্পন্ন জালিম পরিবারগুলো। আমার এ রকম মনে হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে যে দাঙ্গার জন্য যত হিন্দু পূর্ববাংলায় তাদের সম্পত্তি হারিয়েছে—তার থেকে অনেক বেশি সম্পত্তি বেহাত হয়েছে তাদেরই হাতে, যারা দাঙ্গাকারী নয় এবং বিপদে এখানকার হিন্দুদের ত্রাতার ভূমিকায় ছিল, তাদের কারুকার্যে।

দাঙ্গার বিষয়ে এসব পাঁচকাহন এ কারণে যে বড় ইতিহাসকারেরা—অনেক ব্যাপকতায় দেশভাগ এবং দাঙ্গাজনিত অনেক কাহিনী বলেছেন, লিখেছেন, ছবিতে ধরে রেখেছেন, এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু তার বেশির ভাগই শহর নগর এবং বন্দরের কাহিনী। পিছারার খালের মতো জগতের কথা তাঁরা খুব কমই জানতেন এবং তাঁদের লেখাতেও তা স্থান পায়নি তেমন। আমরা যেমন তখন বাইরের খবর পেতাম না, বাইরের লোকেরাও আমাদের খবর জানত না। ছেচল্লিশের ষোলোই আগস্টের কলকাতায় ডাইরেক্ট অ্যাকশান জনিত দাঙ্গার খবর আমার স্মৃতিতে থাকার কথা নয়। পরে বড় হয়ে জেনেছি। তার পাল্টা কার্যক্রমে ঢাকা, নোয়াখালি এবং বিহারের দাঙ্গা বিষয়ে শোনা কথাই পুঁজি। কিন্তু সেসব ঘটনা আমার উজানিখালের জীবনকে স্তব্ধ করেনি বলে তখনও আমরা দিব্য ছিলাম। পঞ্চাশ একান্নর দাঙ্গাই এখানে এক বীভৎস কাঁপন ধরিয়ে দিলে, প্রায় পাঁচশ বছরের পুরোনো সামাজিক ভিতে ফাটল ধরল। এতকাল ভেদ বিভেদ নিয়ে আমরা একটা বিকাশের স্তরে ছিলাম। হয়ত সেটা একটা সময় স্বাভাবিকক্রমে সাম্যে আসতেও পারত। কিন্তু দেশভাগের দুর্মর প্রহারে তা স্তব্ধ হয়ে গেল।

যাহোক, গাজির ঘটনা আর একটা জিনিস খুবই পরিষ্কার ভাবে প্রমাণ করে দিল যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের আর নিজেদের সংরক্ষণের শক্তি নেই। কোনও

আকস্মিক আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করার ক্ষমতা তাদের নেই। যারা সামন্তবর্গী, তাঁরা হয়ত তাদের পাইক, লাঠিয়াল বরকন্দাজদের সাহায্যে কিছু করতেও পারেন, তবে সাম্প্রদায়িক বিভেদের জন্য সেইসব মানুষ সবসময় সঠিক ভূমিকা পালন করবে কিনা, সে সন্দেহও থাকে। প্রসঙ্গত মনে পড়ে যে দাঙ্গার শুরুতে, আমার পিছারার খালের তীরবর্তী হিন্দু যুবকেরা একটি শান্তিবাহিনী তৈরি করেছিল। এদের মধ্যের কেউ কেউ পশ্চিমবঙ্গে চাকরিজীবী অথবা পড়ুয়া। কখনও সখনও গ্রামে আসে, ছুটিতে পার্বণে। তারা আমাদের ছাতের উপর প্রচুর ইট, কাচের ভাঙা বোতল, কিছু পুরোনো ল্যাজা, রামদা, সুপারি গাছের বল্লম এবং কিছু লঙ্কা গুঁড়োর বস্তা জড়ো করে একটি আপৎকালীন প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল, যেন আপৎকালে বাড়িটিকে দুর্গ হিসেবে ব্যবহার করে তারা মহড়া নেবে আক্রমণকারীদের। কিছুকাল তারা রাত জেগে পাহারাদারি করল। তাতে লাভের মধ্যে হল এই যে, গেরস্ত বাড়ির ফলন্ত পেঁপের গাছসুদ্ধ কেটে, পাঁঠাখাসির খোঁয়াড় ভেঙে এবং পুকুর থেকে পালন্ত মাছ তুলে তাদের পাহারাদারির মাশুল উশুল করল। তারপর শহুরে চাকরিদারেরা ছুটির পর কর্মস্থলে প্রস্থান করলে সব চুপচাপ হয়ে গেল। এসময় তারা গ্রামপরিক্রমা করে চোঙা ফুঁইয়ে ধ্বনি দিত, দাঙ্গা চাই না শান্তি চাই। হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই। কিন্তু তারা এই ধ্বনির মাধ্যমে শুধু তাদের হীনম্মন্যতা এবং অসহায়তাই প্রকট করত। তারা নিজেরাই হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই এই তত্ত্বে আন্তরিক ছিল না। তাদের আদর্শে এবং বোধে কোনওদিনই এই ভাই ভাই ব্যাপারটি বাস্তব ছিল না।

হিন্দুদের মধ্যে, যাদের পশ্চিমবঙ্গে কিছু সহায় সম্পদ ছিল, অথবা যাদের ছেলেপুলেরা সেখানে চাকুবি করত তাঁরা অচিরাৎ বসতবাটি, জমি জিরেতের কিছু ব্যবস্থাপনা করে সেদিকে পাড়ি দিলেন। পরে, আমার মনে হয়েছে, ঐ সময়কার স্লোগানগুলোই যেন প্রকারান্তরে এই কথা প্রকট করে সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছিল, হিন্দু মুসলমান আদৌ ভাই ভাই নয়, আর দাঙ্গার বিভীষিকার জন্যই শান্তি চাই এই ধ্বনি।

আমার অভিজ্ঞতায় আমি যেমন দেখেছি, পরে ইতিহাস চর্চায়ও আমার এরকম বিশ্বাস জন্মেছে যে, যখনই আমাদের এই দুই সম্প্রদায় কাছাকাছি এসেছে, তখনই এক প্রবল আঘাত তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। নিতান্তই উদাহরণের জন্য আমি আউল, বাউল, দরবেশ ফকির বা সুফীদের কথা, তাঁদের প্রয়াস এক্ষেত্রে ইংগিত করছি। এই আঘাতকারীরা যে হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের একথার সাক্ষী ইতিহাস। কিন্তু তথাপি বড় খালপারের মহাবৃক্ষ দুটি যেন আমাদের রক্ষা করছিলেন।

— দশ —

এইসব ঘটনার আগেই অথবা পরে, আজ আর ঠিক মনে নেই একজন ভবঘুরে মানুষ আমাদের বাড়িতে এসে হাজির হয়েছিলেন। ধুতি-পাঞ্জাবি পরনে, রোগা লম্বাটে চেহারা। স্বভাবে একটু খ্যাপাটে। নাম সুরেন্দ্রনাথ বোস। বাড়ির আপোগণ্ডদের জন্য

জেঠামশাই তাঁকে গৃহশিক্ষক করে রাখলেন। তাঁর বোধ হয় আশ্রয়ের প্রয়োজন ছিল। তিনি কোত্থেকে এসেছিলেন, কেন এসেছিলেন, কিছুই পরিষ্কার বোঝা যায়নি। তাঁর পরিধানের ধুতি পাঞ্জাবির হাল খুবই শোচনীয়। জেঠামশাই-এর কি খেয়াল হল, তিনি ভাবলেন এ খুব উত্তম শিক্ষক হবে। তাঁকে দেখলে মনে হত তিনি অনেক পথ হেঁটে, অনেক ধুলো মেখে এখানে এসে হাজির হয়েছেন। ঐ মলিন পোশাক, একটি ক্যাম্বিসের ব্যাগ, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো, এই তাঁর সম্বল। ধুতি পাঞ্জাবির স্থানে স্থানে অসাধারণ রিফুকর্ম, কোথাও লেবু কাঁটা, কোথাও বা বাবলা কাঁটার সহায়তায়। দেখলেই বোঝা যায় বহুদিন ধরে বহু কৃচ্ছ্রসাধনায় এই বস্ত্রের বস্ত্রত্ব বজায় রেখেছেন তিনি। চেহারায় বহু প্রব্রজ্যার চিহ্ন। অতএব বাড়িতে অচিরেই তিনি পাগলা মাস্টার বলে প্রতিষ্ঠা পেলেন। বাড়ির মহিলামহল এই আবড় মনুষ্যটিকে বড়ই কৃপার নেত্রে দেখলেন। কিন্তু সেসব কৃপা, মহাশয় ভ্রূক্ষেপমাত্র করলেন না।

পাগলা মাস্টার প্রতিদিন সকাল সন্ধেয় আমাদের পড়াতে বসাতেন। পড়ানোর ব্যাপারে তার একটিই কৃতকর্ম ছিল। সবাই বসলে তিনি আদেশ করতেন—পড়, পড়ে যাও। খানিক্ষণ পরে আমরা যখন বলতাম যে পড়া হয়েছে, তিনিও দ্বিতীয় বাক্যটি উচ্চারণ করতেন—লেখ, লিখে যাও। আমরা লেখা শেষ করলে মাস্টারমশাই, খাতাগুলো দেখে তলায় সই করতেন এস.এন. বোস এবং তৎসহ তারিখ। তারপর তৃতীয় বাক্য, এবার সব যাও, খেলাধূলা কর। কিছু বোঝাতেনও না, পড়াতেনও না।

আমাদের পড়ার মধ্যেই মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে কিসব যেন বলতেন। আমরা কেউ তার কিছু বুঝতাম না। আমার বয়স তখন হয়ত পাঁচ ছ'বছর হবে। অন্য দাদারা, যাঁরা একটু বয়স্ক, মুখ টিপে হাসতেন। তাঁর কথাবার্তাগুলো ছিল নিতান্তই ছেঁড়া ফাটা। তার দু-একটা ক্ষীণ স্মৃতি এখনও আছে। হঠাৎ করে হয়ত আমার হাত থেকে শ্লেটটা নিয়ে, তার উপর আঁকিবুকি কাটতেন। তারপর বিড়বিড় করে বলতেন। এদিকে রাস্তা কৈ? এদিকে যাওয়া যাবে না। আবার বলতেন, কোহিমায় ঝাণ্ডা পুঁতলে আণ্ডা হবে। এত সোজা? এপথে চাট্‌গাঁ যেতে পারলে হয়ত কিছু হত। আবার আমাদের দিকে বুড়ো আঙুলটা বাড়িয়ে দিয়ে বলতেন, কিসসু হবে না। দাঙ্গা হবে দাঙ্গা। ভুল খবর দিয়েছে সবাই। সর্বাধিনায়ককে ধোঁকা দেওয়া হয়েছে। উঃ এতদিন হয়ে গেল, তবু তাঁর একটা খবর কেউ দিতে পারছে না। এরকম সব কথা একা একা বলতেন তিনি। আমরা ভাবতাম পাগলামি: একদিন ভোরবেলায় শুনলাম মাস্টারমশাই নেই। কোথায় চলে গেছেন।

পরে বড়দের কানাকানিতে শুনলাম, মাস্টারমশাই নাকি সুভাষচন্দ্রের সেনাবাহিনীর লোক। বর্মার লড়াই-এর পর যারা এদিক ওদিক বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন, তিনি তাঁদেরই একজন। এসব শুনে আমাদের দারুণ রোমাঞ্চকর লাগছিল ব্যাপারটা। বাবাও মাকে একদিন বলেছিলেন, 'ও একজন পলাতক সৈনিক, দাদায় ঠিক বোজতে পারে নায়। ঐ যে নেতাজী আইছেলেন ওবছর। ও হ্যার দলের লোক।' বাবা হরহামেশা

মাকে এ ধরনের গুরুগম্ভীর কথা বলতেন। মা যদিও প্রচলিত অর্থে প্রায় অশিক্ষিত, কিন্তু বাবা তাঁকে সেরকম মনে করতেন না। অনেক গম্ভীর কথাই তিনি মায়ের সাথে বলতেন। শুনেছি আমাদের এক জেঠাইমা ছিলেন দেশবন্ধুর নাতনি। মা নাকি তাঁর খুব ন্যাওটা ছিলেন। বদ্যিদের আত্মীয়তা, তাদের বংশলতার সব গলতায়। কে যে কার মামা, আর কে যে কার মেসো, এর হদিশ সহজ নয়। নচেৎ যে জেঠাইমার কথা বললাম, তার দেশবন্ধুর নাতনি হওয়া বা হলেও আমাদের পরিবারের বধূ হওয়া আদৌ উচিত নয়। কেননা, জেঠিমার শ্বশুর অর্থাৎ আমাদের সম্পর্কে বড়দাদু ছিলেন রায়বাহাদুর। রায়বাহাদুরেরা আর যে কারণেই স্মরণীয় হোন, তাঁদের ব্রিটিশ বিরোধিতার কোনও প্রমাণ ইতিহাসগতভাবে আমাদের জানা নেই। বিশেষত সেক্ষেত্রে তাদের রায়বাহাদুরত্ব থাকে না। তথাপি জেঠাইমা ছিলেন তাঁর পুত্রবধূ। মা বলতেন, রক্ত কথা কয়। জেঠাইমার সন্তান এবং বাবাদের খোকামনি, একদা নাকি মেছোবাজার বোমা মামলার অন্যতম আসামি হয়ে দেশবন্ধুর রক্তঋণ শোধ করার চেষ্টা করেছিলেন। মহাশয় শুনেছি পরবর্তী জীবনে কম্যুনিস্ট পার্টিতে আজীবন সদস্য ছিলেন। সত্যব্রত সেনের কথা পুরোনো কমরেডদের অনেকেই হয়ত জানেন।

মায়ের কাছে পরবর্তীকালে শুনেছি, আমাদের ঐ বাড়িতে, স্বাধীনতার আগে এবং পরবর্তীকালে অনেক নেতা এসেছেন। আমাদের বৈঠকখানায় তাদের সভাসমিতি হয়েছে, মা তাদের পঞ্চব্যঞ্জনে রান্না করে খাইয়েছেন। মা বলতেন, 'এইসব মাইনসেরা এহানে আইতেন সতীনদার লগে। হেনায় যহন তহন আইয়া কইতেন, আইজ এহানে সভা আছে, এতজোন খাইবে।' মা বলতেন, 'হে একজন এমন মানুষ য্যারে কেউ তুইচ্ছ করতে পারতো না।' তখন নাকি দেশভাগ যাতে না হয় তারজন্য এইসব সভা মিটিং করতেন তাঁরা। তারপর দেশভাগ যখন হলই সেই নেতারা সবাই ওপারে চলে গেলেন। এক্ষেত্রে মায়ের স্মৃতিই আমার স্মৃতি। মা বলতেন, 'বেয়াকেই গেলেন। সতীনদায় গেলেন না। হেনায় কইছেলেন, দ্যাশ ছাড়ইয়া যাইও না কেউ, একদিন আবার সব ঠিক অইয়া যাইবে।' এইসময় আমাদের বুড়ি পিসিমা নাকি প্রায়ই স্বপ্ন দেখতেন। স্বপ্ন দেখা তাঁর একটা বিশেষ 'বাই' ছিল, তা আমরাও দেখেছি। তিনি বলতেন, ও বড় নসু, ও ছোডো নসু। কাইল রাত্তিরে এট্টা স্বপ্পন দ্যাখলাম। বাবা বলতেন, তয়তো সোমোস্যা মিডইয়া গ্যালে। কি দ্যাখলা?

: না দেহিকি, বৈঠকখানার ঘরে সতীন আর কেডা কেডা যেন আইয়া আমারে ডাইক্যা কয়, পিসিমা, তোমার আর কোনও চিন্তা নাই। সব ঝামেলার শ্যাষ।

: কিরহম?

: না, হিন্দুস্তান পাকিস্তান এক অইয়া গেছে। ক্যারোর মধ্যে কোনও বিভেদ নাই আর। আবার বেয়াক আগের মতন অইয়া গেছে।

বুড়ি পিসিমা এরকম 'খোয়াব' পরেও অনেক দেখেছেন। কিন্তু কোনও কিছুই আর আগের মতো হয়নি, হওয়া সম্ভবও ছিল না। স্বদেশিদের একটা ব্যাপক প্রভাব আমাদের

বাড়িতে যে পড়েছিল তা ছোটবেলা অনুভব করেছি, যদিও আমাদের বাড়ির কর্তাদের মধ্যে স্বদেশি আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বিশেষ কেউ ছিলেন না। সত্যব্রত সেনের এক দাদু ছিলেন যদুনাথ সেন, তিনি আমাদেরও দাদু। তিনি ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকীর বিষয়ে খানিকটা জড়িত ছিলেন এরকম জেনেছি। ক্ষুদিরামের সৎকার কার্যে নাকি তিনি শ্মশানযাত্রী ছিলেন এবং তার চিতার একখানা জ্বলন্ত কাষ্ঠ ছিট্‌কে এসে তার কপালের একপাশে লেগেছিল। সেই দাগটিকে নাকি তিনি রাজটিকা হিসেবে সম্মান করতেন। মায়ের কাছেই শোনা এসব গল্প। মা ক্ষুদিরামের ফাঁসির গল্প বলার সময় অবশ্যই ঐ গানটা গেয়ে নিতেন—

একবার বিদায় দে মা
ঘুরে আসি
হাসি হাসি পড়ব ফাঁসি
দেখবে ইংলন্ডবাসী।

আমাদের ছোটবেলায়, একজন অন্ধ ভিখিরি প্রায়ই ভিক্ষে করতে আসত আমাদের বাড়িতে, আর এই গানটা বড় করুণ করে গাইত। মা তাকে অনেক ভিক্ষে দিতেন। তখনও আমাদের সাধারণ আহার্যের অভাব ছিল না।

আমার বাবা জেঠার জীবনচর্যায় স্বদেশীয়ানার বিশেষ কিছুই আমরা দেখিনি, একমাত্র খদ্দরের পাঞ্জাবি, ধুতি পরা এবং কংগ্রেসকে ভোট দেওয়া ছাড়া। বাবা স্বদেশি রোমান্টিকতার নাটুকে মানুষ ছিলেন। ঠিক রাজনীতিগতভাবে কোনও বিশেষ ভূমিকায় তাকে দেখিনি। কিন্তু মায়ের মধ্যে স্বদেশি ভাবের যে প্রকাশ আমার জ্ঞানতকালে লক্ষ্য করেছি তা তুচ্ছ করার মতো নয়। এক্ষেত্রে বাবার রোমান্টিকতা যে তাঁকে প্রভাবিত করেছিল তাতেও সন্দেহ নেই। বাবা সেকালের তুলনায় একজন বেশ সুশিক্ষিত মানুষ একথা বলতে হবে। গ্রামীণ সমাজে, বাইরের শ্রোতাদের সাহচর্য তাঁর তেমন আকর্ষণীয় বোধ হতনা বলে, আমার ঐ অর্ধশিক্ষিতা মায়ের সাথেই ছিল তাঁর এইসব আলোচনার স্থান। দেখেছি, এ ব্যাপারে বাবা মায়ের কাছে যথার্থ আরাম পেতেন। কিন্তু মায়ের মধ্যে ছিল এক স্বাভাবিক স্বাদেশিকতার স্পন্দন। মা খুব ভাল গান করতেন। এই কথাটি হয়ত আমাকে বারাবার প্রসঙ্গক্রমে বলতে হবে। সম্ভবত তিনি আমাদের ঐ জেঠাইমার কাছ থেকে অনেক কিছুই শিখেছিলেন। আমি যখন মায়ের কাছে সেসব কাহিনী শুনতাম, তা তাঁর অতীতচারণাই ছিল। তথাপি, এখনও মনে হয়, কি যে আনন্দময় সেইসব! যখন মা আমাদের সামনের বারান্দার সিঁড়ি-পোস্তায় অর্থাৎ একতলার প্রলম্বিত উঁচু দলুজে বসে, চাঁদনি রাতে গাইতেন—

সেথা গিয়াছেন তিনি,
সমর আনিতে
মায়েরও চরণে
প্রাণ বলিদানে—

বাবা তখন তাঁর রোমান্টিক স্বভাববশত খুবই নস্ট্যালজিক হয়ে পড়তেন। বলতেন—কর তো, গানটা পুরাই কর। —মা গাইতেন—

হয়ত ফিরিয়া আসিবেনা আর
হয়ত মরিয়া হইবে অমর
সেথা যে তাঁহার মরণ সিন্ধু
সেথা গিয়াছেন তিনি।

মা বাবার একটু আস্কারা পেলেই যেন বাবার তিনগুণ বেশি নস্ট্যালজিক হতেন। তখন তাঁর মনে পড়ত ঐ সব স্বদেশি মানুষদের কথা, যাঁদের গল্প তিনি বাবার কাছে শুনেছেন, অথবা যাঁদের একদিন তিনি নিজের হাতে রান্না করে খাইয়েছেন সেই সতীনদা, বিপিনদা, দেবেন ঘোষ এঁদের। কে জানে তাঁরা তখন কোথায়? মা গেয়ে যেতেন—

সধবা অধবা বিধবা তোমার
রহিবে উচ্চশির
ওঠ বীরজায়া বাঁধ কুন্তল
মোছায়ে অশ্রুনীর।

আমাদের ঐ প্রায় প্রাগৈতিহাসিক অট্টালিকার দক্ষিণ আলসের কিনার ঘেঁষে তৃতীয়ার না পঞ্চমীর একফালি চাঁদ ঢলে পড়ত পশ্চিমের আড়ালে। সামনের বিশালকায় আমগাছটার ছায়া সারা উঠোনে সেই চাঁদের সাথে ষড়যন্ত্র করে একটা আলোআঁধারি এমন কৌশলে তৈরি করত, তা দেখে মনে হত সব ফাঁসি যাওয়া স্বদেশিরা, তাদের দেহ বিমুক্ত মূর্তি নিয়ে যেন মায়েব গান শুনছেন। বাবা এই সময় পুরোনো দিনের সব গল্প বলতেন স্বদেশি আন্দোলন বিষয়ে। মা, তন্ময়ভাবে গেয়ে যেতেন—

জেগে আছি একা
জেগে আছি কারাগারে—

এখানে একটা বাস্তব কথা বলা দরকার যে, আমরা পিছারার খালের সংখ্যালঘুদের সন্তানেরা যখন স্বাদেশিকতা বা দেশাত্মবোধের এরকম এক পারম্পর্যে ছিলাম, তখন মুসলমান পরিবারের সন্তানদের এমত কোনও আদর্শের কথা কেউ বলেনি। বলা হয়ত তখন সম্ভবও ছিল না। আমাদের পূর্ববর্তী প্রজন্মে মুসলমান প্রতিবেশীরা যদিও এই ধারায় খানিকটা সমৃদ্ধ ছিলেন, আমাদের সমকালীন প্রজন্ম সম্পূর্ণ অন্য শিক্ষা লাভ করছিল। একটা সময় ছিল যখন মুসলমানেরা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডকে তাঁদের মাতৃভূমি হিসেবে বিচার করতেন না। তামাম পৃথিবীই তাঁদের ভূমি, তাঁদের জাতীয়তা ইস্‌লাম। ইস্‌লাম পথানুসারী একজন মানুষও যেখানে থাকবে, সেটা তাঁদেরই ভূমি। এরকম একটা বিশ্বাস তাঁদের ধর্মগত। জাতীয়তার অন্য কোনও বিচার তাঁদের কাছে গ্রাহ্য ছিল না। অতএব, আমার মায়ের কাছ থেকে স্বদেশি গল্প ও গানের মাধ্যমে যে শিক্ষা আমি স্বাদেশিকতা বিষয়ে লাভ করেছিলাম তার সাথে পাকিস্তানি স্বাদেশিকতার কোনও মিলই ছিল না। কার্যত প্রতি পদে পদে আমাকে পরবর্তীকালে সাবধানতার সাথে এগোতে হচ্ছিল।

কিন্তু আমার ঐ কিশোর সময়টিতে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে স্থানীয় মুসলমানদের একটা দ্বিধারার টানাপোড়েনই আমি দেখেছি। তখন মায়ের শিক্ষা এবং গান—

সেথা গিয়াছেন তিনি সমর আনিতে
মায়ের চরণে প্রাণবলিদানে—

ইত্যাদির সাথে 'নারায়ে তকদীর', 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি সহযোগে মালাউন বা কাফেরদের উচ্ছেদ করার কোনও কার্যকারণ খুঁজে পেতাম না। অথচ এই ধ্বনি কোনও অন্যায় ধ্বনি নয়। বরং ধর্মপ্রাণ মানুষেরা এর মধ্যে শান্তির বাণীই শুনতে চায়। অথচ, এই ধ্বনি তখন আমাদের সংখ্যালঘুদের কাছে কতই না বিভীষিকাময় ছিল। অনেক পরে জেনেছি, হিন্দুরাও ভারতের অনেকস্থানেই দাঙ্গার ধ্বনি হিসেবে, 'বন্দেমাতরম্' এবং 'হরহর মহাদেও' ইত্যাদি ধ্বনি সহকারে মুসলমান নিধনে ঝাঁপিয়ে পড়ত।

আমার পিছারার খালের পারের প্রতিবেশী মুসলমান সাধারণজন বা আমাদের দক্ষিণাঞ্চলের মহালের থেকে আগত মাহিন্দরেরা মায়ের খুব অনুরক্ত ছিল। তারা মায়ের গাওয়া স্বদেশি সংগীত খুবই তন্ময়তায় আমাদের উঠোনে বা দরদালানে বসে শুনত। আমাদের মায়েরা প্রজাদের সামনে কোনও সংকোচ করতেন না। যতদিন মধ্যস্বত্ব ব্যাপারটি ছিল, তারা আমাদের বাড়ির আত্মীয়ই ছিল, এমনই আমি দেখেছি।

— এগারো —

পিসিমা বুড়ি, নগেন মশাই-এর স্ত্রী, যাঁরা গ্রামসুদ্ধ বর্গবর্ণ নির্বিশেষের পিসিমা এবং জেঠাইমা, তাঁরা যতদিন এখানে ছিলেন, পিছারার খালেব বহতা ছিল বড় চমৎকার। আমার স্মৃতিতে এই সময়টি এখনও বড় আশ্লেষে আমাকে জড়ায়। যাঁরা যাই বলুন, এই সময়টিকে আমি ঠিক মধ্যযুগীয় অবস্থার তলানি বলে ভাবতে পারি না। আসলে, মানুষের সামাজিক ক্রমান্বয়কে আদি, মধ্য, অধুনা এরকম বিভাগে ভাগ করে তার ভালমন্দের বা অগ্রগতির তুল্য মূল্য করা আমার পছন্দ নয়। আমার শৈশবের এই সময়টিকে শুধুমাত্র নস্ট্যালজিক কারণে আমি ভালবাসি, একথা যদি কেউ বলেন, আমি বলব, তা ভুল। বস্তুত এ সময়ে আমি কোনও সামাজিক নৈরাজ্য অনুভব করতাম না। ঐ পিসিমা বুড়ি, বা জেঠাইমারা সমাজটিকে তখনও নৈরাজ্যের হাতে ছেড়ে দেননি। তাঁদের নানা ব্রতকথা, নানা পার্বণ, লোকাচারী নানা ক্রিয়াকলাপ নিয়ে সমাজকে সদা উৎসবমুখর রাখতেন। নানান ব্রত, পার্বণ, পুজো ইত্যাদির শেষে পিসিমা বুড়ি আর জেঠাইমারা সর্বশেষ এক আশার বাণী বলতেন—'এ বত্ত যে শোনে যে করে, অপুত্রার পুত্র হয়, নির্ধনের ধন হয়, অকুমারীর বিয়া হয়, যে যা কামনা করে সে কামনা সিদ্ধ অয়।' এই আকাঙ্ক্ষার বাণীর মধ্যে নৈরাজ্য স্থান পেত না। আমরাও সরল বিশ্বাসে এসব গ্রহণ করে ভাবতাম, সবার সব ভাল হবে, সবার মঙ্গল হবে, কল্যাণ হবে। এর মধ্যে ছিল এক অদ্ভুত জীবন বোধ, যা নৈরাজ্যের হাহাকারে পীড়িত নয়। আমি একটু ব্যাপকতায় এই জীবনচর্যাকে বলব।

তখন আমার মতো বয়সিদের কৈশোর, শৈশবের নিষ্পাপতা অপসৃত হয়ে হয়ে এক নতুন উদগম সবে শুরু হচ্ছে। পিসিমা বুড়ি এবং জেঠাইমায়েরা হয়ত শেষবারের মতো 'কাঁকড়ার বত্তের' উপকরণ, 'ভদ্উয়া' চাউলকলা, তালের বড়া ইত্যাদি নিয়ে, পিছারার খালের পাশের কোনও এক শস্যক্ষেত্রে ব্রত উদ্যাপনে যাচ্ছেন। তখন ভাদ্রমাস, আউশ পেকেছে, 'আমন রোওয়া'। রোওয়া অর্থে বিছান থেকে গোছ করে যা চারা হিসেবে পোঁতা হয়েছে মাঠে। বিছান থেকে গোছ তোলার পর যেগুলি বিছানের মাঠে থাকে তারা মাইজলা ভাঙ্গা, সেও ধানেরই ক্ষেত। এরকমই রোওয়া বা মাইজলা ভাঙ্গার কোনও ক্ষেত্রের শস্য শাবকদের মাঝে খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে নিয়ে কাঁকড়ার ব্রতের স্থান হয়। পুরুত ঠাকুর কিছু মন্ত্রোচ্চারণে ক্ষেত্রপাল দেবের পুজো করলে পিসিমায়েরা ব্রত কথাটি বলেন। তাদের ব্রত কথায় একটি সাধারণ আরম্ভনা ছিল, বরাবর দেখেছি। বাওন আর বাওনঝি, মাগেন যাচেন খায়েন, ইত্যাদি। এ ব্রতেও বাওন আর বাওনঝির গল্প। কেমন করে তাঁরা তাঁদের সমুদয় দুঃখ, অভাব ইত্যাদি অতিক্রম করে বিপুল সম্পদ লাভ করলেন। কি করে তাঁদের ওলান শুকিয়ে যাওয়া গাই মোষেদের থানে দুগ্ধ সঞ্চার হল, ফালডা দেওয়া পুহইরে জলে মাছে কেলি করতে লাগল, অথবা গেরস্থ তার হেরে যাওয়া মামলায় জিতে গিয়ে জমিন জায়দাদ সব ফিরে পেয়ে শত্তুরের মাথায় পাও উডাইয়া দিল—এইসব কথা তাঁরা ব্রতের শেষে ব্রতচারীদের উদ্দেশে বলে যেতেন। তারপর সেই আশা আকাঙ্ক্ষার বাণী উচ্চারণ। এরপর আমরা ব্রতচারী পোলাপানেরা ভদ্উয়া ইত্যাদি সুভোজ্য প্রসাদ প্রাপ্ত হয়ে বুড়ির সাথে গলা মিলিয়ে বলতাম, বলভাই কাখড়ার পিরতে হরি হরিবল। পিরতে অর্থে প্রীতে। এক সময়, আবাদের শুরুয়াতে বোধ হয়, এস্থানে কাঁকড়া, কুমির এরা ধানের খুব ক্ষতি করত। তাই এই পূজা বা ব্রতের প্রচলন।

পিসিমা বুড়ি অথবা জেঠাইমা, যতদূর মনে আছে, তাঁদের প্রতাপ যতদিন কার্যকরী ছিল, এইসব ব্রত পার্বণ ধরে রেখেছিলেন। গ্রামের সব মেয়ে বৌদের দিয়ে এইসব ব্রত পার্বণ, লোকাচারী অনুষ্ঠান তাঁরা করাতেন। সব অনুষ্ঠানগুলিতে ব্রাহ্মণদের যে অবশ্য করণীয় কৃত্য কিছু ছিল তা নয়। এইসব অনুষ্ঠানের হয়ত কোনও শাস্ত্রীয় মন্ত্রও ব্রাহ্মণদের নিত্যকর্ম পদ্ধতির গ্রন্থে ছিল না। কিন্তু বুড়িরা জানতেন ব্রাহ্মণ ছাড়া পূজা বিহিত নয়। বুড়ি পিসিমা এবং জেঠি একারণে নগেন জেঠার দরবারে হাজির হতেন। পিসিমা বুড়ি বলতেন, ও ভাইপো, ঠাহুরে কয়কি?

: কি কয়?

: কয় বোলে কুমইর পুজা, কাখড়া পুজা এইসব পূজা আচ্ছার নাকি মোন্তর নাই। এয়া কি ঠিক? জেঠা বলতেন, তোমরা যহন এ পুজাগুলা করইয়া আইতে আছ তহন তো এডা কোনোও কতা অইতে পারে না। আসলে অরা মন্তর জানে না। অরা এট্টা আসল মোন্তরই শেহে নায়।

: হে মন্তরডা কি? একথা জানতে চান পুরোহিত হরিঠাকুর।

: ক্যান? সব্বোযজ্ঞেশ্বরো হরি। অর্থাৎ কিনা তুমি যে কামই কর হেয়া যজ্ঞ আর হেয়ার যজ্ঞেশ্বর স্বয়ং হরিই। এইডাই মোন্তর, বোজলা কিনা?—এর পর হরিঠাকুর যদি না বোঝে, তবে সমূহ বিভ্রাট। কেননা, নগেন জেঠা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। জেঠা বলতেন, এই মোন্তরের লগে কইতে অইবে, তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট ইত্যাদি। বোঝলা? না বোঝলানা? হরিঠাকুর বলতেন, একছের বুঝছি। আহা : কি কতা? সব্ব যজ্ঞেশ্বরো হরি। এ্যাঁ কি কতা। আহা, তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট। অ্যাঁ, আহা কি কতা!

অতএব পুরুত ঠাকুর মন্ত্র পড়তেন, ওঁ নমো কাখড়ায় নমঃ ওঁ নম কুম্বীরায় নমঃ ওঁ নমঃ দক্ষিণরায়ায় নমঃ ইত্যাদি যে পূজার যা হয়, খানিকক্ষণ বিড়বিড় করে পরে খুব উদাত্ত উচ্চারণে বলতেন,—

ওঁ ব্রহ্মণ্যদেবায গোব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥
ওঁ পাপোহং পাপকর্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভব।
ত্রাহিমাং পুণ্ডরীকাক্ষ্যং
সর্ব যজ্ঞেশ্বরো হরি—

এ মন্ত্রের অনুস্বর বিসর্গাদি যথাযথ প্রযুক্ত কিনা জানিনা। হরিঠাকুর যেমন উচ্চারণে বলতেন, তেমনটিই বলে দিলাম। শাস্ত্রজ্ঞ পাঠককুল অপরাধ নেবেন না। এ মন্ত্র পাঠের সাথে সাথে পিসিমা বুড়ি এবং জেঠাইমারা বলতেন, বেয়াকে হোগাভূত অইয়া স্যাবা দেও। হাতের দুব্বা সামনে ফ্যালাও। আমাদের তথাকরণ অচিরাৎ, কেননা ভদউয়া ইত্যাদির সুঘ্রাণে আমাদের নোলা তখন প্রায় নির্লজ্জতার সীমান্তে এসে উপস্থিত হয়েছে।

পুরুত ঠাকুর তথা এইসব অং বং ছাড়াও বুড়িদের আরও অনেক আচার অনুষ্ঠান ছিল। একান্ত নিজস্ব ঢঙে বাড়িতে মেয়ে-বৌদের নিয়ে বুড়ি পিসিমাদের বিচিত্র ব্রত পার্বণের রকমারি জগৎ ছিল। সেখানে আপদনাশিনী, বিপদনাশিনী, আকুলাই, নিরাকুলাই, মঙ্গলচণ্ডী, গোকর্ণ এবং নামভুলে গেছি এরকম কত যে অনুষ্ঠান ছিল তার আর শেষ নেই। সারাবছর ধরেই আজ এটা, কাল ওটা, চলছে তো চলছেই। বুড়ি পিসিমার সিংহ পালঙ্কে এদের কেউ আশ্রয়ী হতে পারতেন না। কারণ, সেখানে আলাদা সব জাগ্রতরা স্থায়ী দখলদারি নিয়ে বর্তমান। এঁরাই মাঝে মাঝে তাঁকে 'সপ্‌পনে' দর্শন দিয়ে নানান সমস্যার সমাধান জানাতেন, আবার কখনও বা ভালমন্দ খাওয়ার আব্দার ধরতেন। ছোট ছোট লেপ তোষকে আসীন থেকে জাগেশ নামধারী নুড়ি পাথরগুলো হরহামেশা বুড়িকে 'সপ্‌পনে' উত্ত্যক্ত করত। কখনও তাদের ক্ষীর খেতে সাধ হত। কখনও খিচুড়ি ভোগ, আবার কখনও ফলফলাদি। এঁদের কারুরই সামান্য আয়োজনে মন ভরত না। এঁরা ছিলেন সব ভদ্রলোক ঠাকুর। পালঙ্ক থেকে নামার নামটি করতেন না কখনও। অন্যরা বাইরের। সবাই 'কাঁচাখাউগ্যা'। তবে জাগেশদের সাথে বুড়ির নাতিনাতনিদের একটা বিশেষ একাত্মতা ছিল মনে হয়। সেটা ভালমন্দ খাবার সংক্রান্ত। জাগেশরা এক্ষেত্রে বোধ হয় নিমিত্তমাত্র।

আপদনাশিনীর ব্রতটি বড় আকর্ষক ছিল আমাদের। এ ব্রতে চাল, কলা, মুগ, কলাই, নারকেল, গুড় ইত্যাদি প্রসাদের উপকরণ। তবে ভদ্‌উয়া নয়। কারণ এ ব্রতে ভাজা পোড়া কিছু চলবে না। দেবী নিতান্ত কাঁচা খাউগ্যা। আমিষ্য বা ভাজা পোড়া কিছু তাঁকে দেওয়া যাবে না। এটাই আইশ্য। ভদইউয়া যদিও প্রসাদ হিসেবে আমাদের কাছে খুবই সুখাদ্য ছিল, কিন্তু যেহেতু তার প্রস্তুত প্রণালী চাল ভাজা বা মৌল্‌খা অর্থাৎ খই-এর ভগ্নাংশ ভিজিয়ে গুড় কলা নারকোল সহযোগে, তাই তা ভাজাপোড়া।

একটি ঘট পেতে, সিন্দূরের পুত্তলিকা এঁকে তার উপর আম বা কাঠাল শরাৎ (ত্রি বা পঞ্চ পত্র) দিয়ে বসান হত। পাশে ধূপদীপ পুষ্প ইত্যাদির সরঞ্জাম। সামনে ব্যাপক জায়গা জুড়ে পাথরের থালা তামার পরাত বা কাঠের বারকোষে প্রসাদ বা পেস্‌সাদ নামক ভোজ্যাবলী। আমরা লিঙ্গ নির্বিশেষে বুড়ি পিসিমার আদেশ মতো দূর্বা হাতে বত্তে-র কথা শুনতে বসে যেতাম। ব্রত কথাটি ছিল এক মজার রূপকথা। কথাটি বলতেন পিসিমা বুড়ি। তার বয়ানেই বলছি—

এক বাওন আর বাওনজি। বাওনজির নাম কিলিকিলি বাওনজি। হ্যারা মাগেন যাচেন খায়েন। ঘরে বাইরে দুই জোন। পোলা নাই মাইয়া নাই। ল্যাঙ্গে ঠ্যাঙ্গে কেউ নাই। নিত্য তিরিশ দিন বেয়ান বেয়ান বাওন যায় মাগতে। যিদিন কিছু পায়, হিদিন খায়, যিদিন পায় না, হিদিন ফালডা দিয়া থাকে। দুই ঘড়ি জল খাইয়া মধ্য খাড়ালে চিৎ অইয়া থাহে, পোড়া চোক্ষে ঘুমও আয়না। ঘরের চালে ছোন নাই, বেড়ায় হোগল নাই। ঘর, বাইর সোমান। প্যাডের জ্বালা প্যাডে থাহে। চালের ফুডা দিয়া তারা নক্ষত্তর চান্দ উহি মারে। বাউনী কয়—বাওনা মোগো বড় দুঃখ। বাওনা কয় বাউনী চান্দের গতি বাওদিগে। মনে অয় সুদিন আইতে বিলম্ব নাই। এইসব কথা-পইদ্য অইতে অইতে দুইজনের চোউক্ষে ঘুমের কাজল লাগলো।

রাইত তহন কত কেডা জানে? বাউনীর ঘুম ভাঙ্গে খাডাশের দরমুল শুনইয়া। ঘরের চালের থিহা বুদ্ধুভুতুম লক্ষী প্যাঁচা ভুদ্‌ভুদুম ভুদ্‌ভুদুম করইয়া ডাহে। এই সোমায় ঝাপের উপার শব্দ অয়। বাউনী জিগায় কেডা? ঝাপ লাড়ো কেডা? উত্তর আয়—

-কিলিকিলি বাউনজি ঝাপ্‌ খোলো।

-কেডা।

-ঝাপ খোল, ডড় নাই, মুই।

কিলিকিলি ঝাপ খোলে। দ্যাহে এউক্যা রাঙ্গা টুক্‌টুকইয়া বৌ। লাল পাইড়ের সাদা খোল শাড়ি পরা। মুহের উপার চান্দের আলো পিছলাইয়া পড়ে য্যান। আর হেই জোছছোনায় দ্যাহা যায় দ্যাবচোক্ষু, জোড়া ভুরু, কপালের মধ্যহানে এট্টা বড় সিন্দুরের ফোডা ডগমগ্‌ করে। কিলিকিলি জিগায়, তুমি কেডা? হেনায় কয়েন, মুই বড় আপদে পড়ছি। মোরে আইজগার রাইতটুকু এট্টু থাকতে দেবা?

-হেয়া দিমুনা ক্যান? থাকপা, হেথে আফইত্য কি? কিন্তু তুমি কেডা?

-কাইল কমু হ্যানে। হুমু কোথায়?

-হোও যাইয়া হাইতনায়। মানা করছে কেডা?

তো হে মাগী যাইয়া হাইতনার পাশে একখান ছেড়া হোগলা পাতইয়া ফলি কাইত দিলে। কিলিকিলি আবার হ্যার জাগামতন চিৎ।

খানিক বাদে বাউনী শোনে বৌডা কইতে আছে—কিলিকিলি বাওনজি মোর বড় বাইজ্য পাইছে, মুই হাগুম।

-হাগ যাইয়া ছাইছে। তো হে মাতারী ছাইচে যাইয়া বাইজ্য করইয়া আইলে। আবার এট্টু পরেই ওডে, কয়—

-কিলিকিলি বাওনজি আমি বাইজ্য করুম।

-কর যাইয়া খাডালে। তো হে মাগী ঘরের খাডালে যাইয়া বাইজ্য করলে। এই রকম এট্টু শোয় আর ওডে। ওডে আর কয় বাইজ্য করুম। বাওনজির রাগ ঢিল নাই। হে কইয়া যায়, হাগো যাইয়া ওশ্যায়, হাগো যাইয়া ঢেঁকি ঘরে এই রহম। তো হারা রাইত ধরইয়া মাগী সাইদ্যের হাগা হাগলে।

রাইত পোয়াইয়া পুব আকাশ ফস্‌সা অয়। বাওনা জাগে, কয়—ডাকে পাখি না ছাড়ে বাসা। হেয়ার নাম ছিরি উঁষা। বাউনী রাইত শ্যাষ ওডো। বাউনী য্যান কহন এট্টু মাছপোড়া ঘুম দেছেলে, ধড়মড় করইয়া উডইয়া বইলে। বাওনা কয়, কাইল হারা রাত্তির ক্যার লগে বগর বগর করলা। ঘুমের মইদ্যে শোনলাম য্যান, কেডা খালি বাইজ্য করার কতা কইলে। বাউনী কয়, চুপ চুপ, বৌডা হোনলে লজ্জা পাইবে। হে আছে হাইতনায় শুইয়া।

-হে কেডা?

-জানিনা। তয় আইজ কইবে।

কিন্তু হাইত্‌নায় আইয়া হেরা কেউরেই দেখেনা। বাউনী জিগায়, ও বৌ তুমি গেলা কই? কোনও উত্তর নাই। তহন বাউনী ভাবে হারা রাত্তির ধরইয়া এত হাগন হাগলে যে মাগী হেগেলে কৈ?—বাওনা বলে, এয়া বুঝি হপপ্‌ন। তহন কেরমে কেরমে সুজ্য ঠাহুর ওডেন। বেয়াক পরিস্কার অয়। কিন্তু হে মাগী কৈ? হ্যারে কেউ দেহেনা। বাওনা কয় ওয়া হপ্‌প্‌ন। বাউনী যায় খাডালে, দ্যাহে হেহানে থুপ্‌থুপ্‌ সোনা, ছাইচে যাইয়া দ্যাহে-থুপ্‌থুপ্‌ সোনা। ঢেঁকিঘরে, এহানে ওহানে বেয়াক জাগায়ই খালি থুপথুপ্‌ সোনা দ্যাহে হেরা। বাউনী দ্যাহে, হ্যার বাড়ির যেহানেই যায় ল্যাঙ্গে সোনা ঠ্যাঙ্গে সোনা। বেয়াক জাগায় সোনার ছড়াছড়ি। সব বাইজ্য সোনা অইয়া রইছে। বাওনা ব্যাপারডা বোঝলে। বাউনীরে কয়,—

-বাউনীলো বাউনী, বোজ্জো নি কেডা আইছেলেন?

-হেয়া আর বুজুম না। বিপদনাশিনী মায় আইয়া মোর বেয়াক দুঃক দুর্‌ করইয়া গেলেন।

হেইদিন থিহা বাওনা আর বাওনীর দুঃক শ্যাষ। বাজা গাইডা রাইত দুফইরে ম্যাৎ ম্যাৎ করাইয়া ডাক ছাড়লে, আর পাল খাওয়ানোর লগেলগে পোয়াতি। ঘরের সামনার হুগনা

পুহইরডায় জলে মাছে কেলি করে, গোলায় ধান ভাইঙ্গা পড়তে আছে, আর হেই ধানের 'ক্যারা পোকার' যন্তন্নায় বাড়িতে টেহা দায়। ক্রেমে ক্রেমে, এর পরথিকা বাজা বাউনী ফি বচ্ছর পোয়াতি অইয়াই যাইতে লাগলে। তহন হ্যারগো ল্যাঙ্গে পোলা ঠ্যাঙ্গে পোলা। এউক্কা হাপুর দিতে না দিতে অন্যউগ্‌গা বাউনীর ছাচে। এই রকম ভাবে বিপদনাশিনী দেবি বাওন-বাউনীর দুঃক নাশ করলেন। হ্যারগো ধনে পুত্রে লক্ষীলাভ অইল।

ব্রত কথা শেষ হলে ঐ একইভাবে বুড়ি পিসিমা তার মন্ত্র বলতেন, এই কথা যে শোনে যে পড়ে ইত্যাদি এবং হাতের দূর্বা সামনের ঘটের উপর ছুঁড়ে দিয়ে বেয়াকের হোগাভূত অইয়া স্যাবা দেওন। ততক্ষণে মা-জেঠাইমাদের কেউ কেউ গুড়, কলা-বাতাসা, নারকেল সহযোগে ভেজামুগ, ভেজা কলাই বা ভেজা চাল মাখতে শুরু করতেন। দরদালানে ততক্ষণে চপলা দাসী, আমোদিনী দিদিমা বা সোনালক্ষী দিদিরা কলার পাত পাততে শুরু করে দিয়েছেন। বুড়ি পিসিমা বলতেন, 'উপোসইয়াগো আগে দেও'। উপোসইয়া বলতে অবশ্যই আমরা। ব্রতধারী ব্রতধারিণীরা উপোসি থাকবে এমনই বিধি। কথাটি হয়ত তিনি ব্যঙ্গার্থেই বলতেন, তবে আমরা তখন প্রকৃতই উপোসি। এ প্রসাদ আমাদের কাছে বড় অমৃতবৎ বোধ হত তখন।

পিছারার খালের জগৎ ছেড়ে ভিন্ন পৃথিবীতে যখন, তখনও ঐ বুড়ি পিসিমা, নগেন, জেঠা, জেঠাইমা বা ডাক্তার বাড়ির সোমত্ত মেয়েগুলো এবং পিছারার খালধারের তাবৎ অনুষঙ্গগুলো আমাকে রেহাই দেয়না। যেখানেই যাই, পিছারার খালের স্রোতের শব্দ একটা একটানা সুরের মতো বুকের মধ্যে বাজতেই থাকে। বান্ধবজনেরা তাদের নাগরিক বোধে আমার স্পর্শকাতরতা, ভাবপ্রবণতা নিয়ে নানান নিন্দামন্দ করে। সত্যই আমি বড় আবেগতাড়িত। আমি ভাবি, আমার তো এই সম্বল। আমি যদি আমার বুড়ি পিসিমার চালকলা মাখা হাতখানার সুঘ্রাণ কোথাও পাই আর তা যদি আমাকে দুকুড়ি-তিনকুড়ি বছরের ওপারে এক সবুজ সতেজ উদ্যানে পৌঁছে দেয় তো দিক না, তাতে কার কি ক্ষতি?

গভীর রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে, এখনও মনে হয়, ঐ পিছারার খালের সোঁতা বেয়ে বড় খালের দিকে এগোচ্ছি। সারা শরীর কাদা-জলে নিমগ্ন। কোমরের কাছের বস্ত্রখণ্ড বা গামছার কোঁচড়ে 'ঘুসা' চিংড়ি নিয়ে এগিয়েই যাচ্ছি বড় খালের দিকে, হাতে 'হোচা' বা 'খুঞ্চই'। পিছারার খাল। বাস্তবে সে খাল কবে শুকিয়ে মাঠ হয়ে গেছে, কিন্তু আমার শিকড়ে যেন আজও তার ধারা বহমানা। তার প্রতিটি খাঁজে আমার হাত হাতড়ে বেড়ায় স্বপ্নের চিংড়ির খোঁজে।

বাস্তবে আর কোনওদিন পিছারার খালধারের সেই সব উৎসবে ফিরতে পারব না জানি। তবু ঐ স্থান, তার প্রতিটি উৎসব অনুক্রম, বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা, কিলিকিলি বাওনঝি, শীতলা, মনসা বা কালীখোলায় মায়ের গলায় গাওয়া রামপ্রসাদী গান, কীর্তন রয়ানি মালসীর অনন্ত আয়োজন—সেসব যে কি আকুলতা আজও আমার। মানুষের জীবনের ধ্রুপদী অনুষঙ্গগুলো যখন ধরা-ছোঁয়ার বাইরের বস্তু হয়ে যায়, তখন মানুষের কিইবা উপায় থাকে?

আবার এর সবটাই ধ্রুবপদ কিনা তাওতো জানিনা। উৎসবের স্মৃতি, ভালবাসার, প্রাচুর্যের এবং সামাজিক সুস্থিতি জনিত আনন্দের স্মৃতিগুলো যদি জীবনের ধ্রুপপদ হয়, তবে তখনকার বীভৎসতা, ধ্বংস, অবিশ্বাস এবং রক্তের স্মৃতিও কি ধ্রুবপদ নয়? কি এক গূঢ় কার্যকারণে যেন তখনকার অতিবীভৎস ঘটনাও নস্ট্যালজিয়ার মাহাত্ম্যে ধ্রুবপদ হতে চায়। এমনকি সে সময়কার নানাবিধ অসম্মানকর সামাজিক আচরণ, যা তখন প্রতিমুহূর্তে দংশন করে বলত,—এ দেশটা তোমাদের আর এখন নয়। তোমরা এবার চলে যাও এখান থেকে—সেসবও আজ ধ্রুবপদ বলেই যেন মনে হয়। যেন সেসবও স্বাভাবিক নির্বন্ধেই এসেছিল। সেসব আসার কার্যকারণ ছিল বলেই।

বাপ-পিতামো এই ভূমির আবাদকালে যে সহজতায় আবাদকারী মানুষদের মধ্যে একাত্ম ছিলেন, এক সময় সেই অবস্থান থেকে সরে গিয়ে, তারা আবাদি ভূমির মালিক হলেন। ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছোনোর পর তারা যে সামাজিক অন্যায় পুরুষানুক্রমে আবাদকারীদের বংশধরদের উপর করেছেন, আমরা ঐ পিছারার খালের সোঁতা বিলুপ্ত হবার সময় থেকে তার ফল ভোগ করেছি। এরকম দায়ভাগ আমাদের হয়ত আরও বহু বহু যুগ ধরে বহন করতে হবে।

পূর্বপুরুষদের কথা ছেড়েই দিই, আমি নিজেই কি স্বয়ং আমাদের কর্তাদের অনেক অন্যায় আচরণ, অন্যায় কর্মের অনুষ্ঠান হতে দেখিনি? সেইসব অন্যায়ের পরম্পরা তো আমাদেরকেও অবশ্যই বহন করতে হবে৷ তার অংশী যে আমি নিজেও তা জ্ঞানে হোক অথবা অজ্ঞানে। অজ্ঞানকৃত অন্যায়, অন্যায় নয় একথাতো কোনও শাস্ত্রকার বা পণ্ডিত বলেন নি। এক্ষেত্রে পরম্পরালব্ধ আচরণের দায় আমরা বহন করছি, যা সাম্প্রদায়িকতা নামক এক পিশাচযজ্ঞের ফল হিসেবে সম্প্রদায়গতভাবে আমাদের ঐ পিছারার খালের চৌহদ্দি থেকে উচ্ছেদ করে এক অনির্দেশ্য ভবিষ্যে নিক্ষেপ করল। এ বিচার মুসলমান সমাজ, যারা আমাদের ওখানকার নিম্নবর্গী, বিশেষত, তারা তুলতেই পারে। যে বুড়ি পিসিমার ব্রত কথা নিয়ে আমার এই সাত কাহন বাক্‌বিন্যাস, তিনি কি প্রতিনিয়ত এদেরকে, জাত তুলে শাপশাপান্ত, বাপবাপান্ত করেন নি? তিনি কি এদের সামান্য ত্রুটিকে উপলক্ষ করে বলতেন না—এ তোগো জাতের দোষ। একারণে এই অনাচারের দায়ভাগ আমাদের বহন যে করতে হবে, তা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তাতেই বা পিসিমার ব্যক্তিক দায় কি?

— বারো —

আমাদের নায়েব মশায়ের দাদা, আমরা যাঁকে বড় নাগমশায় বলে ডাকতাম, তিনি এসে আমার বাবাকে খবর দিয়েছিলেন, ভাইডি, হারামজাদায় মরছে। হ্যারে মারইয়া ফ্যাল্যাইছে, বোজজো? বাবা খুবই কাতর হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কার কথা কইলেন? কারে মারছে?

: ক্যান গান্দিডা? হালার পো হালার লইগ্যা আইজ মোগো একি দশা এ্যা? হ্যারে নাথুরাম দেছে শ্যাষ করইয়া।

এ ঘটনার কথা বাবা পরবর্তী কালে যতবার গল্প করেছেন, বলেছেন, বড় নাগের আপশোস আমি বুজি, তয় মহাত্মা, আহা! এরহম করইয়া কইতে অয়? তেনার নিধন! মহাত্মার এমন পরিণতি!

কিন্তু সে সব স্মৃতির ঘটনা, অপঘটনা, এখন থাক। মূলকথায় যাই। মূলকথা বলতে, যা বলছিলাম, এক ভস্ম আর ছাড়্। দোষ গুণ কব কার? সেই কথা। দোষে গুণে আমরা উভয় সম্প্রদায়ই তুল্যমূল্য। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, বরাবর আমরা একে অন্যকে দুষে আসছি। কেউই কখনও নিজেদের দোষের পসরা নিয়ে বলিনি, দেখ ভাই, এই আমাদের দোষ, এগুলোকে তুচ্ছ করে, এসো আমরা ভালোয় মন্দে বাঁচি এবং এই দোষগুলোর সংশোধন করি। না, আমরা কদাপি এরকম সুবুদ্ধিতে পরিচালিত হইনি। না হিন্দুরা, না মুসলমানেরা।

আমার উজানি খালের দুপাশের যত বসতি ছিল বক্সীবাবু দেশত্যাগ করলে, সবার মধ্যেই একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছিল গ্রাম ছাড়ার। এদের মধ্যে বেশির ভাগই পাড়ি দিচ্ছিলেন হিন্দুস্থানে। হ্যাঁ, আমরা তখন পাকিস্তানের বিপরীতের দেশটিকে 'হিন্দুস্থানই' বলতাম। আমাদের শিক্ষা সেরকমই ছিল। তখন সেকুলার-ননসেকুলার তত্ত্ব জানতাম না। পাকিস্তান মুসলমানেদের দেশ এবং হিন্দুস্থান হিন্দুদের। এরকম একটা শিক্ষা আমরা ঐ সময়ে পারিবারিক, গ্রাম্য সামাজিক এবং রাষ্ট্রগতভাবেই পেয়েছি। সে যাহোক্ যাঁরা সেইসময় হিন্দুস্থানে পাড়ি দিতে পারেন নি, তাঁরা কেউ কেউ, গাঁয়ের বাড়িঘর বিক্রি করে, ঝালকাঠী, বরিশাল, ঢাকা বা অন্য কোনও শহরগঞ্জে বাসাবাড়ি ভাড়া করে উঠে যেতে লাগলেন। তাঁরা কেউ বাড়িঘর বাগান পুকুর বিক্রি করলেন একেবারেই জলের দামে, কারণ তাঁরা জেনে গিয়েছিলেন, অন্যথায় কিছুই পাবেন না। এমনিতেই সব বেহাত হয়ে যাবে। কেউবা, আশায় বুক বেঁধে বাড়ির দেখভাল করার দায়দায়িত্ব প্রতিবেশী গ্রামের কোনও মুসলমান ভদ্রলোকের কাছে গস্ত করে চলে গিয়েছিলেন। মনে আশা যদি কোনওদিন আবার ফিরে আসতে পারেন। যদি কোনওদিন এমন কোনও অলৌকিক ঘটনা ঘটে, যা তাঁদের মানসিক আকাঙক্ষার অভীপ্সিত অবস্থা ফিরিয়ে আনে। অর্থাৎ এঁদের মনেও বুড়ি পিসিমার আকাঙ্ক্ষা।

এই মানসিকতাটি আজও আমার স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করছে। বুড়ি পিসিমা এবং নগেন জেঠিমার কথনে প্রায়ই এই মনোভাব দেখতে পেতাম। দুজনে প্রায় সমবয়সি এবং জ্ঞাতি সম্পর্কে বুড়ি জেঠিমার পিস্‌শাশুড়ি। আমাদের দরদালানের পুবদিকের এক কোণে বসে দুই মহিলার নানান্ জল্পনা কল্পনা। বুড়ি পিসিমা প্রায়ই বলতেন, বোজজোনি বৌ, কাইল রাত্তিরে সপপন্ দ্যাখলাম। দেখলাম কি, হিন্দুস্তান পাকিস্তান বেয়াক ভাগাভাগি মিডইয়া গেছে। বেয়াক কিছুই আবার আগের ল্যাহান। গোলায় ধান, পুহইরে মাছ, গাছে ফলফলাদি, কদম আলি আবার আগের ল্যাহান খাড়ি দুদ দেওয়া আরম্ব করছে। কোনো দিগেই কোনো উদ্বাগ নাই। এ স্বপ্ন তিনি এর আগেও দেখেছেন

এবং বাবা জেঠামশাইকে বলেছেন। কিন্তু জেঠিমা খুব আহ্লাদের সাথে জিজ্ঞেস করতেন—

: কও কি? তুমি হেরম দ্যাখলা?

: হ, কইকি শোন্‌না। দেহি,—এভাবেই দুজনে আকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন নিয়ে বিভোর হতেন। এঁদের কথা ইতিপূর্বে বলেছি। আরও একটু বাকি। তাঁদের দুজনের সম্পর্ক যাই থাক, ভাবটি বড় গাঢ় সখীত্বের। যতদিন কাছাকাছি ছিলেন, এ ভাব তাঁদের বজায় ছিল। শীতলাখোলা, বটকালীতলা, জাতকরনীখোলা এইসব স্থানে পুজো বা ব্রতকথা শেষ হলে, জেঠিমা বলতেন, ও ঊষা বর চাও।

: ওয়া তোমার কাম, তুমিই চাও, জান তো বেয়াকই।—পূজা বা ব্রতের শেষে, বর চাওয়ার এক রীতি ছিল আমাদের ওখানে। ব্রত কথা বলার অধিকারিণী যদি বুড়ি পিসিমা, জেঠাইমার পদাধিকার ছিল বর চাওয়ার। সেই বর চাওয়ার রীতকরণটিও আজও বেশ মনে আছে। জেঠাইমা বর চাইতেন—

আ আরে বড় বাড়্ইয়ারা কি কি বরো চায়
এই ধোনো বরো দিলাম লো
মানো বরো দিলাম লো
পরমাই বর লইয়া যাও ঘরে।

এভাবে গাঁয়ের প্রত্যেকটি বাড়ির জন্য বর চাওয়া শেষ হলে খোলা বা তলায় উপস্থিত মহিলা মহলের গান শুরু হত। যাঁরা গাইতে জানতেন, তাঁরা সাধারণত রামপ্রসাদী গাইতেন। আমার মা এব্যাপারে বেশ দড় ছিলেন বলে, তাঁকে সবাই অনুরোধ জানাত। জেঠিমা তাঁকে ডেকে বলতেন, ও লাবণ্য তুই একখান ধর্। মা ঐ শীতলা বা বটকালীতলার চত্বরে, সম্মিলিত গ্রামীণ মহিলাদের মধ্যে গান গাইতেন উচ্চৈঃস্বরে এবং অসংকোচে। মা গাইতেন—

শ্মশান ভালবাসিস বলে
শ্মশান করেছি হৃদি।
শ্মশানবাসিনী শ্যামা।
নাচবি বলে নিরবধি॥

জানিনা, মা যখন এই গান করতেন তাঁর মনের মধ্যে গ্রামগুলোর শ্মশান হয়ে যাওয়ার বেদনাও কাজ করত কিনা।

হিন্দুগ্রামগুলি ব্যাপকভাবে জনশূন্য হতে থাকলেও, এই দুই মহিলা যতদিন এখানে ছিলেন ততদিন এই পরম্পরা বজায় ছিল। শীতলা এবং বটকালীতলার সামনেই বিশাল ঘাট বাঁধানো এক প্রাচীন দিঘি। সেই ঘাটলার সিঁড়ির উপর মায়েদের গান শোনার জন্য তখন আমাদের পাবলিক ফিল্ডের খেলোয়াড়েরা, যারা মুসলমান সম্প্রদায়েরই বেশির ভাগ, খেলা শেষে বাড়ি ফেরার পথে বসে থাকত। আর তাদের বাড়ির মেয়েরা একটু তফাতে হলেও খোলার সামনে আমাদের মায়েদের সাথে বসেই এইসব গ্রামীণ

দেবীদের পূজার্চনা দেখত, গান শুনত, কেউ কেউ বা গেয়েও ফেলত দুচার কলি। গোপনে পূজার উপকরণও দিত জেঠাইমার কাছে এবং আশীর্বাদ নিত, নির্মাল্য আর প্রসাদ নিত, বলত, ক্যাওরে বুজি কয়েন, পোলাডা ভোগতে আছে আইজ দ্যাড়মাস। পীরছায়েবের পানি পরা খাওয়াইয়াতো কিছু অইলে না। হে কারণে ভাবলাম—এইসব ধারা, শত গোলযোগ সত্ত্বেও এই সময় দেখেছি। তারপর ক্রমশ তা স্তিমিত হয়ে আসতে থাকে। এইসব কথা এখন স্মৃতির পর্দায় কখনও মেঘ কখনও রোদ্দুরের মতো জেগে ওঠে। কিন্তু যতই প্রাচীনতা একে গ্রাস করে, ততই যেন সব ধূসর ছবি হয়ে মিলিয়ে যায়। সম্পর্কের বহতা এক উষর প্রান্তরে গিয়ে লীন হয় আর তারপর থাকে এক হাহাকারের ইতিহাস।

পিছারার খালের জগতে আমাদের বাড়িটি ছিল বড়বাড়ি। সবাই বলত, বড় বাড়ি। একারণেই আমরা 'বড় বাড়ইয়া'। কিন্তু নিয়মমতো বড় বাড়ি হওয়া উচিত ছিল আমাদের গাঁয়ের রায়চৌধুরী বাড়ির। তাদের বিশাল প্রাসাদ। নবাবী উপাধি এবং তাম্রপত্রে লিখে দেওয়া জমিদারির চৌহদ্দির ব্যাপারটা আমাদের ওখানে একটা কিংবদন্তির সৃষ্টি করেছিল। ঐ বাড়িতে নবাবী-ভূস্বামীদের আদলে একটি ভূগর্ভস্থ কয়েদখানাও ছিল। আমরা বলতাম অন্ধকূপ। সে যাহোক. তারা নানা কারণে গত শতাব্দীর চতুর্থ দশকের মধ্যেই অস্তিমতা প্রাপ্ত হলে, তাদের জ্ঞাতি আমরাই হলাম বড় বাড়ি। ইংরাজি 'এল' অক্ষরের আকৃতিতে গড়া আমাদের এই অট্টালিকাটির বহির্বিন্যাস আভিজাত্যমণ্ডিত হলেও অন্দরের জীবনযাপন প্রণালী ছিল খুবই সরল। এককালে দীয়তাং ভুজ্যতাং-এর বাহুল্য থাকলেও, যখনকার কথা বলছি, তখন তেমন কিছুই ছিল না। শুধু দোল-দুর্গোচ্ছব-মোচ্ছবে কিছু রইসী ব্যাপার স্যাপার দেখা যেত। বাড়িটিতে ঘরের সংখ্যা ছিল ষোলোটি। মোটা গথিক ঘরানায় তৈরি থামগুলো সহ একদিকে দোতলা আর অন্যদিকে একতলার বিন্যাসে বাড়িটি তার সংযুক্তি রক্ষা করেছে যে কৌণিক যুগ্মস্তম্ভে তার আড়ালেই দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। অট্টালিকাটির বয়ঃক্রম আনুমানিক দেড়শ বছর।

এর আগে ছিল নাকি গোল পাতার ঘর। সাধারণ গেরস্থের ঘরই নাকি ছিল। আমাদের তালুকদারির বীজপুরুষ জগৎচন্দ্র এবং চন্দ্রমোহন বুদ্ধি এবং লাঠির জোরে একদা এই তালুকদারির তথা এই বাড়ির নির্মাণ করেন। একদিন যে বংশ চিকিৎসা বিদ্যাকে কুলকর্ম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা একসময়ে তালুকদার হলেন। বংশকথায় এ তথ্য পাই।

চন্দ্রমোহন এবং জগৎচন্দ্র ছিলেন দুই ভাই। জ্যেষ্ঠ চন্দ্রমোহন, বাল্যেই পিতৃবিয়োগ বশতঃ পার্শ্ববর্তী বাসণ্ডা গ্রামের জমিদার সেন রায়চৌধুরীদের সেরেস্তায় গোমস্তার কাজ নেন। সেখানে কিছুকাল কর্ম করার প্রাক্কালে কনিষ্ঠ জগতও ঐ জমিদারিতে একটি কর্ম পান। সেকালে তাঁদের মাস-মাইনে ছিল, জ্যেষ্ঠর বারো, কনিষ্ঠের পাঁচ। তখন তাঁদের গোলপাতার বাড়ি, হোগলের বেড়া। মা-বাপ অতি শৈশবে গত হলে, বিধবা

পিসিমা, তাঁর একমাত্র পুত্র গুরুদাসকে নিয়ে ভাইপোদের সংসারের হাল ধরলেন। তারা এই মামাতো, পিস্তুতো তিনভাই ঐ বিধবা রমণীর তত্ত্বাবধানে ক্রমশ প্রায় সহোদর ভ্রাতার ন্যায় একটি পরিবার গড়ে তোলেন। জগৎচন্দ্র, যিনি আমার পিতামহের পিতা, অর্থাৎ প্রপিতামহ, তিনি আমাদের পিছারার খালের জগতের প্রত্যন্ত দক্ষিণ অঞ্চলের মহালে, বাসণ্ডার জমিদারদের খাজনা আদায়কারী গোমস্তা ছিলেন তখন। সন তারিখের হিসেব জানিনা, তবে লোকায়ত প্রবাদে তিন পুরুষে একশ বছর ধরলে জগতমশায়ের সময়কাল প্রায় পৌনে দুশো বছর ধরা হয়ত যায়। তখন অবশ্যই ব্রিটিশ সূর্য মধ্যগগনের পথে দ্রুত ধাবমান। জগৎমশায় তখন বাইশ পঁচিশ বছরের যুবক।

মহানুভব ব্রিটিশরাজ তখন এ দেশীয় ভূমিব জরিপাদি কার্যে ব্যস্ত। আমাদের ঐ রকম নবীন ভূখণ্ডের সমুদ্র কূলবর্তী প্রায় কিশোরী ভূমির বিষয়ে তাঁরা যে অবশ্যই যত্নবান হবেন, সেকথা বলাই বাহুল্য। জঙ্গল আবাদ কর, ভূমি হাসিল কর এই জাতীয় এক ফতোয়ায় বোধ হয় এই সময় আমাদের এই দক্ষিণের অটবী অঞ্চলকে নির্মূল করণের প্রক্রিয়াটি চালু হয়। সুন্দরীবনের অন্ত্যেষ্টি এভাবেই হয়েছিল।

এই স্থানেব হাজার হাজার বিঘা জমির কোনও এক আবাদের জনৈক মুসলমান জমিদার ছিলেন। এই পরগণে সেলিমাবাদ আবাদের শুরুতেই তাঁরা এখানে ভূস্বামী হয়ে বসেছিলেন নবাবী বরকতে। সে ইতিহাস লেখা নেই। কিন্তু আমার প্রপিতামহ যখন তাঁর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে খাজনা আদায়কারী ব্যক্তি তখন এই মুসলমান জমিদারের অধীনস্থ সম্পন্ন প্রজারা জগৎচন্দ্রের কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করে, তাঁর কাছে এক সমবেত আবেদনে হাজির হন। এই মুসলমান জমিদারটি অসম্ভব ইন্দ্রিয়পরায়ণ এবং অত্যাচারী হয়ে উঠেছিলেন। একারণে তাঁদের দাবি যে জগতমশায় যদি তাদের অছি হন তবে তাঁরা ঐ জমিদারের আওতায় আর থাকবেন না। এ কারণে হয়ত কিছু কাজইয়া ফ্যাসাদ হবে, তবে জগতমশায় যদি আফইত্যে না করেন এবং মদত দেন তবে সে ফ্যাসাদ মোকাবেলা করা যাবে।

জগতমশায়ের একটি সুসংগঠিত লাঠিয়াল বাহিনী ও অঞ্চলে ছিল। সংক্ষেপে বলি ঐ লাঠিয়াল-বাহিনী এবং তাঁর বুদ্ধি সব মিলিয়ে মিএগ্র সাহেবের জমিদারিটি অচিরে তাঁর হল। মিএগ্র ভিখিরি হয়ে শেষ জীবন যাপন করেছেন। একথা আমিও ওখান থেকে আসা প্রজাদের জোরগলায় বলতে শুনেছি। হয়ত জগত মশায়ের কর্মকাণ্ডও ততদিনে সেখানে এক কিংবদন্তি হয়ে থাকবে। এভাবেই আমাদের তালুকদারির সূত্রপাত। তখন বোধকরি ঊনবিংশ শতকের মধ্যকাল। পরবর্তী দুই পুরুষে এর সৌষ্ঠব বাড়তে থাকে এবং বাগান, বৈঠকখানা, দিঘি, পুকুর, গোলাঘর, নাটমন্দির, অভিনয় মঞ্চ ইত্যাদি, ইত্যাদি ক্রমশ বিস্তৃতি পায়। যার গঠনকল্প নবাবী এবং সাহেবী উভয় ঘরানার।

যে চৌধুরী পরিবারের কথা বলেছিলাম তাঁরা এবং তাঁদের জ্ঞাতি সূত্রে আমাদের পরিবারই এই পিছারার ঘাটের চৌহদ্দির তাবত উচ্চ এবং অপবর্গীয় মনুষ্যদের

বীজপুরুষদের এস্থানে বসতি করান। তবে এদের অনেক আগেই ধীবর কৈবর্তরা এস্থানে বসতি গড়েছিল। তারা শুধু মৎস্যজীবীই ছিল। চাষি গৃহস্থ ছিল না। আবাদকারীদের, অর্থাৎ চাষি মনুষ্যদের নিয়ে এখানে যে বসতি স্থাপন আমাদের বীজপুরুষেরাই করান এ তথ্য স্থানীয় ইতিহাসে পাওয়া যায়।

আমার অনুমানে এই পিছারার খালের বিশ্বটি গড়ে উঠেছিল প্রায় তিনশ' বছরের আবাদি প্রচেষ্টায়। এই বসতের সৃজন-কথা আশৈশব শুনেছি, এই স্থানের পরম রহস্যময় এবং আশ্চর্য পরণকথা শুনেছি এবং এই স্থানকে এক পরম দিব্য বিভায়ও একসময় দেখেছি ; তারপর এর ধ্বংস যখন প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে তখনকার অপার দুঃখ তো জীবৎকাল ধরে বহনও করে যাচ্ছি। এই সমুদয় সমৃদ্ধি দেখে, এই আশ্চর্য জগতের এক অনাকাঙ্ক্ষিত বিলীয়মানতা প্রত্যক্ষ করতে করতে আমার জীবন চিরকালের জন্য এক বিষণ্ণ জীবনই হয়ে রইল। আমার মতো, হয়ত, আরও হাজারো জীবনই এরকম দুঃখময়তার বিষণ্ণতায় তাদের জীবন অতিবাহিত করে, তাঁদের পিছারার ঘাটের শূন্যতাকে হৃদয়ে নিয়ে নিঃশেষ হলেন, তার খবর ইতিহাসে কোথায় থাকে? লোকেরা শুধু গোদা কথায় দেশভাগ আর তার কার্যকারণ ব্যাখ্যা করে। সেই ব্যাখ্যাই ইতিহাস হয়, কিন্তু আমাদের অনুভবের দুঃখের স্থান সে ইতিহাসে কোথায়?

গাজির ব্যাপারটি এবং আরও অনেক ঘটনা পিসিমার কর্তৃত্বে নাড়া দিয়েছিল। তাঁর ক্ষমতার জগতে সেই সময় এক ব্যাপক ভাঙ্গন দেখা দিলে উনিশশো বাহান্ন কি তিপ্পান্ন সালের ফাল্গুনের এক সকালে বড়খালের ঘাটে একখানা বেশ বড়সড় নৌকো লাগল। পিসিমাবুড়ি তার বয়স্থ, বয়স্থা নাতি নাতনিদের নিয়ে জীবনের দ্বিতীয়বারের মতো তাঁর বাপের বাড়ি ছাড়লেন। প্রথম ছেড়েছিলেন সাত বছর বয়সে, 'রোহিনী বৌ' হিসেবে, কেননা, তখন 'পঞ্চমবর্ষে ভবেৎ গৌরী. সপ্তমে চ রোহিণী'। একাদশ বর্ষে বৈধব্য নিয়ে ফিরে এসেছিলেন বাপের বাড়িতে 'স্বামি খাগি' অভিধা শিরোধার্য করে। তারপর এই তাঁর দ্বিতীয় বহির্গমন এবং শেষ। তাঁর চোখে আমরা কোনও কারণে কোনোদিন জল দেখিনি। কিন্তু নৌকোয় ওঠার আগে, বাড়ির সব ঠাকুর দেবতা, তাঁর জাগেশ, উঠোনের গাছপালা, তাঁর তাবৎ প্রিয় বৃক্ষাবলী এবং মন্দিরগুলোকে প্রণাম করার সময়, তাঁর আকুল কান্না আমি দেখেছি। সে চিত্র ভোলার নয়। তাঁর আজীবনের অবলম্বন ঐ সিংহ পালঙ্ক ভরতি অজিনাসনে উপবিষ্ট অসংখ্য ঠাকুর দেবতার ছবি, পালঙ্কের আনাচে কানাচে সব দেবতা, দেবকল্পিত নুড়ি, পাথর এবং ইত্যাকার তাবৎ আড়ম্বর আর তাঁর জীবনের সব অবলম্বন পরিত্যাগ করে বুড়ি পিসিমা পিছারার খালের জগৎ ছাড়লেন। এইসাথে আমাদের ব্রতকথা, পাঁচালি, বিভিন্ন খোলার মোচ্ছব এবং সমুদয় কিংবদন্তির যুগের অবসান হল। আমরা বাকি যারা রইলাম, তারা নেহাৎই একটা শ্মশানের পোড়া কয়লা আর ভাঙা কলসি হিসেবেই রইলাম। এরপর আর কেউই এমন থাকলনা যে প্রতিটি ক্রান্তিকালে বা সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় প্লবতার সময় সুন্দর সুন্দর সব স্বপ্নের কথা কাহিনী শুনিয়ে আতঙ্কিত জনেদের খানিক আশ্বস্ত করতে পারেন। নৌকোয় ওঠার

সময়, আমাদের সেই বৃক্ষ দম্পতির শিকড়ে তাঁর মাথা কোটাব আর্তি আজও এক অনুপম ছবি হয়ে আছে।

— তেরো —

বুড়ি পিসিমার সাথে বড় ভাইবোনেরা সবাই চলে গেল কলকাতায়, একমাত্র আমি এবং পরের ছোটরা ছাড়া। অতবড় বাড়িতে আমরা তিন ভাই এবং এক বোন। আমার পরে এক ভাই, তারপরে বোন এবং সবচেয়ে ছোট ভাইটা। এর পরে আরও তিন বোনের জন্ম ওখানেই হয়।

তখন অকস্মাৎ এক বিরাট শূন্যতার মধ্যে পড়লাম। এতদিন আশপাশ বাড়ির লোকেরা চলে গেলে মনে কষ্ট হত, কেননা তাদের ছেলে, মেয়েরা যারা খেলার সাথি তাদের আর পেতাম না। বাড়িতে অনেক ভাইবোন ছিলাম বলে কৈশোরিক আনন্দ ব্যাহত হয়নি। এখন মানসিকভাবে ভীষণ অসহায় হয়ে পড়লাম। বাড়িতে তখনও জেঠামশায়ের সাথে একান্নবর্তী। তাঁর দুটি ছেলেও বাড়িতে ছিল, কিন্তু আমার ভাইবোনদের মতোই। জেঠামশায় কর্তা। তাঁর আভিজাত্যের ভয়াবহ শাসন আছে কিন্তু প্রতিপালন নেই। আগে এই শাসন থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য বুড়ি পিসিমার আশ্রয় ছিল, এখন আর তা নেই।

হিসেবে দু ক্রান্তির তালুকদার, কিন্তু সামন্তপনায় মহাবীর বিক্রমকেশরী। জেঠামশাই-এর নির্দেশ, আশপাশের শুদ্দুর বাড়ি, ছোটলোকেদের বাড়িতে যাওয়া চলবে না। বাড়িতেও ঐ সব ছোটলোকদের ছেলেপুলেদের নিয়ে খেলাধুলা করা চলবে না। ভোরে ফুল তুলতে যাওয়া, কুল কুড়োতে যাওয়া চলবে না। জোরে কথা বলা বারণ, খাল পারে যাওয়া বারণ, ছিপ নিয়ে পুকুরে মাছ ধরা বারণ। এরকম এক পরিস্থিতিতে দম বন্ধ হয়ে প্রায় মরার অবস্থা। কিন্তু এসব না হয় আমাদের করণীয়। জেঠামশাই বা কর্তাদের কি কি করণীয় সে বিষয়ে তাঁদের ঔদাসীন্য এ সময়ে অপরিসীম। আমার বা ছোটদের পড়াশোনার ব্যবস্থা করা। ইস্কুলে পাঠানো যে তাঁদের অবশ্য করণীয়, এই সময়টিতে তাঁরা তা কদাচ উপলব্ধি করেননি। বাবা ছিলেন একটু অতিমাত্রায় উদাসীন প্রকৃতির। জেঠামশায়ের উপর নির্ভরশীলতা ছিল তাঁর সারা জীবনের অভ্যেস। তখনও তালুকদারি জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ হয়নি। অতএব পরিশ্রম করে অন্ন সংস্থান করার প্রয়োজন ছিল না।

এই সময়টায় বাবা এবং জেঠামশাই-এর অদ্ভুত সব ক্রিয়াকলাপ এবং আচরণ দেখা গেছে। বাড়িতে তখনও বেশ কিছু চাকরবাকর ছিল। তাদের বোধ করি আর কোথাও যাবার জায়গা ছিল না বলে ভাত কাপড়েই থেকে গিয়েছিল। তখন সামান্যতম ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য তাঁরা দু-ভাইই খুব নিরুত্তাপ চিত্তে নিজেরা শাসন না করে ঐ সব চাকরদের হাতে আমাদের নির্যাতন করাতেন। চাকর-বাকরেরা এসব কাজে প্রভূত আনন্দ পেত। নানা কারণেই কর্তাদের উপর তাদের ক্ষোভ ছিল, এখন সেই ক্ষোভ তাঁদেরই দৌলতে আমাদের উপর প্রতিহিংসার আগুন হয়ে কারণে অকারণে দহন

করত। চাকরদের হাতে কানমলা দেওয়ানোর শাস্তিমূলক অনুষ্ঠানটি জেঠামশায়ের যে কি পর্যন্ত তৃপ্তির ব্যাপার ছিল, তা বলে বোঝানো যায় না। মা বাবার ব্যবহারে অনেক সময়ই আমার মনে হত যে তাঁরা ভাবতেন, তাঁদের সেরা সন্তানেরাই যখন কাছে নেই, তখন এই অনাকাঙ্ক্ষিত আপদগুলোকে আদর আহ্লাদ করার কিইবা আছে। তাঁরা একথা কখনও কখনও বলতেনও। এ সময়কার পবিস্থিতিই যেন তাঁদের এরকম তৈরি করেছিল।

তাঁদের এই মানসিকতার কারণ তখন বুঝিনি এবং সে কারণে যথেষ্ট অভিমানও মনের মধ্যে পোষণ করেছি। একসময়, বড় হয়ে, তাঁদের ঐ সময়কার ওরকম আচরণের রহস্যভেদ করতেও পেরেছি। আমার দাদাদের বেশিরভাগ যে বয়সে মা বাবার স্নেহাশ্রয় ছেড়ে দেশ থেকে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিল, তাঁদের স্বাভাবিক মানসিকতার বিপর্যয় সে কারণে অযৌক্তিত নয়। মা এবং বাবা, দাদা-দিদিদের মঙ্গল চিন্তায় সেসব দিনে সর্বদাই দুশ্চিন্তিত থাকতেন। তাদের সেই সতত দুশ্চিন্তার দায়ভাগ, অর্থাৎ তজ্জনিত হতাশা, বিরক্তি, ক্রোধ ইত্যাদি আমাকেই বিশেষ করে বহন করতে হত। কারণ ওখানে তখন আমিই যা একটু বড়। এজন্যে সবসময়ই খুব বিষণ্ণ থাকতাম। দেশভাগের হ্যাপা এবং তৎসংক্রান্ত আতঙ্ক তখনও খুবই প্রকট। তাছাড়া তাঁদের সন্তানেরা বিদেশবিভুঁয়ে কেমন আছে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় মা বাবা নিয়তই মুহ্যমান থাকতেন। তবে মাঝে মধ্যে এক-আধবার কলকাতায় গিয়ে তাদের সাথে দিন দশ বারো থাকা ছাড়া বাবা আর যে বিশেষ কিছু করতে পারতেন এমন অবস্থা তাঁর ছিল না। তখন এস্টেটের খরচেই কলকাতার সংসার চলত। আমাদের বড় দাদা, এবং দুই কাকা চাকরিও করতেন অতএব তাদের খারাপ থাকার কারণ ছিল না। বাবা ছাড়া, নায়েব মশাই বা কর্মচারীদের কেউ কেউ মাঝে মধ্যেই ওখানে যেতেন।

মা আমাদের কুড়োনো কুল, আম, চালতা ইত্যাদি দেশজ ফলের আচার, আমসত্ত্ব, আমসি, চালতের (শুকনো) গুঁড়োর পিঠে ইত্যাদি তৈরি করে নায়েব মশাই-এর সাথে পাঠিয়ে দিতেন তাদের খাওয়ার জন্য। আমাদের কখনও ওসব খেতে দিতেন না। বলতেন, তরাতো কত খাও, অরগো কপালে তো এসব জোডে না। আমাদের আনন্দ হত যে আমাদের জোগাড় করা জিনিসগুলো দাদা দিদিরা খাবে। কলকাতায় এসব পাওয়া যায় না। কিন্তু পরে জানা গেছে এইসব পৌছোনোর জন্য তাঁর ঠিকানা অন্য ছিল। অথচ বাড়ি থেকে রাশি রাশি ভোজ্যবস্তু তখন পাঠানো হত। খেজুর গুড়ের বড় বড় নাগরী, ক্যানেস্তারা টিন ভর্তি মশলা মাখানো নোনা ইলিশ মাছ, নারকেলের নাড়ু এবং আরও কত কি। কিন্তু তাদের কপালে এর কিছুই জুটত না। বছর খানিক বাদে তিন দাদা একবার দেশে ফিরে এসেছিলেন। তখন আমাদের খুব আনন্দ হয়েছিল। সবসময় ছায়ার মতো তাদের সাথে সাথে থাকতাম। তখনও আমি ইস্কুলে পড়ি না। দাদারা কলকাতায় ইস্কুলে ভর্তি হয়েছিল। কিছুকাল বাদে ওরা আবার চলে গেল এবং এবার আমি আরও নিঃসঙ্গ ও বিষণ্ণ হয়ে পড়লাম।

বাড়িতে ছিল এক দঙ্গল গোরু ছাগল। চাকর-বাকরের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় সেসবের দেখভালের দায় আস্তে আস্তে আমার উপর বর্তালো। একটি মুসলমান মুনিষ ছিল এ কাজের জন্য আমারই বয়সি। সে একা পারত না বলে, গোরুগুলোকে সকালে মাঠে নিয়ে গিয়ে চরানো বা বেঁধে রেখে আসা, বিকেলে ফিরিয়ে এনে খোলভূষির জাবনা দেওয়া এইসব আমাকে ওর সাথে করতে হত। এর কিছুদিন বাদেই দেখা গেল ছেলেটি আর আসছে না এবং তখন থেকে পুরো দায়িত্বটাই আমার উপরে পড়ল। এইসময় গাইদোয়ানোর বিদ্যেটাও দিব্য রপ্ত হয়ে গেল। আমার এই রাখালি করার সময় অনেক রাখালের সাথে আমার আলাপ হয়েছিল হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের। তাদের কেউই ইস্কুল মাদ্রাসায় পড়ত না। গোরু চরানো এবং চাষবাসের কাজই তারা করত। এক সময় আমিও তাদের একজনই হয়ে গেলাম। তাদের সাথে মাঠে বনে-বাদাড়ে কাটাতাম। যখন-তখন গাছ থেকে ডাব পেড়ে খেতাম এবং বড় খাল পাড়ের কিনারের শিরীষ গাছটায় বসে বাঁশি বাজাতাম। তাদের মধ্যে যে বয়সে বেশ বড়, তাকে নুরুদা বলে ডাকতাম। নুরুদা খুবই ভালবাসত আমাকে এবং ভাটিয়ালি টানে বাঁশিতে সুর তুলতে সেই আমাকে শিখিয়েছিল। সে নিজে খুব সুন্দর বাজাতে পারত। বাঁশি বানানোর কায়দাটাও জানা ছিল তার।

আমরা তিন-চারজন ছিলাম এই রাখালি দলে। আমি ছিলাম সবার ছোট এবং সেকারণে ওদের উপর নির্ভরশীল। তাছাড়া অতগুলো গোরু-বাছুর সামলাবার শারীরিক ক্ষমতাও তখন ছিল না আমার। ওরা সবাই এ ব্যাপারে অনেক সাহায্য করত। নুরুদা বলত, এইগুলাকি তোমাগো করণের কাম? তোমরা ইস্কুলে যাবা, ল্যাহা পড়া করবা, ফিট্‌ফাট্‌ থাক্‌পা। তার এইসব কথা শুনতে তখন ভাল লাগত না আমার। মনে হত, ওরা যেন আমাকে আলাদা করে দিচ্ছে। এই সময়টায় পড়াশোনার বিষয়ে কোনও উৎসাহ তেমন ছিল না। তবে ইস্কুলে না যেতে পারার হীনম্মন্যতাটা ছিল। সে কারণে মাঝে মাঝে মন খারাপ হত। এদের সাথে রাখালি করতে এসে আমার একটা অভাব মিটেছিল। দাদারা চলে যাওয়ার জন্য যে নিয়ত নিঃসঙ্গতায় এবং বিষণ্ণতায় ভুগছিলাম তার হাত থেকে অব্যাহতি মিলেছিল কিছুটা।

গোরুগুলোকে ছেড়ে দিয়ে কোনও গাছতলা বা ঐ কুলপতি বৃক্ষ দম্পতির কারুর গায়ের ওপর বসে গান, গল্প, বাঁশি বাজানো চলত। কখনও লোহার পুলটার উপর দিয়ে বড় খালের মধ্যে লাফ দিয়ে পড়ে বেশ খানিকক্ষণ সাঁতার কেটে হুটোপুটি করতাম। অন্য এক আনন্দের জগতে তখন পৌঁছোতে পেরেছিলাম এবং রাখালি জীবনের অনেক ব্যাপারও আয়ত্ত হয়েছিল।

প্রায় আট-ন মাস এভাবে কাটলে একদিন জেঠামশাই একটি দুধেল গাই রেখে বাকি সবগুলোকে বিক্রি করে দিলেন এবং আমারও রাখালি জীবনের ইতি হল। এই সময় কলকাতায় আমার এক দিদি এবং এক জেঠতুতো দিদির বিয়ে হয়। বাবা এ

কারণে কলকাতায় যান। গোরুবেচা টাকার থেকে জেঠামশাই সম্ভবত বাবার পথ খরচ দিয়েছিলেন। দিদিদের বিয়ে এস্টেটের খরচেই হয়েছিল, তবে তার কিছুই বাবার হাতে হয়নি। ঘটনাটি এ কারণে বলা যে, বাবাকে দুঃখ করে মার কাছে বলতে শুনেছিলাম যে, এতবড় সম্পত্তির অর্ধেকের মালিক হয়েও তাকে প্রায় শূন্য হাতে গোরুবেচা কয়েকটি টাকা সম্বল করে নিজের মেয়ের বিয়েতে যেতে হচ্ছে। আমার দুঃখ হয়েছিল গোরুগুলো বিক্রি হওয়ার জন্য। একটা আনন্দময় জীবনের এভাবে পরিসমাপ্তি ঘটল।

আবার সেই বাড়ির চৌহদ্দির একঘেয়েমি। অলস দিনযাপন। রাখালি দিনগুলোর অবাধ স্বাধীনতার কথা মনে করে আরও বিষণ্ণতায় মগ্ন হওয়া। ঝড় বা বৃষ্টি আসার শব্দে গোরুগুলো যখন উর্ধ্বশ্বাসে বাড়ির দিকে ছুট লাগতো এবং আমিও পিছনে ছুটতাম। তখনকার অনুভূতি এক অসামান্য রোমাঞ্চকর ব্যাপার। প্রত্যেকটি গোরুর এক একটা নাম ছিল। কুন্দ, চান্দি, লালী এইসব নাম। একটা বলদ ছিল, তার নাম মধুমঙ্গল। তাকে বশে রাখা খুব কঠিন ছিল। তাকে ছেড়ে দিলেই সে এ-বাড়ি ও-বাড়ির রান্নাঘরের ঝাঁপের ঠেঙা তার শিং দিয়ে কিভাবে যে খুলে ফেলত এবং তাদের হাঁড়ি, কড়াই খেত। এমন বজ্জাত ছিল সেটা। এ নিয়ে অশান্তি হত খুব। কিন্তু তার উপর বেশিক্ষণ রাগ করে থাকতে পারতাম না। একবার নাম ধরে, 'মধুমঙ্গল' বলে ডাক দিলেই সে খুবই বাধ্য 'ছাওয়ালের' মতো ছুটে চলে আসত। অন্যগুলোরও স্বভাব তেমনই ছিল। নাম ধরে ডাক দিলেই প্রথমে কানদুটি সোজা হয়ে যেত, তারপর ডাকের দিকটির ধারণা হলেই লেজ তুলে ছুট লাগাত সেই দিকে। ওদের খুব ভালবাসতাম আমি এবং মনে হয় ওরা তা বুঝতেও পারত। এ অন্য এক আনন্দের জগৎ। রাখালি জীবনে ঐ ধরনের একটা চাষিসুলভ অনুভবও গড়ে উঠেছিল এবং বোধহয় তার রেশ সারাজীবন বহন করেই চলেছি আমি।

সব পশুর থেকে গাই-বাছুর, বলদ বরাবর ভালবেসেছি। ওদের প্রতি কিরকম যেন একটা কৃতজ্ঞতা, স্নেহ, ভালবাসার মিশ্রিত অনুভব আমার মধ্যে কাজ করেছে। জেঠামশায় একমাত্র চান্দিকে আর তার সদ্যোজাত বাছুরটিকে ছাড়া বাকি সবগুলোকেই বিক্রি করে দিয়েছিলেন। মনে আছে, সেদিন যখন গোরুর ব্যাপারী সেই খরিদ্দার ওদের নিতে আসে, আমি আমাদের সিঁড়িকোঠার চিলেঘরের এক কোণে দুকানে আঙুল দিয়ে বসে কাঁদছিলাম। তা অবশ্যই কারুর নজরে পড়েনি। মা বলেছিলেন, কুন্দর আর মধুমঙ্গলের নাকি চোখ থেকে জল পড়ছিল। কুন্দর 'হাম্বা' বলে ডাকটা কানে আঙুল দিয়ে থাকা সত্ত্বেও যেন শুনতে পেয়েছিলাম। ব্যাপারী গোরুগুলিকে নিয়ে যাবার অনেক পরে ঐ চিলেকোঠা থেকে নেমে এসেছিলাম। এরপর কোনওদিনই আর আগ বাড়িয়ে অবশিষ্ট গাই বাছুরটির তত্ত্ব তালাশ বা দেখাশোনা আমি করিনি। ঐ নিয়ে জেঠামশাই চেঁচামেচি করা সত্ত্বেও যখন ওইদিকে আর ভিড়লাম না, তখন তিনি তাদের প্রতিপালনের অন্য ব্যবস্থা করতে বাধ্য হলেন।

— চৌদ্দ —

রাখালি জীবনের ঐ আনন্দটুকুও চলে গেলে আমি আর কিছুতেই মন লাগতে পারছিলাম না। তখন বয়স ঠিক কত মনে নেই। বয়সের হিসেবটা আমাদের ভাইবোনদের ক্ষেত্রে বরাবরই একটু গোলমেলে। কারণ আমরা ছিলাম আট ভাই, পাঁচ বোন। বাবার দুই সংসারের ফসল। বড় দাদা, দিদি এবং ছোড়দাদা ছাড়া অন্য কারুরই জন্মতারিখ বা সাল মা বাবা নিজেরাও বোধ হয় জানতেন না। অনুমানে বোধ হয় তখন বছর আট-দশেক বয়েস হবে আমার। কিছু দিনের জন্য কীর্তিপাশার ইস্কুলের ফ্রি-প্রাইমারিতে ক্লাস ফাইভে পড়েছিলাম। তারপর পরীক্ষা শেষ হলে জেঠামশাই বলেছিলেন যে এখানে আর কিছু হবার নেই। ওকেও এবার কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া যাক। বলেছিলেন বটে, কাজে করেন নি। কেননা এই সময়ে মধ্যস্বত্ব বিলোপ আইনটি পাশ হয়। বেশ কিছুদিন ধরেই মধ্যস্বত্ব প্রথার বিলোপ বিষয়ে কর্তাদের আলাপ আলোচনা চলছিল। এই নিয়ে বাবা জেঠামশায়ের একটা চাপা উত্তেজনাও দেখা গেছে সেসময়। তবে ব্যাপারটার গুরুত্ব বোঝার মতো বয়স, বুদ্ধি তখনও ছিল না বলে, খুব একটা ভাবিত হইনি।

একদিন গভীর রাত্রে জেঠামশাই এবং নায়েব মশাই দক্ষিণের 'মহাল' থেকে ফিরে এলেন। দরদালানের বারান্দায় চাকরপাট এবং অন্দরের মহিলামহল চঞ্চল হয়ে উঠল তাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থার জন্য। জেঠামশাই, নায়েব মশাইকে দিয়ে বাবাকে ঘুম থেকে ওঠালেন। সিঁড়ির চত্বরে বসল তাদের আলোচনা সভা। জেঠামশাই কোনও ভূমিকা না করেই বললেন, ভাইটি We are lost. The zamindari system has been confiscated by the Government. We have now to decide, what to do next and how to survive. বাবা এবং জেঠামশাই-এর মধ্যে কখনও বিতণ্ডা হতে বিশেষ দেখা যায়নি। যদি কখনও হত তার সংলাপের মাধ্যম হত ইংরেজি। এও এক ধরনের আভিজাত্য। কারণ চাকরপাট, বাড়ির মেয়েমহল, আশপাশ বাড়ির লোকেরা আছে। তারা যেন দু'ভাই-এর মনোমালিন্য বিষয়ে কিছু না জানতে পারে, তাই এই সতর্কতা। সাধারণ্যে তাদের ভাবমূর্তি যেন নষ্ট না হয়। সে রাত্রে, মা রান্নার ব্যবস্থার জন্য উঠে যেতেই জেগে গিয়েছিলাম। এবং বাবা জেঠামশায়ের বার্তালাপ শুনছিলাম আড়ালে দাঁড়িয়ে। তখনও ইংরেজি ভাষা ভাল করে বোঝার মতো ক্ষমতা হয়নি। তবে মোদ্দা ব্যাপারটা বুঝেছিলাম এবং পরবর্তীকালের নানান আলোচনার জন্য ব্যাপারটার পুরো discourseটা মনে থেকেই গিয়েছিল। বাবা, জেঠামশাই-এর কথা শুনে জানতে চাইলেন যে জমিদারি, তালুকদারি বা মধ্যস্বত্বীয় ব্যবস্থা অবশ্যই বিলোপ করা হতে পারে। কিন্তু খাসজমিগুলো যতক্ষণ দখলে থাকবে ততক্ষণ ধ্বংস হয়ে যাবার প্রশ্ন ওঠে না। সরকার নিশ্চয় এই সব মানুষকে না খেয়ে মরার পথে ঠেলে দেবে না। এবং যেসব ভোজ্যদ্রব্য 'মহাল' থেকে এতকাল ধরে এসেছে, তা না আসার কোনও কারণই তো নেই। কেননা, সেসব তো প্রজাপত্তনির উপজ নয়। তা তো

খাস জমির ফসল। জেঠামশাই একটি অট্টহাস্য করে বললেন, আহা! তুমিতো দেখি কিছুই খবর রাহ না। আর রাখবাই বা ক্যামনে? নিজের হাতে কিছুই তো করনায়। —কিন্তু আশ্চর্য! তুমি কি মেয়েদের বিয়েতে যে এইসব খাস জমি বিক্রি করে টাকা জোগাড় করতে হয়েছিল সেসব ভুলে গেছ? বাবা বললেন যে, এরকম একটা গল্প তিনি এই প্রথম শুনলেন। সারা জীবন তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠর বাধ্য থেকেছেন। এবারও তার অন্যথা হবে না। কিন্তু তিনি খুব ক্ষোভের সঙ্গে জানালেন যে, এই বিপুল সম্পত্তির অর্ধাংশের মালিক হয়েও কোনওদিনই এর হিসেব তিনি জানতে চাননি।

বাবা এতগুলো কথা একসাথে জেঠামশাইকে কোনওদিনই বলেন নি। ফলত, তাঁর এমত প্রতিক্রিয়ায় জেঠামশাই খুবই ক্ষুব্ধ হলেন। বললেন যে এটা স্বাভাবিক, সংসারে এটাই নিয়ম। যে ব্যক্তি পরিবারের জন্য সব কিছু করে, তাকেই সব ক্ষয়ক্ষতি এবং লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়। বাবা বলেছিলেন, এ বিষয়ে বিতণ্ডার প্রয়োজন নেই। If you think it's all right, it's all right. I will never open this chapter again. Be satisfied yourself বলে বাবা ঘরে চলে গেলেন।

পরেও জেনেছি আমাদের তালুকদারির প্রজাপত্তনি জমির, অর্থাৎ যার খাজনার অধিকারী আমরা, তা খুব একটা সামান্য ছিল না। কিন্তু তার তুলনায় অনেক বেশি আয়ের ব্যবস্থা ছিল খাস জমি থেকে। খাসজমির তখন কোনও সীমা নির্ধারণের ব্যাপার ছিল না। ফলে, তার আয় থেকে মধ্যস্বত্বভোগীদের খোরাকির ব্যবস্থা বেশ ভালভাবেই চলার কথা ছিল। পিছারার খালে নৌকোয় নানান সামগ্রী আসত, অথবা যেসব বড় ঘাসি নৌকোগুলি সেখানে ঢুকতে না পেরে বড় খালে থাকত, তাতে যেসব সামগ্রী আসত, তা সবই খাসজমির উপজ সামগ্রী। প্রজাপত্তনির খাজনা সে তুলনায় কিছুই না। কিন্তু সেসবের গতি যে কি হল, তা একমাত্র জেঠামশাই আর নায়েব মশাই-ই জানতেন। সেসব খাস জমির আর কোনও হদিশই পাওয়া গেল না কোনওদিন।

এরপর শুরু হল এক উঞ্ছবৃত্তির জীবন। পিছারার খাল বা বড় খাল, কোনও খালের সোঁতা ধরেই আর ধান-মান-কলা-কচুর বহর আসল না। প্রায় একবছর সময় ধরে চলল বড় বাড়ির সঞ্চিত ঐতিহ্যময় দ্রব্যাদির জলের দামে বিক্রি কবা এবং সেই মূল্যে অন্ন সংগ্রহ। বাড়ির উঠোনে বড় বাঁশের খুঁটোয় বাঁধা হল দাঁড়ি পাল্লা। তাতে ওজন করা হতে লাগল পুরোনো কাঁসা পিতল এবং তামার বাসনপত্তর। পর্বতপ্রমাণ সব ডেগ, ডেক্‌চি, গামলা, পরাৎ, থালা, হাঁড়ি, কলসি এবং তাবৎ বাসনপত্তর। গ্রাম গাঁয়ে, ভোজে মোচ্ছবে হরবখৎ আজকের দিনের মতো, ডেকরেটার্সকে খবর দিলেই এসব পাওয়া যেত না। ছিলই না এরকম ব্যবস্থা। তাই বড় বনেদি বাড়িগুলোতে এসব থাকত। কেননা, প্রয়োজনটা তাদেরই বেশি হত। অন্যদের শ্রাদ্ধে, বিবাহে বা ভোগ মহোৎসবে, বারোয়ারি কাজে। এখন সেসব দেদার বিক্রি হতে লাগল। তারও হিসেব পত্তর করার দায়িত্ব নায়েব মশায়ের। তাঁর তখনও ছুটি হয়নি, যদিও নায়েবি শেষ কেননা, তালুক মুলুক চৌপাট। নায়েব মশাই সিঁড়ির পোস্তায় বসে কাগজ কলম নিয়ে মাপজোক হিসেব পত্তর লিখছেন। ব্যাপারীরা ওজন করছে

এবং বলছে। এ দিকে অবশিষ্ট চাকরপাট যারা ছিল তারা মালগুদাম থেকে মালপত্তর বার করে উঠোনে টাল দিচ্ছে। মা, ঘরের মধ্য থেকে এইসব দেখছেন আর চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছেন। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, বাবা বা জেঠামশাইয়ের আচরণে কোনও দুঃখবোধের প্রকাশই নেই এ ব্যাপারে। সম্পদ অর্জিত না হলে, তার প্রতি বোধ হয় কোনও মমত্ব জন্মে না। তদুপরি তখন তাদের অদ্যভক্ষ্যোধনুর্গুণঃ অবস্থা। বিষয়সম্পদ থেকে সঞ্চয় করে রাখার কথা কোনওদিন ভাবেন নি। পিতৃপুরুষের সম্পত্তির মারফত কখনও দীয়তাং ভুজ্যতাং, কখনও বা গয়ং গচ্ছ দিন যাপন। একসময় চাকর, দাস, দাসী, মোচ্ছব। এখন বাসন বিক্রি করে খাওয়া। ক্রমশ বাসনকোসন শেষ তো অন্যান্য মহার্ঘ বস্তু, সোনারূপার অলংকার, রুপোর গ্লাস, সোনার থালা, রুপোর থালা, পুরোনো স্বর্ণ এবং রৌপ্য মুদ্রা—সব বিক্রি, বিক্রি আর বিক্রি। সর্বশেষ পিতামহ ঠাকুরের খেয়ালি সন্নেসীপনার সম্পদ, সে এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড। কী, না তার গুরুদেব শ্রীমৎ প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের নাতিক্ষুদ্র সোনায় বাঁধানো ফোটো ফ্রেমের সোনাটুকু নরুণ দিয়ে চেঁছে চটিয়ে তাও বিক্রি করে পেটভরা। সবই অবশ্য জলের দামে। কারণ আভিজাত্য যায়নি। বাবুরা কি এইসব ছাইছাতা নিয়ে বাজারে বিক্রি করতে যেতে পারেন? বাবুদের অবশ্য কাণ্ডজ্ঞানও নেই, কি বস্তুর কি মূল্য। অতএব চাকরেরা বিক্রিবাটা করে যা এনে দেয় তাই সই। বেচা কেনার 'কামডা' 'নিতান্তই' 'ছোডোলোকের কাম' ওয়া বাবুরা কহনও পারে?

এইসব কার্যকলাপের মধ্যেও বাঙ্গাল সামন্ত চরিত্রের কিছু বিশেষ ভাব প্রকটন। একটি কাহিনী বললে বিষয়টির স্বরূপ বোঝা যাবে। বাড়ির তখনকার একমাত্র চাকর ফটিককে গঞ্জে পঠিয়েছিলেন বাবা একখানা বেশ বড়সড় রুপোর থালা বিক্রি করার জন্য। সে ফিরে এসে তাঁকে দিল একশ কুড়ি টাকা। তখনকার বাজারে আমাদের প্রায় তিনমাসের সমস্যার সমাধান। বাবা খুশি। এদিকে তাঁর এক জিমন্যাস্ট শিষ্য নারায়ণ ঠাকুর, ফটিকের পশ্চাদনুসরণে প্রকৃত মূল্য জেনে আসেন। নারায়ণ ঠাকুরের বরাবরই একটু চোর ধরার বাতিক। তিনি এসে জেঠামশায়ের দরবারে নালিশ রুজু করলেন। অপরাধ হাতেনাতে প্রমাণিত। নারায়ণ ঠাকুর জেঠামশায়ের সামনেই ফটিককে মারলেন পেল্লায় এক 'থাবড়া'। ঘটনাটি ঘটেছিল সন্ধের খানিকটা পর। জেঠামশাই তখন তার দোতলার শয্যাগৃহে। প্রহৃত ফটিক বিকট চিৎকারে কান্না জুড়ে দিল। বাবা থাকতেন নীচের তলায়। ফটিকের কান্না এবং নারায়ণ ঠাকুরের চেঁচামেচি শুনে, একখানা লাঠি হাতে দোতলায় উঠে এসে নারায়ণ ঠাকুরকে আপদমস্তক পেটালেন। নারায়ণ ঠাকুর যতই তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করেন, ততই তিনি তাঁকে পেটান আর বলেন, তুই আমাগো চাকরের গায় হাত দিলি কোন সাহসে? তুই জাননা চাকররে মারা আর বাবুগো মারা একই কথা? ও যে চোর, হেয়া তুই আমারে কবি আর আমি জানুম? আমি জানিনা যে ওর তিন পুরুষ এ বাড়ির থিকা চুরি করইয়াই বাচইয়া আছে? ইত্যাদি। এমত সামন্ত আভিজাত্য আর খুব একটা দেখিনি কখনও।

এভাবেই বাড়ির জৌলুস আস্তে আস্তে শেষ হতে লাগল। বাসনপত্তর, সোনাদানা দিয়ে শুরু হয়ে ক্রমশ তা ঢেঁকিঘর, গোলাঘর, গোয়ালঘর, 'বৌখ্‌না' ঘর এবং বৈঠকখানা

ঘরগুলোর টিন, কাঠ, চেয়ার, টেবিল, দেরাজ, তক্তপোশ ইত্যাদিতে পৌঁছোল। কর্তারা তখনও কর্মক্ষম পুরুষ, কিন্তু কর্মে আগ্রহ নেই। জেঠামশাই-এর যাও আছে, বাবা এ বিষয়ে একেবারেই শুদ্ধ, বুদ্ধ, নিত্য ও মুক্ত, সাংখ্যের পুরুষ। বাস্তব বিচারে অপদার্থ। তফাৎ শুধু এই সাংখ্যের পুরুষের ভক্ষণ, মলমূত্রাদি বর্জন ইত্যাকার কর্মও নেই, বাবা, এখানকার ভাষাবিন্যাসে বলতে গেলে আগে হাগতেন বাইরে, এখন ঘরে। প্রায় সেই সাংখ্য পুরুষের স্তরেই উঠে গেছেন। তবে ঝাপট লাগছে তাঁর প্রকৃতির গায়ে, কেননা প্রকৃতিকে তো অনেকগুলো মুখে অন্ন জোগাতে হয়। অতএব প্রকৃতি ঐ দর্শনের তত্ত্বানুযায়ীই প্রায় সদা চঞ্চলা, সদা বিঘূর্ণিতা। ঘূর্ণনের কেন্দ্রের পুরুষ স্থিতাবস্থায়।

বাড়িটি ছিল পূর্বদীঘল বা সূর্যদীঘল। আমাদের বাড়িতে দুটি সুদৃশ্য বৈঠকখানা ঘর ছিল। বাড়ির বিস্তীর্ণ প্রলম্ব সোপানগুলি বেশ খানিকটা উঁচু থেকে উঠোন অবধি নামলে, উঠোনের ব্যাপক ব্যাপ্তি। তারপর একটি নাতি প্রশস্ত পথ। সামনের দিকে বেশ খানিকটা এগোলে দুই ধাপের সিঁড়ির সংযুক্তিতে প্রথম বৈঠকখানা ঘরটি। আমরা বলতাম লামার বৈঠকখানা বা ছোট বৈঠকখানা। লামার বৈঠকখানার অর্থ হচ্ছে নীচের বৈঠকখানা। অর্থাৎ এর পরে আরেকটি বৈঠকখানা আছে, যা, একটু উঁচুতে। ছোট বৈঠকখানা পেরিয়ে দু সিঁড়ি নেমে একটি পাকা সংযুক্তি এবং তারপরই বড় বৈঠকখানা বা আটচালা বৈঠকখানায় উঠবার জন্য তিনটি সিঁড়ি। তার উচ্চতা একটু বেশি। বড় বৈঠকখানা পেরিয়ে তিন সিঁড়ি নেমে, আবার প্রলম্বিত রাস্তা, সোজা প্রায় সিকি মাইল গিয়ে বড় খালের উপর লোহার পুল পর্যন্ত। রাস্তার দুপাশে ক্রমান্বয়ে, ফুলের বাগান, বাগান পেরিয়ে দুপাশে দুটি বৃহৎ জলাশয়, তারপরে বাঁহাতি তিনটি মন্দির এবং তৎসহ ফুলের বাগান এবং নারকেল সুপারির শ্রেণী। মন্দিরের মধ্যে একটি পঞ্চরত্ন। মন্দিরের অভ্যন্তরে তিন ভাই-এর সমাধি—চন্দ্রমোহন, জগৎচন্দ্র এবং গুরুদাস, প্রস্তরফলকে নাম খোদাই করা আছে। আর দুটির একটি জেঠামশাই-এর মা শ্রীমতী কুসুম কুমারী দেবীর সমাধি মন্দির। অপরটি সৌন্দর্য বর্ধনকারী একটি মণ্ডপরচনা অবশ্যই মন্দিরাকৃতির। এরপরই আমাদের প্রশস্ত ঘাটবাঁধানো দিঘি এবং তার পুবপার ঘেঁষে পোস্ট আপিসের বাড়িটি। তারপর পাঠশালা বাড়ি। এরই আশেপাশের প্রত্যন্তে নায়েববাড়ি, কুমোর বাড়ি, ধোপাবাড়ি, নাপিতবাড়ি- এইসব। শুধু ভুঁইমালীরা থাকত বাড়ির পিছনের দক্ষিণ পশ্চিমের এক কোণের দিকে। পিছারার খাল ঘেঁষে। একমাত্র নায়েববাড়ি ছাড়া সব বাড়িগুলোই 'চাকরান্' সূত্রে, অর্থাৎ খানাবাড়ির প্রজা ছিল তারা। কিন্তু এসব কথা আলোচ্য নয়। শুধু বৈঠকখানা দুটির অবস্থান জানানোর জন্য এতসব বলা যা একান্তই বৈঠকখানা বিষয়ক।

আমাদের ছোট বৈঠকখানাটি ছিল বস্তুত একটি যাদুঘর। প্রশস্ত এই বৈঠকখানাটিতে বেশ কিছু তক্তপোশ পাতা থাকত, পুবদক্ষিণ কোণ ঘেঁষে ছিল একটি আরাম কেদারা। এছাড়া দুচারখানা চেয়ার, এসবও ছিল। সবচেয়ে আকর্ষক ছিল ঘরটির দেয়াল। বাড়িটি

ছিল শণের ছাউনি এবং কাঠের ফ্রেমের। কাঠের দেয়ালগুলো জুড়ে অসংখ্য হরিণ আর মোষের শিং। নীচে দেয়াল ঘেঁষে হাতির মাথা, বাঘের মাথা, গণ্ডারের চোয়াল ইত্যাদি। ঘরটিকে প্রায় বেষ্টন করে 'আড়ার' নীচ থেকে ঝোলানো ছিল একটি অজগরের চামড়া। সেটি শুকিয়ে প্রায় কাষ্ঠবৎ হয়ে গিয়েছিল। যে অজগরটির চামড়া এতটা দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ জুড়ে ছিল, জীবিতাবস্থায় সেটি যে কি ভীষণাকৃতির ছিল, তা অনুমান করা অসম্ভব ছিল না। এটির বিষয়ে একটি সুন্দর কিংবদন্তিও ছিল। কিংবদন্তি ছিল মোষ, হরিণ ইত্যাদির শিং এবং অন্যান্য জীবজন্তুর মাথা চামড়া বিষয়েও। সেসব সুন্দরবন আবাদকালের ব্যাপার স্যাপার। বুড়ি পিসিমা বলতেন এসব কিংবদন্তির গল্প। বুড়ির এসব কথা বলার হক ছিল ন'সিকের। কেননা, তিনি জগৎসেনমশায়ের একমাত্র কন্যা। তার জ্ঞানকালেই এ বাড়ির তাবৎ রহট। দীর্ঘজীবনের অধিকারিণী বুড়িপিসিমা, অতএব যা বলতেন তাই আমাদের কাছে ইতিহাস বোধ হত। এর মধ্যে তাঁর বাতেল্লা বাজি একেবারে ছিল না একথা বলব না। তবে তার পরত ভাগ করে একটু ছেনে নিলেই তা দিব্য ইতিহাস হত। বুড়ি বলতেন, এ্যার বেয়াক কিছুই কর্তাগো সোমায়ের জমি হাসিল করনের লইগ্যা। সুন্দইরবনে না আছিল, এমন কোনও জানোয়ার নাই! জমি হাসিল করার সোমায়, আর ঐ শিকার-টিকারে যাইয়া কর্তারা এইসব মারছেন। হেইসব জানোয়ারের মুণ্ড এগুলান। বাড়িতে জগৎসেনমশায়ের দুখানা বৃহৎ তৈলচিত্র ছিল মধ্যের ঘরের সামনের এবং পিছনের দেয়ালে টাঙানো। একখানার অঙ্কন অসম্পূর্ণ ছিল। আর্টিস্ট সম্ভবত ঊনবিংশ শতকের কেউ হবেন। মহাশয়ের প্রতিকৃতির মধ্যে আকর্ষণীয় ছিল তার দীর্ঘ দেহ এবং প্রগাঢ় চক্ষুদুটি, মাথার বিস্তীর্ণ ইন্দ্রলুপ্ত এবং তার চৌহদ্দির সাদা পশমের মতো চুলের আভাস। হাতে একটি ফরসির নল। সধুম আলবোলাটি ঈষৎ দূরে। গায়ে একখানা জামিয়ার। দেখলেই দাম জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে। দেখলেই বোঝা যায় মহাশয় বেশ 'হুনিয়ার' পুরুষ। গৌরকান্তি, উন্নত নাসা, গভীর চক্ষু, দীর্ঘ দেহ রাজবৎ উন্নত মহামহিম পুরুষ। ইনিই আমার প্রপিতামহ জগৎস্যানমশায়। বুড়ি পিসিমার বাবা। কিন্তু ধ্যাৎ, বুড়ি যাই বলুক, এরকম বাপ থাকা খুব ভয়ের কথা। দেখলেই মনে হয়, বকবে। এই তৈলচিত্রটি দেখিয়ে আমাদের বাল্যকালে বুড়ি 'খ্যানে অখ্যানে' আমাদের ভয় দেখাতেন।

তা মহাশয়ের নাকি একটি গাদা বন্দুক ছিল সেই কালে। সেও গল্প কথা। তবে শুধু গাদা বন্দুক দিয়ে যে ছোট বৈঠকখানার ঐসব পশুদের শিকার করা সম্ভব হয়েছিল তা মনে হয়না। কেননা, অন্য পশুদের কথা ছেড়ে দিলেও, ঐ হাতি, বাঘ আর যেসব মহিষের মাথাগুলো শিং সহ ওখানে ঝোলানো ছিল তা শিকার করা এক অসম্ভব ব্যাপার। তা সেই গাদা বন্দুক নাকি আবার জ্ঞাতি ভাই চৌধুরীরা কায়দা করে মহাশয়ের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিল। ছোটবেলা বুড়ির এসব গল্প শুনে মহাশয়ের বীরত্ব বিষয়ে আমরা খুবই সন্দিহান হয়ে পড়তাম এবং ঐ সব জন্তু জানোয়ারের নিধন যে তার হাতে হয়েছে এরকম বিশ্বাস কিছুতেই আমাদের মনে আসত না। আবার যখন একটু

বড় হয়ে খানিক জ্ঞানগম্যি হল, তখন সুন্দরবন আবাদকালে, সে স্থানে হস্তীশিকার বিষয়টাও যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য বলে বোধ হয়নি। কিন্তু অজগরের ব্যাপারটি অবিশ্বাস করার মতো ছিল না। বুড়ি এ বিষয়ে যে গল্পটি বলতেন, তা আক্ষরিক সত্য না হলেও, ঐতিহাসিক ঘটনা হবার জন্য আঠেরো আনা হক্‌দারির অধিকারী। কারণ, ঐ অজগরের বিশালকায় শরীরটি না দেখলেও, তার চামড়ার দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেধ আমরা সম্যক দেখেছি এবং তা তার দেহান্তের প্রায় শতবর্ষ পরের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে। তাতেই যা বোঝা গেছে কিংবদন্তিটি সে তুলনায় খুব একটা বাতেল্লা নয়। বরং আরও খানিকটা হলেও কিছু অন্যায় হত না। সে যাক্, বুড়ি বলেছিলেন যে, সুন্দরবন আবাদ কালে যে কাঠুরিয়ারা সেখানের বিশাল সুন্দরী, গরাণ, গেউয়া এইসব গাছ কাটত, তারা মাঝে মাঝেই ক্লান্তি অপনোদনের জন্য ঐ গাছগুলোর উপর বসেই তামাক-টামাক খেত। তারা গাছ কাটতে যাবার সময় দিনের পর দিন জঙ্গলে থাকত বলে, গন্ধককাঠি, আগুনের তাওয়া, তুষ, তামাক, হুঁকো কলকে এইসব জিনিসপত্র নিয়েই সেখানে যেত। আবাদিত স্থানগুলিতে, যেখানে দু-এক ঘর বসতি হত, সেখানে তাদের থাকা খাওয়ার স্থান নির্দিষ্ট থাকত। সুন্দরবনে তখন অসম্ভব বাঘ, সাপ এবং অন্যান্য হিংস্র জন্তুর প্রাদুর্ভাব। একারণে যে জমিদার বা তালুকদারের হয়ে তারা কাজ করত, তাদের এক সশস্ত্র বাহিনী এদের পাহারা দিত। সশস্ত্র বলতে, তারা ছিল তিরন্দাজ, বল্লমধারী পাইক। এরাই সব পশুগুলোকে শিকার করত।

তা একবার নাকি কাঠুরেরা, একটা জায়গায় বিশ্রাম এবং তামাক খাওয়ার প্রয়োজনে একটা বড় গাছের গুঁড়ির উপর বসে অনেকক্ষণ ধরে গালগল্প করছিল। তামাক পুড়ে গেলে, কেউ একজন কলকের আগুন ঠুকেঠুকে সেই গাছটির উপর ফেলছিল এবং আবার তামাক সাজাচ্ছিল! এইসব কৃৎকর্মের মধ্যে হঠাৎ গাছটা নড়ে ওঠে। কাঠুরেরা দেখে যে ওটা আসলে গাছ নয়, একটা অজগরের শরীর। তখন তারা কুড়ুল দিয়ে নাকি আগা ল্যাজা কেটে সেটাকে মারে। সেই অজগরের চামড়াই ছোট বৈঠকখানার ঝালর সদৃশ চামড়াটি।

সব বেচে খাওয়ার দিনগুলোতে দেখা গেল, এসবেরও খদ্দের আছে এবং এইসব হরিণের শিং, মোষের শিং, হাতির দাঁত বাঘের চামড়া, হরিণের চামড়া, সব কিছুই জলের দামে বিকিয়ে যায়। এই বস্তুগুলো এতদিন ছোট বৈঠকখানার সৌষ্ঠব বাড়িয়েই রেখেছিল শুধু। তা বর্তমান কর্তাদের অভ্যেসেই ছিল, নজরে ছিল না। এই ঘরটি ব্যবহৃত হত প্রধানত ছোটবাবু মানে বাবার বৈঠকখানা ঘর হিসেবে। এখানে তিনি তাঁর লোকজনদের নিয়ে বসতেন। একসময় বাড়ির বয়ঃসন্ধি অতিক্রান্ত ছেলেরা এটিকে ব্যবহার করত তাদের 'ডরমিটরি' হিসেবে। রাতে ঘুমোবার ব্যবস্থাও তাদের এখানেই। এখন এর অভ্যন্তরের সামগ্রী এবং গড়নের কাঠকুটো বিক্রি হচ্ছে। তক্তপোশ, আরামকেদারা, সাধারণ বেঞ্চি চেয়ারগুলোও বিক্রি হচ্ছে। একটা গোল মেহ্গনির টেবিল ছিল। ছোটখাটো সভার আয়োজনে এখানে আসর বসলে নগেনমশাইকে এই

টেবিলের উপর বাঁহাত রেখে আমি বক্তৃতা করতে শুনেছি। তখন আমি খুবই ছোট। তবে মনে আছে, এই টেবিলটির উপর পাশার ছক্ রেখে বিরাজদাদু এবং বাবা, যাঁরা সম্পর্কে খুড়ো ভাইপো, পাশা খেলতেন, অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত কয়েকবার কচ্ছয়—বারো, পোয়াবারো-তেরো ইত্যাদি করতেন। তামা, কাঁসা, পিতল, সোনাদানা শেষ হলে এখন সেসব বিক্রি হতে লাগল। ছোট বৈঠকখানার সরঞ্জামগুলোর মধ্যে একটি অদ্ভুত জিনিস ছিল। সেটি হল সুদৃশ্য একপাটি পাম্প 'শু'। তার মাপ সওয়া হাত। সেটিও 'আড়ার' পাড়ের সাথে ঝোলানো থাকত। বুড়ি পিসিমাকে একদা এর ব্যবহারের বিষয় জিজ্ঞেস করলে, বুড়ি বলেছিলেন, ওয়ার আর ব্যবহার নাই। এককালে কত্তারা 'আনাড়া' পেরজাগো শায়েস্তা করতেন ঐ জোতা দিয়া। এহন তো আর হেদিন নাই, খালি জোতাহান ঝোল্‌তে আছে। আমাদের বাড়িতেও যে এরকম 'জোতার' ব্যবহার হত আগে জানতাম না। আমরা ছোটবেলা থেকে চৌধুরী বাড়ির বিষয়ে শুনতাম তাঁরা ছিলেন প্রবল অত্যাচারী। তাঁদের বাড়ির সামনা থেকে কেউ জুতো পায়ে বা ছাতা মাথায় দিয়ে গেলে তাঁরা প্রচণ্ড শাস্তির বিধান করতেন তাদের। কেননা, এটা তাঁদের মতে নিতান্তই বেয়াদপি-কাণ্ড। প্রসঙ্গত বলি, সম্প্রতি ঐ বংশের একজনের সাথে, তাদের পরিবার বিষয়ে কথা বলতে গেলে ভদ্রলোক বলেছিলেন, দেখুন, ঐ বাড়ির বিষয়ে আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। আমি এখন একজন রেলের সাধারণ শ্রমিক। আমি আমার ঠাকুর্দা মশাই-এর পরিচয়ে পরিচিত হতে চাই না। আমি জানি, তিনি শেষ পর্যন্ত কিভাবে মরেছেন, কিন্তু তা তাঁর প্রাপ্য ছিল। আমাকে কিছু বলবেন না। আমি সবই জানি। ভদ্রলোক আমাকে অনেক কথাই বলেছিলেন, বলার সময় তিনি স্পর্শকাতরতার জন্য কেঁদেও ফেলেছিলেন। এই চৌধুরীরা প্রকৃতই অত্যাচারী ছিলেন এবং ভদ্রলোক তাঁর যে ঠাকুর্দার কথা বললেন, তিনি শেষ পর্যন্ত যে ওখানে ভিক্ষাবৃত্তিতে জীবনপাত করেছেন, তা আমি দেখেছি।

বড় বৈঠকখানা ঘরটি ছিল বর্গাকৃতি এক আটচালা কাষ্ঠ-মণ্ডপ। তার অর্ধেক অংশে একটি এপ্রান্ত-ওপ্রান্ত জোড়া মঞ্চ, থিয়েটারের। বাড়ির ছোট কর্তা থিয়েটারের ব্যাপারে উৎসাহী। নিজে অভিনয়াদি করেন। তাঁর এ ব্যাপারে খ্যাতি ছিল খুবই। এক আধবার নাকি স্টার থিয়েটারে শিশির ভাদুড়ীর সঙ্গে সীতা না কি নাটকে অভিনয় করে নামও করেছিলেন। কিন্তু জেঠামশাই জানতে পেরে কান ধরে বাড়িতে এনে বলেছিলেন, স্টেইজ বানাইয়া দিতে আছি, যা করার বাড়িতেই কর। চরিত্তিরডা খারাপ করইয়া বংশের নাম ডুবাইওনা। তখনকার দিনে পাবলিক থিয়েটারে অভিনয় করলে নাকি 'চরিত্তির' একেবারে নষ্ট হয়ে যেত। কেননা সেখানে স্ত্রীচরিত্রে 'মাগীরা' অভিনয়াদি করত। আমাদের বাড়ির স্টেজে কখনও স্ত্রীচরিত্রে মেয়েরা অভিনয় করেনি। 'সিরাজদ্দৌল্লা' নাটকে আলেয়া, লুৎফাদের দিব্য পুরুষ্টু গোঁফ ছিল। পার্ট করার সময় তাঁরা তা কামিয়ে নিতেন। সে গল্প পরে বলছি। আসল প্রসঙ্গে আসি। সেই স্টেজ এখন সাধারণ কাঠের দামে বিক্রি হচ্ছে। এভাবে ছোট এবং বড় বৈঠকখানার আসবাব

সব বিক্রি হয়ে গেলেও বৈঠকখানা ঘর দুটি আরও কিছুকাল ছিল। বাষট্টি সালের প্রলয়ংকরী ঝড়ে তা ভেঙে পড়লে তার টিন, কাঠ, তক্তা সব বিক্রি করতে বেশ সুবিধে হল। দুই বৈঠকখানার দুটি ভিত, দুটি বড় চিতার মতো বাড়ির সামনেটায় দিনরাত খাঁ খাঁ করতে লাগল।

আমাদের ওখানের গঞ্জে একটি যাত্রাদল ছিল নাথ কোম্পানি নামে। তার অধিকারী মশাই, নাম গোপাল নাথ, একাধারে ব্যবসায়ী, তার উপর যাত্রার দলের রোজগারে মবলগ দু'পয়সার বড় মানুষ। তখনকার দিনে পুববাংলায় তাবৎ নায়েক বন্ধুরা তাঁর গুণগ্রাহী এবং অনুগ্রহভাজন ছিলেন। গোপাল নাথ জানতেন যে আমাদের বাড়িতে থিয়েটারের নানারকম সরঞ্জামাদি আছে। যখন বাড়ির মূল্যবান বাসনপত্র এবং অন্যান্য শৌখিন জিনিসগুলো জলের দরে বিক্রি হচ্ছিল, নাথ মশাই তার অনেক কিছুই কিনে নিয়েছিলেন। নাথমশাই মানুষ বেশ ভালই ছিলেন। আমাদের বাড়িতে অভিনয়কালে, বাবার অনেক অভিনয়ও তিনি করতেন। তাঁর দলের জন্য অভিনেতা নির্বাচন ব্যাপারটি শুনেছি বেশ দক্ষতার সাথেই তিনি করতেন। অভিনেতা নির্বাচনের আগে জেনে নিতেন তারা আমাদের বাড়ির মঞ্চের অভিনয় দেখেছে কিনা।

বাবার অভিনয় আর পাশা খেলার গুরু এবং জ্ঞাতি খুড়ো বিরাজসেন মশাই। আমাদের বিরাজদাদু, এ সময় এই নাথ মশাই-এর কোম্পানিতে পেশাদার অভিনেতা হিসেবে কাজ নেন। বিরাজদাদু তখনকার দিনে সারা বাংলায় একজন নামকরা যাত্রা অভিনেতা। দীর্ঘকায় গ্রীসীয় চেহারার মানুষ। কণ্ঠস্বর যেন নাভি কুণ্ডলী থেকে উঠে সরাসরি মূর্ধাকে আঘাত করে। তাঁরই সুপারিশ ক্রমে নাথ মশাই একদিন বাবার কাছে এলেন, দাদুকে সাথে নিয়েই। বাবা তাকে বিলক্ষণ খাতির মহব্বত করে সৎকার করলে তিনি খুবই বিনয়ের সঙ্গে বললেন যে, যদিও এরকম একটা কথা উত্থাপন করতে তার কুণ্ঠা হচ্ছে, তবু ছোটবাবু যদি তার দলে যোগ দেন তবে তাঁর যোগ্য সাম্মানিক দিতে তিনি কার্পণ্য করবেন না। বিরাজদাদু বললেন, ভাইপো, না করইওনা। আমারে দ্যাহ। কোনও দিন ভাবছেলা যে আমি যাত্রাপালায় অভিনয় বেচুম? দেহ, এহন আমিও হেই কাম করইয়াইতো খাই। তুমিও আয়ো। আর বাড়ির থিয়েটারের সামগ্রীগুলা নাথ মশায়েরে দিয়া দেও। ওয়া আর আমাগো কোনো কামে লাগবে না। নাথ মশায় উপযুক্ত মূল্য দিয়াই নেবেন। স্টেইজ ক্র্যাফটগুলা অকারণ নষ্ট অইতাছে। ওগুলাও দিয়া দেও। ওনার ব্যবসা আছে এসবের।

বাবা, তাঁর খুড়োর দিকে সেদিন কিভাবে, এই কথার পর, তাকিয়ে ছিলেন, খেয়াল করে দেখিনি। এসব ভাঙনের দৃশ্য দেখে বোঝার বয়স, সে নয়। পরে নানান কথাবার্তা স্মৃতি রোমন্থন ইত্যাকার ঘটনায় বুঝেছিলাম তাঁর সেদিনের অনুভূতি। বিশেষত, মায়ের কাছে এই দুই অভিনেতার অনেক গল্প শুনে শুনেও একটা ধারণা জন্মে গিয়েছিল। তাই এসব কথা এখন লিখতে পারছি। বিরাজ দাদু বলেছিলেন, ভাইস্তা, তোমারে আমি আর কি কমু। আমার বুকটাও তো ফাডইয়া যায়। এই স্টেইজ, এইসব সীন্

তুমি আর আমি কত মেহন্নত করইয়াই না বানাইছিলাম। আর আইজ দ্যাহ, তোমার গুরু অইয়াও আমিই তোমারে কইতে আছি যে এগুলা এহন জঞ্জাল। এগুলা বেচইয়া দেও। ভাইস্তা, অন্নঃ ব্রহ্ম ইতি। এইডাই শ্যাস কথা জানবা। 'অন্নাধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।/অন্নরূপামৃতম্‌যস্তিভাতি।/ওঁ অন্নঃ ইতিব্রহ্মঃ।' বাবা বলেছিলেন, সবতো বোজলাম, তয় দাদার ধারে না জিগাইয়া তো কিছু করতে পারি না। এ কথায় খুড়া ক্রুদ্ধ হন। বলেন, তোমার দাদায় করবে কাফা। হে ট্যাহে ট্যাহা বান্দুক তুমি গুষ্টি লইয়া মর। বাবা বলেন, খুড়ো তুমি চেত্‌ইও না। আমারে তো জানো। দাদায় কইলে, আগুনেও ঝাপ দিমু, কিন্তু হ্যার অবাইধ্য হইতে পারমু না। তয় থিয়েটারের সরঞ্জাম আমার নিজস্ব ব্যাপার। নাথ মশায়রে হেয়া আমি এহনই দিয়া দিতাছি। পয়সার লইগ্যা না। পয়সা উনি না দিলেও চলবে। উনি নাটকের আদর করেন এইডাই বড় কথা। ওনার সোমায়মত লোক পাডাইয়া, উনি য্যান বেয়াক লইয়া যায়েন।

গোপাল নাথ, এতক্ষণ কোনও কথাই বলেন নি। শুধু খুড়ো ভাইপোর হা হুতাশ শুনছিলেন। এখন বললেন, ছোডোবাবু, আমি আপনেরে জোড়হাত করইয়া নিবেদন জানাইয়া গেলাম, আপনে যদি আমার দলে আয়েন, হেডা আমার ভাইগ্য বলইয়া জানুম। বাবা বললেন, দেহি দাদায় কি কয়। নাথ মশাই বললেন, জিনিসগুলা ফডিক রে দিয়া পাডাইবেন। উপযুক্ত মূল্য দিতে আমি কসুর করুম না। এইভাবে থিয়েটারের সরঞ্জামগুলো চলে গেল। এর অনেক আগেই বিভিন্ন সীনগুলো কেটে মা আমাদের ইজের ইত্যাদি তৈরি করে দিতেন। তালুক থাকা অবস্থায়ও আমরা কোনদিন ভাল জামা কাপড় পরেছি এরকম স্মৃতি নেই। একবার পুজোর সময় শুধু নায়েব মশাই পুজোর নানাবিধ বাজার করার সাথে আমাদের জন্য ছিট কাপড়ের নতুন জামা ইজের কিনে এনেছিলেন। এখনও সে স্মৃতি বেশ জ্বলজ্বল করছে। কেননা সেই জামা এবং ইজেরের ভাঁজের ধুলোর দাগগুলো না ছেঁড়া অবধি বহাল ছিল। এ কারণে সীনের জামাকাপড় বহু আগে থেকেই আমরা পরতে অভ্যস্ত ছিলাম। এবিষয়ে ক্রমশ আরও বিশদ হব। এখন বিরাজ দাদুর আর তার ভাইস্তার অভিনয় জীবনের কথা বলি।

এই খুড়া ভাইস্তার ব্যাপারটা জেঠামশায়ের ততদিনই পছন্দের ছিল, যতদিন তাঁরা বাড়ির স্টেজকে আশ্রয় করে অভিনয়াদি করতেন। তখন জেঠামশাই নাকি তাঁদের যথেষ্ট মদতও করতেন। বাড়িতে তখন প্রায়শই নাটক হত। এসব গল্প শুনেছি সেই জান্‌দা বা জানকীনাথের কাছে। মা অথবা পাড়ার বয়স্ক-বয়স্কাদের কাছেও অনেক শুনেছি। তাছাড়া বাড়িতে অভিনীত সেইসব নাটক একসময় পড়েওছি। উত্তরা, সিরাজদ্দৌল্লা, মীরকাসিম, বঙ্গে বর্গী, মেবার পতন, শাহ্‌জাহান, কঙ্কাবতীর ঘাট, চণ্ডীদাস, পল্লীসমাজ এবং অনুরূপ হাজারো নাটক এখানে অভিনীত হয়েছে এবং এই খুড়া ভাইস্তা সেসব নাটকের মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন। আগেই বলেছি, গ্রামের অন্য একটি বাড়িতেও একটি মঞ্চ ছিল এবং সেখানেও এঁরাই সবাই অভিনয় করতেন। জান্‌দা বলত, বোজলানি, উনি যহন সীতা নাটকে রাবন সাজইয়া সীতা হরণের লইগ্যা তারে কান্ধে উডাইয়া লইতেন, মেয়ারা কইতো হালায়

হুদা রাবণ। নাইলে অতবড় এট্টা ছ্যামড়ারে ঐরহম কান্ধে উঙাইয়া লওন যায়? প্রসঙ্গত, সীতার অভিনয় যিনি করতেন তিনি কখনই 'ছেমড়ী' ছিলেন না। তখন তাবৎ মহিলা চরিত্রে 'ছ্যামড়ারাই' ছেমড়ীর ভূমিকায় অভিনয়াদি করতেন।

বিরাজদাদুর মদ্যপানে একটু অতিরিক্ত আসক্তি ছিল। গলায় একঢোঁক না নিলে তাঁর 'পাট' খুলত না। যখনই কোনও অভিনয়াদির ব্যাপার থাকত, বাবা নাকি 'জান্‌দাকে' গঞ্জে পাঠিয়ে খুড়োর ব্যবস্থাদির বিষয়ে মনোযোগী হতেন। জান্‌দার কাছে জেনেছি যে মেথর বাড়ি থেকে একবোতল মদ ঐসব দিনে নাকি প্রায়ই তাঁকে এনে দিতে হত। আমাদের ওখানে মদের প্রচলন খুব একটা ছিল না। যাঁরা খেতেন তাঁরা মেথরবাড়ির 'দেশি' কোহলেই তেষ্টা মেটাতেন। কিন্তু বিরাজদাদুর নাকি ঢোঁক মানেই গেলাস, এরকম এক অভ্যেস ছিল। অভিনয়াদির সময় একারণে বিভ্রাট হত খুব। বাবার কাছেই শুনেছি, উত্তরা নাটক হচ্ছে, বাবা ঘটোৎকচ, দাদু অর্জুন। বাবা বলতেন, কিসের ছাতার ঘটোৎকচ আর কিসের অর্জুন। খুড়া তহন আমার মদে টং। হে দেহি, বেয়াক আমার পাট কয়। আমি ফিস্ ফিস্ করইয়া কই খুড়া, ও পাট আমার, ওয়া আপনে কইবেন না। আপনে তো অর্জুন, আমার খুল্লতাত। মধ্যম পাণ্ডবপুত্র আমি ঘটোৎকচ। হেয়া কেডা শোনে কার কথা। খুড়ায় খালি ধাবার দে আর কয়, চোপড়াও বেয়াদব, বাইরেও তুই আমার ভাইস্তা, থিয়েটারেও তুই আমার ভাইস্তা। তুই আমারে শেখাবি? তো এই যহন অবস্থা, বাইরে হৈ চৈ। কি? না খুড়ায় খ্যাপছে। খুড়ায় খ্যাপছে না ঐরাবত খ্যাপছে। ফেলা ফেলা ড্রপ ফেলা, ক্যালেঙ্কারীর একশ্যাষ। নাইলে বেয়াক মাডি। তখন ড্রপ ফেলে মুখরক্ষা। বেশ খানিকক্ষণ বাদে খুড়োকে টকদই এটা ওটা খাইয়ে আবার নাটকের শুরু।

এই গল্প শুধু নাটক, অভিনয় বিষয়ে নয়, এ গল্প ফেঁদেছি বড় বৈঠকখানার তাবৎ কথা বলার জন্য। এর বেশিটাই মায়ের কাছে শোনা। এইসব অভিনয় কথা, বড় বৈঠকখানার আনুষঙ্গিক গল্প ইত্যাদির তাবৎ ভাণ্ডার ছিল তাঁর কাছে। ভাণ্ডার বলতে বেশ কয়েকটা সিন্দুক যেন তাঁর নিজস্ব দখলেই ছিল। তাঁর এই দখলদারির বা মালিকানার কারণও ছিল বেশ পোক্ত। বাড়ির ছোট বৌ বা সোনা বৌ হওয়ার সুবাদে, গেরস্থালি পরিচালনায়, অন্দরমহলে তিনিই ছিলেন একচ্ছত্র কর্ত্রী। বড় এবং ছোট বৈঠকখানা থেকে হামেশা চিরকুট আসত কর্তাদের। বেণুর মা, অদ্য জনা দশেক বিশিষ্ট অতিথি এই বাটিতে মধ্যাহ্নভোজন করিবেন। বিপিনকে দিয়া রণমতির বাজার হইতে আবশ্যকীয় ভোজ্যাদির সরঞ্জাম আনাইয়া লওয়া যাইতে পারে। নায়েবের নিকট হইতে পয়সা নিয়া বিপিনকে দিয়া আনাইয়া লওয়া হউক। মহাশয়েরা বড়ই মাইন্যমান। অতএব রন্ধন উত্তম হওয়া আবশ্যক। আপাতত, শ্বেত পাথরের গেলাস এবং পিরিচে দধির সরবৎ ও কিঞ্চিৎ উত্তম মিষ্টান্ন পাঠানো আবশ্যক হয়।—এরকম চিরকুট বৈঠকখানা ঘর থেকে তখনকার দিনে অন্তত বেশ কয়েকবার আসত। মা-ও বিনা বাক্যব্যয়ে, সেসব সরবরাহ করতেন।

মা বলতেন, হে এক উদ্‌বাগ। কত যে মানুষ তোগো এই বড় বৈঠকখানায় আইতো হেয়ার শ্যাষ নাই। খালি এক জোনেরই দেখছেলাম বৈঠকখানায় ঢোকেন নাই। বড়খাল

পাড়ের বড় রেন্ট্রি গাছটার তলায় হেবার হেনায় আর হ্যার ভোলান্টিয়াররা সভা করইয়া গেলেন। খাওন দাওন আপ্যায়ন বেয়াকই হেহানে অইলে। তিনি নাকি সুভাষচন্দ্র। তার আগমন এবং সভাকরণ বিষয়ে বাবা নাকি স্বয়ং খুবই উদ্যোগী ছিলেন। ডাক্তার জেঠা বলেছিলেন, তোমার বাবায় আর সুভাষ বাবু পাশাপাশি বইছেলেন। হেয়ার ছবিও আছিল। যাহোক, সে ছবি আমি দেখিনি। মা নাকি তখন অসামান্য সব খাবারদাবার তৈরি করে তাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেছিলেন। পরবর্তীকালে কিছু অসামান্য চীনেমাটির পেয়ালা পিরিচ মায়ের আলমারিতে দেখেছি। সুবজাভ রঙ, মা বলতেন—এগুলা, ঐ যহন সুভাষবাবু আইছেলেন তহন আমি কেনাইছিলাম। আশ্চর্য! মায়েরা কোনওদিন ভদ্রলোককে নেতাজী বলতেন না। বলতেন, সুভাষবাবু, সতীন সেন মশাইকে বলতেন, সতীনদায়, শৈলেন দাশগুপ্তকে বলতেন বেচউয়া, মা তাঁর মাসিমা ছিলেন।

মায়ের মিষ্টান্ন সরবরাহক ছিল আমাদের ফটিক দাসের বাবা শশী দাস। তার ছিল একটা বিস্কুটের 'তাবাল'। আর সেই তাবালের পাশের চুলোয় রসগোল্লার রস সহযোগে মোদকের সামগ্রী বানাত। শশী দাসের রসগোল্লার চাঙাড়ি আর বিস্কুটের তাবাল ছিল মায়ের অতিথি সৎকারের ভাণ্ডার। সেখানে মাসকাবারি ব্যবস্থা ছিল তাঁর। কেউ গিয়ে বললেই হল। শশী দাস বলত, 'রসগোল্লা ট্যাহায় ষোলডা। একটা একপয়সা। য্যার নেতে অয়, নেও, না নেতে অয়, নৈকাড়ির হাডে যাইয়া হোগামারাইয়া দু পয়সায় কেন এহেকটা। খাইয়া দ্যাখফা কেমন লাগে। হোগামারন ডুক ফাউ। হোগামারান বলতে এক্ষেত্রে ঐ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করা বুঝতে হবে। অসভ্য অর্থে নয়। সে যা হোক, শশী দাসের বাণিজ্য রীতিটি ছিল এরকম। শুধু মায়ের ব্যাপারে তার রীতকানুন ছিল আলাদা। বলত, সোনাঠাইরেণের ব্যাপার আলাক। হেনায় যদি চায়েন এককুড়ি রসগোল্লা, মুই দিমু দুকুড়ি। জানিতো, লাগবে হ্যানে। আর মোর পয়সারও চিন্তা নাই। পোলা দুইডারে তো হেনার ধারেই দিয়া দিচ্ছি। সে পোলাদের কথা পরে বলা যাবে। এখন মায়ের অন্য বিত্তান্ত বলি।

মা বলতেন, স্বদেশি যুগে এবং দেশভাগের পরেও তাবড় তাবড় নেতারা নাকি বাড়িতে আসতেন, আর এই রকম চিরকুট আসত বৈঠকখানা থেকে। এর মধ্যে শুধু সতীন দাদাই অন্দরে আসতেন। বৌমাদের খবর কবতেন। বাকিরা বাইরে থিহা আইতেন, বাইরে থিহা যাইতেন। মা চিরকুট অনুযায়ী খাবারদাবারের ব্যবস্থা করতেন। তখন মহালের আয় ছিল অসুমার। কোনও কিছুই অপ্রতুল নয়। দুপুরের রান্নার বাড়তি ভাত পিছারার পুহইরে ঢালইয়া দেত ঝি মাথারীরা, মাছেগো খাওনের লইগ্যা। পাড়া প্রতিবেশীরা বলত যে মা লক্ষ্মীর এরকম অসম্মান তিনি সহ্য করবেন না। তখন বাজার সরকার মোটা পেতলে বাঁধানো তেল চকচকে বাঁশের লাঠি হাতে এব্‌লা ওব্‌লা আসত বাড়ির তেল মশ্‌লা সরবরাহ করতে। রান্নার মশলাপত্তর, তেল এই সব জোগান দিত সে। জান্‌দার কাছে শুনেছি যে একবার নাকি সে তার লাঠিখানা দেখতে চেয়েছিল। কিন্তু তেল সরকার তা দেখতে দিতে চায়নি বলে জান্‌দা লাঠিখানা নিয়ে টানাটানি শুরু করে। তার বোধ হয় কোনও সন্দেহ হয়ে

থাকবে। এক সময় লাঠির মাথার পেতলের মুখটিটি খুলে যায় এবং প্রায় সের তিনেক তেল ভলকে ভলকে বেরিয়ে পড়ে। সরকার অপ্রস্তুত। জান্‌দাকে আড়ালে নিয়ে তখন তার আবেদন, ক্যারুরে কিছু কইও না।

পিছনে পিছারার খাল, সামনে বড় খাল। বড়খালের উপর যে পুলটি (পুল মানে এখানে ব্রিজ ধরতে হবে) সেটি আমাদের খানাবাড়ির জমির শেষ প্রান্ত। বড় খালের উপর দেহ এলিয়ে সেই বৃহৎ রেন্ট্রি, আর তার তীর থেকে খানিক প্রশস্তে আরেকটি। পুল পেরিয়ে রাস্তাটি ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা। আমাদের রায়বাহাদুর ঠাকুবদা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের একজন মেম্বারও ছিলেন একসময়। তাঁরই দৌলতে ঐ রাস্তাটি হয়েছিল, যার দীর্ঘতা গঞ্জ অবধি। রাস্তাটি বিখ্যাত, কিন্তু কাঁচা, তাহলেও সভ্যতা থেকে তিনমাইল যোগাযোগ রক্ষাকারী একটি সুউচ্চ মৃন্ময় রাস্তাও সেযুগে কিছু ফেলনা ব্যাপার নয়। আর বড় খালপারের সেই মহাবৃক্ষ দম্পতির গভীর মাহাত্ম্য তো আছেই।

তবে আমার স্মৃতিতে রাস্তার মাহাত্ম্য অনেক হলেও রেন্ট্রি গাছ দুটির উপস্থিতির প্রগাঢ়তা অনেক বেশি। বড় বৈঠকখানা, দিঘি, পুকুর দুটি, পোস্টাপিসের বাড়িটি এবং লোহার পুলটি আমার কাছে অনেক গভীর বার্তাবহ। আমরা বলতাম 'পোলকাটা' অর্থাৎ পোলঘাটা। এখানে এককালে একটি কাঠের ঘাট তৈরি করা হয়েছিল, পুলটির ঠিক গায়ে। ঐ যেবার সুভাষবাবু আইলেন, হেইবার করা অইছেলে। বিধুমুখী ল্যান্ডিং ঘাট। ঐ ঘাট দিয়েই নাকি মহাশয় অবতরণ করেছিলেন লঞ্চ থেকে। বিধুমুখী আমার বাবা, জেঠামশাই-এর ঠাকুমা অর্থাৎ জগৎসেন মশায়ের বিধবা। এই রেন্ট্রির তলায়ই মায়েদের সুভাষবাবুর সভা হয়েছিল। আমি সেসব গল্প শুনেছি, দেখিনি। কিন্তু সে আমার অনুষঙ্গ নয়। আমার অনুষঙ্গ হচ্ছে, আমাদের বড় বৈঠকখানা থেকে শুরু করে এই 'পোলঘাটার' রেন্ট্রির তলা পর্যন্ত যে সব লোকাচরণ এবং লোকানুষ্ঠানগুলো হয়েছে সেই সব। তার সাথে অবশ্যই এর বিপরীতকল্প ঘটনার স্মৃতিমন্থন, যা আমাদের হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সমাজের শিকড়ে বিষ প্রয়োগ করেছিল এবং যে বিষের জ্বালায় আজও আমরা সবাই জ্বলছি, জ্বলছি এই উপমহাদেশ জুড়েই। আমার আজও কেন যেন মনে হয় ঐ বৃক্ষ দুটিই আমার পিছারার খালের জগতে পিতামহ এবং পিতামহী এবং তা সম্প্রদায় নির্বিশেষেরই, আর আমরা যেন তাদের নির্দেশ কখনওই মানিনি বলে আজ এই অন্ধকারে।

এইখানের এই রেন্ট্রিগাছের নীচে, দেশভাগ এবং দাঙ্গার পরেও, যখন পাকিস্তান তার প্রতাপে প্রায় উগ্রচণ্ড, তখনও বিজয়া দশমীর মেলায় হিন্দু এবং মুসলমান অপবর্ণীয় বা বর্গীয় মানুষদের আপোশে ছোরাখেলা, লাঠিখেলা দেখেছি। আমাদের বড় বৈঠকখানার সিঁড়ি পেরিয়ে দুপাশের গোলাপ বাগান ছাড়িয়ে, তারপর ডানবাঁয়ে দুটি বড় পুকুরের মাঝখান দিয়ে আরও এগিয়ে এসে দিঘির ঘাট্‌লা বাঁয়ে রেখে প্রায় সিকিমাইল বিস্তৃতিতে ব্যাপক মানুষের মেলা দেখেছি, যারা ভিন্ন ধর্মী হয়েও নিতান্ত স্বজনের একাত্মতায় সেখানে মিলেছে। সেখানে রাতের পত রাত গুণাবিবির গান

হয়েছে। রূপভান কন্যার পালা হয়েছে, রয়ানী, কীর্তন ইত্যাদি কিই বা না-হয়েছে। কিন্তু সেসব এক সময় ঐ পিছারার খালের মতোই যেন শুকিয়ে গেল।

এইসব কথা বলতে গেলে খেই থাকে না। দেখার স্মৃতি শোনার স্মৃতি সব মিলেমিশে এক হয়ে যায়। শুধু জ্বল্‌জ্বল্‌ করে কিছু বিশেষ মুহূর্ত। যেমন আমাদের শেষ সামন্তক্ষণের বেচা কেনা করে দিন গুজরানের কথা। বাড়ির থিয়েটারের স্টেজ, সেট্‌ সেটিংস্‌, অভিনয়ের পোশাক, অস্ত্রশস্ত্র, পরচুল, দাড়ি এইসব পর্যন্ত বিক্রি হয়ে যাওয়া। সিনসিনারিও দিয়ে আমাদের জামা ইজের তৈরির কথা। সিন্‌সিনারি গুলো, আগে থেকেই এর অন্য ব্যবহার শুরু হওয়ায়, সেগুলো বিক্রি করা হয়নি। ওগুলো যাত্রার অভিনয়ে কাজেও লাগে না। ঐ যে একবার নায়েব মশাই-এর এনে দেওয়া নতুন জামাকাপড় পুজোয় পেয়েছিলাম, স্মৃতিতে নতুন জামাকাপড় সেই প্রথম এবং সেই শেষ। তারপরের স্মৃতিই 'সীন' কাটা ইজের এবং জামা। মা বানাতেন, আমরা পরতাম। কারোর ইজেরের পাছায় মুর্শিদাবাদ প্রাসাদের খানিকটা, কারুর সামনের দিকটায় বর্গিরা ঘোড়সোয়ার হয়ে বল্লম উঁচিয়ে লড়াকু, কারুর জামার পাশে হয়ত একটা মন্দিরের চূড়ার খানিকটা বা একটা প্রাচীন ঘাটের সিঁড়ি। সে এক অনবদ্য শিল্প।

'সিরাজদৌল্লা' নাটকের গানগুলো মা খুব ভাল করেই তুলেছিলেন। বাবারও ঐ নাটকটি খুবই পছন্দের। বরাবর নাম-ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। দশজনে তারিফ করেছে। আমি দেখতাম মা এইসব 'সীন' কেটে জামা ইজের বানাবার সময় একাগ্র মনে গাইতেন সেইসব নাটকের গান—

পথহারা পাখি
কেঁদে ফিরি একা—

আমার বয়স তখন খুব কম হলেও, তার কষ্ট এবং আবেগ কিছু যেন বুঝতাম। বাবা, পালঙ্কের উপর বসে একের পর এক ফরমাশ করতেন, ঐ গানটা করো না, ঐ যে, বলে, নিজেই বেসুরো গলায় গাইতে চেষ্টা করতেন, মা ধরে নিতেন—

বাহিরে অন্তরে
ঝড় উঠিয়াছে
আশ্রয় যাঁচি হায়
কাহারও কাছে।

বস্তুতই তাঁদের তখন বাহিরে অন্তরে একটা ঝড়ের ব্যাপার ঘটত এবং তাঁরা কোথাও আশ্রয় পেতেন না যেন। তাঁরা যে জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন, তার দুঃখনিশি ভোর কোনও দিনও হয়নি, হওয়ার কথাও নয়। সুতরাং মায়ের গাওয়া সেই গান—

বুঝি দুঃখ নিশি মোর
হবে না হবে না ভোর
ফুটিবে না আশার
আলোক রেখা।—

প্রকৃতই তাঁরা তাঁদের আশার আলোক রেখার সাক্ষাৎ আর কোনওদিনই পাননি। তাঁরা ছিলেন প্রকৃতই পথহারা পাখি।

মা এইসব গান করতেন সেসব দিনে। তাঁর স্মৃতিতে এ সব তখনও বড় জ্বলজ্বলে। কাটা সীনের ঐ ছবিগুলো, ঐ সব নাটকের অনুষঙ্গ খুব স্বাভাবিক ভাবেই আসত তাঁর মনে। কিন্তু কী গভীর দুঃখময় তখন তাঁর গায়কী। হায়! এইতো সেদিনেই না এইসব তিনি মঞ্চে দেখেছেন, যে মঞ্চে তাঁর স্বামী এবং অবশ্যই যিনি তাঁর দয়িত পুরুষ, যিনি একজন সুঠাম সাবলীল যুবক নায়ক, তিনি এইসব দৃশ্যের পটে নবাব, বাদশা বা চক্রবর্তী সম্রাটের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। হায়! আজ তাঁর সেইসব সামগ্রী ব্যবহার করতে হচ্ছে তাঁদেরই সন্তানদের লজ্জা নিবারণের বস্ত্র হিসেবে। তিনি আর তাঁর এই পুরুষটিকে 'সিরাজ' হিসেবে দেখবেন না। প্রতিবেশী মেয়ে বধূরা আর কোনওদিন তাঁর দিকে ঈর্ষাতুর চক্ষে তাকাবে না এবং ভাববে না যে ঐ পুরুষটি এই নারীর দয়িত এবং স্বামী। এই দাহ, যে কি অসম্ভব দাহ, মায়ের গান শুনে ঐ বয়সেও আমি যে তা বুঝিনি এমন নয়।

ছোট বা বড় বৈঠকখানায় দিনমানে কোনওদিন বাড়ির বৌ, মেয়ে, ঝিয়েরা যেতে পারতনা। কেননা, তা ছিল পুরুষদের রাজপাট। সেখানে যখন নাটক মাইফেল হত, তখন ছোট বৈঠকখানাটি ছেড়ে দেওয়া হত বাড়ির মেয়েমহলের জন্য। চিকের আড়ালের ব্যবস্থা অবশ্য আমি দেখিনি তবে শুনেছি এককালে প্রায় সেরকমই কিছু ব্যবস্থা তাদের জন্য করা হত। দুর্গা পূজার আরাতি দেখা বা এইসব নাটকাদির অভিনয় দেখার জন্য তাদের ব্যবস্থা হত এখানে। বাড়ির মেয়েদের কোনওদিনই বড় বৈঠকখানায় যেতে আমি ঐ শেষ অবস্থায়ও দেখিনি। অন্দরমহল থেকে বৈঠকখানার দূরত্ব ছিল প্রায় দেড় দুশো মিটারের রাস্তা। একমাত্র বিজয়ার দিন গোটা দুর্গা মণ্ডপ আর বড় বৈঠকখানা তাদের দখলদারিতে ছেড়ে দেওয়া হত। তখন আইশ্য পইশ্য অতিথি অইভ্যাগত পুরুষদের সেখানে অধিকার থাকতনা। মহিলাদের জন্য তখন তা ছেড়ে দেওয়া হত। সেখানে যেমন বাড়ির বা পাড়ার মহিলারা থাকতেন, তেমন আশপাশ মিঞাদের বিবিরাও ভিড় করতেন। তখন প্রতিমাবরণ, সিন্দুর খেলার পাট চলত। পুরুষদের মধ্যে বরণবাদ্য বাজানোর জন্য নট্টমশাইয়েরা, মণ্ডবী জানকীনাথ এবং তার সহযোগী কিছু আবশ্যকীয় চাকর পুরুষরাই থাকতে পারত। এই সময়টি ছাড়া মেয়েরা কখনওই বড় বৈঠকখানার চৌহদ্দিতে যাবার অধিকার পেতেন না। ওখানে তখন থাকত বড়বাবুর দরবার। কত প্রজা পাট, কত মানুষজন, কত বিচার আচারের রহট সেখানে। সাধারণ 'মাথারীরা' কি সেখানে যেতে পারে? এসময়ে জেঠামশাই, বড় একটা বাড়িতে থাকতেন না। একদিন সন্ধ্যার পর মা আমায় বললেন, এহনতো ভাসুর ঠাকুর বাড়ি নাই। আমারে এট্টু বড় বৈঠকখানায় লইয়া যাবি? তখনও আট্‌চালা বড় বৈঠকখানা ঘরটা ঝড়ে ভেঙে পড়েনি, তবে মঞ্চটা বিক্রি হয়ে গেছে। মায়ের কথায় তাঁকে নিয়ে গেলাম সেখানে। শূন্যতা খাঁ খাঁ করছে চারদিকে। মঞ্চের ফাঁকা জায়গাটায় চাঁদের আলো পড়ে শূন্যতা যেন আরও অনেক বেশি প্রকট হয়েছিল সেদিন। চারদিকে কেউ

নেই। বড় বৈঠকখানার এরকম শূন্যতা, আমাদের অন্দরবাসিনী মায়ের বোধহয় কল্পনায় আদৌ ছিল না। তিনি হয়ত ভাবছিলেন, হয়ত কেন নিশ্চয়ই ভাবছিলেন, এই কি সেই স্থান, যেখানে তাঁর সুদর্শন, সুঠাম শরীর, নায়কোচিত কণ্ঠ সম্পদের অধিকারী স্বামী এবং দয়িত অভিনয়কালে স্বর্ণসীতাকে জীবন্ত সীতাভ্রমে সীতা সীতা সীতা বলে উন্মাদের মতো আলিঙ্গনে উদ্যত হতেন? এবং মা যে তখন নিজেকেই জীবন্ত সীতা মনে করে অশ্রুজলে বুক ভাসাতেন, এ বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। কেননা আমি তো মায়ের কাছে এবং অন্যজনেদেরে কাছেও শুনেছি যে সেইসব দিনে এই মঞ্চে 'সিরাজদৌল্লা' নাটক অভিনয় কালে 'আলেয়া' নামে সভানর্তকীটি, যে আসলে একজন উঠতিবয়সি ছোকরা, তার কোলিকণ্ঠের গান—

আমি আলোর শিখা
অন্ধ আঁধারে আমি দীপকণিকা—

শুনে মা তার প্রতি ঈর্ষিতা হতেন। মায়ের সখীরা, যাঁরা চিকের আড়ালে ছোট বৈঠকখানা থেকে এই 'ঠিয়াটার' দেখতেন, তাঁরা ঐ আলেয়াবেশী ছোকরাকে মায়ের সতীন বলে ঠাট্টা করতেন। এভাবেই চন্দ্রগুপ্ত নাটকে ছায়াকে ঈর্ষা করতেন তিনি। কিন্তু কি সব মধুর ঈর্ষার দিনই না গেছে। যেন এক স্বপ্নের মতো ব্যাপার ঘটল তাঁর জীবনে। আজ সেইস্থানে চাঁদের জ্যোৎস্না যেমন প্রাচীন কথা মনে পড়িয়ে তাঁকে আকুল করছে, তেমনই সেই স্মৃতিতাড়নায় মা যেন এক হরিষ বিষাদে অন্য রকম হয়ে গেলেন।

মঞ্চের এলাকাটি পরিক্রমা করে, আবিষ্টের মতো মা একবার উত্তরের দুর্গামণ্ডপের সিঁড়ির দিকে, একবার পশ্চিমের ছোট বৈঠকখানার বাঁধানো সংযুক্তির দিকে, আবার কখনও যে কোণটিতে সাজঘরের এলাকা ছিল, সেই সব স্থানে ঘুরতে ঘুরতে পুবের লালা সাদা আরামবেদিকা দুটি পেরিয়ে, ঐ রঙেরই সোপানগুলো ভাঙতে ভাঙতে তিনিও যেন একসময় শেষ সোপানটিতে গিয়ে ভেঙে পড়েন। সামনে বিস্তীর্ণ রাস্তার দুপাশের মাঠেও জ্যোৎস্না পড়েছে। কিন্তু খাঁ খাঁ করছে। ফুলের বাগানটা আর নেই। গোলাপ গাছগুলোও নেই। বাঁ হাতি দাদুব বাগানের দিকটা তখন আর দেখা যাচ্ছে না। দেখা গেলে মা জানতে পারতেন, ঐ কাঁটাতারে ঘেরা বাগানটিতে অতি পরিচিত গেটটিও ভেঙে গেছে। বাগানটি আর বাগান হিসেবে নেই। শুধু দাদু আর ঠাকুমার পাশাপাশি চিতাদুটি এখনও একটু মাথা উঁচু করে আছে, তাও নেহাৎ মাটির স্পর্ধায়। সেখানে কোনও সমাধিসৌধ নির্মিত হয়নি। কেন হয়নি তা জানি না। তবে তাঁরা যখন গত হয়েছিলেন, তখন হতে কোনও বাধা ছিল না, বরং এটাই তখন রীতি ছিল।

বড় বৈঠকখানার শেষ পৈঠায় বসে মা দুহাতে মুখ ঢেকে এক হাহাকার কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন সেদিন। আমি কিছুটা বুঝে, কিছুটা না-বুঝে, ওমা, মা, মাগো, তুমি কান্দ ক্যান্? বলে তাঁকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দেওয়ার প্রয়াস পাচ্ছিলাম। কান্নার আবেগ প্রশমিত হতে, মা খুব দরাজ কণ্ঠে গান গাইতে শুরু করলেন। মা, তাঁর ঐ হাহাকার কান্নার পর যে গানটি ধরলেন, তা বড় অর্থবহ তাঁর এতাবৎ কালের যাপিত জীবনের পরম্পরায়। গানটি ছিল—

ভেঙে গেছে মোর স্বপ্নের ঘোর
ছিঁড়ে গেছে মোর বীণার তার
ভগ্ন পরাণে, এ মহাশ্মশানে
আজি কি মা গান গাহিব আর।

মা এরকম অনেক গানই একের পর এক গেয়ে যাচ্ছিলেন সেদিন। আমি শুনছিলাম আর ভাবছিলাম। ভাবছিলাম, মায়ের কি দুঃখ! এর বেশি সেদিন আর কিছু ভাবিনি। কিন্তু পরে ভেবেছি এবং বুঝেছিও, মায়ের ব্যাপারটা শুধু একদার সুখস্মৃতি এবং পরবর্তীকালের সব হারানোর দুঃখ বেদনাই শুধু নয়। এর সাথে জড়িয়ে আছে আরও অনেক কিছু। সেসব মানুষের শেকড়-বাকড় শুকিয়ে যাওয়ার অথবা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ব্যাপার। মা যে খুব সুশিক্ষিতা মহিলা ছিলেন না সেকথা আগেও বলেছি কিন্তু তার ভাবের গভীরতায় কোনও খামতি ছিল না বোধহয়। যেদিনকার কথা বলছি, তখন আমার বয়স বা মানসিকতা এই ভাবের বিষয়ে যথেষ্ট সংবেদনে হয়ত ছিল না, কিন্তু পরবর্তীকালে স্মৃতি তাঁর এই গহন বোধ বিষয়ে আমাকে বড়ই শ্লাঘার জগতে পৌঁছে দিয়েছে। এই বোধই কি মানুষকে বিপন্ন বিস্ময়ে প্রোথিত করে? অথবা এই কি মায়ের কাছ থেকে আমার প্রাপ্য উত্তরাধিকার।

সেদিন যখন সেই বহির্বাটির শূন্যতা প্রদক্ষিণ করে মা আর আমি অন্দরের অবরোধে গেলাম, তখন বাবা তাঁর সতত আশ্রয় পালঙ্কটির উপর স্বভাবসম্মতভাবে ধ্যানাশ্রয়ী। ঐ পালঙ্কটি তখনও বিক্রি হয়ে যায়নি। এটি তাদের বিয়ের পালঙ্ক। পরে অবশ্য এটিও বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। আমি ঘরে না ঢুকে দরদালানের সামনের সোপানে বসেছিলাম। মা ঘরে চলে গিয়েছিলেন। আমার কানে এই সময় একটা জলদমন্দ্র কণ্ঠস্বর পৌঁছেছিল। সেই কণ্ঠটি বাবার। আজ পর্যন্ত তার রণন ভুলিনি। 'শ্মশান দেইখ্যা আইলা? কেমন দ্যাখলা?' বাবা যে আমাদের এই নৈশ পর্যবেক্ষণ খেয়াল করেছেন এবং তাঁর স্ত্রীর এই দুঃখভোগের শরিকও হয়েছেন তা বুঝলাম, যখন মায়ের হেঁচ্‌কি তুলে কান্নার শব্দ এবং প্রত্যুত্তরে বাবার উচ্চারণ শুনলাম। সময় সব সৃজন করে সময়ই তা ধ্বংস করে। সময় বা কালের মাহাত্ম্য কেউই পুঙ্খ পুঙ্খ জানে না। কাল স্তম্ব থেকে ব্রহ্ম, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ থেকে অনির্বচনীয়ে শুদ্ধমাত্র ধারণায় প্রলম্ব। প্রত্যক্ষে আমরা শুধু সৃজন, বর্ধন এবং ধ্বংসকেই অভিজ্ঞতায় পাই। মহাজনেরা তাই সৃজনেও উৎফুল্ল হন না, বিধ্বংসেও কাতর হন না। আত্মস্থ হও এবং সব গ্রহণ কর। এছাড়া উপায় নেই।

বাবা. মায়ের বোধ্য সংলাপেই এইসব বলছিলেন। তিনি, আগেই বলেছি, আবেগ তাড়িত নটচরিত্রের মনুষ্য। অত্যন্ত সংবেদনাহত হলে অনর্গল নাট্য সংলাপ বা কবিতা আবৃত্তি করা ছিল তাঁর স্বভাব। মাকে খুবই স্নেহের সাথে আহ্বান করে বললেন বস, শোন একথা তোমাকে ছাড়া আর কাউকেই তো শোনাতে পারিনি। শোন, বুঝতে পারবে—

Ask her forgiveness?
Do you but mark how this becomes the house :
Dear wife (daughter), I confess I am old ;

Age is unnecessary ; on my knees I beg
that you'll vouchsafe me raiment, bed and food.

শেক্সপীয়ারের রচনায় যেখানে daughter শব্দটি ছিল, মনে আছে, বাবা অবলীলাক্রমে সেখানে wife শব্দটি ব্যবহার করলেন। বাবা হামেশা এ রকম করতেন। এরকম ব্যবহার প্রায়ই তাঁর আবৃত্তিতে শুনেছি বলে প্রায় মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। বাবা শেক্সপীয়ার খুব পছন্দ করতেন এবং সততই তা অধ্যয়নও করতেন। একারণেই দেখেছি, সঠিক সংলাপটি সময়মতো তাঁর এসে যেত। মায়ের শিক্ষাদীক্ষার বিষয়টি আগেই বলা হয়েছে। ইংরাজি ভাষায় তাঁর আদৌ কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। কিন্তু বাবার কাণ্ডজ্ঞান, মায়ের থেকে কিছু অধিক ছিল না বলে এইসব সংলাপ মাকে শুনতেই হত, তা কি হর্ষে কি বিষাদে। আবার এও এক চমৎকারিত্ব যে এভাবেই আমাদের মা একসময় তাঁর নিজের ধরনে, এইসব সংলাপের তাৎপর্য বুঝতেও পারতেন। তাঁর স্বভাবের মধ্যে বাবার স্বভাবের এক ছায়াচেতনা যেন গ্রথিত হয়ে গিয়েছিল। সেদিনের সেই সান্ধ্য ঘটনার প্রেক্ষিতে তা অন্তরাল থেকে আমার শ্রবণে যেন আরও বেশি গাঢ়তায় ধরা পড়েছিল। বাবার ঐ আবৃত্তি, মা কী বুঝেছিলেন জানিনা। আবৃত্তি শেষে বাবা বলেছিলেন, কিছু গাও, মা তাঁর কান্না জড়ানো কাঁপা কাঁপা গলায় যে গানটি গেয়েছিলেন, সিঁড়ির সোপানটির শেষ ধাপে বসে সেই গান শোনার স্মৃতি আমার আজও ম্লান হয়নি। সেটি বড় তাৎপর্যপূর্ণ গান অতুলপ্রসাদের, তার অন্তরাটি ছিল—

ঝড়েতে বাঁধন টুটে
দিশাহারা ধেনুছুটে
তাই তরী তব তটে
লাগিল এবার।

সেদিন ঐ পরিবেশে গানটি আমাকে যত না মোহিত করেছিল তার দশগুণ বেশি আবেগ মথিত করেছিল আমার বাবাকে। কারণ বড় বৈঠকখানা, মঞ্চ এবং এ ব্যাপারে তাবৎ অনুষঙ্গ তো তাঁরই নস্ট্যালজিয়া। আমি শুধু এই বেদনার এক অবশ্যম্ভাবী গ্রাহক মাত্র। সংবেদনশীল কোনও মানুষ যেমন কোনও প্রতিভাধর ধ্রুপদী গায়কের সুরমাধ্যমের আর্ত বিচরণের গ্রাহক হয়, আমার তখন তেমনই অবস্থা।

বাবা আবেগমথিত সময়গুলোতে যেন ঠিক প্রকৃতিস্থ থাকতেন না। হয় ক্রমান্বয়ে নাটকের সংলাপ বা কবিতার চরণ আবৃত্তি করতেন, অথবা মাকে আদেশ করতেন গান গাওয়ার জন্য। এই সময়ে আমি তাঁকে এরকমই দেখেছি। তখন কখনও শেক্সপীয়ার থেকে কখনও বা গিরিশচন্দ্র থেকে অনর্গল আবৃত্তি করে যেতেন। তাঁর কণ্ঠে প্রসাদগুণ ছিল এবং আমাদের এই ব্যাপক কক্ষগুলি অতিক্রম করে তাঁর ধ্বনি এবং সুস্পষ্ট সুন্দর উচ্চারিত শব্দগুলি দরদালানের বিস্তৃতিতে গম্‌গম্ করত। ঐদিন, একথা পরে আমার মনে হয়েছে, যে তাঁর অতীতের সম্পদশীল জীবনচর্যার সময়ের সামন্তসুলভ আচরণাবলি হয়ত তাঁকে ক্ষতবিক্ষত করছিল। বোধহয় তাঁদের অকারণ প্রজানিগ্রহে যে অন্ন এবং সম্পদ আহৃত তার ভোক্তা যে তিনিও এ কথাই ঐসব আবৃত্তি, উদ্ধৃতির মাধ্যমে প্রকাশ করতে চাইতেন তিনি।

মায়ের গানটি শেষ হলে, আমি সিঁড়ির সোপানে বসে ঐ গম্‌গমে্‌ আওয়াজে শুনেছিলাম তাঁর আবৃত্তি—

জাননা জাননা কৃশোদরি,
যে অনলে জ্বলে প্রাণ মম ;
তাই কই
ব্যথা দিতে করি কথা আলোচনা ;
সরলে, জাননা
দিন দিন পলে পলে কত সহি
উন্মত্ত প্রভাবে দুর্ম্মদ ক্ষত্রিয়কুল
নিত্য নিত্য করে বল পরস্পরে
দীন প্রজা বিকল্প বিগ্রহে,
কারু শস্য দহে শরানলে
কারু গৃহ রথসঞ্চালনে,
কষ্টার্জ্জিত ধন নিত্য দেয় রণব্যয়ে,
জায়া পুত্র অন্নবিনা মরে।'

এইসব আগে, পরে, তাঁর আবেগের সময় অথবা জ্বরতপ্ততায় অনেকবারই শুনেছি বলে মনে আছে। মায়ের গাওয়া শেষ গানটি ছিল সেদিন বড়ই আক্ষেপের—

এ জীবনে মিটিল না সাধ
ভালবাসি।

বাবার স্পর্শকাতরতা, আবেগ ইত্যাদি মাকে এতই প্রভাবিত করেছিল যে তিনি সারাটি জীবন যেন তাঁর ছায়ামাত্র হয়েই বেঁচেছিলেন। বাবার যে মানসিক দ্বন্দ্বটির কথা ইতিপূর্বে বলেছি তার প্রশমনের জন্য মায়ের এই আজীবনের নিবেদিত চিত্ততা এক অসামান্য শান্তির প্রলেপ বলে আমার বরাবর মনে হয়েছে। এরকম গাঢ় দাম্পত্য সম্পর্ক আজ অবধি আমি দেখিনি।

মা লিখেছেন, আজ দীপযাত্রা। (কিন্তু) আমার জীবন দীপতো নিভিয়া গিয়াছে। আমি আজ অন্ধকারে থাকিব। আজ আলো আর আমার ভাল লাগে না, আজ আর আমার কিছুর দরকার নাই এ পৃথিবীতে, ছেলেমেয়েরা বড় হইয়াছে। এখনই তুমি তোমার জন্য বাঁচা দরকার মনে না করিয়া চলিয়া গেলে আমাকে নিলে না? আমি আজ একেবারেই সংসারে (নিজেকে) অশান্তি বলিয়া মনে করি। কোনও কাজেই তো আর লাগিনা।

— পনেরো —

যে সময়টিকে নিয়ে এই কথা ·কথন করছি, তখন পিছারার খালের সব গেরস্থালির নাভিশ্বাস। যাঁরা এই স্থান ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন তাঁরা তাঁদের সম্পদাদি বিক্রি করার উদ্যোগে ব্যস্ত। যাঁরা দেশত্যাগ করার কথা ভাবতে পারছেন না, যেহেতু তাঁদের

হিন্দুস্থানে কোনও সহায় সম্পদ বা খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মতোও কিছু নেই, তাঁরাও পেটের দায়ে অথবা তাঁদের যা কিছু আছে, তা লুট হয়ে যেতে পারে, এই আতঙ্কে সব বেচে দিয়ে নিঃস্ব রিক্ত এবং অ-গৃহস্থ হয়ে যাচ্ছিলেন। গ্রামীণ স্থিতিশীল মানুষেরা কোনও প্লবতার কারণে যখন অগৃহস্থতায় নিজেদের পরিণত করতে বাধ্য হয় তার থেকে করুণ অবস্থা আর নেই। গৃহস্থালি যেখানে স্থায়িত্ব, সেখানে গৃহস্থ স্বয়ং যদি উঞ্ছ হয়ে যায় তবে যে সংকট ঘটে, আমার পিছারার খালের চৌহদ্দির তৎকালীন সংকট সেরকমই দেখেছি। পৃথিবীতে ইতিপূর্বে এক ব্যাপক, সর্বগ্রাসী যুদ্ধ ঘটে গেছে। সেই যুদ্ধের দায় মেটানোর খাতিরে আমার এই মানুষেরাও দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে তো পড়েইছিল কিন্তু তাও তাদের ততটা অগৃহস্থ করতে পারেনি। কারণ এই স্থানটি ছিল সভ্যতার গতিপথের একান্ত প্রত্যন্তে। এখানকার উপজ সামগ্রী অন্যান্য অঞ্চলের মতো এলাকার বাইরে নিয়ে যাওয়ার আধুনিক উপায় তখন তেমন ছিল না। প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতাই এই সুযোগ এখানকার মানুষদের দিয়েছিল। তখন এ অঞ্চলে রেলপথ বা স্থলযান ছিল না। নদীপথে, ঝালকাঠী, নলছিটি, বরিশাল ইত্যাদি অঞ্চল থেকে যেসব সামগ্রী জাহাজ, ইস্টিমারগুলোতে যেত তার মধ্যে ধান, চালই আসল। গৃহস্থের গোলাঘরের ভূগর্ভস্থ মট্‌কায় যে চাল মজুত থাকত তা যে সরকারি সংগ্রহকারিদের পক্ষে বিশেষ সুবিধেজনকভাবে সংগ্রহণের স্থান ছিল তা নয়। এ বিষয়ে, তেতাল্লিশের মন্বন্তরের গল্প কথা যা বুড়ি পিসিমাদের কাছে শুনেছি, তার ভিত্তিতেই একথা বলছি। তবে এর প্রকোপ একেবারেই যে কিছু পড়েনি এখানে তাও নয়। কিন্তু পিছারার খালের চৌহদ্দিতে এই মন্বন্তরে মানুষ না খেয়ে মরেছে এরকম কাহিনী আমরা শুনিনি। অনটন অবশ্য ছিল। হাট থেকে 'ফরিয়া'দের মারফৎ চাল, ধান ইত্যাদি নাকি সংগ্রহ হয়েছিল। কিন্তু সে অনেক আগের কথা। আমরা তখনও জন্মাইনি।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালীন একেকটি দাঙ্গার বিভীষিকা অথবা হিন্দু, মুসলমান এই সমাজ দুটির পারস্পরিক অবিশ্বাসের উদ্ভবের কারণেই আমার এই ভূমির মানুষদের গৃহস্থালির উৎসৃজন। উচ্চবর্ণীয় সংখ্যালঘু সমাজ তখন সেখানে মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকার কথা চিন্তা করেনি। নিম্নবর্ণীয় সংখ্যালঘুদের সঙ্গে পাকিস্তানপন্থী সংখ্যাগুরুর সমঝোতা ছিল। কেননা, উভয়ই উচ্চবর্ণীয়দের দ্বারা শোষিত এবং উৎপীড়িত। আমার পিছারার খালের এলাকায় 'উচ্চবর্ণীয়' মুসলমান যে ছিলনা বললেই চলে একথা আগে বলেছি। মুসলিম লিগ, পাকিস্তান কায়েমের শুরুয়াতে এবং কায়েম হওয়ার কিছুকাল পর অবধি এই চমৎকার স্বার্থসিদ্ধকারী তুরুপের তাসটি বেশ ভালভাবেই খেলেছিল। একারণে, আমার অঞ্চলটিতে বিভেদের আগুন হঠাৎই যেন প্রয়োজনাতিরিক্ত মাত্রা পায়। বিভেদের এই আগুন, প্রায় তুষানলের মতোই ধীরে ধীরে বিস্তৃতি পেতে থাকে উচ্চবর্ণ থেকে নিম্নবর্ণ পর্যন্ত। সাম্প্রদায়িক রণকৌশলে এ বড় তাৎপর্যপূর্ণ এক কৌটিল্য পন্থা, এবিষয়ে সন্দেহ নেই।

পিছারার খালের এলাকায়, এমনকি তামাম রাষ্ট্রকল্পেও, সংস্কৃতিগতভাবে আকর্ষণীয় কোনও মূলস্রোত তখনও গড়ে ওঠেনি। তখন সম্প্রদায়ই একমাত্র বাস্তব এবং তা

সংখ্যাগুরুর আর সংখ্যালঘুর উভয়তই। সংখ্যাগুরু এ কারণে সদ্য আহৃত স্বাধীনতাকে বর্গনির্বিশেষে এক নৈরাজ্য পন্থা হিসেবেই গ্রহণ করে এবং তা সংখ্যালঘুদের উপর যা কিছু করার অধিকার হিসেবে জারি করতে প্রয়াসী হয়। তাৎক্ষণিক প্রয়োজনটাকেই তারা পরমার্থ বোধ করে সংখ্যালঘুদেরকে অবলীলায় এক অন্ধ হাড়িকাঠে চাপিয়ে দেয়।

জারিগানের আসরে বয়াতিদের দেখেছি খোদ আল্লাহ্ তায়লা বা নবীর বন্দনার আগেই লোকায়ত দেবী বিপদনাশিনীর বন্দনা করতে। অর্থাৎ অপবর্ণীয় মানুষদের ধর্মীয় আচারের পরম্পরা ঐ পিছারার খালধারের মনুষ্যের মধ্যে সম্প্রদায় নির্বিশেষে প্রায় এক অভিন্নতায় বিরাজিত ছিল। তারা লোকায়ত দেবীদের যেমন মান্যতা দিত, তেমনি মান্যতা দিত পীর পয়গম্বরকে। উচ্চবর্ণীয়দের কথা স্বতন্ত্র। তাদের অধিকাংশই আবহমানকাল বর্ণবিদ্বেষী এবং অত্যাচারী। কিন্তু অপবর্ণীয়দের মধ্যে এই ভেদের আগুন আনল কে? এবং কেনই বা তাদের প্রতি পরে বিশ্বাসঘাতকতা করা হল—এটাই একটা বড় প্রশ্ন।

বিশ্বাসঘাতকতার কথাটি বলছি একারণে যে আমরা জানতাম 'শিডিউলড্ কাস্ট ফেডারেশন'-এর অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ তফশিলি জাতি ও উপজাতিয়রা পাকিস্তানপন্থীদের মিত্র। একমাত্র উচ্চবর্ণীয়রাই তাদের স্বাভাবিক শত্রু। পাকিস্তান কায়েমের প্রাক্কালে তাই এরা মুসলিম লিগের সাথে সমমনস্ক ছিল। মুসলিম লিগ এবং পাকিস্তানপন্থীরা একথা লিখিতভাবেও রেখেছেন যে, তাদের বিরোধ শুধুমাত্র উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের সাথেই। তাঁরা চান যেন উচ্চবর্ণীয় হিন্দুরা এদেশে না থাকেন। এ সব কথা আমরা পাঁচের দশকের শুরুতেও বিভিন্ন জমায়েতে শুনেছি। কন্তু একটা সময় এই প্রতিজ্ঞা আর থাকেনি। তখন উচ্চবর্ণীয় হিন্দুও হিন্দু আর নিম্নবর্ণীয় হিন্দুরাও হিন্দু বলেই চিহ্নিত হয়েছে এবং তাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে। প্রয়োজনবোধে কোথাও কোত্‌ল করা হয়েছে।

বস্তুত ঘটনাতো দাঁড়িয়েছিল এক সম্প্রদায় আল্লাহ্‌কে গাল দেয় তো অন্য সম্প্রদায় 'বুৎপরস্তীদের' দেবদেবীকে 'খামার দে' এবং যখন মোল্লা মুছুল্লিরা বেশি শরিয়তের রাস্তা বাৎলায় তখন অপবর্গী মুসলমানেরা 'আড়ালে আবডালে' কালীমন্দির, শেতলা খোলা বা কামেশ্বরীর থানে কানে হাত দিয়ে বলে, 'অফরাদ লইও না, মাগো, মা। মোরা কৈলম একছের ভবসাগরের ট্যাপ্লোনা। দয়া কর মা, দয়া কর।'—এসব আমাদের বাড়ির বাগাল ছিল যে নাগরালি তার আচরণে দেখেছি। কিন্তু সে আবার রোজার দিনে যথাসম্ভব রোজায় থাকত। সন্ধ্যায় ডাবের জল এবং 'লেয়া নাইরকোল' দিয়ে তার সাথে আমরা 'এ্যাফতার' করতাম আমাদের বড় খালধারের সেই কুলপতি বৃক্ষের নীচে অথবা পিছারার খালের কোনও নিভৃতে আবার এও দেখেছি যে শুক্‌নো ঋতুর সময়ে জলা জায়গাগুলো যখন শুকিয়ে কচুরি পানাগুলো মাটির সাথে সমতল হত, তখন সুপুরি গাছের তীক্ষ্ণ বল্লম দিয়ে ঠুক্‌ঠুক সে ধরে আনত 'দুর' যা কচ্ছপের সগোত্রীয় এক প্রাণী এবং যার মাংস ইসলামি মতে নাপাক্, কেননা তাকে হালাল করা যায় না। নাগরালির এ মাংসে বিশেষ অরুচি কোনও দিন দেখিনি। কিংবা শজারু শিকারেই কি

তার অনাগ্রহ দেখেছি বা সেই অজবেহ্সম্ভব, নাপাক্ প্রাণীর মাংস ভক্ষণে? নাগরালির মতো মানুষ পিছারার খালের জগতে নেহাৎ হাতে গোনা ছিল না। তারা এসব না-পাক কাম করত। নাগরালিকে এও দেখেছি যে রাতে পাহারাদারি করার সময়, আমাদের বটকালীতলায় টিনের চালা খুলে নেওয়ার প্রচেষ্টকারীদের—'চুৎমারানীর পোয়ারা, তোগো মা-মাসীর ফলনাতা হরি'—বলে বল্লম নিয়ে ধাওয়া করতে। এই মানসিকতার কার্যকারণ বড় গভীর গবেষণার ক্ষেত্র। এ পথে কদাচিৎ কেউ গমন করেন। এ বিষয়ে কেউ যদি কিছু জানেন, তবে সে ঐ মহাবৃক্ষ।

— ষোলো —

এ বাড়ি ছাড়িয়া কোথায় যাইব
কেনবা যাইব বল।
শিশুকাল হতে বাড়ির মায়াতে
কত না শুনিতে হল।
এরই লাগি নাকি জীবন আমার
হইয়া গিয়াছে মাটি,
এর মায়া যদি যাইত কাটিয়া
মানুষ হতাম খাঁটি।
অমানুষ কি মানুষ বলিয়া
যাহা কিছু বল ভাই,
সেদিনের চেয়ে আজও এরে আমি
ভালই বাসিতে চাই।

পঞ্চাশের মধ্যকালের এক সমাজ রষ্ট্রীয় প্লবতার কারণে যখন অবশিষ্ট সংখ্যালঘুরা আবার দেশত্যাগ করতে শুরু করে তখন আমার বাবা এই পদ্যটি লিখেছিলেন। আমাদের পরিবারের বেশিরভাগই একান্নর দাঙ্গার সময়ই দেশ ছেড়ে ছিলেন। বাবা, জেঠামশাই বাকিদের দেশত্যাগ বিষয়ে পরে আর সচেষ্ট হননি। শুধু যখন কোনও হিড়িক উঠত তখন সাময়িকভাবে একটু দোদুল্যমান হতেন। যে সময়টার কথা বলছি তখন সেই রকম একটি অবস্থা বিরাজমান। সময়টা উনিশশো আটান্ন সালের অক্টোবর মাস। ইস্কান্দার আলি মির্জা সাহেব পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট তখনও। জনাবের শাসনকালেই দেশে এক প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ হয়। দুর্ভিক্ষের কথা পরে বলছি। এই উপলক্ষে জেনারেল মহঃ আইয়ুব খান আটান্ন সালের সাতাশে অক্টোবর তারিখে এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানে প্রেসিডেন্ট জেঃ মহঃ ইস্কান্দার আলি মির্জাকে অপসারিত করে দেশের ক্ষমতা দখল করেন। এর কিছুদিনের মধ্যেই আবার সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগের হিড়িক শুরু হয়ে যায়, যদিও এবারের ঘটনার পেছনে আগের মতো দাঙ্গার প্রকোপ থাকে না। এবারকার কায়দাটি ছিল অন্য ধরনের।

আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল ব্যাপারটি ঘটেছিল প্রায় পাচপেঁচি ছিন্‌তাইকারীর কায়দায়। খানসাহেব তখন জেনারেল। অক্টোবরের ঐ সাতাশ তারিখের রাত্রে নাকি জেনারেল তাঁর রিভলভারের নলটি প্রেসিডেন্ট মীর্জাসাহেবের পশ্চাতে ঠেকিয়ে একেবারে করাচির বিমানবন্দরের একটি বিশেষ বিমানে বসিয়ে দেন। তাঁর হাতে লন্ডনস্থ একটি অভিজাত হোটেলের ঠিকানা এবং বুকিং সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় রসিদপত্র দিয়ে বলেন, জনাব বহুকালাবধি পরহেজগারে জীবনপাত করেছেন। পাকিস্তান এবং ইসলাম একারণে তাঁর সবিশেষ শুক্‌র গুজার করছে। অধুনা সেনাবাহিনী মনে করছে জনাবের এখন বিশ্রামের প্রয়োজন। জনাব যদি কিছু মনে না করেন, তবে দেশ এবং ইসলামের স্বার্থে সেনাবাহিনী তাঁকে সব দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিতে ইচ্ছুক। অতঃপর তিনি প্রেসিডেন্ট হিসেবে প্রাক্তন হয়ে গেলেন। অবশ্য যদি পুনরপি 'অধুনা' হবার প্রচেষ্টায় কোনও কলকাঠি নাড়তে জনাব সচেষ্ট হন তবে এই রিভলভারের নলটি তার গুহ্যদেশে ঢুকিয়ে জেনারেল প্রেসিডেন্ট স্বয়ং ঘোড়াটি টিপে দিতে বাধ্য হবেন। এখন জনাবের যেমন মর্জি। ব্যস্‌ রক্তপাতহীন বিপ্লব সমাধা হয়ে গেল। গণমাধ্যমের যতটুকু সে যুগে ব্যবহারে ছিল, তাতে এই সংবাদ ঘোষিত হল। তাতে আরও বলা হল, দেশের অতঃপরের প্রেসিডেন্ট জেঃ মহঃ আইয়ুব খান। অতএব পাকিস্তান রাষ্ট্রের শত্রুরা সাবধান, মুনাফা লোভী, দুর্ভিক্ষ পয়দাকারি, চোরাকারবারি, ঘুষখোর আমলা সবাই সাবধান। অতঃপর এদেশে ফৌজি কানুন মোতাবেক সব অপরাধের বিচার হবে। প্রাক্তন সংবিধান বাতিল।

আমাদের পিছারার খালের দুপাশের গাঁও গেরস্থালিতে কদাচিৎ খবরের কাগজ পৌঁছোতো। রেডিও ট্রানজিস্টারও তখনও সেখানে পৌঁছোয়নি। রক্তপাতহীন এই বিপ্লবের দু'একদিন পরে, আমাদের বাড়ির উঠোনে, ছাতের উপর এবং আগানে বাগানে কয়েক আন্ডিল ইশ্‌তেহার পড়ল। রক্তপাতহীন বিপ্লবের বাণী বহনকারী ইশ্‌তেহার। তাতে নানাবিধ ভাল ভাল প্রতিশ্রুতির সাথে একটি অতিরিক্ত সুসংবাদ ছিল এই যে জেনারেল প্রেসিডেন্ট অচিরেই দেশবাসীকে প্রকৃত গণতন্ত্র উপহার দেবেন। ইতিপূর্বের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিশ্বাসী এবং নির্বাচিত, জেনারেল প্রেসিডেন্ট মনে করেন না যে সেই গণতন্ত্রের জন্য দেশবাসী আদৌ উপযুক্ত। মানুষকে শিক্ষিত করতে গেল অ আ ক খ থেকেই তো শেখাতে হবে। তিনি মনে করেন গণতন্ত্রেরও সেই বুনিয়াদি ক্রম পেরিয়ে তবেই সংসদীয় স্তরে উন্নীত হতে হবে এবং প্রেসিডেন্ট স্বয়ং সেই বুনিয়াদি গণতন্ত্রের বুনিয়াদ তৈরি করে দেবেন।

ফৌজি শাসন কায়েম হতেই দেখা গেল অবশিষ্ট ছিটেফোঁটা উচ্চবর্গীয়/বর্ণীয় সংখ্যালঘুরা উৎখাত্‌ হতে শুরু করেছে। আমাদের বন্দরের পালচৌধুরীরা ছিলেন বার্মাশেল কোম্পানির এজেন্ট। তাঁরা বেশ ধনী এবং প্রতিপত্তিশালী সওদাগর। তাঁদের খবরাখবর আমরা বেশ পেতাম। আমাদের নায়েব মশাই, মধ্যস্বত্ব লোপের পর এখানেই চাকরি নিয়েছিলেন। কিন্তু একদা ফৌজিরা অতর্কিতভাবে সেখানে হানা দিয়ে নানান দোষত্রুটি আবিষ্কার করে এবং ফলত সংস্থাটি বন্ধ হয়ে যায়। দেশের বিভিন্ন স্থানের

হিন্দু বণিক প্রতিষ্ঠানগুলো এভাবেই উচ্ছেদ হতে থাকে। অনুরূপ ছাপা মারি মুসলমান বণিক সংস্থাগুলোর উপরও যে হয়নি তা নয়, তবে সেগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ার কোনও খবর বা স্মৃতি আমার নেই। সি. এস. পি. আখ্যাযুক্ত কদাচিৎ দু একজন বাঙালি হিন্দু আমলা তখনও শাসন সংক্রান্ত পদাধিকারে ছিলেন। তাঁরাও হঠাৎ হঠাৎ হিন্দুস্থানে পাড়ি জমাতে লাগলেন। এদের একজনকে আমি দেখেছিও যিনি বরিশালের বিভাগীয় কমিশনার ছিলেন, নাম এ. কে. দত্ত চৌধুরী। তাঁকে ওখান থেকে পালিয়ে আসতে হয়েছিল।

ফৌজিরা তাদের এই প্রাথমিক দুর্নীতিদমন নামক হুটোপুটি বন্ধ করে থিতু হয়ে বসার কিছুকালের মধ্যেই তাঁদের কুর্তার বহর আটত্রিশ থেকে চল্লিশ এবং কোমরবন্ধের মাপ ছত্রিশ থেকে বেয়াল্লিশে গিয়ে দাঁড়ায়। বুনিয়াদি গণতন্ত্র তার নিজস্ব নিয়মে 'দেউলা' করতে থাকে। কিন্তু সে শুধু শহরে। আমাদের অজগাঁয়ে আমরা অন্য সমস্যায় ধ্বস্ত হতে থাকি। এখন জেনারেল প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা দখলের সময়কার সেই দুর্ভিক্ষটির কথা বলি।

আমার যতদূর মনে পড়ে এই দুর্ভিক্ষটি হয়েছিল আটান্ন সালেই, সঠিক মনে করতে পারছি না। তখন আমি সেভেন অথবা এইটে পড়ি। একটা সময়, চুয়ান্ন কি পঞ্চান্ন সালেও হাটে বাজারে চাউল বিকোতো পাঁচ থেকে সাত টাকা কাঠি। বেতের তৈরি সেরের বত্রিশ সের। এই দাম আস্তে আস্তে বেড়ে দুর্ভিক্ষের সময় দাঁড়িয়েছিল চল্লিশ থেকে পঞ্চাশে। দুর্ভিক্ষের কার্যকারণ কী ছিল, তা জানবার মতো বয়স বুদ্ধি তখনও হয়নি বলে, কোনও স্মৃতি নেই। এ বিষয়ে একটিই স্মৃতি জ্বলজ্বলে যে তখন আমাদের বাড়িতে একটি লঙ্গরখানা বসেছিল। ঐ লঙ্গরখানাটির স্মৃতিই আমার এই দুর্ভিক্ষ বিষয়ে কথনের একমাত্র উপজীব্য। বুড়ি পিসিমাদের কাছে তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের গল্পে এবং পরবর্তীকালে নানান সাহিত্য সংবাদে জেনেছিলাম যে তখন নাকি পঞ্চাশ লক্ষ লোক মরেছিল!

আমাদের বাড়ির 'এস্টেটের' বাসনপত্রগুলোর তখনও বিক্রিবাটা শেষ হয়নি। সরকারি লঙ্গরখানার রসুই কর্মের জন্য অতএব, যে বাসনপত্র, অর্থাৎ হাঁড়ি, ডেকচি, গামলা, বালতি, পরাত ইত্যাদি দরকার, তা ঐ স্থানে আমাদের বাড়িতেই ছিল। তখন তালুকদারি নেই। জেঠামশাই এবং নায়েবমশাই ইত্যাদি মহাজনেরা নানান কারুকার্য করে এই লঙ্গরখানার দায়, আমাদের বাড়িতেই নিলেন। সেই বয়সেও আমার বুঝতে অসুবিধে হয়নি যে এই ব্যবস্থাপনার পিছনে তাঁদের সাধারণ মনুষ্যদের স্বার্থ বা হিতচিন্তা কার্যকরী ছিল না। তাঁরা নিজ স্বার্থ সংরক্ষণেই এই দায় গ্রহণ করেছিলেন। রিলিফের টন টন চাল, তখন আসছিল সুদূর আমেরিকা থেকে। আমেরিকা তখন জেনারেল প্রেসিডেন্টের উপর বড় নেক নজরি ছিল। তাঁর তখন বৃহস্পতি তুঙ্গে। এ বিষয়ে তদনীন্তন সংবাদমালা নিয়ত দেশের এবং বিদেশের সংবাদপত্রে ছবিসহ বিদ্যমান। আমেরিকনদের হরবখত মদত আমরা ঐ অজগাঁয়ে বসেই প্রত্যক্ষ করেছি। তাঁরা তার বৃহস্পতি। বুদ্ধি দিয়েই

যাচ্ছেন। তাঁর উদ্ধারকল্পে তথা প্রতিষ্ঠা কামনায় টন টন চাল পাঠাচ্ছেন তাঁরা। জেঠামশাই, নায়েবমশাই, এঁরা সেই চালের ব্যবস্থাপনায় যদি অধিকারী হন তবেই না তাঁদের অনেক মুশকিল আসান হয়।

কিন্তু চাল এলেই তো শুধু হবেনা। তার অনুষঙ্গ ভোজ্য কি? সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর ওপারের যে বৃহস্পতি আমেরিকা চাল পাঠাচ্ছে, সে তো জানেনা যে এখানের মনুষ্য ভোজন বিষয়ে কতটা রসিক। তাই শুধু চালের বন্দোবস্তে লঙ্গরখানার ভিখিরিতম মানুষটিও তৃপ্ত হয়না। হয়ত পৃথিবীর সব স্থানের মানুষের দুর্ভিক্ষাবস্থা একরকমভাবে মোকাবেলা করা যায় না। বিশেষত আমার পিছারার খালের আশপাশ অঞ্চলের মানুষেরা শুধুমাত্র ভাত বা রুটি পেলেই যে তৃপ্ত হবে এমন কোনও পরম্পরা নেই। অথচ সময়টা দুর্ভিক্ষের। দুর্ভিক্ষ একারণে যে চাল নেই। তারা জানে না, তাদের এত চাল কোথায় গেল? আমাদের ঐ স্থানটিতে চাল না থাকাই দুর্ভিক্ষ। গম বা অন্য শস্যাদি সেখানে কখনও চালের পরিপূরক নয়। দিনভর আটাময়দা বা অন্য ভোজ্য খেলেও, তারা ভাবে সারাদিন উপোসেই থাকতে হল। তাদের খাদ্যের অভ্যেস একান্তই চাল-ধর্মী।

সকাল থেকে দূর দুরান্তরের 'হাভাতে' মানুষদের মিছিল আসত তখন। আমি তাদের নাম লিখতাম, টিপছাপ নিতাম কাগজে, কতজন খেল, কতজন এল এইসব হিসেবের। আমাদের দরদালানে লাইন দিয়ে বসিয়ে তাদের খাওয়ানো হত। ভাতের সাথে, অনুষঙ্গ হিসেবে ডাল থাকত একমাত্র সহকারী ভোজ্য হিসেবে। ঐ ডাল আনা হত রিলিফের কিছু চালের বিনিময়েই। কিন্তু তার পরিমাণ এতই কম যে ডালটাকে ডাল বলে চালানো খুবই কষ্টকর হত। এক সের ডালে যদি বিশ সের জল দেওয়া হয়, তাহলে যা দাঁড়ায়, এই ডালটি তাই হত। এটি আবার কখনও খিচুরি হিসেবেও তৈরি হত। সে আরও অনবদ্য। মানুষকে চালের মধ্যে ডালের অবস্থান বিষয়ে গবেষণা করতে হত তখন। ভাগ্যিস, হলুদ বলে একটা মশলা তখনও তেমন মহার্ঘ ছিল না, তাই রঙটা মানানসই করার চেষ্টা চলত। সেও তবু মন্দের ভাল। কিন্তু ডালই যেদিন ভাতের অনুষঙ্গ হত, সেদিন তাকে ন্যাতা ধোওয়া জল থেকে পৃথককরণ বড় কষ্টকর হত। আজকের দিনে এসব কথা কাউকে বলে বা লিখে বোঝানো সম্ভব নয়। শুধু একটা উদাহরণ বলি যে, ডালবোধে একদিন ভুলবশত ন্যাতাধোয়া জলই বভুক্ষু মানুষদের পরিবেশন করা হয়েছিল। অনেক পরে তা সবার নজরে পড়ে। সবাই সেই ন্যাতা-ধোয়া জলে ভাত মেখে, মুখে দিতে না দিতেই ওয়াক তুলতে শুরু করেছিল। আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম ডালে নুন পড়েনি। পরে, মায়ের নজরে ব্যাপারটি ধরা পড়তে মা কেঁদে ফেলেছিলেন। যদিও ভুলটা তাঁর ছিলনা। এই ভুলের সব দায়িকতা তথাপি নিজের উপরই নিয়ে, মা আকুল হয়ে, আমাদের বাড়ির ঠাকুরঘরের সিংহপালঙ্কের সামনে বসে বলেছিলেন, ঠাকুর, আমার এই পাপ তুমি ক্ষমা করইওনা যেন, আমারে এয়ার লইগ্যা শাস্তি দিও। এ পাপ আমার। কাকতালীয় হলেও মা এর শাস্তি একদিন পেয়েছিলেন, তা আমি নিজেই দেখেছি। সেদিন মা আর আমি এই ভুলের কথা, যাকে তিনি পাপ বলে

জেনেছিলেন, তা স্মরণ করেছিলাম। মা সেদিন ভুলবশত তার বড় ছেলের পাতেই ন্যাতা ধোয়া জল দিয়েছিলেন ডালের বদলে। তখনও এক দুর্ভিক্ষকাল, মধ্যষাটের দশকের খাদ্য অন্দোলন চলছে তখন। সে বর্তমান কাহিনীর অনেককাল পরের অন্য এক আকাশের নীচের বার্তা।

আমেরিকার খয়রাতি চাল নিয়ে সেদিন দুর্ভিক্ষের মোকাবেলায় নেমেছিল পাকিস্তানি ফৌজি সরকার। দেশের অন্যান্য জিলার তখন কি অবস্থা তা জানার কোনও উপায় আমার ঐ পিছারার খালের আশপাশের, বা তার তামাম চৌহদ্দির মানুষদের ছিল না। আমারতো নয়ই। আমি শুধু পিছারার খালের প্রান্তবর্তী জগতে মানুষদের অবস্থা, আমাদের বাড়ির ঐ লঙ্গরখানার 'লপ্‌সী' গেলাবার সময় যেটুক দেখেছি, সেকথাই জানাচ্ছি। অবশ্য এক্ষেত্রে শুধুই পিছারার খালের দুই কূলই নয়, বড় খালের বিস্তৃতির দুই পার্শ্ববর্তী বহু গ্রামের মানুষের দুর্ভাগ্যও দেখেছি তখন।

মার্কিন কাপড়ের চেহারা, রঙ এবং স্বভাব যেমন 'কোরা', মার্কিন চালের গতর এবং বর্ণও তেমনি। এই চালের চেহারায় যেটুকু সাহেবিয়ানা দেখেছি, তা হচ্ছে এর চাক্‌চিক্যে এবং লম্বা গতরে। এছাড়া এর আর কোনও সাহেবি কৌলীন্য ছিল না। সবাই বলত, বিলাতি চাউল তো, দ্যাখথে শোনতেই যা সাহেব গো ল্যাহান। নাইলে, যা স্বোয়াদ, এয়ারে চাউল কইবে কোন হালায়? হায় বালামের দেশের মানুষ কি কখনও বালামের স্বাদের নস্ট্যালজিয়া ভুলতে পারে? ফলত এই 'সায়েবি' চেহারার চালের স্বাদ পেটের জ্বালা মেটালেও জিভে 'তার' আনেনা। ভোক্তারা সবাই বলে, ক্যামনতারা য্যান ঠেহি, রবাট রবাট। চিবাই ঠিকই, ভাত বলইয়া মালুম অয়না। সোয়াদ কইতে কিচ্ছু নাই। রবাট অর্থে রাবার। ব্যাপারটা অনেকটা চ্যাপলিনের 'জুতোর' ভোজ খাওয়ার মতো। বালাম বিষয়ে পণ্ডিতেরা যা কবার কবেন। 'আফইত্য নাই'। তবে আমাদের অভ্যেস ঋতু অনুযায়ী অন্নভক্ষণ। আমাদের 'মাস মধ্যে মার্গশীর্ষ আপনি ভগবান', অর্থাৎ অগ্‌গেরান—অগ্রহায়ণ থেকে আমাদের চালের বিষয়ে 'আইশ্যাদির' শুরু। এ ব্যাপারে, সেই কালে আমাদের কোনও বেচাল কেউ দেখেনি। আর 'বেচাল চাল' খাবার অভ্যেসও আমাদের সেকালে ছিল না। আমাদের অন্ন ভক্ষণের শুরুয়াৎ অগ্রহায়ণ থেকেই। সেই 'ধান ঘরের' পর 'নবান্ন'। গাঁয়ের বুড়িরা এক সময় ভোরবেলা গাইতেন—

অগ্‌গেরাণ মাসেতে সবে নব অন্ন খায়।
আমার ঘরে কিষ্ণ নাই বংশী কে বাজায়॥

যদিও এই গান অতি পুরাতন, তথাপি পিছারার খালের জগতের ক্রমবিলীয়মানতার দিনগুলোতেও যখন এরকম ভাবে, অবশিষ্ট বুড়িরা গাইত, মনে হত, হায়! তাদের ঘরের কৃষ্ণ এখন কোন্ গোঠে গোচারণ করছে, কে জানে? অথচ বুড়িরা তখনও 'অগ্‌গেরান' মাসের 'নব অন্ন' মেখে নিয়ম পালন করে যাচ্ছেন। ধানপানের তরিবৎ তাঁরাই তো করছেন। নবান্নে 'আগুনি'র চাল না হলে তা শুদ্ধ হয় না। অঘ্রান থেকে আমাদের 'আগুনি' খাওয়ার 'আইশ্যা'। অঘ্রানে আগুনি, পৌষে পৌষালি, মাঘে তাবৎ ধান গোলায়।

পিঠাপায়েস মিষ্টান্ন 'জড়জাপটে' খেয়ে মানুষ তখন নতুন চালের গন্ধ ভুলে গেছে। তখনতো সব চালের একই নাম—আমন। আশুনি, শীতাশাল, ঝিঙ্গাশাল, বৌআরি, নলডোগ, আউশ এবং কার্তিকদল—এইসব আমাদের ঋতুকাল অনুযায়ী ভোজ্য। অবশ্য যারা গেরস্থালিতে শ্রীযুক্ত, ঋদ্ধিযুক্ত, তাদের জন্যেই এই ভোজ্যাচার। নচেৎ সাধারণ্যে সাধারণ চাল, সে চাউল অর্থেও আবার চাল্‌বাজি অর্থেও। তার নাম 'জয়না', সে হাটে গেলে রয়না, আবার বাবুদের পেটে গেলে, একেবারে সয়না। এরকম এক 'শোলোক' এখানের চাষি লোকেরা কয়। জয়না শেষ হলে, লাল লাল ডেঁয়ো পিঁপড়ের ডিমের মতো আউষ চাল এসে যায় হাট বাজারে, গেরস্থের গোলায় তো বটেই, তখন সেই চালের ভাত, সেই চালের চিঁড়ে এবং সেই চালের ফেনভাত 'মরিচপোড়া আর প্যাজ পোড়া দিয়া য্যান্ অমের্ত'। আমাদের জিভের 'তারের' তরিকা এমন। সেখানে 'রবাটের' মতো মার্কিন চাউল ক্যামনে সোয়াদ জোগায়?

তাছাড়া অন্য অনুষঙ্গি ভোজ্য ব্যাপার। মার্কিনি চাল এত কায়দার যে তার সাথে, খারকোল বাটা, খেসারির বড়া, শাপল্ চচ্চরি, শাপলার ঘণ্ট, 'চাড়্‌কাডা শাগ্', আক্রা ডগার ঝোল, সজনে ফুলের পাতরি, মালঞ্চ শাগ্, গিমা বেগুন, তেলাকুচার ডাঁটার সাথে মুগডালের ছেচ্‌কি, লাউ বা ছাঁচি কুমড়োর খোসা ভাজা এবং অনুরূপ আরও অনন্ত 'পদ' যেন আদৌ খাপ খায়না। একারণে ভোক্তারা এই সাহেবি চালকে চাল বলেই যেন ভাবতে পারে না। আমাদের চালেব স্বাদের সাথে এই চালের স্বাদের তুলনাই হতে পারে না। এখানের এই সব চালের স্বাদ, এবং ঘ্রাণ, এই সব বিভিন্ন অনুষঙ্গ যাদের জিভে, নাকে এবং মস্তিষ্কে গ্রথিত আছে, তারা কি এই মার্কিনি 'রবাট' চালের 'সোয়াদে' তুষ্ট হতে পারে?

বাড়িতে লঙ্গরখানার ব্যবস্থা তো কর্তামশায়রা করলন। নিত্যদিন শ'য়ে হাজারে মানুষ খাবে। কিন্তু তালুকদারি শেষ হবার পরে বাড়িতে তো আর সেই আগের মতো চাকর পাট, দাসদাসী বেঠ বেগাবরা নেই যে এই মোচ্ছব সামাল দেয়। কর্তারা শুধু চালের আমদানিটার দিকেই নজর রেখেছিলেন, ব্যাপক কর্মযজ্ঞর কথাটা তাঁদের মগজে আদৌ ছিল না। তাঁদের মাথায় পুরোনো ধারণাটিই বলবতী ছিল—চাল যখন আছে বাকি ব্যাপারগুলো সাবেকি ধরনে, স্বাভাবিকভাবেই হবে। রান্না কে করে, জ্বালানি কে জোগায়। আর এত মানুষকে পরিবেশন করার ব্যবস্থাই বা কি? এতো আর একদিনের ব্যাপার নয়। এ ব্যবস্থা কতদিন চলবে কেউ বলতে পারে না। কিন্তু বাবা, জেঠামশাই বা নায়েব মশাই এঁরা এর কিছুই ভাবলেন ন।

আমার মা বাড়ির সোনাবৌ ছিলেন। বরাবর বড় বৈঠকখানার আইশ্যজন পইশ্যজনের হ্যাপা সামলে দিতেন। এখন তাঁর নিজের স্বামী সন্তানদের নিয়েই তিনি পেরে ওঠেন না। একুনে আট নটা পেটের অন্ন রান্না করেই তিনি জেরবার। তথাপি দেখলাম কর্তাদের ত্রাণ করতে তিনিই এগিয়ে এলেন। তিনিই তাঁর স্বামী সন্তানদের অন্ন সংস্থান করছেন এরকম একটি সূক্ষ্ম বোধও তাঁর মনে কাজ করছিল বলে বোধ হয়। বিশ সেরি, ত্রিশ

সেরি ডেগে, কড়াই-এ রান্না করার মতো এক অমানুষিক পরিশ্রমের কাজ তিনি আরম্ভ করলেন। এমন কি ঐগুলি উনুন থেকে নামাবার, ভাতের মাড় গালবার জন্য বড় বড় ঝুড়িতে ঢালার সময়েও বিশেষ সাহায্য তিনি পুরুষদের কাছ থেকে পেতেন না। বাবা সাহায্য করতে তৎপর ছিলেন বটে, তবে তিনি এককালের বড়লোকের আলালী বেটা, এসব দৈহিক কর্মে অকর্মার তালুকদার। তাঁর সাধ্য কি এই ভীমবল্লভী কর্ম করেন। ফলে মায়ের উপর চাপ পড়ল পাহাড় প্রমাণ। চাপ আমার উপরও পড়ল।

তারপর জ্বালানি সমস্যা। জ্বালানি বলতে কাঠ। কাঠের উনুনে রান্নার ব্যবস্থা আমাদের ওখানে। আমি আর আমার পরের ভাইটা, ছোটন, কুড়ুল নিয়ে বন জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে আনতাম। তখন আমরা দুজনেই গতর খাটানোর বয়সের সন্ধিক্ষণে এসে পড়েছি। তাই ঐ বিপুল অন্নযজ্ঞের সমিধ সংগ্রহের দায়িত্ব আমাদের উপর পড়ল। এ ব্যাপারে কিন্তু কর্তাদের আভিজাত্যে ফাটল ধরল না। আমার ঐ সময়কার স্মৃতি বড় করুণ। তখন মোটামুটি জানা-বোঝার বয়সে পৌঁছেছি। আমার দেশে, যেখানে অসুমার ধান তাব রূপশালী মহিমা নিয়ে বর্ষা, শরত এবং হেমন্তের মাঠে তার রূপ, রস, বর্ণ এবং ঘ্রাণে আমাদের আবহমানকাল তৃপ্তি দিয়েছে, যেখানের চাষির গলায় প্রেমের গান ছাড়া কোনও হুতাশ শুনিনি কোনওদিন, সেই দেশের চাষিরা আজ কোন সুদূর সাগর পাড়ের কোন দেশ থেকে আসা অপরিচিত এবং অশ্রদ্ধার অন্ন মুখে তুলছ ভিখিরির মতো। সে অন্নে স্বাদ নেই, তৃপ্তি নেই, পরিবেশনে সামান্যতম শ্রদ্ধা বা সম্মান দূরস্থান, দয়া অথবা করুণাও নেই। সেই অন্ন তারা পেটের তাড়নায় খাচ্ছে এ যে কি হৃদয় বিদারক দৃশ্য, যারা তা দেখে নি, তাদের বোঝানো অসম্ভব।

কিন্তু তবুও তা অন্ন। পেটে গিয়ে মানুষকে দু দণ্ড সম্বিৎ দেয় অন্য ভাবনা ভাবতে। আমি এই সময়ের এই মানুষদের অনেককেই জানি যারা, এই অন্নগ্রহণের জন্য দ্বিতীয়বার আর আসেনি। দু'একজন অসম্মানের জ্বালা জুড়োতে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছেও। অন্ন গ্রহণের এমত অসম্মান তারা সহ্য করতে পারে নি। কত মানুষ যে সেই সময় তাদের বাড়িঘর জমি জিরেত বিক্রি করে ছিন্নমূল ভিখিরি হয়ে গিয়েছিল তার পরিসংখ্যান কেউ করেন নি। সে যুগে, অন্তত আমরা দেখিনি। মানুষই বা কত সংখ্যক মারা গিয়েছিল তার হিসেবও জানা নেই। দুর্ভিক্ষ, অন্যান্য বিপর্যয়ের মতোই স্বাভাবিক ভাবে অপবর্গীদের বিপত্তি ঘটায়। তখন এখানকার অপবর্গীদের রাষ্ট্রীয় কারণে দুটো সম্প্রদায়, সংখ্যালঘুরা ইতিপূবে বার্ণত ঘটনা সমূহের কারণে তখন আধাগেরস্ত। তাঁদের এক পা ঘরে তো অপর পা বাইরে। কেউ দেশ ছেড়েছে, কেউবা ছাড়ব-কি-ছাড়ব-না এরকম দোটানায়। সংখ্যাগুরু অপবর্গীদের অন্তত এই ব্যাপারটা ছিল না বলে এবং তাদের গেরস্থালি ঠিক এরকম সংকটের সম্মুখীন না হওয়ার কারণে, দুভিক্ষ সংখ্যালঘু অপবর্গীদের জন্যই যেন চরমতম আঘাত ছিল। সংখ্যাগুরুদের সমস্যা এই দুর্ভিক্ষকালে খুব একটা অসহনীয় হয়নি, এরকমই পিছারার খালের আশপাশে আমি দেখেছি। আমার এই অভিজ্ঞতা নিতান্তই আঞ্চলিক এবং সে এক ক্ষুদ্র অঞ্চল। অতএব এর মাধ্যমে

আমি অবশ্যই ঘটনাটিকে একটা পরিকল্পিত সাম্প্রদায়িক দুর্ভিক্ষ হিসেবে পুরোপুরি চিহ্নিত করতে চাইছি না। সংখ্যালঘু অপবর্গীদের দুর্ভিক্ষকালীন সমস্যা এবং সংখ্যাগুরু অপবর্গীদের অনুরূপ সমস্যার মধ্যে যে একটা ভিন্ন মাত্রা তখন কার্যগতিকে বাস্তব ছিল, সেই কথাটিই বলতে চাইছি। কারণ আমার পিছারার খালের 'হিন্দু' সীমান্তের অপরদিকে যে সখ্যাগুরু অপবর্গীদের গ্রাম, সেখানে ঐ সময় কোনও লঙ্গরখানা হয়নি। অথবা আমাদের বড় খালের অপর পারেও তাদের এলাকার দুর্ভিক্ষকে মোকাবেলার কোনও ব্যবস্থা আমার নজরে পড়েনি। থাকলে অবশ্যই পড়ত। সে যা হোক, আমাদের লঙ্গরখানায় যে সব মানুস আসত, তারা সবাই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এবং তারা যে ঐ অখাদ্য অন্ন খাবার প্রত্যাশায়, তাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ইত্যাদি সহ কত দূর দূর গ্রাম থেকে আসত। হায়! তাদের মধ্যে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের একমাত্র ভিখিরিরা ছাড়া কোনও গেরস্থ মানুষকে দেখিনি। এরা বার বাড়ির অঙ্গনে ভিড় করে থাকত এবং সবার খাওয়া দাওয়া শেষ হলে, আল্লারওয়াস্তে মোগো দুগ্‌গা ভাত দেন বলে কাকুতি মিনতি জানাত। আমার মা, এদের জন্য কিছু ভাত আলাদা করে রেখে দিতেন। সবাই চলে গেলে, আমাকে দিয়ে তাদের দেওয়াতেন। সংখ্যাগুরুদের গ্রামে এ সময়ে যে আলাদা লঙ্গরখানা ছিল না তার প্রমাণ হিসেবেই একথাটি বললাম।

বাবা যে একটু কবি প্রকৃতির মনুষ্য, একথা আগেই বলেছি। এ কারণে তাঁর মাঝে মাঝেই নানারকম সন্তাপ দেখতাম। বলতেন, মানুষের দুর্ভিক্ষের অন্নে ভাগ বসাচ্ছি, এ যে কি দীনতা! প্রায়শই তাঁর এরকম শোক উথ্‌লে উঠত এবং চোখে জলধারা। মা কদাচ বাবার এই উথ্‌লে ওঠা শোক বিষয়ে কিছু মন্তব্য করতেন। বরাবরই তিনি বাবার ছায়া-প্রায়। তাঁর বাক্য মায়ের কাছে শেষ বাক্য। কিন্তু বাবার এবারের দুঃখ বিলাসে মা খুবই তীক্ষ্ণ হলেন। জীবনে কোনও দিনই এরকম আচরণ তাঁর দেখিনি। বাবা বলছিলেন, আমাগো ভাত পরেরাই কত খাইত। আর এহন? এহন দ্যাহ, আমরা মাইন্‌সের দুর্ভিক্ষের অন্ন দিয়া নিজেগো প্যাট ভরাইতে আছি। এ তো পাপের অন্ন। বাবা এরকম ভাবেই সব কিছুর সহজ বিচার করতেন। কিন্তু মা এবার এবং আবারও বলি এই একবারই তীব্র বাক্য ব্যবহারে বাবাকে স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন। তিনি যে এরকম বাক্য বলতে পারেন বা এ রকম কোনও অভিমান তাঁর চিন্তায় বা হৃদয়ে ছিল আগে কোনও দিন তা জানিনি। বুঝতেও চেষ্টা করিনি। তাছাড়া মাকে বাবার মুখে মুখে কথা বলতেও তো দেখিনি কোনওদিন।

মা বলেছিলেন, এ ভাত তোমাগো লইগ্যা পাপের ভাত কিনা আমি জানি না। তয় আমার আর আমার পোলা মাইয়ার লইগ্যা যদি এয়া পাপের অন্ন, তয় কাইল থিহা এর ব্যবস্থায় আমরা আর থাকুম না। তোমরা যা পার করইও।

নিয়ত হাড়ভাঙ্গা শ্রমে তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটেনি। কিন্তু যে মানুষ নিজের স্ত্রী এবং অপরিণত বয়স্ক সন্তানদের সারাদিন ঐ কঠোর পরিশ্রম করতে দেখেও একটা সহানুভূতির কথাও বলেন না, তাঁর এহেন দুঃখবিলাস মাকে সেদিন বেশ ক্রুদ্ধ করে

তুলেছিল। সেদিন তিনি বাবাকে আরও অনেক কিছুই বলেছিলেন যা এতদিন বাদেও কানের কাছে ঝন্ঝন্ করে বাজছে। তিনি বলেছিলেন, এ ভাত খাইতে তোমাগো লজ্জা করে, মনে কষ্ট অয়, না? আর এতকাল যে অন্ন খাইছ, হেয়াতে কষ্ট বাস নায়? হেয়াও তো দুব্বিক্কের অন্ন। তয় হে দুব্বিক্ক আমাগো আছেলে না, য্যারগো আছেলে হ্যারগো লইগ্যা তহন তো ভাব নায়?

বাবা এসব কথা শুনতে অভ্যস্থ ছিলেন না। যুগানুযায়ী তাঁর মনটা যে খুব অপরিচ্ছন্ন ছিল তা নয়। তবে তাঁর মানবিকতা বোধের কাঠামোটা ছিল প্রকৃতই সামন্তসুলভ। সে কারণে, কোনও দ্রব্য তিনি প্রার্থীকে দিয়ে তাকে কৃতার্থ করার দাম্ভিক আনন্দ বা তৃপ্তি উপভোগ করতেন, কিন্তু নিজের স্ত্রী সন্তানদের শ্রম বিক্রয়ের সহজ সত্যটা তাঁর নজরে পড়ত না। মা, মূলত গরিব ঘরের মেয়ে ছিলেন। বোধহয় অনেকটা পোড় খেয়েই বাবা জেঠামশাই-এর এই মানসিকতটা বুঝতে পেরেছিলেন। একারণে তাঁর ঐ রকম তীক্ষ্নতা জীবনে একবার হলেও দেখেছিলাম।

মায়ের প্রতি বাবার ভালবাসা বা সহানুভূতির ঘাটতি ছিল না। কিন্তু নিরন্তর সন্তানের জন্ম দিতে দিতে আমাদের মায়ের শরীর নিতান্ত অস্থিচর্মসার এবং দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তার উপর ছিল দীর্ঘকালীন অম্লশূল ব্যথার নৈমিত্তিক অসহ্য যন্ত্রণা। প্রতিদিনই অবেলায় খেয়ে, খানিকক্ষণ বাদেই প্রচণ্ড ব্যথার প্রকোপে তাঁকে চিৎকার করতে দেখতাম। মুঠো, মুঠো খাবার সাড়া গিলে তাঁকে ব্যথা প্রশমন করতে হত। একটা সময় অবশ্য বাবা ক্যালবিসমা বলে একটা ওষুধের নিয়মিত ব্যবস্থা করেছিলেন।

— সতেরো —

আমাদের বাড়ির নির্মাণ, তার গেরস্থালির সৌষ্ঠব, সৌকর্য, যেমন আস্তে আস্তে গড়ে উঠেছিল এক সুদীর্ঘ সময় ধরে, তার বিলয়ও তেমনই এক মন্দাক্রান্তা ছন্দ ধরেই হচ্ছিল। আর এর সাথেই পিছারার খালের আশপাশের উত্থান এবং বিলয় যেন এক নির্ধারিত ক্রমে ঘটছিল। আমাদের গেরস্থালির ব্যাপকতার জন্য তার স্থায়িত্ব শেষ হয়েও যেন শেষ হচ্ছিল না, বাকি পরিবারগুলোর ব্যাপকতা ঐ মাপের ছিল না বলে তাদের শেষ হয়ে যাওয়াটা চট্‌জলদি নজরে পড়ছিল।

আমরা আমাদের প্রাচীন অবস্থান থেকে একটু একটু করে খসে পড়ছিলাম এবং দুর্ভিক্ষ পরবর্তীকালে বাড়ির তাবৎ আভিজাত্যের সেই সময়কার খোলসটুকুও পরিত্যাগ করে একদিকে এক ধ্বংসের গহ্বর, অন্যদিকে পিছারার খালের ক্ষীণ সোঁতাটুকুই শুধু অবলম্বনীয় হয়ে দাঁড়াল। হয় ঐ ধ্বংসের গহ্বরে আমাকে আমার অনুজ, অনুজাদের নিয়ে বিলীন হতে হবে, অথবা পিছারার খালের ঐ অবশিষ্ট ক্ষীণ ধারাটি আশ্রয় করে বড় খালে এবং তারপর আরও বড় খাল বা নদীকে অবলম্বন করতে হবে। ঐ ক্ষীণ সোঁতাটুকুই আমাকে যেন তখন হাতছানি দিল নতুন এক নির্মাণের দিকে। বাবার অবস্থা তখনও ভবভূতির অনুভূতিতে আচ্ছন্ন—'যদুপতে কাঃ সা মথুরাপুরী? রঘুপতে কাঃ

গতোত্তরা কোশলা', এবং তদের পক্ষ সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমি তো তখন কিশোর, আমার তো সেই অনুভূতি বা নৈরাশ আশ্রয় করে বসে থাকলে চলবে না। তাই পিছারার খালের সোঁতাকেই অবলম্বন করলাম। এই সোঁতাই এক সময় বড় খালের আপেক্ষিক বৃহৎ বিশ্বে আমাকে পৌঁছে দিল। তারপর এক সময় সেই বড় খালটি সামনের এক নদীতে আমাকে পৌঁছে দিলে, বড়খালও পিছারার খাল হয়ে গেল এবং এই ক্রমতা চলতেই থাকল। তবে বড়খাল থেকে সামনের ঐ প্রায় স্বপ্নের নদীতে পৌঁছোতে আমার বেশ কয়েক বছর স্রোতের প্রতিকূলে সাঁতার কাটতে হয়েছিল। এখন ঐ পিছারার সোঁতা ধরে বড় খালে পৌঁছোনোর গল্পই বলি।

পিছারার খালটি যেখানে বড় খালে গিয়ে মিশেছে তার উল্টোপাড়ের ছৈলা গাছের ঝোপটি পেরোলেই ছিল আমার দাদীআম্মার বাড়ি। জাওলা বা কাউফ্লা আর সুপারি গাছের ঘন বুনোটের আব্রুর ফাঁক দিয়ে, গোলপাতার ছাউনি আর হোগোলের বেড়ার যে কুটিরটি আমরা বড়খালে চিংড়িমাছ হাতড়ে বেড়াবার সময় দেখতাম সেটিই ছিল দাদীআম্মার ঘর। তখন এরকম চিংড়ি হাতড়ে বেড়ানোর সময়ই একদিন তাঁর সাথে আমার দেখা হয়ে গেল। আমরা বড় খালের এবং পিছারার খালের দুকূলের হিন্দু-মুসলমান ছেলেরা ভাদ্র-আশ্বিনের জলে ডুব দিয়ে দিয়ে চিংড়িমাছ ধরতাম। দাদীআম্মা তখন ঐ ছৈলাগাছের ঝুপড়িতে দাঁড়িয়ে 'ছাবি' দিয়ে চিংড়ি বা কুচোকাচা মাছ ধরতেন। সাদা ধবধবে চুল, পরিষ্কার সাদা নরুণপাড় কাপড় পরা, বেশ উজ্জ্বল গায়ের রঙ এবং অসামান্য অভিজাত চেহারার এই মহিলাকে আমরা রোজই দেখতাম। তাঁর চেহারার সাথে, ছাবি নিয়ে মাছ ধরার ব্যাপারটির একটা বিরোধ আমার নজরে পড়েছিল। চিংড়িমাছ ধরার কৌশল বিষয়ে আমি আদৌ দক্ষ ছিলাম না। ঘন্টার পর ঘন্টা হাতড়ে হাতড়ে অন্য সাথিরা যখন তাদের কোঁচড় ভরিয়ে ফেলত, আমার কোঁচড়ে তখন প্রায় কিছুই থাকত ন। এ ব্যাপারে যে একটা সূক্ষ্ম কৌশল আছে, তা আমি জানতামই না। সাথিরা সবাই তা জানত এবং এ কারণে আমাকে তারা বড়ই করুণা করত। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করত, অরা কি এসব পারে? না এয়া অরগো কাম? অরা তো বড় ঘরের ছাওয়াল। এবং এর সাথে ওদের একটা আহাভাবও থাকত, যা আমাকে নিয়ত বিদ্ধ করত যেন। ভাবতাম, আমি কেন ওদের মতো ঘরে জন্মাইনি? আমি কেন ওদের মতো এইসব কাজের অন্ধিসন্ধি জানিনা? আমি কেন ওদের থেকে আলাদা? আমি এত অপদার্থ কেন?

এরকম সময় একদিন, বেলা তখন প্রায় ঢলে পড়ছে। সাথিরা অনেকটাই আমাকে ফেলে এগিয়ে গেছে, ছৈলাগাছের গূঢ়স্থান থেকে দাদীআম্মা আমায় ডাকলেন। এর আগে তাঁর সাথে পরিচয় বা বাক্যালাপ কোনওদিন হয়নি। তাঁকে ওখানে দেখতাম এই পর্যন্ত। ঐ দিন একলা পড়ে গিয়েছি বলেই তিনি বোধহয় ডেকেছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন,

: কিছু ধরতে পারছ?

: না, এট্টাও পাই নাই। আমি ঠিক পারি না।

: ক্যান্, পারনা ক্যান?

: কায়দাটাই বোজতে পারি না। ধরতে যাই, ফট্‌ফট্ বেবাক সরইয়া যায়। আমি খালি হাতড়াই।

: খালি হাতড়াইয়া লাভ আছে? থাহ কোতায়? কোন বাড়ির পোলা?

পরচয় দিতে বুড়ির হাত থেকে হঠাৎ ছাবির দড়িটি খসে যায়। 'ছাবি' হঠাৎ-স্বাধীনতায় খালের ঘোলা জলে আস্তে আস্তে তলিয়ে যায়। তিনি শুধু একটা চাপা আর্তনাদ করে ওঠেন—'হায় আল্লাহ্'! তাঁর এমত আচরণের কারণ বুঝতে পেরেও আমি মাছ হাতড়ানোর কাজ বন্ধ করিনা। কেননা, এরকম হুতাশ পিছারার খাল অতিক্রম করার সময়ে অনেক শুনেছি এবং বড় খালে পৌঁছোনোর তাগিদে সব ঝেড়ে ফেলে দিয়েছি। বুড়ি যেন হঠাৎ এক প্রগাঢ় আবির্ভাবে, কোনও প্রাচীন আভিজাত্যে মূর্ত হয়ে উঠে আমাকে হুকুম করেন—

: উড়ইয়া আয়। তোর লগে মোর বাত্ আছে।

: কি বাত?

: আগে উডইয়া আয়, কমু হ্যানে।—আমার উঠে না আসার ক্ষমতা থাকে না যেন। সিক্তবসন আমি তাঁর পেছনে পেছনে জাওলা, সুপারি, কলাগাছের ঘেরাটোপের আড়ালের সেই গোলপাতার কুটিরে পৌঁছোই।

দাদী পিছনে তাকান না। সোজা ঘরের অভ্যন্তরে গিয়ে একটি গামছা আর লুঙ্গি নিয়ে বেরিয়ে এসে বলেন, গা, হাত, পা মোছ আর এই লুঙ্গিডা পর। মুই আইতে আছি। সামনের দলুজে একটি মোটা পাটি পেতে সেখানে বিশ্রাম করার ইংগিত দিয়ে বুড়ি ভিতরে চলে গেলেন। আমি তার আদেশমতো সব করে পাটির উপর বসলাম। বুড়ি পিসিমা, নগেন জেঠিমাদের পর এরকম আভিজাত্যপূর্ণ আদেশ এই বয়সি কোনও মহিলার কাছ থেকে পাইনি বলে, এ আমার বেশ লাগল। মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমি তাঁর প্রতিটি নির্দেশের রণন যেন শরীরের সমস্ত কোষে অনুভব করলাম। আমার অসম্ভব ভাল লাগছিল। তখন আশ্বিনের শুরু। কিন্তু আকাশে একফোঁটাও মেঘ ছিল না। বুড়ির উঠোনে, তাঁর পোষা রাওয়া আর মুরগিগুলো অকাতরে স্বাভাবিক অসভ্যতা করে বেড়াচ্ছিল। তাঁর নাতি নাতনিরা একেকজন এসে আমাকে দেখে যাচ্ছিল এবং তখন জীবন বড়ই মোহময় হয়ে, খুবই করুণ এবং তাচ্ছিল্যের চোখে আমার পেছনে ফেলে আসা অট্টালিকাপ্রতিম বাড়িটার শীর্ষ কার্নিশটা তির্যক দৃষ্টিতে দেখছিল। তখন বুড়ি একখানা প্রাচীন তামার রেকাবিতে কিছু মিষ্টান্ন, দেশজ কিছু কাটা ফল এবং একটা কাঁসার গেলাসে এক গেলাস ডাবের জল নিয়ে এসে বললেন—এগুলা খাও। এ খাবার খাইলে য়িন্দুগো জাইত যায় না। মুই জানি। আমার পেটে তখন অনন্ত বুভুক্ষা। আমি গোগ্রাসে সবই খেলাম। বুড়ি বললেন, এহন খানিক্ষণ জিরাও, বেলা পড়লে, বাড়ি যাবা হ্যানে। আমি শুধোই, কি জানো কতা আছে কইছেলেন হেয়াতো কইলেন না? তিনি বললেন, কমু, তয় আইজ না। হায় আল্লাহ্! মাইন্‌সের ভাইগ্যে তুমি যে কি

লেইখ্যা রাহ, হেয়ানি মাইনসে বোঝতে পারে?—আমি তাঁর আচরণের সংগতি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। একথা সত্য যে এই সব মানুষের কাছে, আমি যে-বাড়ির ছেলে তার এইভাবে প্রকাশ এক আশ্চর্যের ব্যাপার। তারা কখনও এ ঘটনাগুলো স্বাভাবিকভাবে নিতে পারেন না। কিন্তু ঐ বুড়ি ওরকম এক আভিজাত্যে হঠাৎ কেমন করে পৌঁছে গিয়ে আমাকে ওভাবে আদেশ করতে পারেন। এ ধন্দ ঐ বয়সেও আমার মধ্যে ছিল। সে যাই হোক্, এই বুড়ি অতঃপর আমার দাদীআম্মা হলেন এবং তাঁর সাথে এক প্রগাঢ় আত্মীয়তায় আমি বাঁধা পড়লাম।

এরপর থেকে যখনই ঐ ছৈলা গাছের শেকড়ের কাছটিতে পৌঁছোতাম তখনই দাদীআম্মাকে দেখতাম ছাবি নিয়ে ঘুষা ধরার কৌশল করছেন। ছাবি হচ্ছে ছোট মাছ ধরার এক ধরনের অবলম্ব। একটুকরো বর্গাকৃতি ন্যাকড়ার ফালিকে দুটি বাঁশের কঞ্চি বেঁকিয়ে একটা বড় মুখ থলির মতো করা হয়। বাঁশের কঞ্চি দুটি একটা যোগ চিহ্নের ধনুর্গুণ যেন। ন্যাকড়ার মাঝখানে থাকে 'গাঙের' একদলা মাটি আর তার উপরে ছড়িয়ে দেওয়া হয় কিছু তুষ বা কুঁড়ো। কঞ্চি দুটির সন্ধিতে একটি রশি বেঁধে তাকে জলে ডুবিয়ে রাখতে হয়। একাজে মেয়েরাই সাধারণত দক্ষ। ঐ তুষ কুঁড়োর লোভে ঘুষা চিংড়ি এবং ছোট ছোট নানান মাছ ঐ ছাবির মধ্যে এসে জড়ো হয়। তখন আস্তে আস্তে রশিটি গুটিয়ে তুলে এনে মাছগুলি সংগ্রহ করা হয়। এই হচ্ছে ছাবির কৃৎ কৌশল। সে যাহোক, দাদীআম্মার সাথে সম্পর্ক হওয়ার পর ঐ ছৈলা গাছের আশপাশে আমার হাতড়ানো অসম্ভব বেড়ে গেল। সাথিরা যখন হাতড়াতে হাতড়াতে দৃষ্টির বাইরে চলে যেত, আমি ঐ স্থান থেকে যেন বেরোতেই পারতাম না। সব সময় দাদীআম্মা ওখানে থাকতেন না বলেই এমনটি হত। বুড়ি নিজেও আমার এই খেলাটি বুঝে থাকবেন। তিনি এসেই আদেশ করতেন—উডইয়া আয়, ঘরে চল। আমি তাঁর এই আদেশের বংশবদতা স্বীকার করে নিয়েছিলাম। এসব স্মৃতি এখন বা বহুকাল ধরেই যেন হাঁসের ডিমের কুসুমের মতো লালচে হলুদ রঙ হয়ে বা স্বপ্নের জ্যোৎস্নার মতো এক অশরীরী নাজুক বিহ্বলতায় আমার শরীর মন, তথা গোটা অস্তিত্বকে সারাজীবন জড়িয়ে থাকল। এই সম্পর্ক এখনও আমার প্রাণের মধ্যে অনুভূতির স্তরে স্তরে এক বেদনার মতো দোলন দিয়ে যায়। একারণেই এই আধপোড়া প্রৌঢ়ান্ত কালেও ঐ কুসুম লাল হলুদ রঙটির আভাস ধরেই পথ হাঁটি। সেই সময়টিতেও এ রকমই পথ অতিক্রম আমার নিয়ত দেখা স্বপ্নের মতোই অনিবার্য ছিল। সেই পথের প্রান্তে এক সমুদ্রতীরে অনন্তকালীন মানুষ, যাদের নাম উদ্বাস্তু, তারা যেন মুসার অনুগামীদের মতো ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকে একটা অলৌকিকতার অপেক্ষায়। যে অলৌকিকতা তাদের এক নিরাপদ উপকূলে পৌঁছে দেবে এবং তারা লাভ করবে এক সুস্থিত ভূখণ্ড, এই বিশ্বাসে। কিন্তু হায়! কোনও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নবী কখনওই তার অলৌকিক দণ্ডটি নিয়ে আমার অথবা অপেক্ষমাণ ঐ উদ্বাস্তুদের সামনে এসে দাঁড়ান না। সামনের সমুদ্র ফুঁসতেই থাকে আর পিছনে যেন ফেরাউনের সৈন্যদের কোলাহল ক্রমশ নিকটবর্তী হয়।

দাদীআম্মা বলতেন, বোজলা কিনা আমরা বাঙ্গালিরা আসলেই টেপ্‌পোনা। ভাসইয়া বেড়ানোই, মোরগো নসীব। হে কারণে দ্যাহ মুই ভাসতে ভাসতে এই বড় খালধারে এট্টু মাডি পাইলাম। এহানে মোর এট্টু শেহড় গজাইলে। তয় এ শেহড়ও থাকপে না। যদি জিগাও, ক্যান্? তো মোর ধারে হ্যার জবাব আছে পুরা একখান কেতাব। তো হে কেতাব ল্যাহা ছাপা নাই, থাকেও না। হে কেতাব কেরমশ বাড়তেই থাহে—যদি তুমি বেয়াক পরণ কতার কতাগুলা তোমার পোলারে দেও, তোমার পোলায় যদি হ্যার পোলারে দে, হেই পোলায় যদি হের আওলাদগো দিতে দিতে আউগ্‌গায়। কিন্তু হেয়াতো অয়না শেহড় যহন ছেড়ে তহন পরণকতাও আস্তে আস্তে হুগাইতে থাহে আর এই আলেহা পুথির গতর অয় দুবলা। তহন হেয়ার মইদ্যে হক্‌কতা থাহে না কিচ্ছু—খালি ঝুডা কতা, মিছা কতার আপ্যাচলা প্যানাই থাহে।

এ রকম বিন্যাসে দাদীআম্মার কথন। বুড়ি পিসিমাদের ব্রত কথার কিলিকিলি বাওনজির গল্পের, তাদের স্বপ্ন দেখার এবং স্বপ্ন নষ্ট হওয়ার এক অলিখিত প্রতিবিনির্মাণ পাই যেন দাদীআম্মার কথনে। বুড়ির তহজিব তমুদ্দুন বড় গভীরে প্রোথিত। দাদীআম্মার মানস জগত আমার বুড়ি পিসিমাদের আচরিত ব্রত পার্বণের তথা আকাঙ্ক্ষার জগত থেকে যেন অনেক প্রগাঢ়। কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই একটা মিল সেখানে আমি পাই।

দাদীআম্মা, পিছারার খালের ইতিপূর্বের যাপিত জীবনের শূন্যতা অনেকটাই ভরাট করে এক নতুন চরৈবেতির উপত্যকায় যেন পৌঁছে দেন। আমার জীবন এভাবে ক্রমশ এক নতুন সার্থকতার আনন্দ উপভোগে অর্থময় হয়। পিছারার খালের দুপারের শূন্যতা বড় খালের ধারের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ঘন বসতির জমজমাটে যেন এক অন্য উষ্ণতা পেতে শুরু করে। পিছারার খালের আশপাশ গ্রামের শূন্য হওনে আমার যে মানসিক অবসাদ শুরু হয়ে আমাকে এক নিঃসীম নিঃসঙ্গতার প্রান্তরে পৌঁছে দিয়েছিল সেই নিঃসঙ্গতা ক্রমশ দূর হয়ে আমাকে দাদীআম্মার জগতের স্বজনে স্থাপিত করে পিছারার খালের বিশ্বের নির্জনতা ভুলিয়ে দিল।

আমার ঘুষা চিংড়ি ধরার কৌশল তখন প্রায় শেষ। দাদীআম্মার বাড়িতে তখন প্রায় প্রত্যহই আমার ফলারের আয়োজন মজুত থাকে। ছৈলাগাছের আনাচ কানাচে পৌঁছোলেই উড়ইয়া আয় এই ডাক শুনি। নিয়মিতভাবে আমিও উডইয়া যাই তাঁর পেছন ধরে। আমার সাথে আরও বেশ কয়েকটি পোলাপান থাকে, তাদের কেউ হিন্দু, কেউ মোছলমান। আমরা হিন্দুরা তাদের বলি, শ্যাখ। দাদীআম্মার আপ্যায়নে শ্যাখ হিন্দুর তফাৎ থাকে না। সবার পাতেই তার ফলারের সামগ্রী পড়ে। এমত সময় একদিন দাদী জিজ্ঞেস করেন, হারাদিন থাকবি তো? বললাম, হঁ।

: খাবি কি?

: যা দেবা।

: পাহানইয়া, না আপাহান্ইয়া? বলে বুড়ি মুচকি হাসেন।

: যেমন তোমার দেল চায়। আমার কোনো আফইত্য নাই।

: তয় আইজ পাহানইয়াই খা। কিন্তু একতা পাচ কান্ করিস না? পাচকান অইলেই জাইত যায়। না অইলে যায় না। আসলে মোরগো কোনও জাইত নাই। না মুই শরীয়তী মোমেন মোছোলমানের বেওয়া, না তুই নিয়মের য়িন্দু। মোরগো হিসাব কিত্তোব বেয়াক আলাক্।

: হেয়া কেমন? এ প্রশ্নের উত্তরে বুড়ি এক পরণ কথা বলে। সে পরণ কথা তার প্রাচীন হৃদয়ের গভীরে ছিল এতকাল, যেন বহু বহুকাল ধরে যা এখন কথনে গতি পায়। সে পরণ কথা এখন আমাদেরকে এক প্রদোষকালীন প্রাকৃত অবস্থার সারবত্তাকে অবলম্বন করতে বলে। অথবা দাদীআম্মা, তার দলুজে বসা আমাদের কচিকাচার দঙ্গল, সামনের বয়ে যাওয়া খাল, হিজল, ছৈলা, কাউফ্লা, সুপারি আর কলাগাছের সারি, দূরের জাহাজঘাটা, নদী, আশ্বিনের অপরাহ্নের অলস কাঁচা হলুদ রোদ্দুর আর ঐ আবেষ্টনীর ফাঁক থেকে উঁকি মারা চৌধুরীদের সিং দরজায় জোড়া সিংহ, ভগ্ন দেউলের চূড়া, সবই যেন এক প্রাকৃত প্রদোষের প্রর্দশনী হয়। ছবি হয় যেন। তারপর দাদীআম্মা সেই ছবিতে কথা কিংবদন্তির শব্দ বুনোট করে, আরও গভীর গহন এক প্রাকৃতের ইতিকথার পরণ কথার ঝাঁপি নিয়ে বসেন এবং বলতে থাকেন, তয় শোন। কিন্তু অতীব আশ্চর্যময় এক অনুভবে আজও ভাবি, আমাদের সেই শ্রোতা মহলের মধ্যে দেশের তৎকালীন বিভেদের বাষ্প কিছুমাত্র প্রভাব বিস্তার লাভ করত না তখন। কোনও হিংসার স্ফুলিঙ্গ ঐ সবুজ বনে কোনও কোমল পত্রিকার উপর এসে পড়ে কোনও দগ্ধতার ক্ষত সৃষ্টি করেনি। ইতিপূর্বের কথনের তাবৎ তিক্ততার অভিজ্ঞতা ভুলে আমরা বড় খালের উজান বেয়ে চিংড়ি মাছ ধরার এক অনুপম কামারাদারি এবং দাদীআম্মার পরণ কথার বুনোটে দিব্য একটি একক সত্তায় পরিণত হলাম যেন। দাদীআম্মার পরণ কথায় এক মহামিলনের সূত্র ছিল হয়ত। তিনি বড় সুন্দর এবং স্বাভাবিকতায় সেই পরণ কথা বলতেন যা ইতিপূর্বের বলা বুড়ি পিসিমাদের ব্রত কথার থেকেও গাঢ় এবং মহিমান্বিত।

চন্দ্রদ্বীপ নরেশ রায় রামচন্দ্র দেব, যিনি কৌলিক পরিচয়ে রামচন্দ্র বসু। তাঁর পুত্র কীর্তিনারায়ণ ঢাকায় মুসলমান নবাবের যাবনী খাদ্যের ঘ্রাণ গ্রহণে নাকি জাতিচ্যুত, সমাজচ্যুত হন। ইতিহাস কথন এই যে, মহাশয় একজন দীর্ঘ দেহকাণ্ডের অধিকারী অসামান্য বল্লম এবং তলোয়ারবাজ যোদ্ধা ছিলেন। সপ্তদশ শতকের পর্তুগিজ হার্মাদ এবং মগেদের দৌরাত্ম্যকালে তিনি চন্দ্রদ্বীপ লেঠেলদের সাহচর্যে এইসব হার্মাদ, মগদের সাথে যুদ্ধ করে এক অসামান্য সামরিক কীর্তির অধিকারী হলে নবাব খাতির করে তাঁকে তার ঢাকাস্থ শিবিরে আপ্যায়ন করেন। তখন নাকি যাবনিক খাদ্যের ঘ্রাণ গ্রহণ করার জন্য তিনি জাতি এবং সমাজচ্যুত হন। কিংবদন্তিটির অন্য রূপও আছে। মহাশয় নাকি এক যবনীর রূপে আকৃষ্ট হন। সেই যবনী কীর্তিনারায়ণের হৃদয়মন জয় করেছিল বলেই নাকি তিনি জাতি এবং সমাজ ত্যাগ করেন। ফলত তাঁকে সিংহাসন হতেও বঞ্চিত হতে হয়। এই ঘটনা নিয়ে জাতি বিরোধ তুঙ্গে উঠলে মহাশয় প্রথমে মাধবপাশার

বাদলা গ্রামে বসবাস শুরু করেন, পরে সেখানেও টিকতে না পেরে আমাদের গ্রামের সীমান্তে একটি স্থানে তাঁর বসতি হয়। তবে নবাবের সহায়তা থাকার জন্য তিনি তার প্রাপ্য ভূ-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হন না। যদিও সিংহাসন তাঁকে ত্যাগ করতেই হয়। কীর্তিনারায়ণ মগ, পর্তুগিজদের সাথে সংগ্রামেই নিহত হন। আমাদের গ্রামের সীমান্তেই তাঁর এবং তাঁর প্রিয় ঘোড়াটিকে সমাধিস্থ করা হয় এমন লোকশ্রুতি। কীর্তিনারায়ণ কোনও ইসলামি নাম গ্রহণ করেন নি। জনশ্রুতি এই যে তিনি হিন্দু এবং মুসলমান উভয় ধর্মের আচারই পালন করতেন।

এখন এই পরণ কথা শোনাবার পর দাদীআম্মার দাবি যে তিনি ঐ কীর্তিনারায়ণের বংশজা। কীর্তিনারায়ণ ইসলামি নাম না নিলেও তার পুত্র মামুদ হাসান নাম গ্রহণ করে পিতৃকুলনাম পরিত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই পরিবার হিন্দুয়ানিকে সম্পূর্ণ ত্যাগ কোনওদিনই করতে পারে নি। কীর্তিনারায়ণ থেকে পঞ্চম পুরুষে এসেও যখন তাদের ইসলামিকরণ সম্পূর্ণ হয়না তখন থেকে তাঁরা তাদের ইসলামি নামের সাথে 'বাকলাই' উপাধিটি ব্যবহার করতে থাকেন এবং অদ্যাবধি তা চালু আছে। এই পরিবারের একজন মহিলা, যাঁর নাম ছিল ফুলবানু, তিনি রীতিমতো হিন্দু আচার পালন করতেন এরকম আমরা শুনেছি।

দাদীআম্মা বলেন, তয় বোজো হেই বংশের মাইয়া অইয়া, মুই যদি এই ফাডা ঘরে পড়ইয়া থাকতে পারি, তয় তোমার চিংড়িমাছ হাতড়ানইয়া ব্যাফারডাওতো মানইয়া লওন লাগে। হোনছ কিনা জানিনা, তয় এই এমন বাহারইয়া গেরাম কীর্তিপাশা, হেয়া কৈলম ঐ কীর্তিনারায়ণের নামেই রাহা অইছেলে। বেয়াকই আল্লা মাবুদের মর্জি। হেনায় যা মর্জি করেন, হেয়া, ছাড়া তো অইন্য কিছু হওয়া সম্বব না। আল্লা মেহেরবান্।

আমি এই বংশের একজন মানুষকে দেখেছি। তাঁর নাম মজিদ বাকলাই। তিনি এক অদ্ভুত রোগে রুগ্ন। আমাকে বলেছিলেন একদিন, মুই এই বেয়াক জমিন জায়দাদ্ কিনইয়া লমু। এমন কি তোমাগো বাড়িডাও।

আমি জানতে চেয়েছিলাম—কেন?

না, এগুলা তা একসময় আমাগোই আছেলে। এ্যার বেয়াক মোর চাই। ট্যাহার চিন্তা নাই। য্যাতো লাগে দিমু হ্যানে।

কীর্তিনারায়ণ এ অঞ্চলে ব্যাপক ভূসম্পত্তির মালিক ছিলেন। তাই বোধহয় তার এরকম আকাঙ্ক্ষা।

এ গল্প আরও অনেক দীর্ঘ। হয়ত এ সব নিতান্ত গল্পই। দাদীআম্মার কথনে তা প্রায় এক দিনান্তকালেও সমাপ্ত হতে চায় না। যখন তিনি তাঁর কথন শেষ করেন, বুঝতে পারি অকথিত কাহিনী আরও অনেক রয়ে গেছে। এতো শুধু একটা পরিবারের আখ্যান নয়। এ আখ্যান আমার এই অঞ্চলের সমাজ গঠনের। হিন্দু এবং মুসলমানের রক্তের মিশ্রণের এক অপূর্ব সমাচার। সেখানে ভেদ বিভেদের আগুন উভয় সমাজের মাঝখানে লেলিহান হয়ে দাঁড়ায় না। সেখানে শুধু দাদীআম্মারা পরণ কথা বলেন আর তাঁদের

নপ্তারা শোনে। শোনে আর সমসাময়িক সংঘটন দেখে বিস্মিত হয়ে বিষণ্ণ হয়ে ভাবে, তাহলে এ রকম কেন হল? গল্প শেষ হতে হতে দিনের আলো ম্লান হয় কিন্তু আকাশে তারারা তথাপি অতি দূরের হলেও, আলোর দীপ্তি নিয়ে ফুটে ওঠে। দূরে কোথায় যেন কোনও এক ঝোপে শেয়াল ডাকে। সন্ধ্যা শেষের জোয়ারের জলের শব্দ শুনি হোগল, ছৈলা গাছের গোড়ায় আছড়ে পড়ার কলোচ্ছ্বাসে। ডিঙ্গি নৌকোগুলোর বৈঠার ঠকাস্ঠক শব্দ, তারা গঞ্জের কাজ সেরে ঘরে ফিরছে। সবাই যেন এক নিরুদ্বেগ ভূখণ্ডে আশ্রয় চায়। জীবন তখন এক নিবিড় স্বপ্নের প্রাকৃত আবরণকে গায়ে জড়িয়ে কীর্তিনারায়ণের ঘোড়ার খুরের শব্দ কান ভরে শোনে। তাঁর হাতের বল্লম আর তলোয়ারে রূপালি ঝিলিক যেন দেখতে পাই, যখন আলপথে নৈশ নক্ষত্র দ্যুতিতে ফিরে আসতে থাকি। নিজেদের ভগ্ন প্রাসাদটাকে যেন তখন কীর্তিনারায়ণের দুর্গ বলে মনে হয়, আর আশপাশের উঁচু জমিগুলো তাঁর আর তাঁর ঘোড়ার কবরের মতো।

এরপর একদিন দাদীআম্মা আমাকে ফতোয়া দিলেন, তোর ইস্কুলে পড়ন লাগবে। এহানে এট্টা ইস্কুল অইছে। তুই হেই ইস্কুলে পড়বি। তোর মুরুব্বীগো স্বভাব নষ্ট অইছে, বুদ্ধি ভষ্ট অইছে। হেয়া তোরে ইস্কুলে দেনায়। আমি তোর ব্যবস্থা করইয়া দিতাছি খাড়া।

দাদীআম্মার বাড়িতে তাঁর দুটি কিশোর নাতি ও একটি নাতনি ছাড়া কোনও বয়স্ক মানুষ ছিল না। কিছু জমি জায়গা তাঁর ছিল, সে কারণে অন্নাভাব ভোগ করতে হত না। সচ্ছল না হলেও ঐ সময়কার গ্রামীণ মানুষদের চাহিদা অনুযায়ী তাঁরা দিব্য ছিলেন। তাঁর সংসারে চতুর্থ নাতি হিসেবে একসময় আমি প্রতিষ্ঠা পাই। অবশ্য একথা আমার বাড়ির 'গার্জেনরা' জানতেন না, জানাবার মতো হিম্মৎও আমার হয়নি। কেননা, কোনও মোছলমান বাড়িতে আমি আউষ চালের ফ্যানাভাত বা এটা-ওটা খাই—একথা টের পেলে জেঠামশাই হেঁটোয় কন্টক, উপরে কন্টক প্রয়োগে বুনো শেয়ালদের দিয়ে খাওয়াতেন। বাবার কাছ থেকে এ ব্যাপারে ভীতির ততটা সম্ভাবনা ছিল না। তথাপি শ্যাহের ভাত খাওয়া বিষয়ে তিনিও যে খুব একটা ছাড়পত্র দিতেন এমন বুঝি না।

দাদীআম্মার নাতনি শিরি ছিল আমার সমবয়সি। তার ভাই দুজনের একজন আট অপরজন দশের কোঠায়। আমরা দুজনে তখন এগারো বারো বছরের। ও আমাকে ভাই জান বলে ডাকত, আমি বুনডি বলে। ওর এক ফুফাতো ভাই, দুলালও আমাদের উভয়ের সমবয়সি। দুলাল বয়সে একটু বড় ছিল। ও আমাকে প্রায়ই বলত, ও শিরিকে বড় হয়ে বিয়ে করবে এরকম নাকি কথা আছে। ওদের মধ্যে এরকম বিয়ে হত।

আমরা তিনজনে একদিন দাদীআম্মার দলুজে বসে গল্প করছি। তখন আউশের খন্দ উঠে গেছে। আশ্বিন কার্তিকের এই সময়টায় সকালে আউশের ফ্যানাভাত, দুপুরে আউশের ভাত আর পানি কচুর তরকারি, আবার রাতেও আউশের ভাত আর খেসারির ডাল ছিল আহার্য। আউশের একটা মিঠে গন্ধ তখন সবারই বাড়ির আশপাশে ছড়িয়ে থাকত। এখনও যেন চোখ বুজলে সেই গন্ধটা টের পাই। টের পাই, আউশের চিড়ে, নারকোল কোড়া আর গুড় দিয়ে মাখানো সেই দ্রব্যটির স্বাদ ও গন্ধ।

শিরি বলছিল, ভাইজান, কাইলকা তোমার এহানে পাহানইয়া নাস্তা খাওন লাগবে। দুলাল বলেছিল, খা না একদিন, বেয়াকে একলগে খাইয়া দেহি তোর জাত ক্যামনে যায়। মনের মধ্যে ততদিনে জাতের নির্বোধ জানোয়ারটা অনেকটাই কমজোরি। তাছাড়া ওরা জানেনা যে ইতিমধ্যে আমি পাহানইয়া খাবার খেয়ে বসে আছি। দাদীআম্মা সেকথা ওদের বলেন নি। নাস্তা বা জলখাবার তখন আমাদের বাড়িতে হত না। সংস্থান ছিল না। অভাব তখন আষ্টেপৃষ্টে। অতএব আমন্ত্রিত হয়েও পেটে বুভুক্ষা পুষে রাখার মতো জাতিঅন্ত প্রাণ হতে পারিনি। আবার জাত কিভাবে যায় সেটা দেখার কৌতূহলও একেবারে ছিল না তা নয়। অতএব পরদিন ভোর সবেরে দাদীআম্মার বাড়ি পৌঁছোই। আমাদের তিন জনের চক্রান্তের কথা দাদীআম্মা জানতেন না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন—

: অ্যাতো বেন্‌ইয়া কালে আইলি যে? বেযাকে আছে তো ভাল?

: হ ভাল আছে। আইলাম। তুমি আইজ নাস্তায় পাহাবা কি?

: ক্যান? তুই খাবি?

: হ, আমি ঠিক করছি আইজ এহানে নাস্তা খামু। পাহানইয়া নাস্তা—আউশ চাউলের ফ্যানা ভাত বুইনডিগো লগে।

: ক্যান?

: বুনডিরা আমারে দাওয়াত দিছে। অরা দ্যাখতে চায় জাত ক্যামনে যায়। আমি যে আগেই তোমার ধারে পাহানইয়া খাওয়া খাইছি হেয়া ওরা জানে না।

দাদীআম্মা সব শুন হেসে কুটিপাটি। তক্ষুনি কোমর বেঁধে নাস্তা বানাতে লেগে গেলেন। বড় বাহারের নাস্তা বানিয়েছিলেন তিনি সেদিন। পায়েলইয়া মরিচ ঘুষা চিংড়ি আর নারকোল একসাথে বেটে তার বড়া আর আউশের ফ্যানাভাত। সে স্বাদ বোধহয় মরার আগের দিন পর্যন্ত থাকবে। আমরা পাঁচজনে পাশাপাশি বসে হাপুস হুপুস করে খেলাম। কিন্তু জাইত যে কোনহান দিয়া গেল টের পাইলাম না। এর পর থেকে প্রায়ই ওখানে খেতাম।

কিন্তু আজও যে গ্লানি অন্তরে বহন করি তাহল এই যে আমি কোনও দিনই দুলাল, শিরি বা তাদের ভাইদের নিয়ে আমার বাড়িতে গল্পও করতে পারিনি, একসাথে বসে পাহানইয়া বা আপাহনইয়া কোনও খাদ্যও গ্রহণ করতে পারিনি। এর কারণ ছিল দুটি। একটি হচ্ছে বাড়িতে কোনও বন্ধুকে নেমন্তন্ন করে খাওয়ানোর মতো স্বাধীনতা আমার ছিল না। আরেকটি হল, তাদের খাওয়ানোর মতো সামান্যতম আর্থিক সঙ্গতিও আমাদের ছিল না। একারণে আজও এক গভীর বেদনাবোধ এবং গ্লানি উপলব্ধি করি। এ ব্যাপারে জাতের ব্যাপারটি যে একেবারে ছিল না, তা বলিনা। তবে সেটাই সবচেয়ে বড় বাধা ছিল না। ওরা অবশ্য তখন ব্যাপারটাকে জাতিগত সমস্যা বলেই মনে করত।

দাদীআম্মা তার যুগের তুলনায় অনেক আধুনিকমনস্ক, তাঁর মতো উদার মানসিকতা সম্পন্ন মহিলা খুব কমই দেখেছি। বোরখা-টোরখার বালাই তাঁর ছিল না। তাঁর ঘর গেরস্থালি ছিল অদ্ভুত পরিচ্ছন্ন। দলুজে উঠলেই তা বোঝা যেত।

পরিণত বয়সে শিরি আর দুলালের ঢাকার বাসায় দীর্ঘকাল বাদে গিয়েছি। তারা অনেক লেখাপড়া করে শহরের আধুনিক মানুষ হয়েছে। পরবর্তীকালে ওরা সত্যিই বিয়ে করেছিল। আমরা ছোটবেলার অনেক স্মৃতি রোমন্থন করে দারুণ আনন্দ করেছিলাম সেবার। কিন্তু একটা জিনিস আমাকে অবাক করে দিয়েছিল। শিরি অসম্ভব ধর্মবাতিকগ্রস্ত হয়েছে দেখলাম। বাইরে যাওয়ার সময় আপদমস্তক কালো বোরখায় ঢেকে সে বের হয়। দুলাল বলেছিল, ও অসম্ভব মৌলা হয়েছে। আমার কিরকম অবাক লাগছিল। ওরা দুজনেই ভোর রাতে উঠে নমাজ আদায় করে আবার বেলা অবধি ঘুমোয়। শিরির পড়াশোনার বিষয়ও ঐ ধর্মীয় ধারায়ই। চমৎকার রেজাল্টও করেছিল। মাঝে মাঝে ইসলামি মহিলাদের জমায়েতে ও ভাষণ দেয়। ঐ নিয়েই থাকে। দুলাল আবার বলেছিল, ও খুব মৌলা হয়েছে, জানিস। আমি জানতে চাইছিলাম—আর তুই?

: আমি? আমি সারাদিন ডাক্তারি করি, বাড়ি ফিরে ওর নির্দেশমত খোদার দরবারে মোনাজাত করি।

: দুটো ব্যাপার মেলাতে পারিস?

: মেলাতে চাওয়ার মতো সময় কোথায়?

আমি বলেছিলাম, তোরা দুজনেই অন্য রকম হয়ে গেছিস। যেন আমি বা আমাদের সম্প্রদায়ের মানুষেরা ছোটবেলায় ঐ সব দিনে যেমন ছুঁৎমার্গী ছিলাম, তোরা এখন তাই হতে চাচ্ছিস। আমি ঠিক মেলাতে পারছি না।

: মেলাতে চাইছিস কেন?

: দাদীআম্মার কথা মনে পড়ে।

: তিনি কিন্তু খুবই নিষ্ঠাবতী শরিয়তী মহিলা ছিলেন।

: সে অন্য রকম। তাঁরটা বুঝেছিলাম, তোদেরটা বুঝতে পারছিনা। দুলাল আমার ধন্দটা বুঝতে পেরেছিল, তবু বলল, তুই এসব ব্যাপার কিছু জানিস?

: কিছু জানি। নমাজ উত্তম ব্যায়াম জানি, ওজুকবা স্বাস্থ্যসম্মত শুদ্ধাচার তা জানি। আরও অনেক কিছুই আমি দাদীআম্মার কাছে এবং বড় হয়ে বই পুস্তক পড়ে জেনেছি। কিন্তু দাদীআম্মার ধর্মাচরণ এক, তোদেরটা সম্পূর্ণ আলাদা। আমি ঠিক বোঝাতে পারব না।

এরকম অনেক আলোচনা ঢাকায় বসে ওদের সাথে আমার হয়েছিল। দাদীআম্মার স্মৃতি আমার মন থেকে কোনওদিন মুছে যায়নি। কিন্তু শিরি আর দুলালের বর্তমান যাপিত জীবন, তাদের আনুষ্ঠানিক ধর্ম পালনের তীব্রতা, অধুনাকার গণতন্ত্রকামী এবং মানবিক ধর্ম অনুসারী বাংলাদেশি সাধারণ মানুষদের সাথে তাদের আচার আচরণের অসম্পৃক্তি আমাকে বড় বিমর্ষ করেছিল।

জীবন অনেক দূর পথ অতিক্রম করেও এখনও এক পিছারার খাল খোঁজে যেন। মাথার চুলে সবিতৃচ্ছটা প্রকট, লোলচর্ম, ক্ষীণদৃষ্টি। তথাপি এখনও আমার স্বপ্নের রাস্তা এক ক্ষীণ স্রোতোস্বিনীর রেখা ধরে ক্রমশ বড় খালের দিকে যেতে চায়। সেই বড়

খালের মোহনার এক ছৈলা গাছের গোপন থেকে শুভ্রবস্ত্রা এক রমণী ছাবি নিয়ে চিংড়িমাছ ধরে। যখন স্বপ্ন আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে সেখানে পৌছায়, সে বলে,—উডইয়া আয়, আর কত ভাসবি? দূরে অস্পষ্ট একফালি ম্রিয়মাণ ডুবন্ত চাঁদের প্রচ্ছায়ায় কীর্তিনারায়ণ আর তাঁর ঘোড়ার কবরের আভাস দেখা যায়, আর একটা ভাঙা অট্টালিকার চূড়া, যেখানে একটা বিদ্‌ঘুটে নিশাচর প্রহরঘোষক পাখি তীব্র চিৎকার করে ডাকে, যেন বলে—গেল যা গেল যা দুচ্ছাই দুচ্ছাই।

স্বপ্ন স্তিমিত হয়ে ঘুম একটু গাঢ় হলে, পৃথিবী আবার যেন ক্রমশ তরুণা হতে থাকে। স্বপ্ন আবার শরীরী হয়ে দুটি কিশোর আর একটি কিশোরীকে অঘ্রানের সন্ধ্যার আলপথে দৌড় করায়। তখন আবার কীর্তিনারায়ণের ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা যায়। আবার দাদীআম্মা আমাদেরকে নিয়ে তার দলুজে পরণ কথায় বসেন, বলেন, কীর্তিনারায়ণ তো হেই মগ, হার্মাদেগো লগে কোদাকুদি করতে যাইয়া এন্তেকাল ফরমাইলেন, বোজজোনি? কও, ইন্না লিল্লাহে রাজেউন। আমরাও বলি, ইন্না লিল্লাহে রাজেউন।

— আঠেরো —

একটা সময় ছিল যখন পিছারার খাল এবং বড় খালের দুই পাড়ের ভদ্রলোক হিন্দু যাঁরা তাঁদের কেউ কেউ কলকাতায় থাকেন, চাকরি করেন, দোল, দুর্গোচ্ছব পূজা পার্বণে বাড়ি আসেন। পরিবারস্থ অন্যান্যরা দেশের বাড়িতেই থাকেন। জমিজমা, চাষবাস ইত্যাদি দেখাশোনা, সাত পুরুষের নানান আইশ্যি নিয়ম পালন এইসব তাঁদের কাজ। কলকাতার বাবুদের দেশেব বাড়িতে বড় কদর। তাঁরা দেশবিদেশের নানান খোঁজ খবর রাখেন, রাজনীতি সমাজনীতি নিয়ে নানান তর্ক বিতর্ক করেন। চক্‌চকে শরীর, চা বিস্কুট খান, শৌখিন ধাত তাঁদের। আর যাঁরা প্রান্তিক সাধারণ মানুষ, যারা বছরভর চাষবাস ফাইফরমাশ খেটে দিন গুজরান করে, তারা অবাক বিস্ময়ে এঁদের দেখে। তাঁদের সামান্যতম কাছাকাছি আসতে পারলেও শ্রদ্ধাভক্তিতে আনত হয়ে কৃত কৃতার্থ বোধ করে। মাঝেমধ্যে টাকাটা সিকেটা, জামাটা ধুতিটা পেয়ে ভাবে—বড় মাইনসেরগো পোলা, দিল্‌ডা বড় তো অইবেই। এইসব ভদ্রলোকবাড়ির কামকাজে আশপাশের ব্যাপক সাধারণ হিন্দু-মুসলমান জনের রুজি রোজগার। এঁদের পার্বণই তাঁদের পার্বণ। এঁদের সুদিনেই তাঁদের সুদিন। শতচ্ছিন্ন হাঁটু ধুতি পরনে নিশিকান্ত নাটুয়া অথবা 'আষ্ট গোণ্ডা তালিমারা' লুঙ্গিধারী এরফানউল্লাহ্, একারণে, যখন একটা কোড়া ধুতি বা 'চ্যাক্ চ্যাক্' লুঙ্গি উপহার পায়, তারা আহ্লাদে বেশক্ 'ফাউকায়'। আট-দশ গ্রাম ঘুরে, তারা এই সম্মানের বৈভব দেখায় মানুষদের, —অমুক বাড়ির কইলকাতইয়া বাবু দেছে। পোশাকের চাইতেও পোশাক প্রাপ্তির সম্মান তখন তাদের কাছে বড় হয়ে ওঠে। আবার এইসব কলকাত্তাই বাবুরা যখন এই পিছারার খালের চৌহদ্দিতে আসেন তখন বেশ কিছু আধুনিকতা তাঁদের গায়ে জড়িয়ে নিয়ে আসেন। তাঁদের আলাপ আলোচনা, আচার

আচরণ, গান বাজনা, থিয়েটার এবং নানান শখ শৌখিনতায় তা প্রকাশ পায়। আমার পিছারার খাল, বড় খালের অজ গ্রামীণ জগতে এভাবেই একধরনের আধুনিকতার প্রকাশ ঘটে। সেই আধুনিকতায় এইসব মানুষ কোনও-না-কোনওভাবে ঋদ্ধ হয়। সেই ঋদ্ধতায় তারা শুধু এটুকুই ভাবতে পারে যে—বাবুগো পোলাপানেগো নিয়ইত ক্যাতো চোমৎকার!—তাদের 'পোলাপানেরা' তখন 'সাজ-সবেরে' গোখাটা খাটে ফসলের ক্ষেতে। এইসব অনিবার্য এবং প্রায় চিরন্তনী ঘটনাগুলো ঘটে পিছারার খাল এবং বড় খালের দুইধারে, বিশেষত শারদী উৎসবের সময়টিতে। কেননা এই সময়েই কলকাতা প্রবাসী বাবুরা বাড়িতে আসেন, দেশের বাড়ি। বছরের বেশির ভাগটাই কাটে তাঁদের কলকাত্তার বাসাবাড়ি অথবা মেস বাড়িতে। এঁদের মধ্যে কেউবা চাকরিজীবী, কেউবা কলেজে পড়াশোনা করতে গেছেন। তদানীন্তন কালের রীতি অনুযায়ী এঁরা বেশিরভাগই, বয়স যাই হোক, বিবাহিত। স্ত্রী এবং যাঁদের সন্তানাদি জন্মেছে, তাদের দেশের বাড়িতেই রাখা বিধি। সে অর্থে আমার পিছারার খালের চৌহদ্দির ভদ্রসমাজের যুবকেরা সম্প্রদায় নির্বিশেষে প্রোষিতপত্নীক এবং তাঁদের পত্নীরা প্রোষিতভর্তৃকা। অতএব দোল মোচ্ছব, দুগ্গোচ্ছব, শ্রাদ্ধাদি যে কারণেই তাঁদের এই স্থানে আগমন ঘটুক, তা বড়ই বর্ণাঢ্য এবং আনন্দের হয়। সাধারণ মানুষেরা এই আনন্দের অংশী বলে যার যা সাধ্য সেই অনুসারে, নিজেদের এবং সন্তানদেরও বঞ্চিত করে, তাদের শ্রেষ্ঠ সামগ্রীগুলো এঁদের ভোগের জন্য মিনিমাঙ্না দিয়ে যায়। তখনও ভাঙন স্পষ্ট হয়নি বলে এঁরাও তা সহজ অধিকারে গ্রহণ করেন। অবশ্যই তাঁরা এই মানুষদের আকাঙ্ক্ষার বিষয়েও উদাসীন থাকেন না।

ব্যবধান অবশ্যই তখন ছিল। ছিল শোষণ এবং সুবিধে গ্রহণের পরম্পরাও, তথাপি কোথাও যেন একটা নিশ্চিত আত্মীয়তা ছিল। প্রান্তিকজনেরা জানত, এঁরা মা-বাপ, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-আত্মীয়-বান্ধবদের ছেড়ে কোথায় কোন বিদেশ বিভুঁই-এ থাকেন, আহা! তারা কি খায়েন, কিবা করেন, অতএব এঁরাও যখন দেশের বাড়িতে আসতেন এইসব প্রান্তিক মানুষদের কথা কিছুই যে ভাবতেন না এমন নয়। এই মানুষদের সম্পর্ক একান্তই যে খাদ্য-খাদকের ছিল তা বলব না। আত্মীয়তার বন্ধন একটা যে ছিল তা দেখেছি এবং জেনেছিও।

তারপর শারদীয় উৎসব শেষ হয়ে গেলে পৃথিবীর এই প্রান্তে হেমন্ত নামত ফসল কাটার মরশুম হয়ে। তীব্র কর্মপ্রবাহে তখন প্রান্তিকজনেরা প্রবাসী এইসব মানুষদের বয়ে আনা নতুনতা, আধুনিকতা এবং চাক্‌চিক্যের উষ্ণতা ক্রমশ বিস্মৃত হয়ে আটপৌরে হতে থাকত, কিন্তু তা নিঃশেষে বিলীন হত না। থিতু হয়ে তা এক সময়ে তাদের মধ্যে কিংবদন্তি তথা পরণ কথা হয়ে এক ধ্রুবপদ হত। এই ধ্রুবপদটি তাদের অভ্যেসে গভীর এক প্রভাব ফেলেছিল, আর তার বহতা ছিল বহু, বহুকাল ধরে। গ্রামগুলো যখন শূন্য হয়ে গেল. যখন আর কোনও কিরায়া নৌকো প্রবাসী এইসব বাবুদের নিয়ে বড় খালপারের রেন্ট্রির শিকড়ে কাছি বেঁধে নোঙর করত না, তখনও প্রান্তিক এই মানুষদের মধ্যে এই আকাঙ্ক্ষার অপেক্ষা দেখেছি। বড়খাল পাড়ের উঁচু পথ ধরে চলার সময় তারা বলাবলি করত 'অমুক বাড়ির অমুক বাবুর পোলায় তয় কি এবার পূজায় আইবে

না, তাঁরা এক সময় থেকে আর আসেন না। কিরায়া নৌকোগুলোর সংখ্যা আস্তে আস্তে কমতে থাকে। যেসব বাড়ির ছেলে তাঁরা, সেইসব বাড়িগুলোর জৌলুস এবং মানুষজন ক্রমশ কমতে কমতে এক সময় শূন্য হয়ে যায়। বাড়ির ঘরগুলো তালাবন্ধ থেকে থেকে ভুতুড়ে হয় অথবা শুধু ভিতটা একটা কুৎসিত বেঢপ চিতার মতো পড়ে থেকে খাঁ খাঁ করতে থাকে।

প্রান্তিকজনেরা গোপাট থেকে গাভী বা বলদগুলোর লেজ মুচড়োতে মুচড়োতে ফিরিয়ে নিয়ে আসার সময় ভাবে, 'হ্যারা আর আয়মা ক্যান?' আমি দেখেছি এই সময় এইসব মানুষের বুকে যেন এক বিষাদের জন্ম হত। সেই বিষাদ শারদী উৎসব শেষ হবার পরও হেমন্তের ধানের ছড়ায়, ঘাসের শিশিরে যেন এক করুণ ছবি হয়ে দুলতেই থাকত, দুলতেই থাকত। আমাদের বাড়ির পুরোনো মুনিষ মাহিন্দরেরা এই কলকাতার বাবুদের ঘরে ফেরা নিয়ে নানান স্মৃতিকথা বলত, আর হুতাশ করত, আহা! কি দিনই না গেছে! কি আছিল আর কি অইল! তাদের জবানে আমাদেরই একদার কথা গল্প শুনতে শুনতে আমার এই সময়ে খুবই মন খারাপ হত, মন খারাপ বোধকরি আমার চাইতে তাদেরই হত বেশি।

এরকম এক সময়ই তখনও তালুকদারি লুপ্ত হয়নি, আমাদের বাড়িতে একজন সর্বক্ষণের রাখাল বহাল হয়েছিল। তার নাম নাগর আলি, যার কথা আগেই বলেছি। নাগর আলি ভাই ছিল সেই সময় আমরা যে কটি বালক গ্রামে ছিলাম, তাদের সর্দার, যদিও তার তখন চুলদাড়ি সাদা। সে আমাদের বড় বৈঠকখানার দরবারে বাবুদের অনুপস্থিতিকালে আমাদের নিয়ে আসর জমাত। গল্প বা কিস্‌সা বলা এবং কথায় কথায় গান গাওয়া ছিল তার স্বভাব। লোকটি অকৃতদার। প্রায় জন্মসূত্রেই রাখাল। ভরাভর্তি গ্রামের সুখের দিনের গল্প তার কাছেই বেশি শুনতাম। কলকাতার বাবুদের ঘরে ফেরার এবং তাদের নানা ব্যাপার স্যাপার নিয়ে আমাদের বেশ রসিয়ে গল্প করত সে। গ্রাম শূন্য করে চলে যাওয়া মানুষদের উপর তার ছিল ভীষণ অভিমান। ভাগাভাগি, হানাহানির ব্যাপারে তার যে কী পর্যন্ত বিতৃষ্ণা ছিল আজও তা মনে পড়লে চোখে জল আসে। একবার ইউনিয়ন বোর্ডের নির্বাচনের সময় সে একখানা গান বেঁধেছিল। সেই গান মাঝে মাঝেই সে আমাদের শোনাত। সে গাইত—

যতসব দীনদরদী
তারা সব পাইছেন গদি
খালি মোরা দেহি
হাতে কাম নাই
ও মেয়া ভাইরে
কওছেন দেহি
ক্যামনে প্যাট চালাই?
হিন্দুরা যায় হিন্দুস্তানে

আর দরদীরা ট্যাহা গোণে
আর নজর হ্যারগো ডাহার পানে
মোগো হিসাব নাই—
ও মেয়া ভাই রে
কওছেন দেহি ক্যামনে প্যাট চালাই।

তাদের পেট চালাবার ব্যবস্থা ইতিপূর্বে যা ছিল, তা যে খুব উচ্চ আদর্শের তা অবশ্যই নয়। তবে সেটা একটা ব্যবস্থা তো বটেই। এখন ব্যাপক গেরস্থ হিন্দু মধ্যবিত্ত গ্রাম শূন্য করে যেতে থাকলে তাদের গতি কী হয়?

তখন যে কথা বলেছি, হিন্দু মুসলমান উভয় সমাজেরই বনেদি, শিক্ষিতদের অনেকেই দেশের বাড়িতে পরিজনদের রেখে শহর কলকাতায় অথবা ঢাকা চট্টগ্রাম ইত্যাদি শহরে চাকুরিজীবীর জীবনযাপন করতেন। এইসব স্থানে কারুর কারুর একটা আস্তানা বহুকাল থেকেই ছিল, দেশ ভাগের পর তার দ্রুত বিস্তৃতি ঘটতে থাকে। যেন দেশ ভাগজনিত সমস্যায় ঐ আশ্রয়কে অবলম্বন করা যায়। এই ব্যবস্থা অবশ্যই শুধুমাত্র উচ্চ এবং মধ্যবিত্তদের ছিল। এর ফলেই আধুনিকতার কেন্দ্র মহানগরী কলকাতার সাথে এই অজ গ্রামীণ জগতের একটা নিয়ত যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল একদা।

আমাদের বড়দা ছিলেন বাড়ির জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি কলকাতায় পড়াশোনা করতেন, পরে চাকুরি সূত্রেও সেখানেই তাঁর অবস্থান। ছুটিতে যখন বাড়ি আসতেন, সে এক কাণ্ড। 'বড় বাড়ির বড়পোলায় বাড়ি আইছে।' খালের ঘাটে বাহারি নৌকো লেগেছে। খানাবাড়ির ধোবা, নাপিত বা কুমোরদের কেউ তা দেখতে পেয়ে অন্দরে খবর দিতে ছুটছে। কি? না, 'উনি আইয়া পড়ছেন'। আমরা দেখতাম, একজন সুবেশ যুবা, পরনে এন্ডির পাঞ্জাবি এবং চুড়িদার পাজামা, তীক্ষ্ণ গ্রীসীয় নাসা আর গভীর চোখ এবং উজ্জ্বল স্বাস্থ্যের প্রায় পরণ কথার রাজপুত্তুরের মতন পুরুষ নৌকো থেকে অবতরণ করছেন। জনাকয়েক খানাবাড়ির মনুষ্য প্রজা, তাঁর যাবতীয় বোঝা কাড়াকাড়ি করে বয়ে আনছে বাড়ির দিকে। বাড়িতে মহা হৈ-চৈ, ধুমধাম। বিপিনকে বাজারে পাঠানো হচ্ছে। কেউ পুকুরে জাল ফেলছে। সে এক অসুমার কাণ্ড। বড়দাদা তখন কলকাতায় থাকেন, রেলের বাবু, উপরন্তু ঘোরতর তালুকদারি জমিদারিতন্ত্রের বিরোধী। মহানগরীর কমিউনিস্ট তন্ত্রাচারী। সামন্ততন্ত্রের ভয়ানক সমালোচক। কিন্তু অন্যদিকে বেজায় মেজাজি আর রোমান্টিক। সে এক প্রগাঢ় বিভ্রান্ত। বড়দাদার চরিত্রে নানান গুণের সমাহার, যার থৈ পাওয়া ভার। এ ক্ষেত্রে বাবার একটি কুবচন মনে আছে। তিনি বলেছিলেন, কমিউনিস্ট, তয় হেয়া বুর্জি হাউসের। অর্থাৎ শখের। বড়দাদার আচরণে সামন্তপনার কিছু ঘাটতি তখন দেখিনি। চাকর বাকর বা খানাবাড়ির প্রজাদের প্রতি আচরণে যে নমুনার প্রকাশ আমার স্মৃতিতে আছে তা বাবার মন্তব্যের বিপরীত নয়। কিন্তু তাঁর নানাবিধ গুণে যে আমরা অর্থাৎ তাঁর কনিষ্ঠরা ঋদ্ধ হয়েছি এ কথাও মিথ্যে নয়।

আমরা ছোটরা তখন আগানে-বাগানে ঘুরি, পুকুরে বঁড়শি ফেলে মাছ ধরি, পাতিশিয়ালের গর্ত খুঁড়ে, তাদের ছানা বের করে এনে পাঁঠাবলি খেলি। দাদা আমাদের ইদৃশ ইল্লুতেপনায় যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হয়ে শক্ত শক্ত অঙ্ক আর ট্র্যানস্লেশান দিয়ে দরদালানের বারান্দায় বসিয়ে দিতেন। না পারলে, বেদম প্রহার। এ কারণে তাঁর আগমনের আনন্দ অচিরেই মাটি হত। তবে এ যন্ত্রণা আমাদের খুব বেশিক্ষণ সইতে হত না। অন্যান্য বাড়ির যাঁরা ততক্ষণে এসে পৌঁছতেন, তাঁরা অচিরে হাজির হয়ে, তাস, পাশা, দাবা, নৌকো ভ্রমণ, চড়িভাতি এবং কমিউনিস্টি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আমাদের অব্যাহতি দিতেন। আমরাও তখন বঁড়শি হাতে আবার বেড়, পুকুর বা খালধারে গিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতাম।

দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর দাদা তাঁর বন্ধুবর্গকে নিয়ে ছোট বৈঠকখানার তক্তপোশগুলোতে জাঁকিয়ে বসে কমিউনিস্টির তক্ক করতেন। কখনও বা বায়োস্কোপ, থিয়েটার, শচীন কত্তা বা অন্য কোনও গায়কের গান এবং আবৃত্তি এইসব করতেন। তখনকার প্রান্তিক হিন্দুমুসলমান সাধারণজনেরাও এই আসরে এসে শ্রোতা হত। এভাবেই মহানগরীর আধুনিকতার কথা কিছু কিঞ্চিত পিছারার খালের মানুষদের তৃপ্ত করত। প্রান্তিকজনেরা এভাবেই কলকাতার বাবুদের হালচাল, কথাবার্তা শুনে সেই আশ্চর্য নগরীর বিষয়ে কিছু ধারণা তৈরি করে নিত।

কিন্তু এক সময় এই দেশের বাড়িতে আসার এবং গ্রামকে উৎসবের চূড়ান্তে পৌঁছোনোর পালা শেষ হয়ে গেল। পিছারার খাল আর বড় খালের দুই পাড়ে সৃষ্টি হল এক বিশাল শূন্যতা। সেই শূন্যতা আমি স্বয়ং উপলব্ধি করেছি, উপলব্ধি করতে দেখেছি ওখানে থেকে-যাওয়া হিন্দুদের এবং মুসলমান জনেদেরও। এমন কি যারা হিন্দুদের দেশত্যাগজনিত কারণে সমূহ লাভবান, তাদের বাড়ির যুবজনেরা বা মেয়েরা এই শূন্যতার কারণে যে নিদারুণ কষ্ট ভোগ করত, তাও তো দেখেছি। এই শূন্যতা ভরাট করার উপায় এখানের মুসলমান সমাজের মানুষদের তখন ছিল না। পিছারার খালের আবেষ্টনীর মুসলমান এবং তফশিলি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের মধ্যে কোনও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল না। যা দু'একজন এই শ্রেণী চরিত্রের ছিলেন, তাঁরা শ্রেণী গঠন করেননি, শুধুই মধ্যবিত্ত ব্যক্তি হিসেবে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁদের প্রভাব প্রতিপত্তির ফায়দা তুলেছেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলতে হিন্দু সম্প্রদায়ের ভদ্রবাবুরাই ওখানে সমাজের স্তম্ভ এবং একারণেই তাঁদের দেশত্যাগ এই বিরাট শূন্যতার বাতাবরণ তৈরি করেছিল। পিছারার খালের আবেষ্টনীতে আজও যদি কেউ হঠাৎ গিয়ে পড়ে, সেই শূন্যতা আজ পঞ্চাশ বছর পরেও কবরের নিস্তব্ধতার মতোই হাহাকারপূর্ণ, তা কি হিন্দু গ্রামে কি মুসলমান গ্রামে। সেখানে আর নতুন কোনও সমাজ সৃজন হল না। মুসলমান সমাজের যুবকেরা, যারা শিক্ষিত মার্জিত হল, তারা শহরে নগরে নিজ নিজ পরিবারস্থদের স্থানান্তরিত করল। জমিজমা ইত্যাদির শাসন শহর থেকেই তারা করতে থাকল। তাদের কিছু দুর্বল আত্মীয়স্বজন, যারা চাকুরিজীবী নয়, তাদের উপর দায়িত্ব থাকল এই জমির

উপজসমূহের মূল্য তাদের শহরের ঠিকানায় পৌঁছে দেওয়ার এবং চাষবাসের ব্যবস্থাপনাদির উপর নজর রাখার। একারণে এই পিছারার খালের, বড় খালের আশেপাশের গ্রামগুলিতে অবশিষ্ট থাকল একান্ত কৃষি এবং কৃষিশ্রম নির্ভর যারা তারাই, যদিও জমির মালিকানা শহরের চাকুরিজীবী বা পেশাগত ভাবে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল অথবা ব্যবসাজীবীদের হাতেই। অনুপস্থিত ভোক্তারা কৃষির উন্নয়ন বিষয়ে কিছু মাত্র যত্নবান হল না। তাই এই স্থানের আর কোনওই উন্নতি দেখা গেল না। খাল, নদী, পুকুরের সংস্কার হল না, কৃষির বিষয়ে যুগানুযায়ী অধিক ফলনের প্রচেষ্টা হল না, ব্যাপারটা পরম্পরাগত নিয়মেই চলতে থাকল। এভাবেই মানুষ দুঃখের পঙ্কে নিমজ্জিত হতে লাগল আরও বেশি করে। এখানে তখনও যারা ভিটে আঁকড়ে পড়ে তারা আমার বাল্যের দেখা সেই প্রায় আদিম ব্যবস্থায়ই ছিল। মধ্যস্বত্ব লোপ হয়েও তাদের কোনও উন্নতিই হয়নি। তারা কোনও অর্থনৈতিক পুনর্বাসন পায়নি।

— উনিশ —

দাদীআম্মার প্রচেষ্টায়ই একসময় আমি ইস্কুলে ভর্তি হতে পারি। সন্তানদের পড়াশোনা করানো যে অভিভাবকদের একটা বিশেষ দায়িত্ব তা শুধু আমার বাবা জেঠামশাই নন, পিছারার খালের আশপাশের বেবাক হিন্দু অভিভাবকরাই তখন বিস্মৃত হয়েছেন। যাঁদের কিছু সহায় সম্পদ ছিল, তাঁরা গয়ং গচ্ছ করে হলেও তাঁদের ছেলেদের ইস্কুলে পাঠাতেন। মেয়েদের নয়। কেননা একে তারা মেয়ে, তদুপরি ইস্কুল তিন ক্রোশ দূরের পথ। ইস্কুলের কাছাকাছি যাঁরা থাকতেন, তাঁরা কেউ কেউ পাঠাতেন তাদের। বিষয়টা নির্ভর করত তাঁদের সামর্থ্যের উপরও। তবে এসময় একটা ব্যাপার দেখেছি যে মুসলমান সাধারণ চাষি গেরস্থদের মধ্যে লেখাপড়া শেখার একটা তীব্র আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছিল। এর কারণ অবশ্যই সাময়িকভাবে তাদের আর্থিক উন্নতির মধ্যে নিহিত ছিল, যে আর্থিক উন্নতি চলে যাওয়া হিন্দুদের সম্পত্তি থেকেই তারা অর্জন করেছিল। তখন আমাদের এলাকার বড় ইস্কুলটি বন্ধ হয়ে গেছে। বক্সী মশাই দেশ-ছাড়া। এই সময়টায় মুসলমান গ্রামগুলোতে ইস্কুল প্রতিষ্ঠার একটা হিড়িক পড়ে যায়। কিন্তু সর্বাঙ্গসুন্দর, সর্ব আয়োজনে সমৃদ্ধ আমাদের রাজমোহন ইনস্টিটিউশনটি তার বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে, একটি মজে যাওয়া প্রাচীন দিঘির কিনারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্ষয় পেতে থাকে। তার জানালা কপাট, টেবিল চেয়ার, ব্ল্যাকবোর্ড, বেঞ্চি, আলমারি এবং সমগ্র বইপত্তর অরক্ষণীয়া যুবতীদের মতোই লুট হতে থাকে। কেউ কেউ তা সংরক্ষণের প্রচেষ্টা চালায় বটে, কিন্তু যেখানে জনবসতি নেই, গ্রামগুলো শূন্য, সেখানে কীভাবেই বা এর সংরক্ষণ সম্ভব হয়?

আজ ভাবতে অদ্ভুত লাগে, এই ইস্কুলেই আমি পাঠশালা বিভাগে প্রথম ইস্কুল জীবনের আস্বাদ পাই। পিছারার এই খালটির ধার ধরে অনেকটা মেঠো পথ। এ বাড়ির পেছন ও বাড়ির ফুলবাগানের পাশের রাস্তা, এই সাঁকো, ওই কাঠের ব্রিজ পেরিয়ে ঘন বৃক্ষশ্রেণীর মাঝের রাস্তাটি ধরে আমরা শ্লেট, আদর্শলিপি অথবা তালপাতা,

ভুষোকালির দোয়াত আর কঞ্চি আর 'খাগের' কলম নিয়ে ঘাড় কাত করে পাঠশালায় যেতাম। আমাদের পাঠশালার গুরুমশায়ের নাম ছিল ধলুমশায়। নামকরা কীর্তনীয়া। তাঁর বড় ভাইও একজন গুরুমশায় ছিলেন, নাম কালুমশায়। কালুমশায় ছিলেন গোলগাল তৈল চিক্কন দেহ, মাথায় কোঁকড়ানো বাউরী চুল, গলায় তুলসীর মালা। তিনি আমাদের গুরুমশায় ছিলেন না। তিনিও কীর্তন গাইতেন, কিন্তু তাঁর দল ছিল না। তিনি 'মা-দাদা' সম্প্রদায়ের শিষ্য ছিলেন, যাঁরা স্ত্রী পুরুষে একে অন্যকে মা এবং দাদা বলে সম্বোধন করতেন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও এই সম্বোধন প্রচলিত ছিল। আমাদের ওখানের অনেক জমিদারবাবুও এই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। কীর্তন করার সময় তাঁরা একে অন্যকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করতেন তা দেখেছি। এ নিয়ে আমাদের পিছারার খালের সাধারণ মনুষ্যরা নানান রঙ্গও করত। সহধর্মিণীকে মা বলে এবং স্বামীকে দাদা বলে তাঁরা যে রকম ভাবেবিভোর হয়ে পরস্পরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করতেন তা এক দেখার ব্যাপার ছিল। যা হোক, ধলুমশায় শুধু কীর্তন গাইতেন আর গুরুমশাইগিরি করতেন। তাঁরও গলায় ছিল তুলসীর মালা, বর্ণ-শুভ্র অর্থাৎ 'ধলা'। পদাবলী গাইতেন তিনি। তাঁর কীর্তনের দলকে সবাই খুব খাতির করত। ইস্কুলটি বন্ধ হয়ে গেলে মশায় শুধু পদাবলী কীর্তনকেই পেশা করে নেন। আজও তাঁর নিমাইসন্ন্যাস, নৌকাবিলাস, মাথুর এবং অক্রূর সংবাদ পালা গাওয়ার স্মৃতি অম্লান হয়ে আছে। এখনও চোখ বুজলেই তাঁর মূর্তিটি মনে পড়ে। মশায় খানিকক্ষণ বসে বসে আহুম উহুম করে, একসময় কাঁধের গৈরিক উত্তরীয়খানা সুন্দর বিন্যাসে দুদিকে লম্বিত করে উঠে দাঁড়িয়ে গাইতে শুরু করতেন—

আহা চাঁচর কেশের চিকণ চূড়া
সে কেন বুকের মাঝে।
বঁধু সিঁদুরেরও দাগ আছে সর্বগায়
মোরা হলে মরি লাজে।।

এ বাণী কলঙ্কভঞ্জন না মানভঞ্জনের সে কথা আজ আর মনে নেই। তবে 'মশায়' বড় মধুর গাইতেন এইসব পদ। তিনি আরও গাইতেন এবং নাচতেনও এইসব পদ গেয়ে, যেমন—

কুটিল নয়নে কহিছে সুন্দরী
অধিক করিয়া ত্বরা।
তখন কহে চণ্ডীদাস আপন স্বভাব
ছাড়িতে না পারে চোরা।।

এরকম এক পরিবেশে শৈশব শুরু হয়ে যখন 'নারায়ে তকদীর আল্লাহু আকবর' এর মতন অন্য এক কীর্তনের সুর ভয়াবহ দাঙ্গার বাণী হয়ে কানে পৌঁছোল, তখন ধলু মশায়ের সুললিত উচ্চারণের এই বাণীগুলি—

পিরীত পিরীতি সবজনে কহে
পিরীতি সহজ কথা।

বিরিখের ফল নহেগো পিরীতি
নাহিমিলে যথা তথা— ইত্যাদি

ধূল্যবলুণ্ঠিত বলে বোধ হতে থাকল। নারা-এ তকদীর আল্লাহু আকবর এবং মুসলিম লিগ জিন্দাবাদ, পাকিস্তান জিন্দাবাদ, এইসব ধ্বনি শুনলেই তখন দাঙ্গার আতঙ্ক আমাদের মনের মধ্যে বিস্তৃতি পেত। একদল 'আল্লাহু আকবর' আর অন্য দল 'হরহর মহাদেও' বলেই আজও দাঙ্গা করে, কিন্তু কবীরের দোঁহা, চণ্ডীদাসের পদাবলী বা লালনের মরমিয়া সঙ্গীত ইত্যাকার তাবৎ বৈভবে উভয় দলই এখনও চোখের জলে বুক ভাসিয়ে শোনে। এ এক প্রগাঢ় বিস্ময়।

ইস্কুলের কথা বলতে গিয়ে এত আশপাশ কথা গাইলাম। মূল কথায় ফিরি। দাদীআম্মা আমার পড়াশোনার বিষয়ে বড়ই পীড়াপীড়ি শুরু করলেন। আমি একদিন পাশের গাঁয়ের এক মাস্টারমশাই-এর সাথে দেখা করি। দাদীআম্মাদের গ্রামে একটি নতুন ইস্কুল খোলা হয়েছে। তিনি সেখানকার একমাত্র হিন্দু শিক্ষক। তখনও ইস্কুলে একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত রাখার রীতি প্রচলিত ছিল। মৌলবি তো একজন থাকতেনই। সে কারণে, এবং জাত্যংশে ব্রাহ্মণ বিধায় মহাশয় ঐ ইস্কুলের পণ্ডিত। কিন্তু সংস্কৃত কখনওই তাঁর বিষয় ছিল না। একমাত্র পুরোহিত দর্পণ বা নিত্যকর্ম পদ্ধতি পর্যন্তই তাঁর গতায়াত ছিল, কারণ পৌরোহিত্য ব্যবসায়েই তাঁর আহারাদির আহরণ প্রধানত চলে এসেছে। ম্যাট্রিক পাশ। কিন্তু ইংরাজি বাংলা ইত্যাদি নিচু শ্রেণীর ছাত্রদের শিক্ষা দেবার যোগ্যতা অবশ্য তাঁর ছিল। এ কারণে কখনও কখনও তিনি পাঠশালা খুলে বসতেন এবং আমরা প্রায় শূন্য গাঁয়ের অবশিষ্ট হিন্দু বালক, বালিকারা তাঁর কাছে গাণ্ডা বাঁধতাম। তবে সে পাঠশালার আয়ু আদৌ দীর্ঘ হত না। তাঁর নাম পাঁচুঠাকুর। সম্ভবত ঐ নাম মাহাত্ম্যেই পাঠশালাটি বড় ঝটিতি 'পেঁচোয় পাওয়া' রোগে মরে যেত।

মাস্টারমশাই দাদীআম্মার সাথে পরিচিত ছিলেন। কী যেন এক গূঢ় কারণে তাঁর কুটিরে প্রায়শই তিনি যেতেন। এই গূঢ় কারণটি এক সময় আমার কাছে প্রকাশ পায় এক অসাধারণ ঘটনায়। একদিন, আমার তখনকার স্বাভাবিক নিয়মমতো দাদীআম্মার বাড়িতে দুপুরে খাওয়ার সময় গিয়ে দেখি ব্রাহ্মণটি যবনীগৃহে ফলারে রত। মহাশয়ের পাঠশালায় ইতিপূর্বে শিক্ষার্থী ছিলাম বলে, সেইক্ষণে তাঁর এবং আমার সাতিশয় অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। দাদীআম্মা অবশ্য আমাকে কায়দা করে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গিয়ে ব্রাহ্মণের ফলারের অস্বস্তি তখনকার মতো মিটিয়ে দেন, কিন্তু আমরা পরস্পর পরস্পরের কাছে ধরা পড়েই যাই। আর সে কারণে আমার সমস্যার সমাধান বেশ খানিকটা সহজই হয়। দাদীআম্মার কথামতো ইস্কুলে ভর্তি হবার ব্যাপারে যখন তাঁর বাড়িতে যাই তখন পরস্পরের মধ্যে একটা অলিখিত চুক্তি থাকেই যে আমরা কেউই কারুর যাবনিক অনাচার বিষয়ে স্ব-সমাজে কিছু বলব না। মিথ্যে বলব না, মাস্টারমশাই তাঁর কথা রক্ষা করেছিলেন অক্ষরে অক্ষরে। অর্থাৎ গ্রামীণ স্বাভাবিক নিয়মে আমার জেঠামশায় বা বাবার কানে মদীয় যাবনিক খাদ্য গ্রহণাদির বিষয়ে কখনও

কিছু বলেন নি। আমিও ঐ ব্রাহ্মণের ফলারজনিত গূঢ়কর্ম বিষয়ে এই কেতাব লেখার আগে পর্যন্ত সাধারণ্যে বাঙ্ময় হইনি। বিষয়টি গুরুত্বহীন হয়ে যাওয়ায় এতকাল পরে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হল। তবে মহাশয়ের উপর কিছু কিঞ্চিৎ দরকষাকষি যে সে সময় করিনি সে কথা হলপ করে বলতে পারব না। কিন্তু তা খুব একটা নৈতিক কর্ম ছিল না বলে বিশদে যাচ্ছি না।

দাদীআম্মার সাথে তাঁর যে গূঢ় ব্যবস্থাপনাটি ছিল এবং যে কারণে এই ব্রাহ্মণ তাঁর কুটিরে প্রায়শই ফলার করতেন এবং দক্ষিণাটি গ্রহণান্তর স্বস্তিবচন উচ্চারণ করে সিধেটি ঝোলায় পুরতেন তার তাৎপর্য কি? সেটিও একসময় আমার কাছে প্রকাশ পেল। কীর্তিনারায়ণের সংস্কার দাদীআম্মার রক্তে তখনও বহমান। যৎকিঞ্চিৎ হলেও তিনি এই ব্রাহ্মণকে কিছু 'সিধা' দিতেন। ব্রাহ্মণও প্রকৃত ইতিহাসটি জানতেন বলে, তা গ্রহণে দ্বিধা করতেন না। এক্ষেত্রে অভাবজনিত লোভ এবং পরম্পরার প্রকোপ উভয়ই কার্যশীল ছিল।

অতএব, এইসব কার্যকারণে আমার ঐ ইস্কুলে যাওয়ার পথে আর কোনও বাধা থাকে না। ইস্কুলটি তখন সবেমাত্র ভূমিষ্ঠ হয়েছে। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল। মুসলমান প্রধান গ্রাম, অতএব ছাত্রেরা ফসল কাটার পর সংখ্যায় যত থাকে চাষের মরশুমে তত থাকে না।

সে সময়ে আমার অভিভাবকেরা সবে তালুকদারি হারিয়ে এটা-ওটা বিক্রি করে খাচ্ছেন এবং এক অবশ্যম্ভাবী চোরাবালির গভীরে নিমজ্জিত হচ্ছেন। আমি তখন মোটামুটি বুঝতে শেখা এক কিশোর। কিছু বাংলা, কিছু ইংরেজি এবং সামান্য কিছু গণিত, নিজের চেষ্টায় আয়ত্ত করেছি। তাতে খুবজোর ক্লাস সেভেন-এ ভর্তি হওয়া যায়। বাড়িতে প্রচুর বই ছিল। ছোটবেলা থেকে খাপছাড়া পড়াশোনা এবং ইস্কুলের নিয়মে না থাকার জন্য ঐ সব বই ছিল আমার সঙ্গী। কিন্তু ঐ সব বই-এর মধ্যে বেশিরভাগই ছিল ধর্মগ্রন্থ আর নাটক নভেল। সবই বয়স্কদের পাঠ্য। আমার তখন স্বাভাবিক ইস্কুলীয় ধারায় পড়াশোনা করতে না পারার গ্লানি আর অশান্তি এতই প্রকট যে ঐসব পুরাণ, ধর্মগ্রন্থ এবং নাটক নভেলগুলো গোগ্রাসে গেলা ছাড়া অন্য কোনও উপায়ই ছিল না।

বলা বাহুল্য এসবের অধিকাংশই বুঝতাম না। গল্পের আকর্ষণে পড়ে যেতাম শুধু। আবার এর মধ্যে কিছু কিছু বই পড়া বিষয়ে বাবার নিষেধও ছিল। ক্ষীরোদ বিদ্যাবিনোদের নাট্যকাব্য, গিরীশ গ্রন্থাবলী, নারায়ণচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, অমর গ্রন্থাবলী, ভাগবত, কালি সিংগির মহাভারত, বাঁধানো 'প্রবাসী', ভারতবর্ষ, বঙ্গবাণী এবং ইত্যাকার তাবৎগ্রন্থ, যা আমার—ঐ বাড়িতে তখনও যথেষ্ট মজুদ ছিল—তা পড়া চলবে না এরকম একটা নিষেধাজ্ঞা আমার উপর ছিল। খুব সংগত কারণেই আমি তা মানতে পারতাম না এবং লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তাম। দরদালানের এক কোণে বসে এই সব নিষিদ্ধ গ্রন্থ পাঠকালে যদি হঠাৎ বাবার আবির্ভাব ঘটত—আমি চটলজদি বইখানা পাছার তলায় চালান করে দিয়ে তার উপর

বসে থাকতাম। এরকম বেশ কয়েক বার হয়েছে যে পিতৃদেব সন্দেহক্রমে আমাকে উঠে দাঁড়াতে আদেশ দিতেন এবং আমি বমাল ধরা পড়ে গিয়ে তাঁর কাষ্ঠ পাদুকার যথেচ্ছ প্রহার অঙ্গে ধারণ করেছি। তাতে যে আমার ঈদৃশ কুকর্ম আদৌ বন্ধ হত তা নয়। বাবা যে কী কারণে আমাকে ঐ সব গ্রন্থ পাঠ করতে নিষেধ করতেন তাও বুঝতে পারতাম। তখন আমার যা বয়স, সে বয়সে মহাভারত, ভাগবতের মতো গ্রন্থ পাঠ করার আকাঙ্ক্ষা একটা কারণেই ঘটে, তা হচ্ছে যৌনতা সম্বন্ধীয় বিবরণ যা ঐসব গ্রন্থে ব্যাপক লভ্য। সত্যি বলতে কি ভাগবত বর্ণিত রাজা পুরঞ্জয়ের স্ত্রীচিন্তন বিষয়ক আলেখ্য, তাঁর স্ত্রীত্ব প্রাপ্তি অথবা মহাভারতে ঈদৃশ নানান আখ্যায়িকাংশই আমি তখন খুব মনোযোগ সহকারে পড়তাম। তবে সেটাই এইসব পড়ার একমাত্র কারণ ছিল না। প্রাচীন সাহিত্য এবং পুরাণাদি পাঠ এখনও আমার একটা নেশা বটে।

আগেও বলেছি যে আশপাশ গ্রামের ছেলেরা যখন ইস্কুলে মাদ্রাসায় যেত, আমার অসম্ভব হিংসা হত, অপমান বোধ হত। সবাই ইস্কুলে যায়, আমি যেতে পারি না, সবাই কেমন রাত জেগে বা ভোর রাতে উঠে পড়ে, আমি পড়তে পারি না। ওদের জীবন কেমন সুখময়, আমার জীবনে সুখ নেই, সদাসর্বদা এই ছিল আমার কষ্ট। নিজের চেষ্টায় কোনও একটা কিছু লিখে যদি বাবাকে দেখাতে যেতাম বাবা প্রথমে অত্যন্ত উদাসীন ভাব দেখাতেন পরে লেখাটির বিষয়ে এমন সব মন্তব্য করতেন যে আর দ্বিতীয়বার তাঁকে কিছু দেখাবার আগ্রহ থাকত না। যেমন ইংরেজির লেখায় কিছু ভুল থাকলে বলতেন, এটা গোরু চরানো বা হাল চাষ করা নয়, এসব যত্ন করে শিখতে হয়। গোরু চরানোটা তখন আমার কর্তব্যকর্ম ছিল। যদিও হাল চাষটা রপ্ত হয়নি। তবে এইসব কাজকে বাবা বা জেঠামশায়েরা হীন কর্ম বলে ব্যঙ্গ করলেও তার অধ্যয়নও যে যত্ন করেই করতে হয় এবং তা যে ইংরেজি শেখার চাইতে আদৌ সহজ নয়, সে জ্ঞান আমার হয়েছিল। হাল চাষ না করলেও, কৃষি বিষয়ক অনেক কাজই আমি এবং আমার পরের ভাইটা বেশ যত্ন এবং পরিশ্রম করে শিখেছিলাম বলে অভাবের দিনগুলোতে সবাই কিছু খেতে পেতাম।

বাবার এই ধরনের বাক্যবাণে খুবই হতোদ্যম হয়ে ভাবতাম, আমার এরকম দুর্দশা কেন? আমাকে কেউ কিছু শেখায় না কেন? কিন্তু সব অবহেলা তুচ্ছ করে এক সময় নিজে নিজেই ইংরাজি ভাষাটা খানিক রপ্ত করতে পেরেছিলাম।

মাস্টারমশাই-এর সাথে দাদীআম্মাদের গ্রামের ইস্কুলে ভর্তি হতে যাওয়ার আগের দিন সন্ধ্যায় মাকে একা কথাটা জানালাম। বাবা বা জেঠামশাইকে কিছু বললাম না। মা বলেছিলেন, মাস্টারমশায়ের লগে যাবি হেথে আপত্তির কিছুই থাকতে পারে না। তয় ভাসুর ঠাকুর যদি রাইগ্যা যায়েন—। আমি বললাম, বাবার মতামতটাই এখন আমার দরকার। জেঠামশাই-এর মতামত বা রাগারাগি নিয়ে আমি আর ভাবি না। মা বাবাকে বলেছিলেন, বাবা অমত করেন নি, শুধু বলেছিলেন, কিন্তু আমার যে পয়সা নাই। মাস্টারমশাই বলেছিলেন, 'ঠিক আছে দেখি কি করণ যায়। আসলে পোলাডার এহন

ইস্কুলে যাওন আবইশ্যক।' আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। কারণ বাবা মত দেবেন এরকম বিশ্বাসও আমার ছিল না।

দুরুদুরু বক্ষে পরের দিন মাস্টারমশাই-এর সাথে সেই ইস্কুলে গিয়ে হাজির হলাম। যাবার পথে দাদীআম্মাকে প্রণাম করে গেলাম। তিনি গায় মাথায় হাত বুলিয়ে হাজার দোয়াদরুদ আশীর্বাদ জানালেন। আমার পরনে ছিল কোরা মার্কিন কাপড়ের দড়িভরা ইজের এবং সেই কাপড়েরই একটি জামা বা পিরান। মায়ের হাতে তৈরি। 'হেম' সেলাই দিয়ে। জুতো পায়ে দেওয়া আমাদের গাঁয়ের বাড়ির রীতি নয়, তাছাড়া আমার তা ছিলই না। শুধু বাড়ির মধ্যে খড়ম্ পরা বিধি। আমরা ডাঙর কাল অবধি উপানহ বিযুক্ত। এরকম এক দীন বেশে, কার্তিক মাসের এক পূর্বাহ্নে মাস্টারমশাই-এর সাথে যখন ইস্কুলে পৌঁছোলাম তখন সেখানে পাঠ আরম্ভ হওয়ার আগের অনুষ্ঠান জাতীয় সংগীত শুরু হয়ে গেছে। ছাত্রছাত্রীরা সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে গাইছে—

পাকিস্তান জিন্দাবাদ, পাকিস্তান জিন্দাবাদ
পাকিস্তান জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ।
পূরব বাংলার শ্যামলিমায়
পঞ্চ নদীর তীরে অরুণিমায়
ধূসর সিন্ধু মরু সাহারায়
ঝান্ডা জাগে যে আজাদ।

তার মধ্যে 'প্রাচ্য প্রতীচ্যের মিলন গাহি, যমুনা বহে যে উজান।'—এইসব পদও ছিল। এ রকম অভিজ্ঞতা আমার কাছে সম্পূর্ণ নতুন। আমি মুগ্ধ চোখে এবং শ্রবণে এই অপূর্ব অনুষ্ঠানটি অন্তর দিয়ে গ্রহণ করছিলাম। মাস্টারমশাই ফিস্ফিস্ করে কানের কাছে বলছিলেন, শ্যাহেগো দ্যাশ, এহানে থাকতে অইলে এইসব কৈলম করণ লাগবে, বোজজো?—কিন্তু ব্যাপারটি আমার এত ভাল লাগছিল যে মাস্টারমশাই-এর কথা আমার মধ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল না। বরং এই ভেবে আমি উত্তেজিত বোধ করছিলাম যে এখন থেকে আমিও রোজ এরকম একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারব। এই গানটি কে রচনা করেছিলেন তা আজ আর মনে নেই। তবে এই গানের কবি পূর্ব পাকিস্তান কথাটির ব্যবহার না করে 'পূরব বাংলা' কথাটি ব্যবহার করেছিলেন এবং হিন্দু মুসলিমের মিলনের বাণীও এর মধ্যে ছিল। কি কারণে জানি না বছর দু-তিনের মধ্যে গানটি পাকিস্তানে পরিত্যক্ত হল এবং তার স্থলে এল একটি উর্দু জাতীয় সংগীত। জেনারেল প্রেসিডেন্ট মহঃ আইয়ুব খান সাহেবের হুকুমে সেটিই বাধ্যতামূলক হল। আমরাও তার অর্থ, সুর কিছুই না জেনে বুঝে গাইতে শুরু করলাম—

'পাকসার জমীন্ সাদ্‌বাদ্
কিসওয়ারে হসীন সাদ্ বাদ্
কওমে মুল্‌কে সুলতানাত্
পায়েন্দাতা বিন্দাবাদ

সাদ্‌বাদ মঞ্জীলে মোরাদ্।
পরছামে সিতারা হেলাল
রাহেব্বারে তরাক্কি ও কমোল
তু নিশানে আজমে অলিশান
আরজে পাকিস্তান
স্যাএ খুদাএ জুল জালাল।

একটা সময় অবশ্য তার সুরের হদিশও হল, কিন্তু প্রথম সংগীতটি ছাত্রদের হৃদয় এতই বেশি অধিকার করে বসেছিল যে ইস্কুলে বাধ্যতামূলকভাবে নিয়মরক্ষা করা ছাড়া দ্বিতীয় সঙ্গীতটির কোনও আবেদন বা প্রভাবই থাকল না। কিন্তু প্রথমোক্ত সংগীতটি বহুকাল আমরা ঘাটে মাঠে বাটে গেয়ে বেড়াতাম। তার মধ্যে আমরা যে প্রাণের ছোঁয়া পেয়েছিলাম, পাক্‌সার জমীন সাদ্‌বাদ—এর মধ্যে তা পাইনি, যদিও এক সময় তার অর্থটি আমাদের বোঝানোও হয়েছিল। ফলত, এই দুটি জাতীয় সংগীত নিয়ে একসময় ছাত্র সমাজ বনাম ফৌজি সরকারের মধ্যে এক দ্বন্দ্বযুদ্ধ বেঁধে যায়। তখন কিছুদিনের জন্য দুটি গানই জাতীয় সংগীত হিসেবে মর্যাদা পায় বটে কিন্তু একসময় 'পাকসার জমীন'ই স্থায়ী হয় এবং আমাদের ঐ প্রিয় গানটি বিস্মৃতিতে বিলীন হয়ে যায়।

ইস্কুলের হেড স্যারের নাম হাতেম মাঝি। সাদা কুর্তা, সাদা লুঙ্গি, সাদা প্রলম্বিত দাড়ি, বর্ণ উজ্জ্বল গৌর। 'মাঝি' উপাধি-র পক্ষে আদৌ মানানসই নয়। শান্ত সৌম্য ভাব। মাস্টারমশাই আমাকে তাঁর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলে আমি জনাবকে প্রণাম করলাম। তিনি বললেন, তোমার আব্বাজানরে আমি জানি। একসময় আমরা পরস্পর বন্ধু মানুষ আছিলাম। অনেকদিন দেহা সাক্ষাৎ নাই। তেনায় আছেন কেমন? বললাম যে তিনি জানেন, আপনি এখানে আছেন। আমাকে বলেও দিয়েছেন যে ওঁকে আমার কথা বলিস। স্যার বললেন, একারণেই তোমার পেনাম আমি লইলাম। তয় জানবা, এছলামে সিজ্‌দা একমাত্তর আল্লারে ছাড়া আর ক্যাওরে করন যায় না। আমি তখনও ইসলামের রীতকানুন বিশেষ কিছুই জানি না। তাই জিজ্ঞেস করলাম—গুরুরেও না?—স্যার বললেন, পবিত্র কোরআন শরীফে আল্লাহ্‌তলা স্বয়ং আমাগো নবীরে ফরমাইছেন, লা হুক্‌মা ইল্লাহ্ লিল্লাহ্। অর্থাৎ আল্লাহর শরীক নাই। তিনি লা শরীক। গুরু বা ওস্তাদ তেনার শরীক অইতে পারেন না। আমরা বেয়াকেই তেনার বান্দা। বান্দাগো মইদ্যে উচানীচা থাহন গুনাহ। হে কারণ, এক বান্দা অইন্য বান্দার এবাদত্ করতে পারেনা। আমি তখন, আমার বয়স সামান্য হলেও, নিজস্ব শিক্ষা বলে তাঁকে আবার বলি, স্যার, আমার বাবায় রোজ সকালবেলা যে মন্তর কয়েন, হেই মন্তরই আমি এতকাল জানইয়া আইছি। আমার বিশ্বাস আর শিক্ষা হেই মন্তরেই আছে। হেনায় রাজ ভোরবেলা উডইয়া আওড়ায়েন—

অজ্ঞান তিমিরন্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া
চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম

তদ্‌পদম দর্শিতম যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

—আমার মায় বা বাবায় একমাত্তর হেনাগো গুরু ছাড়া আর ক্যাওরে মান্যতা দেন না। তয় গুরুস্থানীয় বেয়াকেরেই স্যাবা দেন।

স্যার বললেন, হে কারণেই তোমার পেনাম আমি লইলাম। জানিনা, এডাও এট্টা গুণাহ্ করলাম কিনা। তয় তুমি মোছলমানের পোলা অইলে এ পেনাম আমি লইতাম না। ক্যান? না—এছলামে এমত বিধি নাই। আমরা আমাগো নবী হযরত মহম্মদ (দঃ) -রেও পায়ে হাত দিয়া পেনাম করতে পারি না। ক্যান্? না হেনায় নবী অইলেও আদমজাত। আল্লা না। তেনারে বা অন্য ওস্তাদ স্থানীয় পীর দরবেশ গো আমরা আড়ু ছুঁইয়া তস্‌লিম করতে পারি, পেন্নাম করতে পারি না। স্যারকে আমার আরও অনেক কিছুই বলার ছিল। আমি বলতে পারতাম, দেখুন, আমার বাবা নানান মন্ত্রোচ্চারণের সাথে সাথে 'তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ' এই বাক্যাংশটি উচ্চারণ করে থাকেন। তিনি বলেন—

তোর অতীতগুরু পতিতগুরু

গুরু অগনন

গুরু বলে কারে প্রণাম করবি মন?

—সে অর্থে প্রতিটি বস্তুকে, ব্যক্তিকে, স্থান, কাল, পাত্রকে এমনকি প্রতিটি রজঃকণাকে আমাদের প্রতিনিয়ত প্রণাম জানাতেই হয়। কেননা আমরা প্রতিটি পদার্থেই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করতে চাই। তাঁকে তাঁর সৃষ্ট জগত থেকে আলাদা করে ভাবতে পারিনা। তিনিই তো এসবের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করছেন। অবশ্যই এই ব্যাখ্যা অথবা চিন্তন আমার সেই সময়কার পারিবারিক প্রভাবের ফল। কিন্তু স্যারের বক্তব্য সম্পূর্ণতই এই বোধের বাইরের এক চিন্তন, যার সাথে আমার সম্পর্কের সবেমাত্র শুরু। ইস্‌লামিক আচার আচরণের তখনও কিছুই জানি না।

আমি সেসব কিছুই তাঁকে বললাম না। শুধু বললাম যে, আমি এছলামে শরীক হইনি। আমি জেনেছি গুরু নররূপী ঈশ্বর। আপনি এক্ষণে আমার গুরু। আমি আপনাকে 'সেজ্‌দা' করবই। আপনি দয়া করে তা কবুল করুন এবং আমাকে দোয়া করুন। স্যার তখন চোখ বুজে আমার কথা শুনছিলেন। তাঁর দুচোখের কোল বেয়ে, কি কারণে জানিনা অশ্রুপাত হচ্ছিল। বোধ করি তাঁর আচার ও ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে আমার অনুষ্ঠেয় আচারের ভিন্নতা তাঁকে এক দার্শনিক সংকটে ফেলেছিল। তথাপি, সেই বৃদ্ধ আমার সর্বশরীরে তাঁর করস্পর্শ সঞ্চালনে আমাকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, তোমার তালেব এলেম পোক্ত অউক। তুমি আল্লাহ পাকের নেক নজর লাভ কর। তোমার বালামুসিবৎ দূর অউক। এবং এভাবেই আমি ঐ ইস্কুলে গৃহীত হলাম। সকলেই আমাকে খুবই স্নেহের সঙ্গে গ্রহণ করলেন।

তখন বাৎসরিক পরীক্ষার আর একমাস মাত্র বাকি। নভেম্বর মাস। ডিসেম্বরে ফাইনাল পরীক্ষা। তখনকার দিনে নিয়ম এরকমই ছিল। ফাইনাল পরীক্ষার একমাস

আগে ইস্কুলের খাতায় আমার নাম তোলা হল। ভর্তির জন্য আমার অভিভাবকদের কোনও টাকা পয়সার লেনদেনে পড়তে হলনা। এ ব্যবস্থা একমাত্র সে যুগেই সম্ভব ছিল। ক্লাস সেভেন। একমাস বাদে পরীক্ষা। আমার বই, খাতাপত্তর কিছু নেই। অথচ আমি পরীক্ষা দেব। আমার বাবা, জেঠামশাই-এর কাছে আমার কোনও প্রত্যাশা নেই। অতএব এক অমানুষিক পরিশ্রম করে আমাকে পরীক্ষা দিতে হল। বইপত্র কিভাবে সংগ্রহ করেছিলাম তার অনুপুঙ্খ আজ আর স্মরণে নেই। পরীক্ষায় তথাপি তৃতীয় স্থানাধিকারী হলাম। বাড়িতে এসে, প্রায় বুক ফুলিয়ে বাবাকে বলেছিলাম, আমি থার্ড হয়েছি। বাবা বললেন, ক্লাসে বুঝি তিন জন ছাত্র?

জেঠামশাই দরদালানে আনমনা পায়চারি করছিলেন। তিনি তাঁর ভাই-এর কাছে জানতে চাইলেন, ও কি ঐ মেঞাগো ইস্কুলে শ্যাষ পর্যন্ত ভর্তি অইলে? ও তো একছের গোল্লায় যাওনের রাস্তা লইছে দেহি। তুমি তো ওরে কিছুই শাসন করনা। ও কিন্তু এ বাড়ির মান ইজ্জতটাও রাকবে না। বাবা কিছু উত্তর করলেন না। জেঠামশাই বলতে লাগলেন, ল্যাহাপড়া সবাইর অয়না। যারগো হওনের হ্যারগো তো ব্যবস্থা করইয়াই দিছি। হ্যারা হিন্দুস্থানের শিক্ষাদীক্ষা পাইতাছে, কইলকাতার ইস্কুলে। হ্যারা কিছু করলেও করতে পারে। তয় এহানে, এই মেঞাগো দ্যাশে যে শিক্ষাদীক্ষার কিছু থাকতে পারে এমন আমি বুঝিনা। বাবা খুবই শান্তভাবে বললেন, আসলে ওর সমস্যাডা আমরা তো সমাধান করি নাই। হে কারণে ওর এট্টা অভিমান আছে। আর এই ইস্কুলের ব্যাপারটায় আমি আপত্তি করি নাই, কারণ এডা ওর নিজের চেষ্টায়ই ও করছে। জেঠামশাই ঘোষণা করলেন যে, এ ধরনের স্বাধীন সিদ্ধান্ত যারা নেয়, তারা আখেরে শুধু পারিবারিক আভিজাত্যকেই কলুষিত করে এবং আমি যে একদা একটি প্রকৃত কালাপাহাড়ই হব এ বিষয়ে তাঁর কোনও সন্দেহই নেই।

আবার সেই আভিজাত্য। এই আভিজাত্য যে শেষ পর্যন্ত কোথায় আমাদের দাঁড় করাবে, কে জানে? অথচ আভিজাত্যের এই আধিকারিকরা এ সময় তাদের ঘটিবাটি বিক্রির পয়সায় অন্ন সংগ্রহ করছেন। জেঠামশাই আভিজাত্যের ব্যাপক প্রবক্তা হয়েও টাকা ধার করছেন একদার খানাবাড়ির প্রজাদের কাছ থেকেও। মুনিষ মাহিন্দরদের কাছ থেকে ঠিক টাকা কড়িতে ধার করছেন না বটে, তবে তাদের সেবার মূল্য দিচ্ছেন না এবং সে কারণে তারা প্রায় সামনাসামনি যদৃচ্ছ খিস্তিখামার করে যাচ্ছে। তথাপি নাকি আমি 'শ্যাহেগো ইস্কুলে' পড়াশোনা করতে গিয়ে বাড়ির আভিজাত্য খর্ব করেছি। এ আভিজাত্যের 'খুরে' দণ্ডবৎ করা ছাড়া আমার আর কোনও উপায় ছিল না।

এই ইস্কুলে ভর্তি হবার আগে—আমাকে কি কি করতে হত সে সব ইতিপূর্বে বলেছি। সেসব কারণে আভিজাত্য খর্ব হল না, হল কখন? না, যখন আমি একটু স্বাধীনভাবে পড়াশোনা করার দিকে ঝুঁকলাম। কেন? না, ওইসব স্থান অতি তুচ্ছ মানুষদের দ্বারা পরিচালিত, তারা শিক্ষাদীক্ষা বিষয়ে আদৌ কোনও ধ্যান ধারণার অধিকারী নয়। তারা কিভাবে আমাদের শিক্ষা দেবে? বিশেষত তারা যে 'মোছলমান',

'মেয়া' 'শ্যাখ'। এই ব্যাখ্যান সম্পূর্ণতই জেঠামশাই এবং তাঁর স্বভাবসম্পন্ন মানুষদের মানসিকতা অনুযায়ী। এ বিষয়ে কিছু অতিরঞ্জন নেই।

জেঠামশাই, যখন আমাদের তালুক মুলুক ইত্যাদি ছিল, তখন বাড়ির চাকর-বাকরদের দিয়ে আমাকে শাসন করাতেন। এখন তারা আর নেই। তথাপি একমাত্র চাকর ফটিকদাস অনন্যোপায় হয়ে থেকে গেছে এবং তার স্ত্রীপুত্র নিয়ে সে এ বাড়িরই স্থায়ী সদস্য। এখন জেঠামশাই তাকেই ব্যবহার করেন আমাকে অপদস্থ করার জন্য। এ মানসিকতার কি যে তাৎপর্য তা আমার বুদ্ধিতে ধরা পড়ে না। জেঠামশাই তাকে সাক্ষী মেনে বলেন, আচ্ছা ফটিক তুমিই কও, এডার কি কিছু হওয়ার? এডা তো এট্টা আস্থা বলদ না কি? ফটিক ফ্যাঁক ফ্যাঁক করে খানিকটা হেসে বলে, বড়বাবু কি মিথ্যা কইতে পারেন? ওডা হাচাই বলদা। এসব বার্তালাপ আমার বাবার সাক্ষাতেই হত। কিন্তু বাবা কিছুই প্রত্যুত্তর করতেন না। তিনি যেন তাঁর জ্যেষ্ঠের আচরণে কোনও আপত্তিকর কিছুই দেখতে পেতেন না। এ কারণে তাঁর কোনও প্রতিবাদও ছিল না। কিন্তু এখন তো আমি কিছু বড় হয়েছি। ক্লাশ সেভেন থেকে এইটে উঠেছি, ক্লাশে তৃতীয় হয়ে। এখনও যদি এই লাঞ্ছনা আমাকে সহ্য করতে হয়, এই আচরণ প্রাপ্য হয়, তবে বেঁচে থাকার সার্থকতা কি? বাবাকে একথা জানালে তিনি বলেছিলেন, যিশু তার নিজের ক্রুশ নিজেই বহন করেছিলেন। আমি তোমার দুঃখ দূর করতে পারব না। I have carried my cross all through my life, perhaps, you too have to carry it. আমি বলি, যাই সামনে আসুক তাকে গ্রহণ কর। কেননা গ্রহণ না করলেও তার প্রকোপ তোমার উপর বর্তাবেই, তেমনই আমার ধারণা। আর সেই প্রকোপ তোমাকে সহ্যও করতে হবে, কেননা, না করে কোনও পরিত্রাণ নেই। বাবা এভাবে আমাকে কোনও দিনই কিছু বলেন নি। তাঁর এই কথার মধ্যে যে এক অসহায়তা, নিরাশ্রয়তার সুর শুনলাম, তা আমাকে কোনও উজ্জীবনে উদ্দীপ্ত করল না। বরঞ্চ আমি নিজেকে জীবনের ক্রমান্বয়ী দুর্ভোগ সহ্য করার নিরুপায় এক মাধ্যম হিসেবে নিজের ভবিষ্য পরিক্রমণকেই প্রত্যক্ষ করলাম যেন। অন্তত এরকম একটা অনুভূতি আমার হয়েছিল সেদিন। আমি এইসব কথা শুনে, মাথা নিচু করে অপরাধীর মতো ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা পিছারার খাল পারে গিয়েছিলাম। আশ্চর্য, তখন আমার ঐ খালটার কথাই প্রথমে মনে হয়েছিল, যেখানে একদা আমার মায়েরা শান্তির অবগাহন খুঁজতেন। কিন্তু গিয়ে দেখলাম, খালটা একটা শুকনো নালার মতো পড়ে আছে। তাকে একলাফে ডিঙিয়েও যাওয়া যায়। ভেবে দেখলাম ইতিমধ্যে বেশ কিছু বছর পেরিয়ে গেছে, আমি এই খালটির পারে আসিনি। মনে অসম্ভব খেদ আর নৈরাশ্য নিয়ে আমি তার 'রেত্' ধরে চলতে লাগলাম। দু'পাশে অসুমার জঙ্গল। আশ শ্যাওড়া বন বাঁডালি, বন কচুর ঝোপ, আর দুই পারের হিজল, চালতা, জাম, ডৌয়া, করমচার ভিড়। খালের দুই পারের ভুইমালীবাড়ি, দাসের বাড়ি, দত্ত বাড়ি, মণ্ডল বাড়ির ঘরের পোতাগুলো সব চিতার মতো পড়ে আছে। এরা সব যে কোথায় গেল, তাও আমার জানা নেই। ভুঁইমালীরা আমাদের খানাবাড়ির প্রজা

ছিল। সেই বাড়তে, তাদের এক জামাই এসে খুব জমিয়ে থাকত। একটা সময় ছিল, যখন জামাই ভুঁইমালী তার শ্বশুরবাড়িতে এলে, তার ব্যাগ থেকে ক্লারিওনেট বের করে—সময়ানুগ রাগ বাজাত। মানুষটি বড় চমৎকার স্বভাবের ছিল। ক্লারিওনেট বাজানোটা তার পেশা এবং শখ তো ছিলই, সে তার হৃদ্দমুদ্দ জানতও। এসব তথ্য আমরা পেতাম আমাদের অন্ধ জেঠামশাই-এর কাছ থেকে। তিনি বলতেন, জামাই ভুঁইমালী এবার কিন্তু কল্যাণে ধরল। আহা! অন্ধ জেঠামশাই আমাদের বাড়ির এক শরিকও বটেন, অথবা তাঁকে আশ্রিত বললেও ভুল হয় না। কিন্তু সে কথা একটু বিশদে বলা প্রয়োজন।

যতদূর স্মৃতি সচল, ছবি দেখি, অন্ধ জেঠামশাই তবলা বাজাচ্ছেন। একজন গানের মাস্টারমশাই, আমাদের বাড়িতে দিদিদের গান শেখাচ্ছেন। সারেগামাপাধানিসা-র সাথে ইংরেজি স্বরলিপির অনুশীলনও হচ্ছে, 'ডুলেনা মান্ডে গাড়ো আ'। ধ্বনিটিই উদ্ধৃত করলাম স্মৃতি অনুযায়ী, অর্থ জানিনা। অন্ধ জেঠামশাই তালে তালে তাল দিতেন। ছোট বৈঠকখানা থেকে অন্দরে আসার পথে মাথাটি নেড়ে নেড়ে তালের সমীক্ষা করতেন। কখনওবা গাইতেনও—'রইব না আর ধূলায় পড়ে পাপে মোহে ম্লান হয়ে, পাপে মোহে ম্লান'।

জামাই ভুঁইমালী কতদিন যে তার ক্লারিওনেটটা বাজায়নি, তাও মনে নেই। এখন পিছারার খালের 'রেত্' ধরে যেতে যেতে আমি সেই স্মৃতিতে আলোড়িত হই। উল্টো পাবের দত্তবাড়িটা হানাবাড়ি হলেও, এখন তার ইট-কাঠ পাথর বজায় রেখেছে। পিছারার খালের সোঁতাটা ভুঁইমালী বাড়ি, দত্ত বাড়ি পেরিয়ে বাঁহাতি যে বাঁড়ুজ্জেদের ভিটেগুলির সুলুক সন্ধান দেয়. তাঁরাও তখন আর দেশে নেই। তাঁরা কবে গেলেন? কোথায় গেলেন? কেনো গেলেন?

খালের 'রেত' ধরে যেতে যেতে এইসব নজরে আসে আর ভাবি, হায়! নির্বেদ ক্রমশ তীব্র হলে জঙ্গলও এক সময় নিবিড় হয় এবং প্রায় অলৌকিকভাবে খালপারে বাধা একটি বাছুরের গলার দড়ি আমাকে আকর্ষণ করে। আমি বাছুরটিকে মুক্ত করে দড়িগাছা সংগ্রহ করি। দত্তদের একতলা হানা বাড়িটার লাগোয়া বাগানটা এখন জঙ্গলই জঙ্গল। ডানদিকে একটা হিজল তার ডাল পালা ছড়িয়ে। আমি দড়িগাছা হাতে নিয়ে হিজলের একটা ডালের ওপর উঠে দাঁড়াই। ঝুলে পড়ার তাবৎ প্রক্রিয়া শেষ হলে, শেষবারের মতো গাছটাকে আনুপূর্ব দেখি। হিজলের শোভা বর্ষায় যাঁরা না দেখেছেন, তাঁরা বর্ণনায় ব্যাপারটা বুঝবেন না। বর্ষার শুরুতে যখন ওর গা-বেয়ে ফুলের ছড়িগুলো ঝুলতে থাকে, তখন প্রকৃতি বড় মোহময়ী হয়। অনেক দিন এদিকে আসা হয়নি বলে এ শোভার কথা ভুলেই গিয়েছি। এখন অঘ্রান মাস। এখন হিজলের গায়ে কোনও ফুল নেই। তবুও তার শরীর এমনই ছন্দোময় যে তার ডালে আর খানিকক্ষণের মধ্যে যে কাজটি আমি করতে যাচ্ছি, তা একান্তই প্রকৃতি বিদ্বেষী। যে ডালটির উপর এখন দাঁড়িয়ে, তা পিছারার খালের উপর ঝুঁকে আছে। সোঁতা এখন অতি ক্ষীণ, এমনকি

তার জলে হিজলের প্রচ্ছায়াও দেখা যাচ্ছে না। অঘ্রানের হিম তার ফুল নিঃশেষ করেছে। রিক্ত ডালটি তাই যথেষ্ট সোচ্চারে যেন আমাকে বারণ করতে পারছে না, বলতে পারছে না, একাজ কোরো না। কিন্তু আত্মনিধন তথাপি বাধাপ্রাপ্ত হল। আমি কিছু কচিকণ্ঠের কলকাকলি শুনতে পেলাম। এই কণ্ঠসমূহ একটি শব্দোচ্চারণে পিছারার খালের সোঁতা ধরে আসছিল। শব্দটি—দাদা তুই কৈ? ও দাদা তুই আমারে কোলে নে। আমি হাটতে পারিনা। আমার হাত থেকে ঘাতক দড়িগাছার অতঃপর পড়ে গিয়ে দোল খাওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না। আমার অনুজ অনুজারা আমার খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে। তার মধ্যে যার গলা আমাকে দড়িটা ছেড়ে দিতে বাধ্য করে সেটাই তখন সবচেয়ে কচি বোন আমার। তার একদণ্ডও আমার কোলছাড়া চলে না। তার আগেরটা ভাই। সবচেয়ে ছোট ভাই আমাদের, সেটাও তেমন বড় নয় তখন। আমি ঐ দড়িটায় দোল খেয়ে গাছটি থেকে নেমে আসি এবং ওদের আওয়াজ শুনে খানিক পিছিয়ে এসে দুজনকে দুকাঁধে নিয়ে বলি, চল বাড়ি যাই।—ঐ মুহূর্তে আমার খেয়াল হয়েছিল যে আমার এরকমভাবে মরাটা খুব স্বার্থপর মরা হবে। আমি যদি এখন মরি প্রাকৃত বিশ্বে তার কিছুমাত্র প্রভাব থাকবে না। কিন্তু এই শিশুগুলি, যারা এখনও অবুঝ, যাদের জন্য আমার তাবৎ চিন্তাচিন্তন, তারা অন্নহীন, আশ্রয়হীন হবে। বাবা এদের জন্য কিছুই করতে পারবেন না, শুধু হা-হুতাশ করবেন। এরা সবাই তখন অন্নাভাবেই মরে যাবে। আমি যদি মরি, আমি বেঁচে গেলাম। কিন্তু এদের কি হবে? কাঁধের উপর থেকে ছোটবোনটা শুধু অনুযোগ জানিয়ে যাচ্ছিল, ওদাদা, তুই কোথায় যাইছিলি? আমারে না লইয়া ক্যান্ যাইছিলি? ও তখনও ভাল করে কথা বলতে শেখেনি। ভাবলাম, আমি কি এরকম একটা স্বার্থপর মরা মরতে পারি? এ কারণেই আমার মরা হল না। মনে মনে বুঝে নিলাম আত্মস্বার্থীয় কোনও কিছুই আমার জন্য নয়, এমনকি আত্মস্বার্থে মৃত্যুও আমার স্বধর্ম নয়। আজ মনে হয়, ঐ মুহূর্ত থেকেই ভবিষ্যতের জীবনযাপন প্রণালীর একটা সুনির্দিষ্ট ছক তৈরি হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে দেখেছি, আমি কিছুতেই এই ছকের বাইরে কোনও বৃহত্তর কর্মকাণ্ডে নিজেকে বেশিদিন নিয়োজিত রাখতে পারিনি। এমন কি ছয়ের দশকের শেষকাল থেকে সাতের দশকের মধ্যকাল পর্যন্ত যে রাষ্ট্রবিপ্লবের আবর্তে নিজেকে নানাভাবে জড়িয়ে ফেলেছিলাম, তাও আমাকে পুরোপুরি তন্নিষ্ঠ করতে পারেনি। সমাজ বিপ্লব প্রচেষ্টার সেই ক্রান্তিকালে আমার যে দোদুল্যমানতা ছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। পরে বুঝেছি যে একজন পেশাদার বিপ্লবী হবার যোগ্যতা চরিত্রগতভাবে আমার ছিল না। আমি শুধু এই কর্মে ব্রতী মানুষদের প্রতি ভালবাসায় আপ্লুত হয়ে কিছু সহায়তা করার মতো মানসিকতায়ই অবস্থান করছিলাম। বস্তুত আমার চরিত্রে স্বাভাবিকভাবেই ভালবাসার এবং আবেগ প্রবণতার মাত্রাটা অধিক। কোনও রকম ভাবেই আমি ঘৃণা বা ক্রোধকে অধিকক্ষণ ধারণ করতে পারি না, তা মহান কারণেই হোক অথবা তুচ্ছ কারণে। ফলত শত্রু-মিত্র বিভাজনের বিচারে আমি কখনওই একবগ্‌গা হতে পারিনি।

— কুড়ি —

মিঞাদের ইস্কুলে পড়াশোনা করার ব্যাপারটা জেঠামশাই আদৌ পছন্দ করলেন না। কিন্তু সংসারের কর্তা হিসেবে অন্য কোনও ব্যবস্থাও তিনি করেন নি। বাবা আজীবন, দাদা যা করেন এমত বিশ্বাসে আচ্ছন্ন। তাঁর ধারণা জেঠামশাই অবশ্যই একটা অসাধ্য সাধন করবেন একসময়ে। কিন্তু তা আর কখনওই ঘটে না। যা ঘটে তা নিতান্তই স্থূল স্বার্থের ব্যাপার। একারণে এ সময় যেসব ঘটনাগুলো ঘটতে থাকে, তা বাবার চিরপোষিত বিশ্বাসের ভিত থেকে একটি একটি করে ইঁট খসাতে থাকে। এবং তিনি ক্রমশ নিজেকে এক চোরাবালির উপর অসহায় নিরালম্ব অবস্থায় আবিষ্কার করতে থাকেন। এরকম একটা সময়েই একদিন একটা থলেতে সের পাঁচেক চাল আমাদের ঘরের সামনে রেখে জেঠামশাই বাবাকে বলেছিলেন, 'আইজথিকা আমরা পিথগান্ন অইলাম। আমার আর এতবড় সংসার টানবার মত সামথ্য নাই।' বাবার ক্ষেত্রে এই ধাক্কাটাই ছিল চরম। তিনি কোনওক্রমে জিজ্ঞেস করেছিলেন : এই কি আমার সর্বশেষ প্রাপ্য। আমিতো এস্টেটের অর্ধেক ভাগের মালিক আছিলাম। জেঠামশাই একটু হেসে বললেন—একথা তো তোমারে আগেও কইছি। মাইয়াগো বিয়ায় সব শ্যাষ। এহন নিজেগো খাওন নিজেগোই রোজগার করণ লাগবে। দ্যাখলাই তো, বাসনপত্তরগুলাও বিক্কিরি শ্যাষ। তথাপি বাবা প্রশ্ন তুলেছিলেন, যদিও খুবই ক্ষীণভাবে,—সিন্দুকের চাবি কোথায়? আকবরি মোহর, গিনি, গয়নাপত্তর আর পুরান চান্দির টাকার থলিডা, হেসব কিছু আছে না নাই? জেঠামশায় বলেছিলেন, তুমি কি খালি সপ্‌পন দ্যাহ? এতকাল এতবড় সংসারডা কিভাবে চালাইলাম, হ্যার খোজও লও নায় কোনদিন। এহনও এইসব জিগাও? সিন্দুকের চাবি আছে, খুলইয়া দ্যাহ, কিছুই পাবানা। হেয়ার যা করার পিসিমায়ই করইয়া গেছেন, আমি সব জানিওনা।

পরে জেনেছি, আমাদের বাড়ির মধ্যের ঘরের যেখানে বিশাল বর্মিসেগুনের সিংহপালঙ্কখানা পাতা ছিল, যার উপর ঠাকুর্দামশাই-এর গুরু, গুরুকল্প তথা গুরুভ্রাতাদের ফোটো, ছবি এবং অন্য অনেক দেবদেবীর প্রতিকৃতিসমূহ সাজানো ছিল তারই পিছনে ছিল সিন্দুকটা।

তা একদিন সেই মরচে-পড়া সিন্দুক খোলা হল। বাবা খুবই হতাশ হয়ে দেখলেন সেখানে খান দুই তিন রুপোর বাসনপত্র ছাড়া আর কিছুই নেই। অথচ ঐ সিন্দুকে নাকি বেশ কিছু আকবরি মোহর, গিনিসোনার বাসনপত্র এবং এ বাড়ির প্রাক্তন বধূদের গহনা ইত্যাদি ছিল, যার ওজন খুব কম করে হলেও, বর্তমান হিসেবে দু-আড়াই কেজির মতো হবে। তার কিছুই সেখানে ছিল না তখন। এরপর বাবা ভেঙে পড়েন। কেননা এতটা বিশ্বাসভঙ্গের জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না বোধহয়। এই বিপুল সম্পদের কোনও হিসেবই বাবা পাননি। যেমন খাস জমির হিসেব পাননি, যেমন তালুকদারি থাকাকালীন খাজনা আদায় উশুলের হিসেব পাননি, তেমনই এই এজমালি সম্পদের হিসেবও পাননি। কিন্তু আশ্চর্য এই, তথাপি তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস কোনও দিনই

হারান নি, যদিও এই জ্যেষ্ঠ তাঁর সহোদর নন, খুড়তুতো জ্যেষ্ঠ। এ বিষয়ে আর অধিক কথন করব না। আমি একটা সময় এই এস্টেটের নগদ টাকা এবং অলংকারগুলির সর্বশেষ পরিণতি জেনেছিলাম।

কিন্তু এইসব পারিবারিক তথা ব্যক্তিগত তথ্যাদির জন্য এ আলেখ্য রচনা করতে বসিনি। এসূত্রে শুধু এটুকুই সারকথা যে, মিঞাদের ইস্কুলে আমার পড়াশোনা করার ব্যাপারে জেঠামশায়ের যতই আপত্তি তথা বিদ্বেষ থাকুক পেটের ভাত জোটাতে তাঁরা দুভাই-ই একসময় এরকম সব ইস্কুলেই শিক্ষকতা অবলম্বন করেন। তখন আমাদের অঞ্চলে চরম শিক্ষকাভাব। কারণ, পেশাগতভাবে যাঁরা শিক্ষকতা করতেন তাঁদের অধিকাংশই দেশছাড়া। মুসলমান সমাজে উপযুক্ত শিক্ষকের উপস্থিতি তখনও আদৌ নেই বললেই চলে। সেখানে আরবি-উর্দু-পড়ানোর জন্য তালেব এলেমধারী কিছু শিক্ষক হয়ত আছেন। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে পড়ানোর মতো শিক্ষকের প্রকৃতই অসদ্ভাব। আমার বাবা-জেঠামশাই বা তাঁদের পর্যায়ের মানুষেরা যে ইস্কুলে ছাত্র পড়ানোর বিষয়ে খুব একটা আদর্শ শিক্ষক এমন নয়। কেননা, তাঁদের কিছু ডিগ্রি থাকলেও শিক্ষকতা কোনওকালেই তাঁদের কৃৎকর্ম ছিল না। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল যে তাঁদের ঐ ডিগ্রিটাই একটা শর্ত হয়ে দাঁড়াল। অতএব, এঁরা দুই ভাইই শিক্ষকতাকে পেশা করলেন, তখন অবশ্য জেঠামশাই 'মিঞাগো ইস্কুলে পড়ামু না' এমত বায়না ধরলেন না, যে বায়নাটা আমার ক্ষেত্রে 'মিঞাগো ইস্কুলে পড়ার' বিষয়ে তাঁর ছিল। কেননা এখানে তাঁর মবলগ দু-পয়সা রোজগারপাতি হওয়ার নির্বন্ধ ছিল।

বাবা কিছুদিন পাশের মুসলমান গ্রামটিতে একটি মাইনর ইস্কুলের শিক্ষক হন। মাইনে তিরিশ টাকা। এই ইস্কুল বাবার কিছু গুণমুগ্ধ বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তিরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইস্কুল ব্যাপারটি এক্ষেত্রে গৌণ। মুখ্য উদ্দেশ্য বাবার তৎকালীন অবস্থায় কিছু সহায়তা করা। এ রকম ইস্কুল ঐসময়ে আমাদের ওখানে সাধারণত ফসল কাটার পর হামেশা গজিয়ে উঠত এবং মাস দু-তিন চলার পর, চাষের সময় ঘনিয়ে এলে আবার বন্ধ হয়ে যেত। এ ক্ষেত্রেও তাইই ঘটল এবং বাবা পুনরায় অজগর বৃত্তি অবলম্বন করে পালঙ্কের উপর নিশ্চল হলেন। আমি তখন ঐ 'মিঞাদেরই' ইস্কুলে ক্লাশ এইটে পড়ি। অবসর কাটে ছাত্র পড়িয়ে। আমার ছাত্র পড়ানোর ইতিহাস নিজের ছাত্র হওয়ার থেকেও প্রাচীন। ছাত্র হওয়ার আগেই আমি শিক্ষকতাকে পেশা করতে বাধ্য হয়েছিলাম। এই সময়টায় আমাদের পারিবারিক অবস্থা বড় করুণ ছিল। আমি আর আমার পরের নাবালক ভাইটা, ছোটন, তখন অক্লান্ত পরিশ্রম করতাম। কখনও এক আনা, দু-আনা রোজে অন্য গ্রামে গিয়ে মজুর খাটতাম। যেখানে কেউ আমাদের চেনেনা। কখনও নিজেদের বাড়ির নারকোল, সুপুরি বা এটা ওটা কুড়িয়ে হাটে বাজারে বিক্রি করে সংসারের চাহিদা মেটাতাম। আশ্বিন-কার্তিক মাসে সুপুরি কুড়োনো আমাদের ওখানে একটা অর্থকরী কাজ ছিল। গ্রামের বেশ কিছু লোক সুপুরির রাখি করত। কখনও তাদের কাছে, কখনও বা হাটে, কুড়োনো সুপুরি বা নিজেদের গাছ থেকেই চুরি করে বিক্রি

করে চাল, ডাল, তরকারির সংস্থান করতাম আমরা। এই কাজগুলো ছিল নিতান্ত নিম্নবিত্তদের আর্থিক কাজ। আমি আর ছোটন, ভোররাতে কেউ জাগার আগেই, সুপুরি, নারকোল, তাল এইসব কুড়োতে বেরিয়ে পড়তাম। রাতে সুপুরি বাগিচাগুলোতে বাদুড়েরা পাকা সুপুরির রস খেতে বসত। তাদের কল্যাণেই ভোরবেলা ঐ সব বাদুরে চোষা সুপুরিগুলো বাগিচার তলা থেকে আমরা কুড়িয়ে নিতে পারতাম। এগুলো ছাতের উপর শুকিয়ে নিয়ে বস্তা ভরে রেখে দিতাম। গাছের তলায় যথেষ্ট না পেলেই আমরা গাছে উঠে চুরি করতাম। অবশ্য নিজেদের গাছের ফল এভাবে গ্রহণ করাকে চুরি করা বলে কিনা, সে নিয়ে বিতর্ক হতে পারে, তবে জেঠামশাই এইকাজকে চুরিই বলতেন এবং সে অর্থে আমি আর ছোটন ঐ বয়সেই বেশ পাকা চোর হয়ে উঠেছিলাম। সুপুরি আমাদের অন্ন জোগাতো, আর তাল নারকোলের ব্যবহার ছিল অন্য। সুপুরির মূল্যে যা চাল ডাল আসত, তার ঘাটতি মেটাতে, গুড়, তাল এবং নারকোল সহযোগে মা যে চমৎকার তালক্ষীরটি বানাতেন তা হজমে কষ্টসাধ্য হলেও, পেটে থাকত অষ্টপ্রহর। পেট ভরানোর জন্য এমত আহার্য দক্ষিণ পূর্ববঙ্গে আর খুব বেশি একটা ছিল না। যে 'ছাতার হুড়ুম' পশ্চিমবঙ্গে এসে মুড়ি হয়েছে, সেই মুড়ির অনুষঙ্গ হিসেবে এই তালক্ষীর যে কি পর্যন্ত অগ্নিমান্দ্যের সহায়ক, তা ভোক্তারা ছাড়া আর কেউ কোনও দিন জানবে বলে বোধ হয় না। কারুর সন্দেহ থাকলে সাতসকালে একথালা এবং বিকেল পাঁচটায় একথালা, একটু জোগাড়যন্ত্র করে, খেয়ে দেখতে পারেন। এ যেন ক্ষিদেয় পাপ, পাপে অম্বল এবং অম্বলে স্বস্তি।

আমাদের ওখানে শ্রাবণ-ভাদ্দর দুইমাস অভাবের কাল ছিল সেসব দিনে। চাষিরা, জেলেরা বা খেটেখাওয়া মানুষেরা বলত—শাঁওন টোটা, ভাদর টোটা। টোটার কালে সবার পেটেই চোঁচাঁ। 'কাম কাজ নাই, তাই পেটেও দানা নাই'। তখন 'হুড়ুম' আর 'তালক্ষীরের' কদর। কদর আরও অনেক কিছুর, যেমন শাকের মধ্যে বনজ মালঞ্চ শাক, গুড়ি কচুর শাক (বিজয়া দশমীর পরে হলে, মা দুগ্গা নাকি তার মধ্যে 'ঘেরতো' অর্থাৎ ঘৃত ঢেলে দিয়ে যান)। কলমী শাক, পাটপাতা 'চাটকাটা' শাক, শাপলা, ছাঁচি কুমড়োর শাক এবং আরও অনন্ত শাকের নাম করা যায়, যারা শুধু একটু নুন সহযোগে সিদ্ধ হয়ে পেটে যাবে। তরকারি বলতে তখন, সাদা রঙের মিষ্টি আলু (পাঠক বিস্মরণ হননি, দ্রব্যটি আমাদের দক্ষিণের মহাল থেকে এক সময় প্রচুর আসত), গিমি কুমড়ো (আগের বন্ধনীতে যা বলা হল, প্রযোজ্য), 'র‍্যাহা' অর্থাৎ রেখা বা চিচিঙ্গা যা উচ্চবর্ণীয় বিধবারা খেতেন না কারণ শাস্ত্রোক্ত নাম গোশৃঙ্গ, ঝিঙ্গা, বিশালাকার শসা (অধুনাকার কচি, ছাল ছাড়িয়ে নুন মাখিয়ে ট্রেনে যেতে যেতে, খাওয়ার শস্য নয়) এবং পেঁপে বা 'পোম্বা'। তখন অন্ন বলতে মোটা লাল আউশ চাল, জয়না চাল এবং খেসারির ডাল, তাও যাদের জুটত। না জুটলে প্রাতরাশে তালক্ষীর হুড়ুম, ডিনারেও। দুপুরের খাওয়ায় ভাতের অনুপস্থিতি হলেই আমরা খুব বিষণ্ণ হতাম। নাই ঘরে খাই বেশি। ফলে সারাক্ষণই যেন ক্ষুধার্ত থাকতাম। কিন্তু সেটা মানসিক খিদে। প্রাতরাশের হুড়ুম আর তালক্ষীর

হজম হতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল। তালক্ষীর খেকোদের একটা বিশেষ ধরনের অম্বল হত যার ফলে দুপুরের খাওয়ার প্রায় প্রয়োজনই থাকত না। তবে ঐ যে বললাম মানসিক খিদে সেটা গরম ভাতের গন্ধে আপ্লুত না হলে মিটত না। কিন্তু তাল কিছু বচ্ছরকালের ফল নয়। তার ঋতুকাল নির্দিষ্ট। সুতরাং অন্য ঋতুতে কাঁচাপাকা বেলও বেশ ক্ষুধানাশকারী। এসব দ্রব্যের অসদ্ভাব ঘটলে লাউ-এর সময় লাউ, কুমড়োর সময় কুমড়ো ইত্যাদি নুন সহযোগে সিদ্ধ হয়ে অন্নের বিকল্প। এ একেবারে শাস্ত্রবাক্যের আক্ষরিক প্রয়োগ, জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি। তা অবশ্য বনে-জঙ্গলে, আগানে-বাগানে নানান আহারের বন্দোবস্ত তিনি করে রেখেছেন। তোলো আর খাও। আমাদের ঐ বয়সটা ছিল প্রায় মানবসমাজের শৈশবকালের 'ফুড গ্যাদারার্স'দের সমধর্মী। শজারু শিকার কর, ডাহুক, পায়রা, হরিয়াল, বক ইত্যাকার প্রণীদের ধর আর খাও। বিলক্ষণ পুষ্টিকর প্রোটিন। এছাড়া 'দুর', 'কাড়উয়া', 'কাছিম'-এর মাংসও স্বাদে গন্ধে দেবভোগ্য প্রায়। তবে তার সংস্থান করা খুব একটা সহজ কর্ম নয়। এছাড়া আছে ফল পাকড়া। যদিও স্বাদে তা হয় টক নয় 'কস্টা'। সুমিষ্ট ফল বনবাদাড়ে বড় একটা হয় না। কিন্তু টক বা কস্টা বলে কি আমরা তার ব্যবহার করতাম না? অধুনাকার গ্রাম গাঁয়ের ছেলেমেয়েরাও অতসব ফলের নাম বলতে পারবে না। কাঁটাবহরী বা বৈঁচি, 'আম-জাম' নামে ছোট ছোট মেরুন রঙের একধরনের ফল, গাব, কাউ, ডৌয়া, কামরাঙা, করমচা, তেঁতুল, চুকইর, পায়লা, ফলসা, ঢ্যাফল, বিলিতি গাব, আঁশফল, বেতফল, জামকল, বাতাবি লেবু বা 'জম্বুরা' এবং এরকম অজস্র ফল আমরা খেতাম।

এতসব দ্রব্য থাকা সত্ত্বেও মাঝে মাঝেই উপোস দিতে হত। বর্ষাকালে আমাদের ঐ অঞ্চল প্রায় গোটা পৃথিবী থেকেই যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। মাঠ-ঘাঠ, পুকুর, নদী, বিল সব জলে একাকার থৈ থৈ। যাতায়াত করা দুঃসাধ্য। এ-বাড়ি ও-বাড়ি বা বাজার হাট করতে যাওয়ার উপায় একমাত্র কলার ভুরা বা সুপুরি গাছের ডিঙি। একবার বৃষ্টি নামল তো দিনেব পর দিন ঝরেই যেত সমানে। আগান-বাগানের ছাইছাতা কুড়িয়ে আনার তো প্রশ্নই ওঠেনা তখন। এই সময়টায় চালের অভাবটাও প্রকট হত। কেউ ধারকর্জ-ও দিতে চাইত না। আমাদের একসময়কার খানাবাড়ির ধোপা, নাপিত প্রজাদের অবস্থা তখন আমাদের তুলনায় ঢের ভাল। পেটের তাড়নায় তাদের কাছেও চাল ধার করতে যেতে হত। ব্যাপাবটা এতই গ্লানিকর ছিল যে তার চাইতে মরে যাওয়াও শ্রেয় মনে হত। তারা ধার হয়ত দিত, কিন্তু বড় অকরুণ ব্যবহার করত। তার সম্যক কারণও যে ছিলনা তা নয়। ধার শোধ করার সংগতি প্রায়শই হয়ে উঠত না। এ অবস্থায় নিত্য ধার আর কে দেয়? বাইরের দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া এবং ভিতরে অন্নাভাবের তাড়নায় কী বিষণ্ণই যে লাগত তখন। মনে হত, পৃথিবীতে আমাদের করুণা করার জন্য কেউ নেই। আমি অন্তত পরপর তিনদিন কোনও অন্নজাতীয় খাদ্য না খেয়ে ইস্কুলে গিয়েছি। এতে আমার খুব একটা কষ্ট হত না। যদিও দাদীআম্মাব বাড়িতে নিজের পেটের অন্ন জোটানো আমার পক্ষে আদৌ কঠিন ছিল না, কিন্তু বাড়িতে অভুক্তপ্রায় ভাইবোনগুলোর

কথা ভেবে নিজের পেট ভরাবার কথা ভাবতে পারতাম না। ওরা তখন এত ছোট যে সংসারের অবস্থার বিষয় কোনও কাণ্ডজ্ঞানও ওদের হওয়ার বয়স হয়নি তখনও।

এই সময়টার অভিজ্ঞতা আমার এবং ছোটনের জীবনের চরমতম অভিজ্ঞতা। তখন অভাব কি আর তার মোকাবেলা করার কত ফিকির আছে অথবা বেঁচে থাকা আর বাঁচিয়ে রাখার যুদ্ধ কাকে বলে, তা একেবারে হাড়েহাড়ে টের পেয়েছিলাম। বাড়িতে আমাদের অংশে আমরা বাবা, মা সহ ন'জন প্রাণী। তাদের সবার অন্ন, বস্ত্র এবং জ্বালানির প্রয়োজন আমাকে আর ছোটনকে বহন করতে হত তখন। বাবা ঐ মাস দু-তিনের মাস্টারি করে যে বসে গেলেন, তারপর আর কিছু কাজকর্ম জোটাতে পারছিলেন না। সে সময় কখনও কখনও গাছপালা বিক্রি করে বা বাড়ির গোয়ালঘর, ঢেঁকিঘর বা গোলাঘরের টিন, কাঠ, তক্তা এইসব বিক্রি করে জেঠামশাই কিছু টাকা পয়সা দিলে তা দিয়ে কিছুদিন চলত। কিন্তু নিয়মিত রোজগারের ধান্দা আমাকে আর ছোটনকেই করতে হত। জেঠামশায়ের সংসার ছোট, তাছাড়া তিনি একটি ইস্কুলের হেডমাস্টারি পেয়ে গিয়েছিলেন বলে তাঁদের বিশেষ অসচ্ছলতা ছিল না। তাঁর রোজগারপাতির অন্যবিধ ফিকিরও ছিল। বাবা স্বভাবতই কর্মবিমুখ ছিলেন, আর গ্রামীণ ধান্দাবাজির ফন্দি ফিকিরও তাঁর জানা ছিল না। যে সময়টার কথা বলছি তখন একটা প্রকাণ্ড নৈরাশ্য তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।

আমাদের অঞ্চলের যেসব পরিবার আমাদের সমশ্রেণীর, তাদের সবার অবস্থাই কমবেশি আমাদের মতোই ছিল। তাদের তক্ষুনি পশ্চিমবঙ্গে চলে যাবার মতো মানসিক বা আর্থিক প্রস্তুতি ছিল না। অথচ ওখানে বিগতকালে তারা যে আর্থ-ব্যবস্থাপনায় গৃহস্থ ছিল সেই ব্যবস্থাটিও সম্পূর্ণত বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। এরা অধিকাংশই ছিল মধ্যস্বত্বের বিভিন্ন স্তরের মানুষ, মূলত ভূমিনির্ভর, তৎসহ কিছু আনুষঙ্গিক পেশা। মধ্যস্বত্ব লোপ আইন জারি হলে এই পরিকাঠামোটি পুরোপুরি ভেঙে পড়েছিল। যাঁরা শিক্ষকতা করতেন, তাঁরা কর্মহীন হলেন, কারণ ইস্কুলগুলি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। যাঁরা চিকিৎসক ছিলেন, তাঁদের বাঁধা রোগীপত্তরেরা দেশত্যাগ করে চলে গেছে। সাধারণ হিন্দু-মুসলমান যারা রোগী হিসেবে আছে, তাদের পয়সা খরচ করে চিকিৎসা করানোর সঙ্গতি নেই। যেসব পরিবার একান্নবর্তী ছিল, যাদের প্রধান উপার্জনক্ষম ব্যক্তিরা, যাঁরা উকিল, মোক্তার, পেস্কার, সেরেস্তাদার বা ডাক্তার ছিল, তারা এখন নিঃসম্বল। কেননা তদানীন্তন রীতি অনুযায়ী এইসব সংসার চলত বিশেষের আয়ে অশেষের পোষণ এই পদ্ধতিক্রমে। বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এইসব আয়কারি ব্যক্তিরা নিজ নিজ স্ত্রীপুত্র সহ পশ্চিমবঙ্গে পাড়ি দিলে পোষ্যবর্গ শুধু সামান্য জমি এবং বাড়িটিই অবলম্বন করে থেকে যায়। তারা কোনও দিনই উপার্জনের জন্য মস্তিষ্কের চর্চা করার কথা ভাবেনি, ভাবার প্রয়োজনও ছিল না। এখন অকস্মাৎ উপোসের মুখে পড়ে প্রথমেই সহজ রাস্তা গ্রহণ করেছিল তারা। প্রথমে জমিটুকু বিক্রি হয়ে যায়, তারপর ভিটে এবং ঘরবাড়ি। এর পরে চিত্র আরও করুণ। গ্রামের পরিত্যক্ত কোনও দালান বাড়ির ছাতের নীচে থেকে

উঞ্ছজীবন যাপন। এই শ্রেণীর মানুষেরা যে কি পর্যন্ত হতভাগ্য জীবনযাপন করেছে খুব কম লোকই তা জানে। মানুষ শুধু এদের পরাশ্রয়ী, পরান্নপালিত অকর্মণ্য হিসেবেই জেনেছে। কিন্তু যে সমাজ একদিন তাদের নিজস্ব প্রয়োজনেই সৃষ্টি করেছিল, যে সমাজ তার সচ্ছলতার দিনে এইসব মানুষগুলির পরিষেবা, উৎসবে, শ্মশানে, রাষ্ট্রবিপ্লবকালে এবং গ্রামীণজগতের নিরন্তর একঘেয়েমি দূর করার জন্য বিনামূল্যে গ্রহণ করেছে, সেই সমাজ এদের নির্মমভাবে শুধুমাত্র ভাগ্যের হাতে ছুঁড়ে দিয়ে দায়মুক্ত হল। তাদের এই করুণ পরিণতির জন্য কেউ একটা দীর্ঘনিশ্বাসও পরিত্যাগ করল না। দেশভাগের অব্যবহিত পরবর্তী দাঙ্গা ইত্যাদি কারণে যারা দেশত্যাগে বাধ্য হয়ে বিভিন্ন ক্যাম্পে উদ্বাস্তু আশ্রয়ে হাজারো লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন, তাঁরা ব্যাপক মানুষের সহানুভূতি, সহায়তা ইত্যাদি প্রাপ্ত হয়ে একটা সময়ে অন্তত মাথার উপর টালি বা টিনের ছাউনি এবং পায়ের তলায় একটু মাটি পেয়েছেন। কিন্তু যাদের কথা বলছি, তারা কিছুই পায়নি, এমন কি মানুষের স্বাভাবিক সহানুভূতিটুকুও নয়। আমি নিজের এই সামান্য জীবনের অভিজ্ঞতায়ই এদের বেশির ভাগকে ভিক্ষেজীবী হিসেবে প্রত্যক্ষ করেছি। তাদের এই সময়কার হতাশার বীজে উদ্ভূত সন্তানদের চোর, ডাকাত অথবা উঞ্ছবৃত্তিধারী হতে দেখেছি। অথচ তাদের এরকম জীবনযাপন করার কথা ছিল না। তাদের পুনর্বাসন কী ভাবে হলে ভাল হত জানি না, তবে কোনও রকম পুনর্বাসনইতো তাদের হয়নি। ঠিক অনুরূপ ভাবেই পুনর্বাসন হয়নি সেইসব মানুষদের, যারা মধ্যস্বত্বভোগী ভদ্র হিন্দু গেরস্তদের একদার সমাজ বিন্যাসে এই গ্রামীণ বিশ্বে নট্ট, মালি, ভুঁইমালী, পুরোহিত, কুমোর, মিরধা, পাঁঠা সরকার, 'বউরুপী' এবং অনুরূপ অসংখ্য পেশাধারী ছোট ছোট গোষ্ঠীয়। তারা তাদের পেশাগত কর্ম ছাড়া আর কোনও কিছুই তো কোনওদিন শেখার সুযোগ পায়নি। অথচ বিশেষ এক ধর্মীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় একমাত্র ধোবা, নাপিত, কামার, তাঁতি এবং জেলে নিকিরিরা ছাড়া, এদের সবার অন্নই বন্ধ হয়ে গেল। এরা কোনওকালেই খুব একটা জমি নির্ভর ছিল না। মধ্যস্বত্বভোগীদের ক্রিয়াকর্ম যজ্ঞাদিতে এটা ওটা করা তথা জাত ব্যবসা'কেই অবলম্বন করে তাদের ভবনদী পবিক্রমা। তা হয়ত প্রয়োজনানুগ ছিল না। কিন্তু নির্দিষ্ট একটা আয়ের পথ তো সেটা ছিল। দেশভাগকারী, মধ্যস্বত্বলোপকারী নেতৃবর্গ এই সামাজিক পরিকাঠামোটিকে আদৌ পরিবর্তন না করে স্থিতাবস্থাটাকে ভেঙে দিলেন। এদের কারুর কথাই ভাবলেন না তাঁরা।

রচনার শুরুতে আমাদের নগেন ডাক্তার মশাই-এর নিজের হাতে তৈরি যে ডাক্তার জেঠার কথা বলেছি, তাঁর পরিণতির কথাটিই উদাহরণ হিসেবে বলি। আমাদের বাড়ির সরাসরি পুব দিকের বড় খালটির সাথে যে লোহার ব্রিজটি আমাদের গাঁয়ে ঢোকার একমাত্র সংযোগ তার উপর একদিন আনমনা দাঁড়িয়েছিলাম। তখন দুপুর গড়িয়ে প্রায় বিকেল। এই সময় ডাক্তার জেঠার সাথে দেখা। অনেকদিন যোগাযোগ নেই। শুনেছিলাম খুবই দুস্থ অবস্থায় আছেন। কিন্তু তাঁকে যে অবস্থায় সেদিন দেখলাম অতটার জন্য তৈরি ছিলাম না। তিনি তখন খালের পুবপাড়ের মুসলমানদের গ্রামগুলোয় ভিক্ষে করে

ফিরছেন। পরনে শতচ্ছিন্ন একটি পিরান আর লুঙ্গি। চেহারা দুর্ভিক্ষপীড়িত। মুখে খোঁচাখোঁচা সাদা দাড়ি। কাঁধে একটি কাঁথার থলি। ডাক্তারবাবু ভিক্ষে করে ফিরছেন। আমার দিকে তাকিয়ে একটু ম্লান হেসে শুধু বললেন, 'ধরা পড়ইয়া গেলাম। আমি যে আইজ-কাইল ভিক্ষা করি, হেয়া এখনও গেরামে কেউ জানেনা। তুমি দেইখ্যা ফ্যালাইলা। ক্যাওরে কও বোচন? বেয়াকে জানে আমি চিকিচ্ছা করতে যাই।' বলে থলের মুখটা খুলে দেখালেন, বললেন, 'এই দ্যাহ আমার ভিজিটের পয়সা।' থলের মধ্যে কিছু খুদ মেলানো চাল, তাও বিভিন্ন জাতির এবং খেসারি, মুসুরি ইত্যাদি ডাল। সব মিলেমিশে সে এক করুণ ছবি। ডাক্তার জেঠা বললেন, 'প্যাডে অনন্ত খিদা, বোজ্‌লা? মনে অয় এই ব্রেহ্মাণ্ডডারে যদি একপাশ দিয়া কামড়াইয়া খাইতে শুরু করি, তয় হয়ত খ্যানেক তৃপ্তি পামু।' আমার দুচোখ ফেটে জল পড়ছিল। এই মানুষটিকেই না আমি একসময় দোর্দণ্ডপ্রতাপ একজন পেট্রিয়ার্ক হিসেবে দেখেছি, যাঁর অসামান্য হাতযশ ছিল ডাক্তার হিসেবে এবং যিনি অতবড় একটা পরিবারকে স্বচ্ছন্দে পালন করতেন। এরকম আরও অনেককেই আমি দেখেছি। কিন্তু তাঁরা সবাই হারিয়ে গেছেন। মরে হেজে মাটিতে মিশে গেছেন।

আমার বয়স তখন তেরো, ছোটনের এগারো। ঐ বয়সেই আমরা দুজনায় 'দা', কুড়ুল, খন্তা, কাস্তের ব্যবহার শিখে গিয়েছিলাম। এসব যন্ত্রের ব্যবহার শিখে নেওয়া কিছু দোষের নয়। তবে আমরা যে পুরুষানুক্রমে অন্য ধাঁচে গড়ে উঠেছি, সেখানে যে এইসব যন্ত্রপাতির ব্যবহার একসময় হারাম হয়ে গিয়েছিল, তাই না এই দুর্ভোগ। কিন্তু সেসবের হারাম হওয়ার জন্য আমি বা ছোটন কি ব্যক্তিকভাবে দায়ী? দেশভাগ হয়ে স্বাধীনতা এসেছে। সেই থেকে গৃহহীন হতে শুরু হয়েছে কোটি কোটি মানুষ। তারা বিদেশ বিভুঁইয়ে কাঁহা কাঁহা মুল্লুকে গিয়ে আশ্রয়প্রার্থী হয়েছে তার ঠিকানা নেই। তারা সবাই ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছে। আবার আমাদের মতো যারা, তারা ঠিকানায় থেকেও পরবাসী হয়ে উঞ্ছ জীবনে বেঁচে থাকতে চেষ্টা পাচ্ছে প্রাণ হাতে নিয়ে। সে প্রাণ যেন কোনও সময়, তাদের একদার বন্ধু অথচ আজকের শত্রুদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য। স্বাধীনতার দাম কি এর চাইতে অধিক? এইসব মানুষের অর্থাৎ আমরা যারা, তখন এই পরিবস্থায় নিরুপায় হয়ে নিরাপত্তা খুঁজি, তাদের কাছে এই স্বাধীনতার কিইবা অর্থ!

বস্তুত আমাদের ঐ পিছারার খালের সোঁতার আশপাশের গাঁও গ্রামগুলিতে স্বাধীনতা একটা তাৎক্ষণিক উৎসব মাত্রই ছিল। তার অন্য কোনও প্রেক্ষিত সদ্যস্বাধীনতা প্রাপ্তদের মধ্যে আমি জ্ঞানত দেখিনি। গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে হয়ত ব্যাপারটা এরকমই হয়। শহরে নগরে ব্যাপারটা আলাদা। তার রূপকল্প এই স্বাধীনতার প্রায় কুড়ি বছর পরে এক বন্ধুর লেখা একটা কবিতায় দেখেছিলাম—যার শিরোনাম 'না'।

ক্লান্ত চোখে ক্লান্ত চোখের পাতা
তারো চেয়ে ক্লান্ত আমার পা

যেথায় দেখি সাধের আসন পাতা
"একটু বসি" জবাব আসে,—"না"।

—আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

এই প্রজ্ঞা আমার পিছারার খালের জগতেরও। কিন্তু তার প্রকাশভঙ্গি আলাদা। সেখানের কবি তখন হাটের কিনারে তার পুঁথি বিক্রি করে ঐ পুঁথিরই পদ গেয়ে—

শোনেন শোনেন আছেন যত হিন্দু মুছলমান
নেক নেক্‌কর ইমানদারীর হইল অবসান।
বন্ধুর ঘরে বন্ধুর আর বওয়ার দলুজ নাই,
হিন্দু মোছলেম জুদা অইল আখেরে সবাই।

হাটুরে লোকেরা এই সব বই কিনে নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে গাইতে গাইতে ফেরে। কিন্তু তাতে গোটা দেশের বিবেক চৈতন্যে কিছুই স্পন্দন জাগে না। শুধু যারা গান বাঁধে আর যারা তার গ্রাহক তারাই বিষণ্ণ হয়, ধ্বস্ত হয়।

সেসময় আমাদের বাড়ির রাখাল নাগরালি মাঝে মাঝেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত আর গালাগালি দিত। কাকে কে জানে? আজাদির 'মা-মাসি' করত লোকটা। বলত, 'বালের আজাদি। প্যাডে নাই ভাত, ল্যাঙ্গে নাই কাপড়, মোরা স্বাদিন দ্যাশের নাগর।' তখনকার পরিবস্থায় কথাগুলো আমাদের কাছে আদৌ মিথ্যে বোধ হত না। নাগরালিভাই আমাকে 'ন্যা-ভাই' বলে ডাকত। ওটা আমাদের ওখানকার সাধারণ মুসলমানদের একটা আদরের ডাক। গান বাঁধতে পারত নাগরালি। আর তার 'খামার' ছিল বড় চোস্ত। সে রাগলেও খামার দিত, খুশি হলেও। জাত রাখাল। আমাদের ওখানকার এক বনেদি পরিবার চাটুজ্জে বাড়িতে তার শৈশব কৈশোর এবং প্রথম যৌবন কাটে। সে সময়কার গল্প বলত সে। সে বাড়িতে ছিল অনেক উঠতি বয়সি মেয়ে। তাদের শরীর স্বাস্থ্যের ব্যাপক বর্ণনা দেওয়া তার একটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আমরাও তাকে ন্যাভাই ডাকতাম। নাগরালির বিয়ে-থা হয়নি। যখন সে চাটুজ্জে বাড়ির মেয়েদের গল্প আমাদের শোনাত, তখন তার দাড়ি চুল সাদা। কিন্তু বাক্যবচন রষবর্ষী। বয়সের দোহাই দিয়ে সে বেমক্কা ভারভারিক্কি কথা গল্প করত না। ফলে আমরা ছিলাম তার অসম্ভব ন্যাওটা। লোকটা একটু খ্যাপাটে হলেও বড় ভাল মানুষ ছিল। যখন তখন গান গাইত, যা তার নিজেরই বাঁধা পদ। তার নমুনা আরও কিছু বলি—

সাগরালির ভাই নাগরালি কয়
হোনো মোর বচন।
পরাণের দুঃকেরো কতা করি নিবেদন।
সুন্দার সুন্দার ছেমরীগুলান
সহালে দুফরে
কি চোমোৎকার খেলা করত
বড় দীঘির পারে।

আহা, সেই দীঘিতে পানি নাই
নোলখাগড়ার বোন
সেই বোনেতে বসত করেন ব্যাগ্র মহাজন।
হে কারণে দীঘির মাঝে গতায়তি নাই।
পশ্চিম পারের বোনে যাইয়া
পলাপলি খেলাই।—

তো নাগরালি দিঘির পশ্চিম পারের বনে গিয়ে তাদের সাথে 'পলাপলি' বা লুকোচুরি খেলত। আজ আর সেরকম লুকোচুরি এইসব গ্রামের ছেলে মেয়েরা খেলে না। কেননা নাগরালি নিজেই একসময় এই খেলার অহিতাচার দেখেছে। একটা সময় যখন সব কিছু সমে ছিল, তখন এই পলাপলি খেলায় কোনও দোষ আশ্রয় করেনি। কিন্তু নাগরালি দেখেছিল যে পাকিস্তান প্রাপ্তির পর এই খেলা তার সহজতা হারিয়ে ফেলছিল। যখন থেকে গ্রামগুলো শূন্য হচ্ছিল আর মানুষের মনে বিভীষিকার সঞ্চার হচ্ছিল তখন থেকেই এইসব খেলার মধ্যে কদর্যতার স্ফুরণ দেখা যাচ্ছিল। আমাদের এই সুন্দর গ্রামীণ জীবনের সরল, নিষ্পাপ কৈশোর এক হতাশার আবর্তে তাৎক্ষণিক সুখভোগের কদর্যতায় ডুবে যাচ্ছিল। নাগরালির গানে এই পরিবর্তন ধরা পড়েছে। অবশ্য আমরা যখন তার কাছ থেকে এ সব কাহিনী কীর্তন শুনি তখন এর তাৎপর্য না বুঝে শুধু যৌনতার আনন্দেই তা আস্বাদ করেছি। পরে বুঝেছি ঐ রাখালের গান বড় ব্যথার। সে গাইত—

আহা, অবশেষে আজাদ আইল
হইল পাকিস্তান।
মোরা বেয়াক যুদা অইলাম
মুস্কিলের আসান।
হিন্দু হিন্দুস্তান পাইল
মোস্‌লেম পাক্ জমীন্
(তমো,) খুনের মইদ্যে রইয়া গেল
আঘারউয়া বদ্ জ্বীন্।
হেই জ্বীনের বদ্ খাইস্‌লতে মোরা
কিবা পাইলাম মন
হিন্দু মুছলমান হইলাম
জিন্দিগীর দুশমন।

নাগরালির অক্ষর জ্ঞান ছিল, কিছু পুঁথি পত্তরও পড়া ছিল তার। এ কারণে তার এই রচনাশৈলী জায়েজ। কেউ হয়ত প্রশ্ন করতেই পারেন, একজন জাত রাখল এই পদ ক্যামনে বানায়? তো বলি, হ্যাঁ, এরাই বানায় বলে আমরা জানি এবং বানাই। নচেৎ, আমাদের আর 'কোন্ ছাতার' দৌলত আছে যে হক্‌কথার কথন শোনাই?

আমার, ছোটনের এবং ওখানকার পিছারার খালের এদিক ওদিকের ঝরতিপড়তি ছাওয়াল পানদের শিক্ষণ জগৎ এই নাগরালিরাই তো। তাই যেমনটি শিখেছি, তেমনটি বলাই ঠিক। তালেব এলেম, পণ্ডিতিতে পোক্ত যাঁরা, যাঁরা শহর নগরের সাত সতেরো হ্যাকোর বাজির সুলুক সন্ধান রাখেন, যাঁরা বহির্বিশ্বের হরেক খবরের নক্সী কাঁথায় শুয়ে, মবলগ 'খাব' দেখেন যে, এ হলে ওই হত, ও হলে তা, তাঁদের কথা আলাদা। আমাদের ঐ সময়ে, বহির্বিশ্বের খবরাখবর আমরা জানতাম কচু। আমরা শুধু জানতাম, কোথাও যেতে না পারার অসহায়তা এবং মুসলিম লিগের উদারতা অথবা বিদ্বেষ। একথা কেউ মানবেন কিনা জানিনা। তবে, যখনকার কথা বলছি, তখন মুসলিম লিগের মধ্যে উদার গণতন্ত্রীদের একটা উপদল ছিল এবং তাঁরা হিন্দুদের দেশ ছাড়ার ব্যাপারটা পছন্দ করেন নি। কিন্তু তাঁরা কোনওদিনই প্রাধান্য পাননি। একসময় অন্য দলে ভিড়ে গিয়ে নিজেদের বিবেকের দংশন প্রশমনে চেষ্টিত হয়েছেন, কেঁদেছেন এমনও দেখেছি।

কিন্তু ওসব গুরুগম্ভীর বিষয় থাক। যে কথা বলছিলাম, তা ঐ সময়কার মানসিকতা, যা আমাদের বাবা জেঠামশাই বা পিছারার খালের জগতের অন্যান্য মানুষদের মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। আমি এবং ছোটন বা আমাদের বয়সিদের পরিশ্রমের ফল ভোগ করতেন আমাদের বাবা জেঠারাও। কিন্তু তার জন্য তাঁদের আমাদের প্রতি কোনও কৃতজ্ঞতা, অনুকম্পা বা সহানুভূতি ছিল না। আমরা যারা সদ্য এই ধরনের কায়িক শ্রমের জীবনে এসেছি, তারাতো দেখতে পাচ্ছিলাম যে নিম্নবর্গীয় এবং বর্ণীয় হিন্দু মুসলাম বাবা জেঠারা তাঁদের সন্তানদের শ্রমকে কত সম্ভ্রমের চোখে দেখেন। সেখানে তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক সমানে সমানে। তাঁদের পরম্পরাগত জীবনচর্যায় যেহেতু এই অভ্যেস তৈরি সে কারণেই তাঁরা এরকম একটা সম্পর্কে হয়ত পৌঁছোতে পেরেছেন। এটা ক্রমশ তাঁদের সাথে মিলেমিশে আমরা বুঝতে পারছিলাম এবং হাজার কষ্ট এবং অভাব অনটনের তাড়না ভোগ করেও একটা উত্তরণ ঘটছিল আমাদের। আমাদের বাবা জেঠাদের সেক্ষেত্রে মানসিকতা ছিল যেন আমরা তাঁদের বেঠ-বেগারি প্রজা, যাদের শ্রমের ফসলের উপর তাঁদের পুরুষানুক্রমের অধিকার আছে। আমরাও বেশ কিছুকাল এরকম বিশ্বাসেই বিশ্বস্ত ছিলাম! সামান্যতম ত্রুটি বিচ্যুতিতে তাই তাঁদের নির্মম প্রহার আমাদের সহ্য করতে হত। কিন্তু সাধারণ নিম্নবর্ণীয়দের সাথে একযোগে কাজকর্ম করতে করতে ছোটন, আমি এবং অন্যান্যরা কর্তাদের এই অমানুষিক আচরণের বিরুদ্ধে বিলক্ষণ ক্রোধপোষণ করতে শুরু করেছিলাম, যদিও তার প্রকাশ ঘটেছে আরও অনেক পরে।

অন্নকষ্ট যদিও-বা নিয়ত অভ্যস্ততায় সহ্য হত, বস্ত্রের অভাব সহ্য হত না। মায়ের সর্বমোট দু-খানা শাড়ি এবং দু-খানাই ছেঁড়া। সেলাই করে করে তাদের অবস্থা দাঁড়িয়েছিল প্রায় কাঁথার মতন। কিন্তু নতুন একখানা কেনার কোনও উপায় ছিল না। এই সময় অবস্থার চাপে পড়েই বোধহয়, বাবা তাঁর হতাশা আর আলস্য কাটিয়ে ক্রমশ একটু উদ্যোগী হতে থাকেন। বাড়িতে দু-চারটি ছাত্র পড়ানো, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করা বা অনুরূপ টুকটাক বোজগেরে কাজ শুরু করেন। কিন্তু তা নেহাৎই যৎসামান্য।

ক্লাশ এইটে উঠে ইস্কুল মারফতই পাঠ্য বইগুলো অনুদান হিসেবে পেয়েছিলাম। হাতেম মাঝি স্যার আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। তিনিই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু কি এক কারণে যেন এই ইস্কুলের চাকরি তিনি ছেড়ে দেন এবং অন্য একজন শিক্ষক তাঁর জায়গায় যোগদান করেন। এই ভদ্রলোকই প্রথম বি. এ. পাশ শিক্ষক এই ইস্কুলের। মাঝি স্যার যাবার সময় আমাকে ডেকে বলেছিলেন, 'বাজান, আমি জানি তোমরা খুবই কষ্টের মধ্যে আছ। আল্লাতায়লার ধারে দোয়া মাঙি, তোমাগো যেন সুদিন আয়। তয় ল্যাহা পড়াডা ছাড়ইও না।' নতুন হেড স্যারকে বলে দিয়েছিলেন, 'এই ছ্যামড়ার দিকে এট্টু নজর রাখবেন মাস্টার ছাব। অর মাথাডা খারাপ না।'—নতুন হেডস্যারও মাঝি স্যারের মতোই আমাকে সস্নেহে গ্রহণ করেছিলেন।

তখন ক্লাশ এইটে আমার প্রায় ছ'মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। বইগুলো সবই পড়ে ফেলেছি। ওগুলোর আর দরকার নেই ভেবে অন্য একটা ইস্কুলের একটি ছাত্রের কাছে দশটাকা হ্যাঁচ্‌কা দরে বিক্রি করে দিলাম। সেই টাকায় মায়ের জন্য একখানা সাধারণ লাল পাড় কোড়া মিলের শাড়ি কিনে আনলাম। শাড়িখানা মাকে এনে দিতেই মা যেন কেমন হয়ে গেলেন। তাঁর বোধ হয় ধারণা হয়েছিল যে আমি চুরি চামারি কিছু করে কাপড়খানা এনেছি। পরে সব বৃত্তান্ত শুনে, কাপড়খানা বুকে জড়িয়ে ধরে ছুটে পাশের ঘরে চলে গেলেন। সেখানে বাবা পালঙ্কের উপর যেমন চুপচাপ বসে থাকতেন, বসেছিলেন। মায়ের আচরণ আমি বুঝতে পারছিলাম না। ও ঘরে যাবার সাহসও হয়নি আমার। কাবণ বাবা যদি আমার এই কাজটিকে পাকামো বলে ভাবেন এবং বকেন? পাশের ঘর থেকে একসময় মায়ের কান্নার শব্দ পেলাম এবং সেই সাথে বাবার আবেগরুদ্ধ কণ্ঠের আভাসও। খানিকক্ষণ বাদে বাবা আমায় ডাকলেন। গিয়ে দেখি মা পালঙ্কের নীচে এক কিনার ঘেঁষে সেই কাপড়খানা বুকে জাপটে বসে আছেন। কাছে গিয়ে দাঁড়াতে বাবা তাঁর ডানহাতখানা আমার মাথার উপরে রেখে চোখ বুজে কোনও রকমে উচ্চারণ করলেন, পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়েৎ। তাঁর চোখের কোল বেয়ে জল পড়ছিল। আবেগপ্রবণ মানুষ, তাঁর চোখের জল কারণে-অকারণে দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম। কিন্তু এদিনকার এই ব্যবহারটি আমার জ্ঞানত প্রথম। এতকাল তাঁর কাছ থেকে শুধু দূর দূর, ছিছি, প্রহার গঞ্জনা এবং ব্যঙ্গ ছাড়া আর কিছুই পাইনি। ঐ দিনের ঘটনার পর থেকে বাবা আর কোনওদিনই আমাকে অনাদর করেন নি।

এর কয়েকদিন পর বাবা কীর্তিপাশার প্রসন্নকুমার বিদ্যালয়ে একটি শিক্ষকতার কাজ পান। মাইনে চল্লিশ টাকা মাসে। তখনকার সময়ের প্রয়োজনানুয়ায়ী আমাদের একটা প্রধান সমস্যা মিটল। মোটা ভাত কাপড়ের সমস্যার সমাধান এভাবে হলে আমার আর ছোটনের পরিশ্রম খানিকটা লাঘব হল।

বাবা তখন প্রায় পঁয়তাল্লিশ পার করেছেন। ইতিপূর্বে তাঁর রোজগেরে জীবন বলতে কিছুই ছিল না। মধ্যস্বত্বভোগীদের সে যুগে গতর খাটিয়ে বা মগজ খাটিয়ে কিছু রোজগার করার প্রয়োজনও ছিল না। বাবার পরিশ্রম বলতে যেটুকু একদা হয়েছিল, তা শুধু

ফুটবল খেলা আর থিয়েটার করার মধ্যে সীমিত। তাও বোধকরি পঁয়ত্রিশ পেরোতে না পেরোতেই শেষ। তারপর বেশ কিছুকাল সামন্ত পরম্পরায় বাক্‌তাল্লাবাজী এবং শখের পদ্য লেখা আর আশপাশ বাড়ির একে-ওকে সময়ে অসময়ে তা শোনানো। তখনও তালুকদারির উপজ তথা অপজ আসছে। পিছারার খালে ঘাসি নৌকো ভিড়ছে, লোকেরা ছোটবাবুর নানান গুণগানে বেশক্ মশগুল। বাবাকে আমি এই স্কুলের সময়টি থেকেই জেনেছি। তাঁর পরিশ্রমী জীবন ইতিপূর্বে কখনও দেখিনি। শুনেছি, জিমন্যাস্টিকে তাঁর দক্ষতার কথা, ফুটবল খেলার কথা এবং থিয়েটারে নবীন রাজা নবাব বা যুবরাজের অভিনয়ে পারদর্শিতার কথা। ক্ষুদ্র এলাকায় তার প্রচার এবং মহিমা অসামান্য। প্রসন্নকুমার বিদ্যালয়ে কর্মগ্রহণের আগে এইসব বিষয়ে নানা কিংবদন্তি এবং বাখোয়াজি ছাড়া তাঁর দক্ষতা বিষয়ে আমার অন্য কোনও বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল না। সে সময়ে আঞ্চলিক লোকেরা যেমন বাখোয়াজি করত তাঁর নানান গুণকীর্তি নিয়ে, তিনি নিজেও অলস আলোচনায় তাঁর যৌবনকালের বাহাদুরির সাতকাহন বলতেন। তাঁকে বুঝলাম এবং জানলাম কীর্তিপাশা প্রসন্নকুমার বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা গ্রহণ করার পর।

আগেই বলেছি, এতকাল বাবা আমাদের কোনও বিষয়েই দায়িত্বশীল ছিলেন না। পুরনো অভ্যেসেই তাঁর দিন কাটছিল। তাঁর চরিত্রে একটি স্বাভাবিক প্রবণতাই আমার পছন্দের ছিল যে তিনি সাধারণ মানুষদের সাথে সহজে মিশবার মানসিকতার অধিকারী ছিলেন। সেই মেলামেশার মধ্যে সে সামন্ত মনোভাব ছিল না এ কথা বলব না, তবে একটা হার্দিক নৈকট্য সব সময়ই তাঁর ব্যবহারে লক্ষ্য করেছি। এ কারণে সবাই তাঁকে ভালও বাসত।

এই ইস্কুলে যোগদান করার পর থেকে বাবার জীবনে একটা ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছিল। বাবা, তাঁর দীর্ঘ-পোষিত অলস জীবন থেকে বেরিয়ে এলেন এবং পরিশ্রমী হলেন। বাবার পরিশ্রমী হওয়ার ব্যাপারটা খুব সহজ নয়। বিশেষত যখন তাঁর বয়ঃক্রম পঁয়তাল্লিশ অতিক্রান্ত প্রায়। এতকাল যিনি একটি নিটোল অলস আর শৌখিন জীবনে অভ্যস্ত, তাঁর এ সময়ে পরিশ্রমী জীবনযাপন শুরু করা এক অসামান্য ঘটনা। একথা মানতে হবে। কিন্তু অবস্থার গতিকে তা হল। বাবা দীর্ঘ দেড় দুই মাইল রাস্তা পায়ে হেঁটে প্রতিদিন ইস্কুলে যেতে শুরু করলেন। আগে জ্বর এবং অন্যান্য ব্যাধি তাঁব নিত্য সঙ্গী ছিল। একনাগাড়ে ছ'মাস, আটমাস ভোগা তাঁর পক্ষে কিছু আশ্চর্য ব্যাপার ছিল না। তখন প্রায়ই তিনি বিছানায়ই পায়খানাপেচ্ছাপ করে কাটিয়েছেন। রোগ তাঁর পিছন ছাড়ছিলই না। এখন সেসব কিছুই আর থাকল না। তিনি যেন এক নতুন জীবন পেলেন। একসময় সমাজ, পরিজন এবং সবকিছু থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে পালঙ্ক আশ্রয় করেছিলেন। কোনও দায় বা দায়িত্বের কথা ভাবতেনও না। এবার শ্রমের জগতে নেমে এসে তাঁর প্রভূত উপকার হল। এমনকি শিক্ষকতা করা ছাড়াও ইস্কুলের নানান কর্মকাণ্ডের দিকেও ঝুঁকে পড়লেন তিনি। ছাত্র-ছাত্রীদের আবৃত্তি শেখানো, জিমন্যাস্টিক, লাঠি খেলা, বর্শা ছোঁড়া শেখানো থেকে নাটক করা ইত্যাদি ব্যাপারে বেশ দায়িত্ব নিয়ে

কাজ করতে লাগলেন তিনি। এসব বিষয়ে তাঁর সম্যক পারদর্শিতার খবর আগে শুধু জনশ্রুতি হিসেবেই শুনেছি। তাঁর শরীর স্বাস্থ্য স্বাভাবিকক্রমে বেশ ভালই ছিল, শুধু দীর্ঘকাল এক অকর্মার জীবনযাপন করে নানান রোগ বাসা বেঁধেছিল তাঁর দেহে। এখন মানুষের সাথে নিয়ত মেলামেশা করে এবং খানিকটা আর্থিক দুশ্চিন্তা মুক্ত হয়ে স্ফূর্তির উদ্ভব ঘটতে থাকলে তিনি বড় সুন্দরভাবে বাঁচতে শুরু করলেন। এভাবে তাঁকে কোনওদিন আনন্দে থাকতে দেখিনি বলে আমাদেরও খুব সুখবোধ হতে লাগল এই সময়। তাঁর গুণপনার কিছু বাস্তব দৃষ্টান্ত দেখে মনে হল, না, আমাদের বাবা একেবারে 'অকম্মার ঢেঁকি' নন, যেমন তাঁর সম্বন্ধে বাড়ির জ্যেষ্ঠরা হামেশা বলে থাকেন।

বাবার কণ্ঠস্বর খুব আভিজাত্যপূর্ণ ছিল। আবৃত্তি বা নাটক অভিনয়ের সময় আমরা তা দেখেছি। তবে পরে বুঝেছি তাঁর ঢংটি শিশির ভাদুড়ী মশাইয়ের। তিনি বাবার কলেজ জীবনের আদর্শও ছিলেন। তবে জিমন্যাস্টিক, লাঠিখেলায় তাঁর দক্ষতা আমি দেখেছি। আমি তাঁকে তুখোড় লাঠিবাজদের সঙ্গে স্পর্ধা করে খেলায় নামতেও এই সময় দেখেছিলাম। তাতে মনে হয়েছে মানুষটা কিছু কিছু বিদ্যে বেশ ভালভাবেই অধ্যয়ন করেছিলেন। অভাব ছিল শুধু অনুশীলনের। ইস্কুলের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রশিক্ষণকালে তাঁর বর্শাক্ষেপণ, ভার-উত্তোলন চক্রক্ষেপণ ইত্যাদির প্রকৌশল দেখে তাজ্জব বনে গেছি। প্রায় পেশাদারি দক্ষতায় তিনি সেসব করতেন এবং ছাত্রছাত্রীদের শেখাতেন। অথচ এতসব ধন নিয়ে তিনি কিনা দীর্ঘকাল এক শয্যাশায়ী মনুষ্য হয়ে থাকলেন।

শব্দের উচ্চারণ তা সে ইংরাজি, বাংলা বা সংস্কৃত যে ভাষাই হোক না কেন, তিনি শুদ্ধতার বিষয়ে সবিশেষ আগ্রহী ছিলেন। অশুদ্ধ উচ্চারণ তাঁর রুচিবিরুদ্ধ ছিল। ইস্কুলের যে কোনও অনুষ্ঠানের শুরুয়াতে তিনি খুব উদাত্ত আবৃত্তিতে বেদমন্ত্র পাঠ করতেন—'সংগচ্ছধ্বম্ সংবোদোদ্ধম সংবোমনাম্ সিজ্ঞানতাম'। এরপরে মৌলবি স্যারকে বলতেন, হুজুর, এবার আপনের আয়াতেও কিছু তেলওয়াৎ করেন, আমরা শুনি। মৌলবি স্যার, আনুনাসিক উচ্চারণে, বিসমিল্লাহির রাহমানের রাহিম। আউজি বিল্লাহমিনাঃ শারিফ শায়তনের রাজিম,—ইত্যাদি আয়াত উচ্চারণ করতেন। তখন জমায়েতে এক অদ্ভুত শান্ততা বিরাজ করত।

তখনও আমি বাবার ইস্কুলে ভর্তি হইনি। মাঝে মাঝে বাজার যাবার পথে দাঁড়িয়ে সেইসব দেখতাম। বাবা প্রসন্নকুমার বিদ্যালয়ে যোগদান করেই সিদ্ধান্ত নিলেন যে আমাকে ওখানেই নিয়ে যাবেন। কিন্তু তখন বার্ষিক পরীক্ষার দু একমাস মাত্র বাকি। এ সময়ে যাওয়া যায় না। এখানে আমিই ছিলাম একমাত্র হিন্দু ছাত্র, আর মাস্টারমশাই একমাত্র হিন্দু শিক্ষক। আমরা কেউই খুব একটা ধর্মীয় জীবনযাপন করতাম না। মাস্টারমশাই রোজগারের জন্য কিছু যজমানি পুজোপাঠ করতেন। সেখানে তাঁর অবলম্বন ছিল একখানা পুরোহিত দর্পণ বা নিত্যকর্ম পদ্ধতি। তাই খুলে তিনি দোল, দুর্গোচ্ছব, শান্তি স্বস্ত্যয়ন, কাঁকড়ার ব্রত বা বারবাঘের কুমীর পুজো সবই করতেন।

আমার পারিবারিক পরিমণ্ডলে ধর্মীয় ব্যাপারটা একটু গোলমেলে ছিল। সে একটা জগাখিচুরি ব্যাপার। প্রাচীন পরম্পরায় আমাদের পরিবারের শাক্তগোষ্ঠী হওয়াই তথ্যসম্মত। সে তথ্য বাবার কাছে শোনা গল্পেও আমি জেনেছি। বড় খালের উল্টো পারের এক গ্রাম, নাম তারপাশা। সেখানে একসময় নাকি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের ব্যাপক বসতি ছিল। আবার দু একজন তন্ত্রসাধকও সেখানে বসতি করতেন। আমাদের কুলগুরুর গৃহ ছিল ঐ গ্রামে। বাবা বলতেন, আমাগো কুল গুরুদেব দিগ্বিজয় ভট্টাচার্য মশাই একমাত্তর কালী পূজার দিনই এ বাড়ি আইতেন, এরহম দ্যাখছি। তেনায় রুদ্র বীণা বাজাইয়া কালীকেত্তন করতেন মোণ্ডোপের সিঁড়ির উপার বইয়া। নরকরোটিতে করইয়া কারণ বারি পার করতেন। আমার খাস চাকর মঙ্গল পাঁড়ে ঝালকাডির ম্যাথর বাড়ির থিহা মদ আনাইয়া দেতে। তেনায় হেয়া শোধন করইয়া ঐ করোটিতেই পান করতেন। আর থাকত এট্টা আস্থা মড়ার মাতার কঙ্কাল। হেডারে মোণ্ডোপের মইদ্যে দেবির পদতলে রাইখ্যা এক গেলাস কারণ ঢালইয়া দেতেন মুহের মইদ্যে। এ মুণ্ড হেই কারণ যে শোঁ শোঁ আওয়াজ করইয়া পান করতে হেয়া তো আমরা দেখছিই।

এসব গল্পে আমাদের খুব শিহরণ হত। জানতে চাইতাম দিগ্বিজয় ভট্টাজ্জি রুদ্রবীণা বাজিয়ে কালী পুজোর রাতে কি গান গাইতেন। বাবা বলতেন, হে এক বিত্তান্ত। রুদ্রবীণা যে সে বাজাইতে পারে না। শিক্ষা লাগে। গিগ্বিজয় ঠাহুর এ সব ব্যাপারে আছিলেন সিদ্ধ পুরুষ। হেনার শেখনের কিছু বাকি আছিল না। রুদ্রবীণা বাজাইয়া হেনায় গাইতেন শ্যামা সঙ্গীত—'নাচে উলঙ্গী নানারঙ্গে। তার ভ্রূভঙ্গে স্থির নিখিল ভুবন। কোলে স্রোতস্বিনী—তরঙ্গে জাগে শ্মশান মশান। জাগে নবনব রূপ প্রকৃতি অঙ্গে।' আমরা তখন কল্পনেত্রে এক কাপালিককেই যেন দেখতাম, যিনি পঞ্চ মকারে কালী সাধনা করছেন, নরকরোটিতে কারণ পান করছেন। আমার জ্ঞানত, জেঠামশাইকে এই শাক্তধারার শেষ প্রতিভূ দেখেছি। বাবা ইত্যাদিরা অজপা মন্ত্রের অসাম্প্রদায়িক ভক্ত। তবে এই অসাম্প্রদায়িকতা কোনও ব্যাপক অর্থে নয়। গোঁসাইজি বোধ হয় তাঁর অনুগামীদের নিয়ে একটি পৃথক সম্প্রদায়ের সৃজন চাননি। তাঁর প্রাক্তন ব্রাহ্ম জীবনে সম্প্রদায়গত নানান বিষয়ে বিতণ্ডা তাঁকে একটা সময় পীড়িত করলে, তিনি সনাতন ধর্মের মূল ধারায় ফিরে আসেন। তথাপি তাঁকে নিয়ে একটা সম্প্রদায়েব সৃজন হয়ই। ব্রাহ্মণ্য আচরণের অস্পৃশ্যতা জাতীয় অনাচার সেখানেও ক্রমশ শিকড় গাড়ে। আমাদের বাড়ির 'গোঁসাই গণের' ধর্ম কর্ম বিষয়ে যে আচার আচরণ দেখেছি, তা ছিল কিছু গ্রন্থ পাঠ এবং ধ্যান করা। সকাল ও সন্ধেয় ধ্যান অথবা রেচক, কুম্ভক, প্রাণায়ামাদি কিছু প্রক্রিয়া করণ, আর নানান গ্রন্থপাঠ। ধ্যানে তাঁরা বীজমন্ত্র চিন্তা করতেন শুধু, জপ করতেন না। ধ্যান মুদ্রা এবং আসনেরও একটি পদ্ধতি ছিল। দু হাতের অনামিকার সপ্তম কড়ে উভয় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ স্পর্শন এবং আসন পিঁড়ি হয়ে বসে শিরদাঁড়া সোজা রেখে মুদিত নেত্রে বীজমন্ত্র চিন্তন। মাকেও এরকম করতে দেখেছি। মা, বীজমন্ত্রটি কি তা আমাকে কোনও দিন বলেন নি। সেই মন্ত্রটির নাকি উচ্চারণ নিষিদ্ধ। জিজ্ঞেস করেছি, এসব করে কি হয়?

মা বলেছেন, চিত্ত শান্ত হয়। হয়ত হয়, হয়ত সেই হওয়াটা নেহাৎই মনের বুঝ। তো সে যাহোক্ অসীম দরিদ্রাবস্থা, পারিবারিক নানান উত্থান, পতন, বিদেশে নিরুপায় সন্তানদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য দুশ্চিন্তা ইত্যাকার হাজার সন্তাপে আমি তাঁদের শান্ত চিত্তই দেখেছি বরাবর। বাবা এবং মা উভয়েই তাঁদের চরম সংকটের মুহূর্তে 'তোমারই ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী, দাও দুঃখ যত পার সকলই সহিব আমি'— এরকম এক উচ্চারণে খুবই শান্ত চিত্তে সব গ্রহণ করতেন। তাঁদের আত্মনিবেদনের এবং তন্নিহিত বিশ্বাসের ভূমিটি ছিল বেশ পোক্ত। যুক্তি বা বিচার সেখানে তাঁদের বিশেষ কোনও দ্বন্দ্বে পীড়িত করতে পারত না। কারণ যুগটা আমাদের পিছারার খালের সোঁতার আশপাশে বহির্বিশ্বের মতো ততটা যুক্তিবিচার-মার্গী তখনও হয়ে ওঠেনি।

অতএব, এরকম এক পরিবেশে মানুষ হয়ে আমার নির্দিষ্ট কোনও ধর্মমত বা পথ গড়ে ওঠেনি। মাস্টারমশাইও কোনও বিশেষ ধর্মীয় নিগরে আবদ্ধ ছিলেন না। আমাদের ধর্মাচার ছিল একান্তই উৎসব সাপেক্ষ। মনসা, দুর্গা, শ্যামা ইত্যাকার পূজা উপলক্ষে। বলির পাঁঠার মাংসের প্রতি আমাদের লক্ষ্য যতটা ছিল পূজাজনিত, পুণ্যের দিকে তার শতাংশের একাংশও নয়। এটা আমাদের ধর্মাচারে শাক্ত ধারার অব্যবহিত আচারগত পরম্পরা বললেও ভুল হয়না। ফলত তারুলি গ্রামের সেই ইস্কুলে মাস্টারমাশাই এবং আমার ধর্মাচার পালন করা বড় কষ্টকর হয়। সাম্প্রদায়িক হিসেবে ঘোষিত এ রাষ্ট্র। বাষ্ট্রের নাগরিকগণের সংখ্যাগুরু মুসলমান সমাজ। অতএব রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম। তবে এই রাষ্ট্র ঘোষিতভাবে সংখ্যালঘুকে, তাদের ধর্মাচরণে বাধা দিতে চায়না, বরং উৎসাহিত করে, যেন তারা তাদের ধর্মানুযায়ী জীবনযাপন করে। কারণ, অন্যথায় বহির্বিশ্বে বদনাম হয়। রাষ্ট্র চায় হিন্দু হিন্দুই থাকুক, মুসলমান মুসলমান। সমবেতভাবে এরা যেন অন্য কিছু হতে না চায়, না পারে, অন্তত অসাম্প্রদায়িক মানুষ যেন হতে না চায়। এমন কি, আমি এরকমও দেখেছি যে, একদা যেমন দাঙ্গা ইত্যাদির সময়, হিন্দুর মুখে গোমাংস ঠুঁসে দিয়ে, কলমা পড়িয়ে, তাদের মুসলমান করা হত, এসময়ে সে পদ্ধতিও গ্রহণ করা হচ্ছে না। উপরন্তু হিন্দুরা মুসলমানি আচরণে, গোমাংস ভক্ষণে বা মুসলমানি পরবাদিতে যোগদান করুক, তারা তাও চাইত না। তারা তাদের মতো থাকুক, আমরা আমাদের মতো। অর্থাৎ ভেদটা বজায় থেকেই যাক। আমরাও তাদের হিন্দুয়ানিতে যাব না, তারাও যেন আমাদের মুসলমানিতে না আসে, এরকম একটা বিচার তখন। এ বিচার শুধু মৌলবাদী মুসলমানদের নয়, সনাতনপন্থী হিন্দুদেরও। হিন্দুরা যাদের ওখানে থেকে যেতেই হবে, কিছুতেই ভূমিত্যাগ করা চলবে না, তাদের মানসিকতায় এই ধারাটি একসময় বেশ খাপ খেয়ে যায়। তারা ভাবে যদি থাকতেই হয় এখানে, তবে পিতৃপুরুষের ধারাটা অন্তত বজায় থাকুক। কিন্তু সে ধারাটিও ব্যাপক স্ফূর্তি পায় না। না পাওয়ার কার্যকারণ অনেক। তার বিস্তৃতিতে না গিয়ে শুধু একটা কথাই বলি, সব দ্বন্দ্বের মূলাধার জমি। মানুষের মধ্যে যত সব দ্বন্দ্ব বিরাজমান, তার মূল বিষয়বস্তু

হচ্ছে জমি, জমির মালিকানা। এমন কি, এরকমও মাঝে মাঝেই আমার মনে হয়েছে যে, স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য কলহের কারণও যেন জমিই।

এ কারণে এই রাষ্ট্রের শুরুয়াতে সাম্প্রদায়িক ঝঞ্ঝাটের যে প্রকরণ ছিল, পরে তা পাল্টায়। আগে ধর্মান্তর করণের একটা প্রবণতা ব্যাপক ছিল। কোনও হিন্দু ধর্মান্তরিত হয়ে, মুসলমান হলে তার আত্মরক্ষার সমস্যা মিটে যেত। তখন দাঙ্গাবাজ যারা, তারা ধর্মীয় উন্মাদনায় যতটা উন্মত্ত ছিল, ভূমি গ্রাসের প্রতি ততটা ছিল না। প্রতিহিংসা এবং তাৎক্ষণিক লুণ্ঠন, ধর্ষণ জনিত প্রাপ্তিই ছিল সে সময়কার সম্প্রদায়গত বিদ্বেষের হেতু। পরে রাষ্ট্র স্থিতিশীল হলে এবং রাষ্ট্রপুরুষেরা ধর্ম ও রাজনীতির মিশ্রণে যে যাদুবল সম্প্রদায়গতভাবে লাভ করা যায়, সে বিষয়ে বিজ্ঞ হলে, এই ধারাটি পরিবর্তিত হয়। তখন কুচক্রীরা সংখ্যালঘুদের তাড়িয়ে ভূমি-লুণ্ঠনে যতটা আগ্রহী হয়, তাদের ধর্মান্তরিত করণ বা নিকেশ করণে ততটা আগ্রহী থাকেনা। এ বিষয়ে ধান্ধাবাজ, কুচক্রী এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্নদের আচরিত কৌশল বিষয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করব। এবং মাস্টারমশাই এবং আমার ধর্মীয় আচরণজনিত সংকটের কথায় ফিরে যাই।

পাকিস্তান তখনও নিতান্ত শিশুরাষ্ট্র, সাতিশয় নাজুক অবস্থা তার। কেউ কেউ বলতেন যে, প্রায় 'এতিম'। কিন্তু সে নেহায়েৎই ফালতু কথা। তার মাথার উপর তখন দুই মুরুব্বি, 'আরশে' আল্লাহ পাক্, আর দুনিয়ায় আমেরিকা। এর চাইতে বড় মুরুব্বি আর কি হতে পারে। যতই ইসলামি, শরিয়তি ব্যবস্থার রাষ্ট্র হোক, তৌরাত, ইঞ্জিল শরিফ কোরানের সাথে ওল্ড বা নিউ টেস্টামেন্টের যতই বিরোধ থাকুক আর 'প্যান্ ইস্‌লামিজম্' যাই ফতোয়া দিক, মুরুব্বি হিসেবে মার্কিন মাথার উপরে থাকলে, আর যাই হোক তাকে 'এতিম' বলা 'গুণাহ'। তাছাড়া ঐশী গ্রন্থে একথা বড় হরফে লেখা আছে 'জান বাঁচান ফরজ।' সে যা হোক, মুরুব্বিদের আদেশক্রমেই রাষ্ট্রীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মীয় কারিক্রম। মার্কিন সাহেবদের তখন এই শিশুরাষ্ট্রটিকে 'ওম্' দিতে দেখেছি প্রায় পক্ষীমায়ের মতো। তখন তাঁরা গামবুট পড়ে আমাদের ঐ অজ স্থানেরও প্রায় অস্থান কুস্থানে 'লৌড়' লাগাতেন, আমাদের অন্ধকার হইতে আলোতে অথবা দারিদ্র হইতে সচ্ছলতায় পৌঁছে দেবার মহান ব্রত পালন করার জন্য। তাঁরা চাইতেন, আমরা নবীন রাষ্ট্রের নবীনরা যেন ধর্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতির অর্থাৎ ইসলামের খিদ্‌মতগার হই। অহো ! ক্রুসেড এবং জ্বিহাদের সময়ে আত্মত্যাগী মার্টার এবং শহিদগণ তোমরা ভূমধ্যস্থ শয়নে পার্শ্ব পরিবর্তন কর। রাষ্ট্রস্বার্থে সব ঐশীগ্রন্থের সমাহার হচ্ছে।

সে যাহোক, মুসলমান ছাত্ররা তাদের ধর্মীয় কার্যক্রমে খুবই নিষ্ঠাবান ছিল। প্রতিদিন জলপানের বিরতির সময় তারা নমাজ আদায়ে বাধ্য হত রাষ্ট্রীয় নির্দেশেই। এ ব্যাপারে কেউ যদি অনুপস্থিত থাকত, তাকে রীতিমতো বেত খেতে হত, পড়া না পারার মতোই। মাথায় সাদা টুপি এবং গোড়ালির উঁচুতে লুঙ্গি বা পাজামা তুলে তারা যখন 'আউজিবিল্লাহ্ মিনাঃ শরিফ' ইত্যাদি উচ্চারণ করত, আমার আর মাস্টারমশাই-এর

তখন বড় দৈন্যদশা। তখন হেডমাস্টার সাহেবের নির্দেশে মাস্টারমশাই আমাকে 'ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ' ইত্যাদি উৎপটাং কিছু শ্লোক পাঠ করাতেন। মাস্টারমশাই যেমন খুশি বলতেন, আমিও আবৃত্তি করে যেতাম। তবে তিনি এবং আমি দুজনেই জানতাম আমরা কোনও ধর্মীয় মন্ত্র উচ্চারণ করছি না। হিন্দুধর্মের ব্যাপারটা ঠিক অন্য ধর্মের মত নয়।

অন্যান্য শিক্ষক সাহেবরা জানতে চাইতেন আমাদের ঐশী গ্রন্থ কী। আমি জানতাম আমাদের কোনও ঐশী গ্রন্থ নেই। তৌরাত, ইঞ্জিল শরিফ, কোরান শরিফ বাবাইবেলের মতো হিন্দুদের কোনও একক ধর্মগ্রন্থ নেই যাকে অনুসরণ করে হিন্দুরা একটিমাত্র নির্দিষ্ট সম্প্রদায় গঠন করতে পারে বা নিজেদের একটা জাতি হিসেবে দাবি করতে পারে। হিন্দুত্ব ব্যাপারটার কোনও শাস্ত্রোক্ত সংজ্ঞা নেই। হিন্দুদের ধর্মপালনের হাজারো নিয়ম নিগড় আছে। মনু, পরাশর, বৃহস্পতি ইত্যাকার ঋষি মশায়দের রচিত সে সব নিয়মের শতমূল ধারা সহস্রমূল বিস্তৃতি। কিন্তু সকলের জন্য একটি নির্দিষ্ট ঐশী গ্রন্থ নেই। মাস্টার সাহেবদের ধারণা গীতা, বেদ এইসব আমাদের ঐশী গ্রন্থ। তাঁদের এ ধারণার হেতুও আছে। কেননা গীতায় 'ভগবানুবাচ' আছে, বেদকে অপৌরুষেয় এবং ঈশ্বরের বাণী এমত বলা হয়ে থাকে। কিন্তু যাঁরা এইসব গ্রন্থ পাঠ করেছেন, তাঁরা জানেন যে এই ধারণার আদৌ কোনও ভিত্তিই নেই। গীতা, বেদ ইত্যাদি সব গ্রন্থই মনুষ্যের রচনা এবং সে সংবাদ ঐ সব গ্রন্থেই পাওয়া যায়। বেদের অপৌরুষেয়তার প্রচার বোধ হয় ইসলাম আগমনের পরবর্তীকালের রটনা। কোরান আল্লাহতায়লার রচিত বাণী এবং ঈশ্বরের বাণী এরকম এক দাবির প্রতিস্পর্ধা হিসেবেই বেদকে এক সময় ব্রাহ্মণেরা অপৌরুষেয় বলে ঘোষণা করে থাকবেন। এটা আমার ধারণা।

এইসব ধর্মীয়করণ-কারণ হয়ে গেলে বৈকালিক ক্লাশ শুরু হত। যতদিন মাঝি স্যার ইস্কুলে ছিলেন, তিনি আমাদের ক্লাশ এইটেই ইংরেজি এবং ইতিহাস পড়াতেন। কখনও কখনও বাংলা ক্লাশও নিতেন। মাঝি স্যার শিক্ষাগত যোগ্যতায় সাধারণ একজন ম্যাট্রিকুলেট ছিলেন, কিন্তু তাঁর পড়ানোর পদ্ধতি আমাদের মতো গ্রামীণ নিম্নমানের ছাত্রদের পক্ষে বড়ই উপযোগী ছিল। ইংরেজি গ্রামার পড়ানোর একটি সম্পূর্ণ নিজস্ব ধরন ছিল তাঁর। তিনি বাংলার মাধ্যমে ইংরেজি গ্রামার পড়াতেন। হাতে কোনও বই পুস্তক রাখতেন না। ক্লাশে ঢুকে বলতেন, খাতা পেন্সিল লও, মেলা কথা কবা না। যার যা জিগাবার ল্যাহা শেষ অইলে অথবা ছুট্টির পর জিগাবা, কথার মইদ্যে কথা কবানা। তারপর টেন্স, সিন্‌ট্যাক্স, শব্দ, বাক্য, ইত্যাদি বিষয়ে গড়গড় করে বলে যেতেন আমরা লিখে নিতাম। আমাদের যেটুকু ইংরেজি বিদ্যে রপ্ত হয়েছিল, তা যে একান্তই মাঝি স্যারের অবদান, একথা এ বয়সেও বিস্মৃত হইনি।

ক্লাশ এইট থেকে বার্ষিক পরীক্ষা দিয়ে যখন নাইনে উঠি তখন দেখা গেল ইতিপূর্বের ফার্স্টবয়কে প্রায় একশ নম্বরে পিছনে ফেলে আমি প্রথম হয়েছি। সে দ্বিতীয় এবং সে হচ্ছে সেই দুলাল। আমাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হাড্ডাহাড্ডি হলেও, আজও আমরা অভিন্ন হৃদয় বন্ধু।

— একুশ —

আবার আমাকে একটু পিছনের বার্তা বলতে হবে। আসলে এরকম রচনার খেই রাখা আমার মতো বেহিসেবি মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই লেখাতে বিষয় বড় খাপছাড়া হয়ে যায়। আমার বন্ধু এবং সহপাঠী দুলালদের বাড়িটা আমাদের ঐ ইস্কুলের একেবারেই কাছে ছিল। একটা কাঠের সাঁকো পার হয়ে ওপারে গেলেই ওদের চৌহদ্দি। ওরা তখন ওখানে বেশ অবস্থাপন্ন পরিবার। সাঁকো থেকে নামলেই ওদের বেশ বড় একটা বৈঠকখানা ঘর। সেখানেই ইউনিয়ন কাউন্সিলের অফিস। দুলালের চাচা সৈজদ্দি শিকদার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান। আগে বলা হত ইউনিয়ন বোর্ড। আয়ুব খান সাহেব ক্ষমতা দখলের পর বুনিয়াদি গণতন্ত্র চালু করলে সবগুলো বোর্ডের নাম কাউন্সিল এবং প্রেসিডেন্টদের পদবী চেয়ারম্যান হয়। বোধহয় খান সাহেব দেশে একজনের বেশি প্রেসিডেন্ট রাখা উচিৎ মনে করেন নি। সৈজদ্দি চাচা চেয়ারম্যান হলেও আসল চাবিকাঠি ছিল আমার সেই জেঠামশাইয়ের হাতেই। তালুকদারির ক্ষমতা চলে গেলেও এই গ্রামীণ রাজনৈতিক ক্ষমতাটি তিনি কোনও দিনই হাতছাড়া করেন নি, যদিও নিজে কখনই পদাধিকারে থাকেন নি।

শুনেছি এবং কিছুটা দেখেওছি যে এই মাতব্বরি করার ক্ষমতাটির জন্য তিনি দীর্ঘ চৌদ্দ বছর মামলা লড়েছিলেন একজন মুসলমান তালুকদারের সঙ্গে । তাঁর নাম ছিল কুট্টি খান। খুবই সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক ছিলেন তিনি। আমার বাবার সাথে তাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু ইউনিয়ন বোর্ড নিয়ে রেষারেষিতে তিনি আর জেঠামশাই ছিলেন পরস্পরের জান্ কা দুশমন। শুনেছি এই মামলা এবং রেষারেষির কারণে বেশ কয়েকটা খুনও নাকি হয়েছিল। মামলা নিষ্পত্তি হওয়ার আগেই কুট্টি খান সাহেব ইন্তেকাল ফরমালে জেঠামশাই আখরি লডাই জিতে গিয়ে আজ একে কাল তাকে প্রেসিডেন্ট করে কাজ চালাচ্ছিলেন। বর্তমানে সৈজদ্দি চাচা চোয়ারম্যান। ইউনিয়নের কাজকর্ম বলতে যা হত তার ব্যাপক বর্ণনা দেবার দরকার নেই। কাজের মধ্যে ছিল শুধু দুর্ভিক্ষ বা দুর্যোগের সময় যে যৎসামান্য রিলিফের সামগ্রী আসত তা নিয়ে ধান্দাবাজি করা।

সৈজদ্দি চাচার চেয়ারম্যান থাকার সময় জেঠামশাই আমাদের ঐ ইস্কুলে কিছুদিন হেডমাস্টারি করছিলেন। তখন প্রবল ফৌজি শাসনের সময়। সবে ক্ষমতায় এসেছেন তাঁরা। দেশ থেকে দুর্নীতি এবং অরাজকতা তথা সরকারি অর্থের নয়ছয় হওয়া বন্ধ করতে ফৌজিরা যত্রতত্র হানা দিচ্ছে। হিসেবপত্তর দেখছে। গরমিল বোধ হলে দনাদ্দন পেটাচ্ছে বা কোর্ট মার্শাল করে জেলে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। আমাদের ওখানে গঞ্জ থেকে গাঁ অবধি সর্বত্র তখন এক কম্পমান অবস্থা। আজ এ কোম্পানিতে ছাপামারি হচ্ছে তো কাল অমুক ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানকে কান ধরে ওঠসব করাচ্ছে। সে এক দেখার মতো কাণ্ড। কিছু মানুষ ভাবতে শুরু করল, এবার দেশের নিশ্চয় উন্নতি হবে। কেননা তাদের বিশ্বাস মিলিটারিরা কখনও আমলাদের মতো অসৎ হয়না। তারা যা করবে দেশের স্বার্থেই করবে। যেহেতু দেশে এই প্রথম সামরিক শাসন, তাই গ্রামীণ

সাধারণ মানুষ, পদস্থ লোকদের নাকানি চোবানি খাওয়া দেখে খুবই আহ্লাদিত হয়েছিল। সামরিক শাসন আসলে যে কী বস্তু তা বুঝতে তাদের বেশ কিছুকাল সময় লেগেছিল, শহরের মানুষদের কথা বলতে পারব না, কেননা, সেসব খবর পিছারার খালের মাঠ প্রান্তরে খুব কমই পাওয়া যেত সেসব দিনে। এ শুধু আমার অঞ্চলের কথা।

এ রকম সময় একদিন ইস্কুলে গিয়ে দেখি একদল ফৌজি এসেছে। তারা ইউনিয়ন কাউন্সিলের আপিসে বসে হিসেবপত্তর দেখছে। আশে পাশে গাঁয়ের লোকেদের ভিড়। তারা সবাই তটস্থ। বেশির ভাগ মানুষই এই প্রথম ফৌজিদের কাছাকাছি থেকে দেখছে। ফর্সা লাল লাল চেহারার জোয়ান সব। পরনে জলপাই রঙের উর্দি, কাঁধে অদ্ভুত ধরনের রাইফেল, গাঁক গাঁক করে উর্দুতে কথা বলছে, সে এক কাণ্ড। স্বয়ং চেয়ারম্যান সাহেব ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে দুই হাঁটুর কম্পনজনিত তাল বাজাচ্ছেন।

ক্লাশের ছেলেরা সবাই আমাকে বলতে লাগল, আইজ তোর জেডার শ্যাষ। অনেক অপকিত্তি করছে। আইজ হ্যার ছাড়ন নাই। এয়ার নাম মিলিটারি হ। জেঠামশাই যে নানাবিধ অপকিত্তির আধার সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ না থাকলেও, এদের বার্তালাপ আমার খুবই খারাপ লাগছিল। জেঠামশাই তখন আমাদের হেডমাস্টার হলেও, তিনি যে অন্য আরেকটি দূরবর্তী গ্রামের ইস্কুলেরও কর্ণধার একই সাথে, সে তথ্য আমার জানা ছিল। কোথাও তিনি নিয়মিত কর্তব্য করতেন না, বা করা সম্ভবও ছিল না। এও তাঁর একটি অপকিত্তির নমুনা। আমাদের ইস্কুলে যেদিন আসতেন, ইস্কুল এবং কাউন্সিলের কাজ একসাথে করে যেতেন। আবার কিছুদিন বেপাত্তা থাকতেন। এদিনটিতেও তাঁর আসার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না, যদিও হিসেব মতো আসার কথা ছিল তাঁর। ফলত সবচেয়ে মুসিবৎ হল সৈজদ্দি চাচার। তিনি সাধারণ অল্পশিক্ষিত গ্রামীণ গেরস্থ মানুষ। জেঠামশাই তাঁকে তালেগোলে চেয়ারম্যান করে বসিয়েছেন। বুনিয়াদি গণতন্ত্রের নিয়মমাফিক নির্বাচন তখনও হয়নি। তিনি শুধুমাত্র প্রেসিডেন্ট থেকে চেয়ারম্যান নামটা পেয়েছেন। এখন ফৌজিরা যা ধুন্ধুমার লাগিয়ে দিয়েছে তাতে চাচার অবস্থা বড়ই লবেজান। চাচা না পারছেন এদের সামলাতে, না বুঝছেন এদের নির্দেশাবলি। উর্দুতে বাতচিৎ করছে ফৌজিরা, যার এক বর্ণও বোধগম্য হচ্ছে না কারুর। গ্রামের অন্যান্য মুরুব্বি মহাজনরা উপস্থিত আছেন বটে, তবে তাঁদের অবস্থাও তদনুরূপ। সে এক অনাছিষ্টি কাণ্ড। তারা বাংলা বোঝে না। এঁরা উর্দু বোঝেন না। একমাত্র হুজুর স্যার অর্থাৎ মৌলবি সাহেব উর্দু আরবি জবানে পোক্ত এমত এক বিশ্বাসে তাঁকে ঠেলে দেওয়া হল দোভাষির কাজে। তিনি মানুষটি খুব শান্ত, উর্দু আরবিও যে তিনি কিছুই জানেন না তাও নয়। তবে তাঁর একটাই অসুবিধে, তিনি নোয়াখালি জেলার মনুষ্য এবং চাকুরিসূত্রে বরিশালের এই অজ গাঁয়ে এসে পড়েছেন। তাঁর বাংলা, উর্দু এবং আরবি তিনটি জবানই এক উচ্চারণের । 'ফ' এবং 'হ' এর উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা হেতু তাঁর উচ্চারিত শব্দাবলি কোনও পক্ষেরই বোধ্য হচ্ছিল না। আবার 'রাষ্ট্রভাষা উর্দুচাই'-এর মতো এক 'আনাড়া' দাবি রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে

তখনও থাকায় ফৌজিরা একবর্ণও বাংলা শিক্ষা করা প্রয়োজন বোধ করেনি, আঞ্চলিক উপভাষা তো দূরস্থান।

এ রকম এক প্রায় কেয়ামতি সংকট সময়ে দেখা গেল প্রায় সাড়ে ছ'ফুট লম্বা, রোদে পোড়া তামাটে বর্ণ এবং অত্যন্ত ছোট ছোট করে ছাঁটা কাঁচা পাকা চুল মাথায় একজন মনুষ্য আসছেন। তাঁর পরিধানে অত্যন্ত নোংরা প্রায় তেল চিট্‌চিটে ধুতি এবং পাঞ্জাবি, হাতে একটি গলা-বেঁকানো লাঠি। পোশাকে খুব শৌখিন না হলেও জেঠামশাই বরাবর খুবই ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পড়তেন। এরকম পোশাকে এবং তৎসহ একটি লাঠি হাতে তাঁকে আমি অন্তত কোনও দিন দেখিনি। তখনই বুঝলাম এটি তাঁর চিরাচরিত স্বভাবেরই প্রকাশ। আগে অনেকবারই তাঁর ইদৃশ উদ্ভট আচরণের গল্প-কথা আমার শোনা ছিল। নিজেকে অত্যন্ত দীনভাবে প্রতিপক্ষের সামনে হাজির করে এক সময় স্বমূর্তি ধারণ করা তাঁর বরাবরের রণকৌশল। বলাবাহুল্য এইসব রণে তিনিই বরাবর জয়ী হতেন।

তিনি সাঁকো পেরিয়ে আসার সময় বন্ধুরা আবার আমায় বলল, দ্যাখ্ আইজ তোর জেডার কি দশা হয়। কিন্তু আমি যথেষ্ট ভীত হলেও দেখলাম, জেঠামশায়ের কিছুমাত্র দশা সেদিন হল না। অবাক বিস্ময়ে দেখলাম, কিভাবে তিনি এই অবস্থার মোকাবেলা করলেন। স্মৃতি যতদূর সচল, মনে করতে পারছি যে ঐ আপিসে ঢুকেই প্রথমে তিনি সৈজদ্দি চাচাকে খুঁজলেন। অতগুলো হুম্‌দো হুম্‌দো ফৌজিদের তিনি যেন আমলই দিলেন না। চাচা জেঠামশায়ের আগমনে খানিক সাহস পেয়ে থাকবেন। তিনি কাছে এসে দাঁড়ালে জেঠামশাই বললেন, সৈজদ্দি, তুমি ওহানে খাড়ইয়া আছো ক্যান্? তোমার চেয়ার তো ঐডা। বলে মেজর সাহেব যে চেয়ারটায় উপবিষ্ট সেটাকে ইংগিত করলেন এবং পরিষ্কার উচ্চারণে তাঁকে বললেন, If you do not mind gentleman that chair is ment for the president, I mean the chairman of this council. Let me introduce him, Mr. Saijaddin Shikdar the duly elected chairman of our union council and I am his humble advisor, Mr Sengupta. মেজর থতমত খেয়ে চেয়ারটি ছেড়ে দিলে, জেঠামশাই বললেন, সৈজদ্দি আর দুইডা চেয়ার বল। চেয়ার এলে তাঁরা পাশাপাশি বসলেন সবাই। এবার জেঠামশাই মেজরের পরিচয় জানতে চাইলেন এবং তৎসহ এই অফিস পরিদর্শনের জন্য তাঁর অধিকারপত্র। মেজর খুশিমনে তাঁর পরিচয় জানালেন, কিন্তু পরিদর্শনের কোনও অধিকার পত্র দিতে পারলেন না। বললেন যে, মার্শাল প্রেসিডেন্ট একটা জেনারেল সারকুলার-এর মাধ্যমে সব মেজরদের এই অধিকার প্রদান করেছেন। জেঠামশাই বললেন, It is good that his excelency has taken such a decision, but I dare say, it is irregular that you don't have a copy of that circular at your disposal. After all this is your official visit. মেজর একটু তাজ্জব বনে গিয়ে ব্যাপারটা স্বীকার করে নিলেন এবং জানালেন যে অত্যন্ত ব্যস্ততা বশত তিনি কপিটি আনেন নি। জেঠামশাই It's

all right, it's all right. Never mind ইত্যাদি বললেও জানিয়ে দিলেন যে সেক্ষেত্রে মেজরের পরিদর্শনটা খানিকটা অসমাপ্ত রাখতে হবে। কারণ তিনি চান এরকম একটি মহান কার্যক্রমে যেন কোনও ত্রুটি না থাকে। Official decorum and sanctity of the union council must be maintained. তিনি মেজরকে কয়েক প্রস্থ ধন্যবাদ দিয়ে বললেন যে শুধুমাত্র ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টগুলো ছাড়া বাকি সবরকম বিষয় পরিদর্শনে কোনও অসুবিধে নেই বরং ভালই হল যে এই সুবাদে মেজরের আরেকবার শুভাগমন এই কাউন্সিল আপিসে ঘটবে অচিরেই।

এইসব কথাবার্তা চলছে এমন সময় একটি অঘটন ঘটল। একজন ফৌজির ভাষা বুঝতে না পেরে জনৈক চৌকিদার একটু ইতস্তত আচরণ করছিল। ফৌজিটি একারণে বিরক্ত হয়ে তাকে একটি চড় মেরে বসল। জেঠামশাই সাথে সাথে উঠে দাঁড়িয়ে মেজর সাহেবের কাছে জানতে চান—Do you approve of this type of impertinence of a subordinate? মেজর সাহেব ফৌজি মানুষ। জেঠামশাই-এর এতাবৎ তালেবরীতে একটু বিগড়েই ছিলেন, এখন এরকম একটা স্পর্ধা সূচক প্রশ্নে খেপে গিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলেন : Who is the subordinate? He is a Lance Nayek. জ্যেষ্ঠতাত তীব্র ব্যঙ্গে প্রত্যুত্তর করলেন, Sorry, I thought a major is a major. But now I see that even a Lance Nayek has the right to defy his major and can exercise his own unjustified whimsicality. এবং মেজর বুঝলেন যে তাঁর প্রতিপক্ষের বেশভূষা যাই হোক, তিনি সাতিশয় ধড়িবাজ। ফৌজি কানুনের ব্যাপার স্যাপারও বিলক্ষণ তার মগজে আছে। একজন মেজরের সামনে যে সাধারণ একজন ল্যান্স নায়েক-এর এরকম আচরণ ফৌজি কাননু সম্মত নয় আর তা যে মেজরেরই অসম্মান, জেঠামশায় অত্যন্ত সরলভাবে তাঁকে তা বুঝিয়ে দিলেন। মেজর বুঝলেনও কিন্তু জেঠামশায়ের পরবর্তী প্রস্তাবটি মানা তাঁর পক্ষে কিছু আপত্তিকর মনে হল। তিনি চাইলেন ল্যান্স নায়েকটি চৌকিদারের কাছে এই অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইবে। এই নিয়ে চাপান উতোর এবং উত্তপ্ততা বাড়তে থাকে। মেজরের বক্তব্য যে, এইসব আদমিরা একবর্ণ উর্দু বোঝে না, পাঞ্জাবি, সিন্ধিও বোঝে না। এদের নিয়ে কাজ করা খুবই ঝক্‌মারি। জেঠামশাইয়ের যুক্তি, একটা মাল্টিলিঙ্গুয়াল স্টেট-এর শাসকদের এমন কথা বলা উচিত নয়। তদুপরি বিগত ভাষা আন্দোলনের পর এই কয়েক বছরের মধ্যেই রাষ্ট্রভাষা বাংলা এবং উর্দু দুটোই হবে, এই নীতি সরকারিভাবে ঘোষিত হয়েছে। এক্ষণে মার্শাল প্রেসিডেন্টের শত্রুরা সব স্থানে ওৎ পেতে আছে তাঁর ত্রুটি ধরার জন্য। এসব ব্যাপার নিয়ে তারা নানান প্রচার চালাতে সুবিধে পাবে। বিশেষত, জেনারেল প্রেসিডেন্ট স্বয়ং বুনিয়াদি গণতন্ত্র বিষয়ে উদ্যোগী। ইউয়িয়ন কাউন্সিল বুনিয়াদি গণতন্ত্রের সর্বনিম্ন ধাপ। সেখানে যদি শাসকরা এরকম আচরণ করেন তবে জেনারেল প্রেসিডেন্টের উদ্দেশ্য পণ্ড হবে। খুবই ধীরস্থিরভাবে এবং সুন্দর ভাষায় জেঠামশাই এসব ব্যাপারের তাৎপর্য এবং কিতাবের ভাষার ব্যাখ্যা করে মেজরকে বোঝালেন। মেজরও তখন বাধ্য

হয়ে ল্যান্স নায়েককে ডেকে ভর্ৎসনা করে বললেন যে সাধারণ কর্মচারী বা সাধারণ কোনও মানুষের সাথে আচার আচরণে অতঃপর যেন কিছুমাত্র বাড়াবাড়ি করা না হয়। ল্যান্স নায়েক অনিচ্ছা সত্ত্বেও চৌকিদারের হাত ধরে 'মাফি', 'কৈবাৎ নেহি,' বলে ব্যাপারটা মিটিয়ে নেয়। সেদিনের মতো মেজরের পরিদর্শন সেখানেই শেষ। হিসেবপত্রের বিষয়ে জেঠামশাই মেজরকে ওয়াদা করলেন যে, সে বিষয়ে তিনি যথাস্থানে হিসেব দাখিল করবেন। তাছাড়া তিনি ঠাট্টা করে মেজরকে এও বললেন যে Atleast a major should not act as an ordinary accountant or a petty clerk. It does not befit him. He has much more responsibility to shoulder at this crucial hour of the country. মেজর জেঠামশাইকে 'শুকরিয়া', 'অলবিদা' করে ফৌজি স্পীড বোটে চাপলেন। ঘোর গর্জন করে বোট বড় খালের উদ্দেশ্যে ছুটল। তাঁরা সব ঢাকা যাবেন, প্রাদেশিক রাজধানীতে। সেখানে তাঁদের আসল রাজ্যপাট। কিন্তু বুনিয়াদি গণতন্ত্রের বুনিয়াদের স্তরে জেঠামশাইদের প্রবল প্রতাপ তখনও।

স্পীড বোটের শব্দ মিলিয়ে গেলে জেঠামশাই ধীরে সুস্থে উঠে দাঁড়িয়ে চারদিকে একবার তাকালেন। গ্রামের সাধারণ মানুষ এবং মুরুব্বি মহাজনেরা তখনও ভিড় করে সেখানে দাঁড়িয়ে। খুবই শান্তভাবে জেঠামশাই তাঁদের বললেন, এবার আপনেরা বাড়ি যায়েন, আমিও উডি। সৈজদ্দি, কেরানি বাবুরে কও ফাইল পত্তর গুছগাছ করইয়া আলমারিতে উডাইয়া রাহুক। কাম কাজ এট্টু গুছাইয়া রাখতে অইবে। হিসাবডা যেন কাইল থিকাই ঠিক করইয়া রাহে। সবাই তখন অবাক বিস্ময়ে আমার জ্যেষ্ঠতাতের মহিমা দেখছিল। জেঠামশাই চাচাকে আবার বললেন, সৈজদ্দি, ছোবল মারতে যদি না পার, অন্তত ফোঁস করইও। এরা কিন্তু শক্তের ভক্ত নরমের যোম। হ্যারা তোমার কথা কিছু বুজুক, না বুজুক তোমারে য্যামন তড়পাইবে, তুমি হেয়ার একশ গুণ বেশি তড়পাবা, তোমার কেরানিবাবু, চকিদার আর দফাদারগো উপার। ঐ রহম কোনায় খাড়ইয়া আড়ু বাজাবা না। এ্যারা কৈলম আসলেই কাচাখাউগ্যা। তয় আইজ্জ চলি।

— বাইশ —

আমাদের বাবা প্রসন্নকুমার বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, আমাকে ঐ ইস্কুলে নিয়ে যাবেন। এই সিদ্ধান্তের পিছনে জেঠামশায়ের পরামর্শ বা নির্দেশ ছিল। বাবার মনোগত ইচ্ছাও অনুরূপই ছিল। কিন্তু দুজনের এরূপ ইচ্ছার কারণ ভিন্ন ছিল। জেঠামশায় আমার বর্তমান ইস্কুলে ভর্তি হওয়া আদৌ সমর্থন করেন নি। এমন কি যে কদিন তিনি ঐ ইস্কুলে প্রধানশিক্ষক হিসেবে কাজ করেছেন (খুব বেশিদিন অবশ্য করেন নি), তার মধ্যে না আমার সাথে ইস্কুলে তিনি একটি কথা বলেছেন, না ক্লাশ নেবার সময় আমাকে কোনও প্রশ্ন করেছেন। তাঁর শিক্ষকতার মান খুব উচ্চস্তরের যে ছিল না, তা তাঁর চাইতে অনেক কম ডিগ্রিওয়ালা হাতেম

মাঝি স্যারের পড়ানোর সঙ্গে তুলনা কোরেই আমি বুঝতে পেয়েছি। জেঠামশাই তখনকার দিনের বি. এ. পাশ এবং তাঁর বরাবরের দাবি তিনি খুবই উত্তম ছাত্র ছিলেন। গ্রাম গাঁয়ে তখনকার দিনে বি.এ. পাশ মানুষ এখনকার মতো আগুায় গণ্ডায় মিলত না। ফলে, জেঠামশাই-এর একজন উচ্চশিক্ষিত মানুষ হিসেবে শুধু পিছারার খালের জগতেই নয়, তার চৌহদ্দির বাইরে সদর অবধি সুনাম ছিল। তদুপরি তিনি আইন বিষয়েও কিছুকাল পড়াশোনা করেছিলেন। তবে এসব ব্যাপারেব সাথে শিক্ষকতার সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ নয় বলে আমরা তাঁর শিক্ষণে কিছুমাত্রই যে উপকৃত হইনি একথা বললে সত্যের অপলাপ হয়না। পক্ষান্তরে শুধুমাত্র ম্যাট্রিক পাশ, নাকি এন্ট্রান্স পাশই বলব, মাঝি স্যার তাঁর দীর্ঘকালীন শিক্ষক জীবনের অভিজ্ঞতায় আমাদের যতটা শেখাতে বা তৈরি করতে পেরেছিলেন, তার সুফল সারাজীবন ভোগ করেছি।

এই রচনা যাঁরা পাঠ করবেন, তাঁরা হয়ত জেঠামশাই বিষয়ে আমাকে খুবই একদেশদর্শী হিসেবে ভাবতে পারনে। কেননা আমি তাঁর বিষয়ে কোনও কিছুই ভাল বলছিনা। শুধুই তাঁর দোষ-ত্রুটি বিষয়েই আলোচনা করছি। কিন্তু সত্যের খাতিরে আমায় এসব কথা বলতেই হচ্ছে। কারণ জেঠামশাই, ঐ সময়কার হিন্দু মধ্যস্বত্বভোগী উচ্চবর্ণীয় মানুষদের একজন প্রকৃষ্ট প্রতিনিধিমূলক চরিত্র।

আমার এই ইস্কুলে পড়াশোনা করার বিষয়ে তাঁর আপত্তির প্রধান কারণ এই যে ইস্কুলটি মুসলমান গ্রামে এবং সেখানের শিক্ষকরাও অধিকাংশই মুসলমান। ঐতিহাসিক এবং সামাজিক বিচারে, ঐ সময়ে, ভাল মুসলমান শিক্ষক সত্যিই যে অপ্রতুল ছিল সে কথা মিথ্যে নয়। কারণ দীর্ঘকালব্যাপী বঙ্গীয় শিক্ষক, উকিল, মোক্তার, ডাক্তার এবং হাকিম বলতে অবশ্যই মধ্যবিত্ত হিন্দু সমাজের মানুষই ছিল। দেশভাগের পর এঁরা যখন পূর্ববাংলার মাটি ছেড়ে সঙ্গত এবং কখনও বা অসঙ্গত কারণে পশ্চিম বাংলায় পাড়ি দেন তখন নবগঠিত রাষ্ট্র পাকিস্তানের সমূহ সমস্যা। তখন অকস্মাৎ এক ব্যাপক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। হিন্দু ডাক্তার, উকিল, মোক্তার, শিক্ষক যাঁরা একাধারে হিন্দু মধ্যস্বত্বভোগী এবং সাধারণ মুসলমান, নমঃশূদ্র, কৈবর্ত ইত্যাদি চাষি বা সাধারণ পেশার মানুষদের শোষক, আবার তেমনই তাঁদের পরিষেবার মাধ্যমে এঁদের সংরক্ষকও। পাকিস্তান কায়েম হবার সাথে সাথেই, দাঙ্গা এবং তার আতঙ্কজনিত কারণে, যাঁদের পশ্চিম বাংলায় কিছু সহায়সম্পদ ছিল, তাঁরা চট্‌জলদি সেখানে পাড়ি দেন। এঁরা কিন্তু ঠিক উদ্বাস্তু হিসেবে সেখানে যান নি। তাঁদের ব্যবস্থা সেখানে করাই ছিল। তাই পরবর্তীকালে এঁদের অনুপস্থিতি শিক্ষাক্ষেত্রে, চিকিৎসার ক্ষেত্রে এবং কোর্টকাছারি, আপিস আদালত ইত্যাদির পরিষেবার ক্ষেত্রে যে ব্যাপক শূন্যতার সৃষ্টি করে, সামান্য সংখ্যক তৎ তৎ পেশা অবলম্বনকারী মুসলমানেরা তা ভরাট করতে পারেন নি। ভূমিলোভী যাঁরা, তাঁরা হয়ত কিছু তাৎক্ষণিক লাভের মুখ দেখে এই মাৎস্যন্যায়ে উৎসাহী হয়েছিলেন, কিন্তু ব্যাপক মুসলমান সমাজ, অন্তত সেই সময়ে, এই এক্সোডাস যে চাননি, এমন আমার মনে হয়েছে।

আমার জেঠামাশাই ছিলেন সেই শ্রেণীর প্রতিভূ যে শ্রেণীর উপস্থিতি প্রকৃতপক্ষে, ওখানকার সাধারণ মানুষের আদেপই কোনো উপকারে আসার কথা নয়। মুসলমানদের, নমঃশূদ্র বা অন্ত্যজদের প্রতি তাঁর ঘৃণা এবং বিদ্বেষ অত্যন্ত উগ্র। তিনি প্রাচীন সামন্তদের ন্যায় আচরণে তাঁর এই মনোভাব কখনও গোপন করতেন না। তালুকদারি প্রথা লুপ্ত হলে তাঁর বৈঠকখানা বা দরবার গৃহের তাবৎ সরঞ্জাম অন্দরমহলে পাচার করে সামান্য কখানা বেঞ্চিমাত্র সেখানে রাখেন, কেননা, যদি কোনো মুসলমান তাঁর বৈঠকখানায় এসে চেয়ারে বসার স্পর্ধা জানায় ! তাঁর অহমিকা এই পর্যায়েরই ছিল। অথচ এই মুসলমান সমাজের লোকের সাথেই তাঁর কাজ কারবার ছিল ব্যাপক। তাঁর পরিবারের কোনও সন্তান মুসলমানের কাছে শিক্ষালাভ করুক, এটা তাঁর সম্পূর্ণতই আদর্শ বিরোধী। বরং সে মূর্খ হয়ে থাকুক, তাতে কিছুই আসে যায় না তাঁর। ব্যাপারটা অনেকটা ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের প্রারম্ভিক যুগের মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের ধারাবাহী, যাঁরা ফার্সী শিক্ষা ছেড়ে ইংরেজি বিদ্যের ধারে-কাছে যাবেন না বলে ধনুর্ভঙ্গ পণ করেছিলেন, তাঁদের মতো। তবে এমত সামন্ত আচার যে ধোপে টেঁকে না তা তাঁর জীবৎকালেই তিনিও দেখেছেন, আমরা তো দেখেছিই।

তথাপি শেষ কামড় দিতে জেঠামশাই ছাড়েন নি। আমাকে ঐ ইস্কুল থেকে প্রসন্ন কুমার বিদ্যালয়ে পাঠানোর জন্য তাঁর যা যা করণীয় সবই তিনি করলেন। এক্ষেত্রে পরিস্থিতি তাঁর সহায়ক ছিল। প্রসন্নকুমার উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় আমাদের ঐ এলাকার সর্বপ্রাচীন বিদ্যালয়। স্থানটি এবং ইস্কুলটি হিন্দুপ্রধান তখনও। এই ইস্কুলটির স্থাপয়িতা স্বনামখ্যাত রোহিনী কুমার রায়চৌধুরী তদানীন্তন রীতি অনুযায়ী পিতৃনামে ইস্কুলটির পরিবর্ধন করেন। ইতিপূর্বে এটি একটি মাইনর ইস্কুল হিসেবেই ছিল। সুপ্রসিদ্ধ 'বাক্‌লা' নামক ইতিহাস গ্রন্থটির রচয়িতা ছিলেন রোহিনী কুমার। আমাদের ওদিগরে এত বড় ইস্কুল আর ছিল না। অবস্থাপন্ন তালুকদার বা অর্থশালী মুসলমানেরা যে এরকম ইস্কুল ইত্যাদি তৈরি করেছেন ইতিপূর্বে তা আমরা দেখি নি। পাকিস্তান কায়েম হবার পর, যখন হিন্দু শিক্ষকরা প্রায় সবাই এদেশ ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে পাড়ি দিলেন, তখন অবস্থাপন্ন বা তালুকদার মুসলমানদের টনক নড়ল যে একটা শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে এবং এই শূন্যতার ফলাফল তাঁদের ক্ষেত্রে অতি ভয়াবহ। কেননা তাঁদের সন্তানেরাই এখন ইস্কুল কলেজের পড়ুয়া। ইতিপূর্বে যে কারণে তাঁরা হিন্দুদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতেন, এখন তার অন্য দিকটাও তাঁদের কাছে প্রতিভাত হল। তাঁরা আশা করেছিলেন যে পাকিস্তান কায়েম হলে, তাঁদের ছেলে-পুলেরাই এই শূন্যস্থানটি রাতারাতি পূর্ণ করে ফেলবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কার্যকালে বিষয়টি অত সরল হল না। বিশেষত গ্রামের ইস্কুলগুলিতে এই ব্যাপক ভদ্র হিন্দুর দেশত্যাগে একটা বীভৎস ধস নামল। একের পর এক ইস্কুল—শিক্ষক এবং ছাত্রের অভাবে বন্ধ হয়ে যেতে লাগল। আমাদের গ্রামগুলোতে যেমন দেখেছি, আটদশটা গ্রাম, বা গোটা ইউনিয়ন জুড়ে হয়ত একটা বা দুটো বড় ইস্কুল তখন ছিল। এই ইস্কুলগুলি সাধারণত কোনও হিন্দুপ্রধান গ্রামেই

অবস্থিত হত, কারণ, সেগুলোর প্রতিষ্ঠাতা হয় কোনও হিন্দু জমিদার বা তালুকদার, নয়তো কোনও সফল ব্যবসায়ী হিন্দু বণিক তাঁদের মা, বাপ বা বিগতা ধর্মপত্নীর নামে স্থাপিত করেছেন। আমাদের পিছারার খালের বা বড় খালের সন্নিহিত অঞ্চলের গ্রামগুলিতে হাতগুণ্‌তি যে কজন সম্পন্ন মুসলমান তালুকদার বা ব্যবসায়ী ছিলেন, তাঁদের সন্তানরাও যেহেতু এইসব ইস্কুলেরই ছাত্র হত, তাই তাঁরা তাঁদের গ্রামগুলিতে কোনও বড় ইস্কুল স্থাপনার প্রয়োজন বোধ করেন নি। বরং তাঁরা আরবি, উর্দু শিক্ষার জন্য ছোট ছোট মাদ্রাসা বা মক্তব খোলার ব্যবস্থা বহুকালাবধি চালিয়ে গেছেন। রইসী মুসলমানদের ঈদৃশ ব্যবস্থাপনার মধ্যে এক স্বার্থবোধ অবশ্য কাজ করেছিল। সাধারণ চাষি গৃহস্থ এবং ইসলামে নিষ্ঠাবান গ্রামীণ কৃষককুল এই শিক্ষাকেই চূড়ান্ত মানলে, তাঁদের অর্থাৎ মুসলমান তালুকদার, জোতদার বা ব্যবসায়ীদের খিদ্‌মতগারির জন্য অফুরন্ত মেহন্নতকারীর অভাব হবে না। হিন্দুদের স্বার্থচিন্তাও অনুরূপই ছিল। কিন্তু তাঁরা জানতেন সাধারণ মুসলমান, অর্থাৎ যারা তাদের আধিয়ার, বর্গাদার, বেঠ্‌বেগারি খাটনেওয়ালা, রাখাল, মাহিন্দার বা ভাতুয়া, তারা কোনও দিনই তাদের সন্তানদের ইস্কুলে পড়াতে পারবে না। কারণ সেক্ষেত্রে রইসিদের খিদ্‌মতগারির সমূহ অসুবিধে। কিন্তু পাকিস্তান কায়েমের সময় এবং তার পরবর্তী বেশ কিছুকাল ধরে যখন রাষ্ট্র নেহাৎ শিশু, মুসলিম লিগ নাড়া দিয়ে গেছে যে ইসলামের ভিত্তিই হচ্ছে সাম্যের ভিত্তি। সেখানে সবাই সমান। আমির গরিবে কিংবা জাতপাতে কোনও ভেদাভেদ নেই। সবার সমান অধিকার। হদিস শরিফে একথা স্পষ্ট বলা হয়েছে যে শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকোবার আগেই তার মজুরি যেন দিয়ে দেওয়া হয়। এ রকম সব উত্তম কথা সেসময় আমরা অনেক শুনেছি। কিন্তু এমনও দেখেছি যে, আমাদের পিছারার খালের উল্টোপাড়ে যেদিকে মুসলমান গ্রাম, সেখানের জনৈক তালুকদার, তাঁর আপন ভাগ্নেকে 'বান্দির বাচ্ছা' বলে গাল পারছেন, কেন? না তার মা, অর্থাৎ ঐ তালুকদারের বোন 'বেওয়া' অবস্থায় তার বাড়িতে (অর্থাৎ ভাই-এর বাড়িতে) দাসীবৃত্তি কবে তার সন্তানকে বড় করেছে। আর সে যখন তার ন্যায্য হিসেব দাবি করছে তখন তাকে বলা হচ্ছে বান্দির বাচ্ছা।

এই শূন্যতা যখন ব্যাপক তখনই সম্পন্ন মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষেরা তাঁদের এলাকায় ইস্কুল স্থাপনে উদ্যোগী হলেন। উচ্ছন্নে যাওয়া হিন্দু গ্রামে ইস্কুলগুলির সম্পদ যখন চোর-ডাকাতে লুট করে নিয়ে যায়, তখন মুসলমান গ্রামগুলোতে নতুন করে ইস্কুল তৈরির প্রচেষ্টা চলে। অন্যথায়, তাঁদের সন্তানদেরই শিক্ষা-দীক্ষার পথ রুদ্ধ। মুসলমান জোতদারেরা অথবা বৃহৎ ও মাঝারি চাষিরা এইসব স্কুল স্থাপনার জন্য তখন উদ্যোগী। তখন একদিকে হিন্দুদের ছেড়ে আসা ইস্কুল, বাড়িঘর, বাগান বিলাস সব চাষের জমিতে রূপান্তরিত হতে থাকে, আরেক দিকে নতুন ইস্কুল গড়ার, খেলার মাঠ গড়ার বা ইতিপূর্বে যে সব বৈভব তাঁরা হিন্দু প্রধান গ্রামগুলিতে দেখেছিলেন, তার অনুকৃতির প্রচেষ্টা চলতে থাকে। কিন্তু আখেরে কিছুই বিশেষ দাঁড়ায় না। কারণ এই গঠনে না

থাকে তাদের কোনও পরম্পরা, না যুগানুযায়ী প্রয়োজনের কোনও নতুনত্ব। এ শুধুই পুরাতনের অনুকৃতির প্রচেষ্টা হিসেবে দুদিন বাঁচে এবং তারপর মরে যায়।

তাদের এরকম প্রচেষ্টার সময়েই আমার বাবা এবং জেঠামশাই-এর মতন অ-শিক্ষক মানুষেরা শিক্ষকতাকে পেশা করার সুযোগ পান। তখনও মুসলমান সমাজ থেকে এইসব ইস্কুলের জন্য শিক্ষক পাওয়া ঐ এলাকায় সম্ভব ছিল না, যে কথা আগেই বলেছি। কখনও শহরের কলেজ থেকে ছুটিতে আসা ছাত্র বা ফাইনাল পরীক্ষা শেষ করে অবসর কাটানো কোনও গ্রামীণ যুবক অথবা কোনওক্রমে টেনেটুনে ম্যাট্রিক উত্তীর্ণ বা অনুত্তীর্ণ গ্রামীণ বেকার কোনও যুবক এইসব ইস্কুলে শিক্ষকতা করে সাময়িকভাবে। তাদের কোনও শিক্ষকতাজনিত যোগ্যতা আদৌ থাকে না। কিন্তু উপায় নেই। দেশে তখন শিক্ষক বলতে প্রায় নেই। প্রসন্নকুমার বিদ্যালয়েও অবস্থা এ সময় এমন কিছু ভাল নয়। এই ইস্কুলের একমাত্র রেক্টর স্যার ছাড়া, অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যে ডিগ্রিধারী ছিলেন শুধুমাত্র হেডমাস্টার মশাই। তিনিই শুধু একমাত্র গ্র্যাজুয়েট। বাকি সব ম্যাট্রিকুলেট। হেডমাস্টার মশাই সে যুগের বি. এ. বি. এড্. ছিলেন। কিন্তু গুরুভক্তি মাথায় রেখেই বলি, তিনিও খুব উত্তম শিক্ষক ছিলেন না। অন্যান্যদের তো কথাই নেই। রেক্টর স্যার, অর্থাৎ অশ্বিনীবাবুই ছিলেন একজন প্রকৃত শিক্ষক এবং আমৃত্যু তিনি তাই থেকে গেছেন। তবে সব মাস্টারমশাইয়েরাই যথেষ্ট আন্তরিক এবং পরিশ্রমী ছিলেন আমাদের শিক্ষাদান বিষয়ে। বাবাও প্রসন্নকুমার বিদ্যালয়ে এরকমই একজন শিক্ষক হলেন। তিনি বাংলা ভাষায় পদ্য লিখতে পারতেন এবং প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে তাঁর পড়াশোনাও ভালই ছিল। কিন্তু তিনিও ভাল শিক্ষক ছিলেন না। অবশ্য ক্রীড়া প্রশিক্ষণে তাঁর দক্ষতা উত্তম ছিল।

প্রসন্নকুমার উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় নামের এই ইস্কুলটি আমাদের অঞ্চলের সব থেকে প্রাচীন বিদ্যালয়। আগেই বলেছি রোহিনী রায়চৌধুরী মশাই খুবই বিদ্যোৎসাহী এবং সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন। কীর্তিপাশা গ্রামটি তাঁদের নিজমৌজা বিধায় তার উন্নতিকল্পে তিনি প্রভূত প্রচেষ্টা করেছিলেন। এই ইস্কুলের উন্নতি ব্যতিরেকেও তিনি পার্শ্ববর্তী গ্রামের টোল, মক্তব, মাদ্রাসা ইত্যাদির উন্নতিক্রমে ব্যাপক কাজকর্ম এবং সাহায্যাদি করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মহাশয় অতি স্বল্পায়ু জীবন যাপন করেছেন। মাত্র সাঁইত্রিশ আটত্রিশ বছর বয়ঃক্রমকালে, মৃত্যু তাঁকে ছিনিয়ে নেয়। তাঁর রচিত অনেক গ্রন্থই আমরা বাল্যে পাঠ করেছি। 'বাকলা' তাঁর ইতিহাস বিষয়ে একখানি আকর গ্রন্থ। এছাড়া তিনি বেশ কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে 'আমার পূর্বপুরুষ', 'চণ্ডবিক্রম', 'নরেন্দ্র নন্দিনী', 'হেমলতা', 'চিতোর উদ্ধার', 'কনকলতা' এবং সম্ভবত 'মায়াবিনী' নামক গ্রন্থগুলির কথা মনে করতে পারছি।

এই প্রসন্নকুমার বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার লোভ আমার নিজেরও কিছু কম ছিল না। আমার বাবাও এই ইস্কুলেরই ছাত্র ছিলেন একদা। এখন শিক্ষক। কিন্তু ক্লাস সেভেন এবং এইটে, যাঁরা বিনা খরচায় আমাকে পড়াশোনা করার সুযোগ দিলেন, তাঁরা আমাকে

সহজে ছাড়তে চাইলেন না। চাওয়ার কারণও ছিল না। এই সময়টায় ইস্কুলে ছাত্র জোটানো একটা সমস্যার ব্যাপার ছিল। বিশেষত, মোটামুটি ভাল ছাত্র জোটানো তো আরও কষ্টকর। এই ইস্কুলটি এখানকার মুসলমান সাধারণ সমাজ সামান্য দু-একজন সম্পন্ন অবস্থার গৃহস্থের সাহায্যে বহুযত্নে ও তিতিক্ষায় স্থাপনা করেছিলেন। স্বাধীনতা লাভের বেশ কিছুকাল পরে তাঁদের এই প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছিল। আমার স্মৃতিতে এখনও অম্লান হয়ে আছে যে ঐ তারুলি গ্রাম এবং তার চৌহদ্দিতে যত এরকম অজগ্রাম আছে সেসব স্থানের সাধারণ মুসলমান চাষিরা কি অসামান্য আকাঙ্ক্ষায় এবং প্রচেষ্টায় এই ইস্কুলটি বাঁচিয়ে রাখতে প্রয়াসী ছিলেন। আমাদের এলাকার প্রাক্তন ইস্কুলটি যদিও তখন তার ইমারত এবং সরঞ্জামসহ ভূতুড়ে বাড়ি হয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছে, তথাপি প্রশাসন তাকে উজ্জীবিত করার কোনও প্রচেষ্টায় যায়নি বলে এই কৃচ্ছ্রসাধনে নতুন ইস্কুলটির স্থাপনা। সরকারের তরফ থেকে উদ্যোগ নিয়ে যদি ওখানেই কার্যক্রমের বিন্যাস হত এবং আশপাশের পরিত্যক্ত হিন্দু বাড়িগুলোকে অধিগ্রহণ করে দূরবর্তী ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস নির্মাণ করা হত, তবে খুবই সামান্য অর্থ প্রয়োগে এক অসামান্য ব্যবস্থার উপায় হত। কিন্তু তা হল না। ইস্কুল স্থাপনাকারীরা চাইলেন যে তাঁদের স্থাপিত ইস্কুল তাদের গ্রামেই হোক, হিন্দুদের গ্রামে নয়, এমনকি তাদের স্থাপিত ইস্কুল বাড়িতেও নয়। ফলত হিন্দুদের স্থাপিত ইস্কুলের দরজা কপাট, বেঞ্চি, আলমারি এবং বইপত্তর কিছু বিত্তবান ধান্দাবাজ মুসলমানের লুটের সামগ্রী হয়ে, তাদের আর্থিক লাভের সহায়তা করল এবং নতুন ইস্কুল স্থাপনার জন্য অনাবশ্যক অঢেল সামাজিক অর্থ-শ্রাদ্ধের প্রয়োজন হল।

সে যাই হোক। এই ইস্কুলটি আমাকে ছাড়তে রাজি হল না। আমি তখন তাঁদের ইস্কুলের সেরা ছাত্র। অতএব ইস্কুলের স্বার্থেই তাঁরা আমার অন্যত্র যাবার বিষয়ে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ হলেন। আগেই বলেছি এই সময় ছাত্র সংগ্রহ করা খুব সহজসাধ্য ছিল না। পিছারার খালের পৃথিবীতে ব্যাপক জনতা ছিল সাধারণ মুসলমান চাষিরা। ইস্কুল চলত মধ্যবিত্ত হিন্দু এবং সামান্য সংখ্যক উচ্চ এবং মাঝারি মুসলমান কৃষকদের ঘর থেকে আসা ছাত্রদের নিয়ে। মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবার উৎসৃষ্ট হওয়ায় ছাত্র প্রায় নেই। সাধারণ চাষিরা তাঁদের সন্তানদের লেখাপড়ার বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহী হলেও, মাঠের কাজের সাথে তার সমন্বয় করে উঠতে পারতেন না। আবার ইস্কুলে যদি নির্ধারিত সংখ্যক ছাত্র না থাকে, তবে শিক্ষা বিভাগ ইস্কুলের অ্যাফিলিয়েশান নাকচ করে দিতেন। আমাদের এই ইস্কুলটির অ্যাফিলিয়েশান জোগাড় করার কথা মনে আছে। ইস্কুলে উপযুক্ত সংখ্যক ছাত্র ছিল না। ইতিমধ্যে স্বয়ং ডি আই সাহেবের পরিদর্শনের দিন ধার্য হল। শিক্ষক সাহেবরা এবং স্বয়ং সেক্রেটারি খুবই চিন্তান্বিত হয়ে পড়লেন। তবে ভরসা একটাই ছিল যে ডি আই সাহেব ঐ গ্রামেরই ছেলে এবং সেক্রেটারি তাঁর আপন চাচা, উপরন্তু তাঁর পিতাও ইস্কুল কমিটির একজন মেম্বার। এ কারণে ডি আই তাঁর আগমনের পূর্বাহ্ণেই খবর পাঠালেন, যে করে

হোক ক্লাস ভর্তি রাখতে হবে। ছাত্র কম থাকে তো মাঠ থেকে ধরে এনে সাজিয়েগুছিয়ে বসিয়ে দাও। তো মুরুব্বিরা এই দায়িত্ব আমাদের উপর ন্যস্ত করলেন। আমরাও ক্ষেতখামারে কর্মরত সালাম, হালিম, গেদু, গোলাম, হরমুজইয়া ইত্যাদিদের তোয়াজ করে এনে যথাসময়ে হাজির করলাম। এ কারণে তাদের একবেলার ক্ষেতের কাজ পণ্ড হল। তবে লাভ হল এই যে ইস্কুলটি অ্যাফিলিয়েশান পেল। কিন্তু ঐ দিনের সেই বিপুল ছাত্রমণ্ডলীর খোঁজ পরে আমরা আর রাখিনি। এভাবে যে ইস্কুলটি তৈরি হল, তার সেরা ছাত্রটি অন্য ইস্কুলে চলে যাবে, তাঁদের এতদিনের আকাঙ্ক্ষার এবং প্রচেষ্টার সুফল অন্যের জন্য সুনাম আনবে। এ এক অবশ্যই নিমকহারামি। এখন ক্লাশ নাইন এবং দেখতে দেখতেই দুটো বছর কেটে যাবে। যদি আমি একটা ভাল প্রথম বিভাগ পাই, তবে ইস্কুলের ছাত্রসংখ্যা হু হু করে বেড়ে যাবে। মাস্টার সাহেবদের সুখ্যাত হবে। আমরা এই ইস্কুলের প্রথম ফসল। তাঁরা আমার এবং দুলালের জন্য বিশেষভাবে আশান্বিত।

কিন্তু তা হল না। আমাকে যেতেই হল। প্রসন্নকুমার বিদ্যালয়ের উপর আমার লোভ থাকলেও এভাবে চলে যাওয়ার ব্যাপারটা আমারও ঠিক ভাল লাগেনি। কিন্তু জেঠামশায়ের চক্রান্ত জয়ী হল। কারণ একে তো 'মোছলমানেগো ইস্কুলে' আমার শিক্ষালাভ তাঁর পছন্দ ছিল না, তার উপর তাঁকে বাধ্য হয়ে ঐ ইস্কুলের হেডমাস্টারি ছাড়তে হয়েছিল, যেহেতু তাঁর দুটি ইস্কুলে একসাথে হেডমাস্টারি করা ইস্কুল কমিটি সঙ্গত কারণেই মেনে নিতে পারেনি।

তবে এই ইস্কুলে যে কিছু কিছু কারণে আমার দমবন্ধ হয়ে আসছিল, তাও কিছু মিথ্যে নয়। আমি যে একটা বনেদি বাড়ির ছেলে হয়েও বিনা বেতনে, তাঁদের অনুগ্রহে পড়াশোনা করতে পারছি, একথাটা ইস্কুলের কর্তারা এবং সহপাঠীরা কখনই আমাকে ভুলতে দিত না। আবার আমি যে একজন কুফ্‌রী, পুতুল উপাসক মালাউন—এই অভিধাও আমার অবশ্য প্রাপ্য ছিল। মাস্টার সাহেবরা অহরহ 'বুতপরস্তি' এবং ইসলামি আচরণের তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা আমাকে অপ্রস্তুত করতেন। তখন আমার বয়স যাই হোক, সামাজিক ভিন্নতা বিষয়ে কাণ্ডজ্ঞান খুব একটা কম ছিল না। মাস্টার সাহেবদের এই তুলনামূলক আলোচনা আমাকে খুবই পীড়া দিত। আমি বলতে পারতাম যে 'বুতপরস্তি' ব্যাপারটা সাধারণ মুসলমান সমাজে আদৌ অনুপস্থিত নয়। খাদ্যাখাদ্যের হালাল হারাম বিষয়ক বিচারও সাধারণ্যে খুব একটা অবশ্য পালনীয় পর্যায়ে নেই। কিন্তু এসব বলার মতো সাহস আমার ছিল না। নিজের কারণে না হলেও বে-শরিয়াত সেইসব মানুষদের, যাদের অন্য অনেক গুণের জন্য আমি আত্মীয় মনে করতাম, তাদের বিপদের আশঙ্কা ছিল। আমাদের কিষান নাগরালির কথা তো বলতেই পারতাম। কিন্তু তার 'হারাম গোস্ত' খাওয়ার বিষয়ে তথ্য প্রমাণ নিয়ে যদি প্রকাশ্যে আমি হাজির হতাম তবে বেচারা নাগর হয়ত খুন হয়ে যেত। এরকম একটা বাতাবরণ তখন ছিল।

এইসব কারণে বাবার ইস্কুলে যাবার একটা আকাঙ্ক্ষা আমার মধ্যে ছিল। সেই ইস্কুলটি হিন্দুপ্রধান। সেখানে আমাকে এ ধরনের বিড়ম্বনায় পড়তে হবে না। নিজেকে অচ্ছুৎ মনে হবে না, বা সবার অনুগ্রহে আমার বিদ্যাভ্যাস করতে হচ্ছে, এরকম এক হীনম্মন্যতা আমার থাকবে না, এইসব চিন্তা আমার মাথায় ছিল। কিন্তু তথাপি বলি, এইসব সমস্যার মোকাবিলা করতে হলেও আমাকে যে ঐ ইস্কুলের মাস্টার সাহেবরা এবং ছাত্রবন্ধুরা ভালবাসতেন না, তা নয়। তাঁরা সবাই আমাকে খুবই যত্ন করতেন। এমনকি যে দুলালের সাথে আমার প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা, যে, আমি ঐ ইস্কুল ছেড়ে চলে গেলে একেশ্বর হয়ে বিরাজ করবে এমনটিই স্থির ছিল, সে পর্যন্ত আমার চলে আসার ব্যাপারে চোখের জলে জানিয়েছিল, 'তুই যাইস না।' কিন্তু আমি চলে এসেছিলাম। আমাকে আসতেই হয়েছিল।

এই ইস্কুল আমাকে অনেক দিয়েছিল। যে লাঞ্ছনাটুকু তখন রাষ্ট্রবিধানে সংখ্যালঘুদের পাওনা ছিল তা হয়ত আমাকে ভোগ করতে হয়েছে। কিন্তু আজ এই প্রৌঢ় কালেও সেজন্যে কারোর উপর কোনও নালিশ বা বিদ্বেষ নেই। তাঁদের ভালবাসার কথাটুকুই শুধু মনে আছে। অন্য কিছু নয়। তাছাড়া, আজকের বিচারে বুঝি, তখন আমি এবং আমার পারিপার্শ্বিক হিন্দু জনেরাও খুবই সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ছিলাম। আর একথাও সবাই জানেন যে সংখ্যালঘুদের সাধারণ ধর্মই হচ্ছে উৎকট সাম্প্রদায়িক মানসিকতায় ভোগা। কিন্তু আমার হিন্দুজনোচিত জাতি বিদ্বেষ এবং ছুঁৎমার্গের অন্ত্যেষ্টিও এখানেই শুরু হয়েছিল।

— তেইশ —

পুরোনো কথা বলার মুশকিল এই যে সব কথা ক্রমবিন্যাসে আসেনা। আগের কথা পরে, পরের কথা আগে হয়ে যায়। পিছারার খালের আশপাশের কথা বলতে গিয়ে তাই অনেক কথাই বেশ মেশামেশি হয়ে যাচ্ছে। আবার ঘুরে ফিরে আমাদের দুই সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্কের যেসব কথা অনিবার্য ভাবেই আসছে, তাও আগে পিছে হয়ে যাচ্ছে।

তারুলি ইস্কুল ছাড়ার কয়েকদিন পর বাবা এক সকালে আমাকে ডেকে বললেন— আইজ থিকা তুই কীর্তিপাশার ইস্কুলে যাবি। তারুলি ইস্কুল ছাড়ার পর মনে একটা অস্থিরতা বোধ করছিলাম। যদিও বাবা প্রসন্নকুমার বিদ্যালয়ে মাস্টারি শুরু করার পর অনেকটাই দায়িত্বশীল হয়েছিলেন, তবু যতক্ষণ ভর্তি না হচ্ছি ততক্ষণ আশ্বস্ত হতে পারছিলাম না। যদি আবার সিদ্ধান্ত নিতে দেরি বা ভুল করেন তাহলে তো অবস্থা চৌপাট। আবার, তারুলি ইস্কুল ছাড়ার ব্যাপারে আমার মনে একটা মানসিক গ্লানিও কাজ করছিল। নিজেকে বিশ্বাসঘাতক, নিমকহারাম বলে বোধ হচ্ছিল। কিন্তু আমার কোনও উপায় ছিল না। এবার নবম শ্রেণী। যেখান থেকে এসেছি সেখানে আমি প্রথম

স্থানাধিকারী ছাত্র। কিন্তু সেই ইস্কুলের বিশেষ কোনও মান্যতা নেই। যেখানে যাচ্ছি সেই ইস্কুলে অনেক ভাল ভাল ছাত্রছাত্রী। তাদের সাথে আমার পাল্লা দিতে হবে। মনে বেশ ভয়।

ইস্কুলে যখন পৌঁছলাম তখন আমি প্রায় একটা দর্শনীয় বস্তু। সেখানে দু-একজনকে চিনি। বেশির ভাগই অচেনা। এই ইস্কুলের রেক্টর স্যারের খ্যাতি অনেক শুনেছি। চিরকুমার, খেয়ালি এবং অসম্ভব পণ্ডিত সেই বৃদ্ধকে নাকি হেডমাস্টার মশাই পর্যন্ত ভয় পান। আগের ইস্কুলের মাস্টার সাহেবরা আমাকে দারুণ ভালবাসতেন। এখানে অবস্থাটা কি দাঁড়াবে সেটা একটা চিন্তার ব্যাপার। ঐ সব দিনে আমরা ছাত্ররা মাস্টার মশাইদের স্নেহ, ভালবাসা পাওয়ার জন্য খুবই আকাঙ্ক্ষী ছিলাম। অবশ্য পরীক্ষার নম্বর সংক্রান্ত ব্যাপারের সাথে এর কোনও সম্পর্ক ছিল না। মাস্টারমশাইদের চালচলন, গাম্ভীর্য, জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে তাঁদের নিষ্ঠা ইত্যাদি খুবই আকর্ষণীয় বোধ হত। তাঁদের সাহচর্য পেলে মনে খুব আনন্দ হত। তাঁরা কোনও কিছু আদেশ করলে যেন বর্তে যেতাম। আমার এরকম মানসিকতার কারণ বোধহয় বাল্যাবধি ইস্কুলে পড়ার সুযোগ না পাওয়া এবং এই ধরনের জীবনের জন্য নিয়ত আকাঙক্ষার মধ্যেই নিহিত। বস্তুত এই সময়টাই ইস্কুল এবং মাস্টারমশাইদের প্রতি আমি বড়ই কৃতজ্ঞ ছিলাম।

আগেই বলেছি, এর আগে আমি এই ইস্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে একবছর পড়েছিলাম। ঐ বছরেই দেশে বোধহয় প্রথম সাধারণ নির্বাচন হয়। সেবার নির্বাচনে পূর্বপাকিস্তানে যুক্তফ্রন্ট সরকার তৈরি হল। প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার আলি মীর্জা সাহেব তখন দেশের সর্বময় কর্তা। রাজধানী করাচি। মুসলিম লিগ তখন পূর্ব পাকিস্তানে আর তেমন জনপ্রিয় নয়। সেটা ১৯৫৪ সাল। আওয়ামি লিগ পার্টি ক্রমশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই নানা কারণে সংসদে গোলযোগ শুরু হয়। যতদূর মনে পড়ে, এসময় সংসদীয় বিতর্ক এক মাৎস্যন্যায়ী রূপ গ্রহণ করলে একদা মারদাঙ্গার ফলে স্বয়ং স্পিকারই সংসদের মধ্যে খুন হয়। সে এক ভীষণ অবস্থা।

আমাদের তালুকদারির রেশ তখনও আছে। কর্তারা এদেশে থাকবেন কি ওপারে পাড়ি দেবেন, এরকম এক দোদুল্যমানতায় বিমূঢ়। একারণে ফাইভ থেকে পরীক্ষায় পাশ করলেও আমার সিক্সে ওঠা হয়নি। আবার ওপারে পাড়ি দেওয়া না হলেও কর্তারা কিছু সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে না পাবায় আমার পড়াশোনাটাই বন্ধ হয়ে যায়। আমি আবার গোচরানো, ক্ষেতখামারি করণ ইত্যাদিতে জড়িয়ে পড়ি। একারণে এক তীব্র মানসিক ক্লেশ আমাকে পেয়ে বসে। বাড়ির বইপত্রগুলোই তখন এই বিষাদ থেকে অনেকটা বাঁচায়। তবে এই সময়টায় আমি ব্যাপকভাবে পুরাণ, মহাভারত, ভাগবত, ভগবদ্গীতা ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠে যত্নবান হয়েছিলাম বলে পরবর্তীকালে অনেক সুবিধে হয়েছিল। পারিবারিক প্রভাবের জন্য এসময় আমি খুবই ধার্মিক জীবনের প্রতি আকৃষ্ট ছিলাম। অদৃষ্টবাদিতা আমাকে তখন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছিল। আমার দীন দশার জন্য একারণে, আমি অদৃষ্ট ছাড়া কাউকেই দায়ী করতে পারিনি।

এইসব কারণে, যখন আমি আবার প্রসন্নকুমার বিদ্যালয়ে গিয়ে পড়লাম তখন আমার আনন্দের আর সীমা ছিল না। কিন্তু প্রথম দিনেই আমার সেই আনন্দ বেশ খানিকটা চোট খেয়ে গেল। মনে আছে ক্লাশে যখন গিয়ে বসেছি, সহপাঠীরা সকলে আমাকে খুব সহজে নেয়নি। কিছু ছাত্র আমার আচার আচরণে মুসলমানি ছাপ আবিষ্কার করল। কেউ-বা আমার আগের ইস্কুল বিষয়ে কিছু উৎকট মন্তব্য করে আমাকে উত্তেজিত করতে প্রয়াস পেল। অবশ্য এসব খুব বেশিদিন চলল না। একসময় সবার সাথেই বেশ হৃদ্যতা তৈরি হয়ে গেল। আমি এসবে যতটা ক্ষুব্ধ না হয়েছি, একদিন হেডস্যারের একটি মন্তব্যে তার থেকে অনেক বেশি দুঃখ হয়েছিল। সেই বয়সের কিছু স্বাভাবিক দুষ্টুমির জন্য তিনি বলেছিলেন, এটা তারুলি স্কুল নয়। এখানের আদব কায়দা আলাদা। এখানে সভ্যভদ্র হয়ে থাকতে হবে। তিনি যদি আমার দুষ্টুমির জন্য যথোচিত তিরস্কার করতেন, আমার দুঃখ হতনা। আমার মনে হয়েছিল ইস্কুলের প্রসঙ্গটি এনে তিনি ব্যাপারটাকে অকারণে সাম্প্রদায়িকভাবে কদর্য করে তুলেছিলেন। সেক্ষেত্রে যে ছেলেরা আমার মধ্যে মুসলমানি ছাপ আবিষ্কার করেছিল তাদের মানসিকতার সাথে হেডস্যারের মানসিকতার কোনও তফাৎ ছিলনা। আমি এসময় সাম্প্রদায়িক মানসিকতায় অবস্থান করলেও তারুলি ইস্কুলে পড়াশুনো করাকালীন দাদীআম্মার সংস্পর্শে এসে অনেক সহনশীল হয়েছিলাম, যদিও পশ্চিমবঙ্গে আসার আগে পর্যন্ত অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের অধিকারী হতে পারিনি।

সে যাহোক, এই ইস্কুলে এসে আমার সবচেয়ে বড় লাভ যেটা হল, তা হচ্ছে আমি রেক্টর স্যারের নজরে পড়ার সৌভাগ্য অর্জন করলাম। তাঁব একটা খ্যাপাটে অনুবাদের ক্লাশ ছিল। সেখানে প্রথম দিনই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলাম। মনে আছে প্রথম দিনের খ্যাপাটে ক্লাশে তিনি বলতে বলতে ঢুকেছিলেন,—পৌষ মাসের দিন। একা আমি, কাজের অন্ত নাই। একাজ ওকাজ সেকাজে ব্যস্ত থাকতে হয়।— ইংরাজি কর।—আমি সবার আগে খাতা নিয়ে তাঁর টেবিলে উপস্থিত হলে, তিনি প্রথমে খাতার লেখা এবং পরে আমাকে দেখলেন। পরিচয় জানতে চাইলেন। বললেন,— যা ল্যাখলা, ব্যাকরণগত ভাবে শুদ্ধ। কিন্তু The sentences should have beem more smart. It is Engish and English is a very smart language. এভাষা য্যারগো মাতৃভাষা হ্যারা য্যামন সব্বদা ফিটফাট থাকেন, ভাষাডাও হেরকমই ফিটফাট রাখতে চায়েন তেনারা।

ক্রমশ এই বৃদ্ধ আমাকে নিবিড় স্নেহে আপন করে নিতে থাকেন। তিনি আমাদের ইংরেজি, সংস্কৃত এবং ইতিহাস পড়াতেন। এই তিনটি বিষয়েই তাঁর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য এবং তিনটিতেই তিনি সেই যুগে মাস্টার ডিগ্রী নিয়েছিলেন। তাঁর নিজের বলতে সংসারে কেউ ছিলনা। দার পরিগ্রহ করেন নি। ভাইয়েরা বহুকাল দেশছাড়া। ছাত্রেরাই তাঁর সব। একদিন স্যার বাবাকে বললেন,—আপনার তো অনেকগুলা পোলাপান, এইডিরে আমি নিমু। দিবেন?—তো বাবা বললেন, হেয়ার আর কথা কি? নেন। ও আপনের

ধারে মানুষ অইবে হেয়াতো কপালের ব্যাপার।—সেই থেকে আমি স্যারের বাড়ির সারাক্ষণের বাসিন্দা হই। সে এক গুরুগৃহবাসের প্রাচীনকালীন বন্দোবস্ত প্রায়। তাঁর এবং আমার দুজনের রান্নাবান্না, ঘরবাড়ি পরিচ্ছন্ন রাখা, জামাকাপড় কাচা, গোরু বাছুরের দেখভাল করা— এইসব আমাকে করতে হত। এইসব করে-কম্মে আমি ইস্কুলে যেতাম। এখানে রাত্রিবেলা অনেক ছাত্র থাকত। স্যার তাদের মিনিমাঙনা পড়াতেন। আমি ক্লাশ নাইন থেকে একেবারে ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষা অবধিই তাঁর কাছে ছিলাম। মাঝখানের কিছু সময় ছাড়া।

স্যারের বাড়িটি ছিল প্রায় তপোবনের মতো গাছপালা ঘেরা নিরালা নিঃঝুম একটি আশ্রমের মতো। আমরা আশ্রম বালকেরা অবশ্য কেউই শান্তশিষ্ট-ব্রহ্মচারী ছিলাম না। প্রত্যেকেই ছিলাম একেকটি অসতের ভাণ্ড। তাঁর গাছের ডাব খেয়ে, আম, জাম, জামরুল ইত্যাদি ঋতু অনুযায়ী ফল পাকড়ার সদ্ব্যবহার করে আমাদের দিব্য দিন কাটত। এছাড়া শীতের সময় খেজুর রসের পায়েস, এদিক ওদিক থেকে চুরি ছ্যাঁচ্‌রামি করে পাঁঠাটা, মুরগিটা, হাঁসটা জোগাড় হলে চড়িভাতি করে আমরা বেশ আহ্লাদে দিন কাটাচ্ছিলাম। স্যার আমাদের সন্ধেবেলা ঘন্টা দুয়েক পড়িয়ে খেয়েদেয়ে 'টোঙ্গের ঘরে' শুতে যেতেন। আমি পূর্বোক্ত নিত্যকর্ম সমাধা করে যথাসময়ে তাঁর কাছে গিয়ে বেশ ভালছেলের মতো গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়তাম। আমাদের কারুকার্য তিনি আদৌ টের পেতেন না। ভোরবেলা সবাই উঠে খানিকক্ষণ পড়ার ভাণ করে যে-যার বাড়ি চলে যেত। আমি আমার কাজকর্ম সমাধা করে স্যারের সাথে ইস্কুলে চলে যেতাম। আমাদের উপর স্যারের অসম্ভব বিশ্বাস ছিল। ফলে আমাদের দৌরাত্ম্য ক্রমশ মাত্রা ছাড়িতে যেতে লাগল। আমরা স্যারের বাড়িতে বসে তেমন কিছু পড়াশোনা করতাম না। কাছাকাছি তুলসী নট্ট বলে একটি ছেলে ছিল। তার বাড়িতে কোনও বয়স্ক গার্জেন ছিল না। সে পড়াশোনার পাট চুকিয়ে নিজের জমিজমার তদারকি করত। ঐ বয়সেই তার বিয়েটাও হয়ে গিয়েছিল, একটা ছেলেও হয়েছিল বেশ দলমলে। আমাদের আহৃত সম্পদ তুলসীর বৌ বেশ তরিবত সহকারে পাক করে দিত। আমরাও সেসব সদ্ব্যবহার করে বৌটিকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করতাম।

স্যারের বাড়িতে আমরা নৈশবিদ্যার্থীরা যেসব কাণ্ডকারখানা করে যাচ্ছিলাম, তাকে আর যাই হোক বিদ্যার্থীসুলভ আচরণ বলা চলে না। ইস্কুলেও তখন আমাদের বেশক্ পাখা গজিয়েছিল। তখন একদিন কী কারণে স্মরণ নেই, ছাত্রবা একটা ধর্মঘট মতো করি। তখনকার দিনে, ওখানে এধরনের ঘটনার কথা কেউ চিন্তাও করত না। যারা বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলাম, তারা ব্যাপারটির গুরুত্ব আদৌ বুঝতেই পারিনি। কয়েকজন বয়স্ক ছাত্র ছিল ঘটনাটির হোতা। স্যারের কি-না-কি ত্রুটি-বিচ্যুতির অছিলায় তারা ঘটনাটি ঘটায়। একটা উত্তেজনাময় পরিস্থিতি। সবাই ক্লাশ ছেড়ে বেরিয়ে এসে হুল্লোড় করেছিলাম, একথা মনে আছে। আমাদের মাথায়ই আসেনি যে স্যারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানানোর কোনও অর্থই নেই। সদাশিব শিশু প্রকৃতির মানুষ। তাঁর বিরুদ্ধে যে কারুর

কোনও ক্ষোভ থাকতে পারে, এরকম কোনও ধারণাও তাঁর মাথায় ছিল না। তার উপর তিনিই একমাত্র শিক্ষক যিনি বিনা বেতনে শুধু ইস্কুলে নয়, তাঁর বাড়িতেও শিক্ষাদান করেন। যে যখন খুশি তাঁর কাছে গিয়ে পড়া বুঝে নিতে পারে। কখনওই না নেই।

যদিও গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যথেষ্ট শস্য তাঁর জমিতে উৎপন্ন হয় এবং প্রয়োজনের তুলনায় তা অনেক বেশি। কিন্তু অন্নচিন্তা না থাকলেই যে লোকে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবে, এ দৃষ্টান্ত আজকে কেন তখনকার দিনেও খুব একটা ছিল না। এহেন মানুষের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ? ফল হল মারাত্মক। স্যার ভীষণ ক্ষুব্ধ এবং অভিমানাহত হলেন। সিদ্ধান্ত নিলেন, আর নয়, স্কুলের সাথে কোনো সংশ্রবই তিনি আর রাখবেন না। আহত ক্ষুব্ধ বৃদ্ধ হন্‌হন্‌ করে যখন বাড়ির রাস্তা ধরলেন আমরা তখন হুল্লোড়ে মত্ত।

পরদিন থেকে তাঁর স্কুলে আসা বন্ধ। রাতেও পড়াতে বসেন না। থাকতেও বলেন না, যেতেও বলেন না। আমি যথারীতি রান্নাবান্না করি। নিজে নিয়েথুয়ে খান। আমাকে ডাকেন না। কারুর সাথেই কোনও বাক্যালাপ নেই। সকালে দুটি পান্তা খেয়ে তাঁর গোরুগুলোকে (যে গুলো কোনোকালে এক ফোঁটা দুধ দিয়েছে বলে আমার স্মৃতিতে নেই) নিয়ে দূরের কোনও মাঠে চরাতে যান। হাতে থাকে একখানা বই। তা নেস্‌ফিল্ডের গ্রামারও হতে পারে, ব্যাকরণ কৌমুদীও হতে পারে, আবার কালিদাস হতেও বাধা নেই। গোরু আর বই। এই দুই বৈপরীত্য নিয়ে তাঁর জগৎ। বই বিযুক্তিতে গোরু আর গোরু বিযুক্তিতে বই। গোরুরা উন্মুক্ত মাঠে তাদের মতো চরে খায়, তিনি বই নিয়ে একটা গাছের ছায়ার বসে তাঁর মতো সময় কাটান। যদিও বই বিযুক্তিতে গোরু আর গোরু বিযুক্তিতে বই আমাদের অঞ্চলে ভিন্ন অর্থে পরম্পরা, কিন্তু স্যার বোধহয় ভেবেছিলেন যে আমাদের মতো দুপেয়ে গোরু চরানোর চাইতে চার-পেয়েদের চরানো ভাল। কারণ দুধ না পাওয়া গেলেও সেই গো-সেবার পুণ্যিটা ফ্যালনা নয়। দুপেয়েদের চরিয়ে তো না রাম না গঙ্গা। একসময় আমাকেও বই বগলে করে গোচারণে যেতে হত বলে, বিষয়টিতে আমার দুর্বলতা প্রখর। তাই অধ্যাপকের ঈদৃশ আচরণে অন্যেরা ক্ষুব্ধ হলেও আমি হইনি। আমি জানি গোরু চরানো এবং বই পড়া দুটোই, অথবা আলাদা আলাদা ভাবে যদি কারুর নেশা হয় তবে তার নাওয়া খাওয়ার সময়জ্ঞান থাকে না। স্যারেরও ছিল না। তিনি গোরু নিয়ে বেরিয়ে গেলে, রান্নাবান্না সেরে, তাঁর খাবার সাজিয়ে রেখে, খেয়ে নিয়ে আমি স্কুলে চলে যেতাম। বেশির ভাগ দিনই ফিরে এসে দেখতাম, খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যেমনটি ছিল তেমনটিই পড়ে আছে। তিনি তখনও ফেরেননি। দুএকদিন দেখার পর আমি ইস্কুল কামাই করতে শুরু করলাম। বারোটা, সাড়ে বারোটা বেজে গেলে যদি মানুষটিকে ধরে এনে দুমুঠো না খাওয়াতাম, তবে হয়ত তিনি তাঁর ঐ অক্ষীরা গবীদের সম্বোধন করে বাশিষ্ঠ শ্লোক উচ্চারণ করে বলতেন, হে কামধেনু ভগবতি, এই সব মনুষ্য এবং জীবদিগকে অন্নপ্রদান কর। ইহারা বড়ই বুভুক্ষু।

ব্যাপারটা যে এতদূর গড়াবে তা আমরা বা মাস্টারমশাইরা কেউই আঁচ করতে পারিনি। স্যার আমাদের শিক্ষালয়ের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। নিঃস্বার্থে শুধুমাত্র একজন শিক্ষাব্রতী হিসেবে তিনি প্রায় তাঁর গটাজীবন এই শিক্ষালয়ের উন্নতি এবং ছাত্রদের হিতার্থে অতন্দ্র ছিলেন। চিরকুমার অশ্বিনীকুমারের জীবনে অন্য কোনও ধ্যানজ্ঞান ছিল না। এই শিক্ষালয়ের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা রোহিনীকুমার রায়চৌধুরী ছিলেন তাঁর আদর্শ পুরুষ। কীর্তিপাশার জমিদার পরিবারে রোহিনীকুমার ছিলেন শ্রেষ্ঠতম মানুষ। বাল্যাবধি স্যার ঐ মহান মানুষটির প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট ছিলেন। তাঁর যৌবনকালে অশ্বিনীকুমার আট দশ বছর বয়সের বালক মাত্র। তিনি রোহিনীকুমারের নানাবিধ লোকহিতকর কর্মের সাক্ষী। এ কারণেই এই বিদ্যালয়ের উপরে এক প্রগাঢ় মমতা সারাজীবন তাঁকে এর সেবায় একনিষ্ঠ রেখেছে।

রোহিনীকুমার তাঁর মানস জগতে যে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন, তা তাঁর মুখেই শুনেছি। বলতেন, অতবড় একটা পরিবারের সন্তান হয়ে তিনি কী করলেন আর আমরা কী করি। তিনি যদি ইচ্ছে করতেন, তাঁর পরিবারের অন্যদের মতো যেমন খুশি ভোগ বিলাসে মত্ত থাকতে পারতেন। সে যুগে কেউ একারণে তাঁকে কিছু বলতেও সাহস পেত না। বরং সেটাই তাঁর ক্ষেত্রে স্বাভাবিক হত। কিন্তু তিনি তো তা করেন নি। তিনি তাঁর যুগানুযায়ী আদর্শে শিক্ষাবিস্তার, সাহিত্যচর্চা, ইতিহাসচর্চা তথা দরিদ্র অধ্যাপকদের বৃত্তি প্রদান এবং অন্যান্য লোক ও সমাজ হিতকর কর্মে তাঁর স্বল্পায়ু জীবন ব্যয় করে গেছেন।

একথা মিথ্যা নয়। রোহিনীকুমারের পরিবারে বিলাসব্যসনে জীবন পার করা কিছু গল্প কথা নয়। তার নমুনা আমরাও বাল্যে কিছুটা দেখেছি। নবাবি আমলের ভূস্বামী তাঁরা। অর্থের অভাব কাকে বলে তা কোনওদিনই জানেন নি। সেই বংশে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র থেকে শুরু করে বিষপ্রয়োগে হত্যা ইত্যাদি অনেক কিছুই ঘটেছে। সেই পরিবারের সন্তান যদি প্রথাগত আচরণে না গিয়ে সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান তথা লোক-হিতৈষণার হাজারো কর্মে জীবন পাত করেন তবে সে এক অনুকরণীর জীবন তো বটেই। সেই পুণ্যশ্লোক মানুষটির অসমাপ্ত কায এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য অশ্বিনীকুমার তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

এই হেন মানুষটিকে আমরা আঘাত করেছিলাম। তখন বুঝিনি, পরে যখন বুঝেছি, অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছি। সে অনেক কথা। এখন কী ভাবে স্যারকে আবার ইস্কুল আনা হল সেই কাহিনী বলব।

মাস্টারমশাইদের মধ্যে একমাত্র অশ্বিনীবাবু ছাড়া কেউই খুব বড় মাপের শিক্ষক ছিলেন না। তিনিই ছিলেন একজন অসীম জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ। তাঁর অধ্যয়ন, সর্বোপরি তাঁর মেধার তুল্য মেধা অন্য কোনো মাস্টারমশাইদের মধ্যে যে ছিল না একথা অন্যদের প্রতি সশ্রদ্ধ থেকেও বলতে আমার কোনও দ্বিধা নেই। তাই তিনি যখন ইস্কুলে আসা বন্ধ করলেন, আমরা যে কজন তাঁর ন্যাওটা ছেলেমেয়ে, প্রমাদ গুনলাম। ধর্মঘটের গোটা ব্যাপারটা আমাদের খুব জোলো বলে বোধ হতে লাগল।

ইস্কুলে অন্য মাস্টারমশাইরাও আমাদের ঐদিনকার আচরণে বিরক্ত হয়েছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ স্যারের কাছে গিয়েওছিলেন, অনুরোধ করে যদি ফিরিয়ে আনা যায়। কিন্তু তাঁর এককথা, আর না। আমরা কম বয়স্করা তো বুঝিইনি, স্যার নিজেও বুঝতে পারেননি এরকম একটা ঘটনা ঘটার কারণ কী? তাঁর খুব সম্ভব মনে হয়েছিল যে শুধু ছাত্ররাই নয়, তাঁকে এভাবে অপদস্থ করার পেছনে আরও কেউ কেউ আছে যারা ব্যাপারটা উস্কে দিয়েছে। গ্রামগাঁয়ের ইস্কুল। কুচক্রীপনার আখড়া। স্যারের জনপ্রিয়তা কারুর ঈর্ষার কারণ হয়ে থাকবে। ছাত্রদের মধ্যে যে দুজন ঘটনাটির হোতা, মুসা এবং হাকিম, তারা আর যাই হোক ছাত্র অথবা মানুষ হিসেবে আদৌ আদর্শ-স্থানীয় তো নয়ই বরং নানান অসৎ কাজের ভাণ্ড। আমরা ছোটরা নিছক সাময়িক হুল্লোড়ের লোভে দলে ভিড়েছিলাম ফলাফলের কথা চিন্তা না করেই। মুসা এবং হাকিমকে সম্ভবত কেউ উস্কে দিয়ে থাকবে এবং সে স্কুলেরই কেউ। পরে বুঝেছিলাম ঘটনাটা সেরকমই ষড়যন্ত্রমূলক।

যাহোক, এ অবস্থায় একদিন মৌলবি স্যার আমাদের বললেন যে আমরা যেন সবাই অশ্বিনীবাবুর পা ধরে ক্ষমা চেয়ে ইস্কুলে নিয়ে আসি। মৌলবি স্যার মানুষটি খুবই সজ্জন ছিলেন। স্যারকে খুব শ্রদ্ধাও করতেন। তিনিও স্যারের প্রতি এরকম আচরণে মর্মাহত হয়েছিলেন। আমরা তাঁর কথামতো হেডস্যারের কাছে গিয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত জানালে, তিনি বললেন, পালের গোদা হাকিম আর মুসাকেও নিয়ে যেও। স্যার কিন্তু জানেন এ কাজ কে করেছে। তারাও যেন স্যারের পায়ে পড়ে ক্ষমা চায়।

কিন্তু মুসা আর হাকিম জানালো যে তারা সাথে যেতে পারে কিন্তু পায়-টায় ধরতে পারবে না। ওসব ইসলামে বারণ। তারা বে-ইসলামি কাজ করতে পারবে না। যাহোক, আমরা দলবেঁধে স্যারের কাছে গিয়ে তাঁর পায়ের উপরে গড়াগড়ি দিতে লাগলাম। হাকিম আর মুসা ছাড়াও অন্য অনেক মুসলমান ছাত্র আমাদের সাথে ছিল। তারাও আমাদের পন্থাই অনুসরণ করছিল। কিন্তু স্যারের ঐ এককথা—আর না। আমি আর পড়াব না। আমরা যতই তাঁর পায়ে পড়ি তিনি ততই তাড়ান। হাকিম আর মুসা কোন কথা বলছে না। সে এক বিতিকিচ্ছি অবস্থা। এমন সময় দেখি আমাদের 'হুজুর' অর্থাৎ মৌলবি স্যার আসছেন। তাঁকে আসতে দেখে হাকিম আর মুসা একটু ঘাবড়ে যায়। মৌলবি স্যার মানুষটি বড় ধর্মপ্রাণ। তিনি এলে আমরা তাঁকে আদাব আরজ এবং প্রণাম করে হাকিম আর মুসাকে প্রায় দায়রায় সোপর্দ করি। কিন্তু তারা মৌলবি স্যারকে দেখে প্রথমে ঘাবড়ে গেলেও, তাদের গোঁ বহাল রাখে। হুজুরকে তারা প্রশ্ন করে যে মুসলমান একমাত্র আল্লাহ-কে ছাড়া কাউকে 'সেজদা' করতে পারে কি না। হুজুর বললেন, তা পারে না। কিন্তু তোমরা মুসলমান শাস্ত্রের কতটুকু মানো বা জানো, সেটা বল তো শুনি। তোমরা কি জানো ওস্তাদ অর্থাৎ গুরুর আর্জি আল্লাহ্‌র দরবারে তৎনগদ কবুল হয়? তিনি ওস্তাদের ইজ্জতের কথাটাই আগে বিচার করেন। সেজন্য জিজ্ঞাসা করি, তোমরা দুজনে কি এই মান্যমানের সাথে বে-ইসলামি কিছু আচরণ করেছ? সত্য

কথা বলবে। এখন হাকিম আর মুসার বাক্‌যন্ত্র কাজ করে না। তারা যে কর্মকাণ্ডটির নেতৃত্বে ছিল তা বে-ইসলামি কিনা তাদের জানা নেই। মৌলবি স্যার তাদের সংকট বুঝতে পারেন। উত্তরের অপেক্ষা না করে বলেন, তোমরা ঐ কবিতাটি পড়েছ? ঐ যে—

বাদশা আলমগীর
কুমারে তাঁহার পড়াইত এক
মৌলবী দিল্লীর

তো বাদশা আলমগীর নাকি একদিন দেখেন যে তাঁর আওলাদ মৌলবি সাহেবের পায়ে পানি ঢেলে দিচ্ছে আর তিনি নিজেই তাঁর পা প্রক্ষালন করছেন। দৃশ্যটি দেখে তাঁর তাজ্জব মালুম হল। তিনি মৌলবি সাহেবকে ডেকে পাঠালেন। এত্তেলা পেয়ে তো মৌলবি সাহেবের অবস্থা বেসামাল। তিনি ধরেই নিলেন যে তাঁর গর্দান যাবে শাহ্‌জাদা তাঁর পায়ে পানি দিচ্ছে এবং স্বয়ং বাদশাহ্ তা দেখে ফেলেছেন। হায় আল্লাহ্ ! কিন্তু বাদশাহ্ বললেন অন্য কথা। তিনি বললেন, এ কেমন কথা যে ওস্তাদ হয়ে আপনি নিজের পা নিজের হাতে প্রক্ষালন করছেন? শাহজাদা কেন তার হাতে এই কাজটি নিজে করবে না? এ তো আপনি তাকে ভুল শিক্ষা দিচ্ছেন। ওস্তাদকে খুশি রাখা তো ফরজ। তো এই হল আসল কথা। তোমরা এখন নিজেরা বুঝে দেখ তোমাদের ওস্তাদকে কী ভাবে তোমরা খুশি করবে।

মৌলবি স্যারের গল্প এবং সিদ্ধান্ত শুনে হাকিম আর মুসার অবস্থা তখন সসেমিরা। মানিক ফিস্ ফিস্ করে মুসার কানে কানে বলে, পড় না, পড়ে যা না পায়ের উপর। পরে না হয় আল্লাহ্‌র কাছে মাফ চেয়ে নিবি। বিজয় আমাদের মধ্যে বেশ খানিকটা হৃষ্টপুষ্ট বিধায়, হিড়হিড় করে দুজনকে টেনে এনে স্যারের সামনে ফেলে দেয়। বলে, যা করার কর, নইলে দুজনের মাথায় মাথা ঠুকে চালতা বানিয়ে দেবো।

তখন আর উপায় নেই দেখে তারা গুটি গুটি স্যারের দিকে এগোতে থাকলে স্যার বলেন, তোমাদের আমি এমনিই ক্ষমা করলাম পায়ে হাত দেবে না। ইসলামে বারণ আছে। তাছাড়া আমিও ব্যাপারটা পছন্দ করিনা। তবে যদি জিজ্ঞাসা কর, এদের প্রণাম নিই কেন? তো বলব, এটাও একটা পরম্পরাগত শিষ্টাচার। ইংরেজিতে বলে Anthropomorphism অর্থাৎ মানুষের প্রতি দেবত্ব আরোপ। যেমন পীরের দরগায় কবরের উপর লালশালু বিছিয়ে, ধূপ দীপ জ্বেলে খাদেমদের বসে থাকা। সে অনেক কথা। ইসলামে সিজ্‌দা একমাত্র আল্লাহ্‌কেই করা যায় এমত বিধি। কথাটা কিন্তু সেজদা নয়, সিজ্‌দা। তবে গুরুজনেদের হাঁটুতে হাত ছুঁইয়ে আবার নিজের বুকে ঠেকানোর একটা ব্যাপার আছে ইসলামি সমাজে। সেটা কদমবুসি নয়, তস্‌লিম বলা যেতে পারে।

এই হলেন অশ্বিনীবাবু, আমাদের স্যার। শেখাবার কোনো সুযোগ ঘটলে সামান্যতম কার্পণ্য করেন না। ছাত্ররা তা গ্রহণ করতে পারুক কি না পারুক। স্যারের এরূপ ভাবান্তর ঘটলে মৌলবি স্যার যারপর নাই আহ্লাদিত হলেন। আমরাও। হুজুর বলেন, আপনি যা ব্যাখ্যা করলেন তা অতি ন্যায্য এবং হক্‌কথা। আপনি মুরুব্বি মহাজন মানুষ। কিন্তু

'পোলাপান অসাইদ্য বেয়াদপ'। তবু আমার আরজি, আপনি ওদের দোয়া করেন। চলেন। ইস্কুলে যাই। সবাই আপনার জন্য বসে আছেন।

এরপর স্যার আর কোনও আপত্তি করেন না। আমরা প্রায় মিছিল করে স্যারকে নিয়ে ইস্কুলে আসি। ইস্কুলের মাঠে পৌঁছেই তাঁকে ঘিরে আমাদের উদোম নৃত্য। সে এক দেখার মতো অবস্থা। বাজারগামী বা পথচারী লোকেরা এসে মাঠে ভিড় করে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখে। বিজয় স্যারকে কাঁধে নিয়ে টিচার্স রুমে নির্দিষ্ট চেয়ারটিতে বসিয়ে খাঁটি চান্দ্রদ্বীপি ভাষায় বলে, আমরা পোলাপান। পোলাপানেরা অসাইদ্য বেয়াদপ অয়, জানেন না? আর পোলাপানের উপার রাগ করলে ভগবান পাপ দে। তয়, আর যদি কোনোদিন বেয়াদপি করি তো মা কালীর কিরা, আল্লার কিরা, মোগো মাথায় যেন ঠাডা পড়ে। স্যার বলেন, ধুর ছাই, ওকথা বলে না। তোরা শুধু একটু পড়াশোনা করে মানুষ হ, আমি দেখে সুখ পাই।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। কিছুদিন যেতে না যেতেই আমাদের আবার পাখা গজালো। সব শপথের কথা সবাই ভুলে গেলাম। স্যারের বাড়িতে নৈশ আড্ডা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। এক বয়সি অনেকগুলো ছোকরা একসাথে থাকলে যা হয় আর কি। রাত একটু হলেই স্যার যখন 'টোঙ্গের' ঘরে উঠে যেতেন আমাদের মোচ্ছব শুরু হয়ে যেত। অন্য যেসব ছেলে স্যারের বাড়িতে রাতে থাকত, তাদের কারুর অবস্থাই আমার মতো করুণ ছিল না। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বছরের পর বছর ফেল করেও নির্বিকার চিত্তে পরীক্ষা দিয়েই যেত। পরীক্ষাজনিত কোনও দুশ্চিন্তা তাদের পীড়িত কখনওই করত না। তারা অনেকেই বিড়ি সিগারেট ধরেছিল, গঞ্জের শহরে রাতবিরেতে কমলা টকিজে সিনেমা দেখে আসত। এমন কি এক-আধ জন প্রেম-ট্রেম বিষয়েও অভিজ্ঞ হয়েছিল তখনই। আমি তখনও ও সব বিষয়ে খুবই খাজা ছিলাম। তখনও সিনেমা ব্যাপারটা কি ধারণা ছিল না। বিড়ি, তামাক, বাড়িতে যখন চাকর বাকরদের রাজত্ব ছিল, দু-এক টান যে হয়নি এমন নয়। পরেও বাবার প্যাকেট থেকে চুরিচামারি করে এক আধটা সিগারেট টেনেছি কিন্তু গুছিয়ে উচ্ছৃঙ্খল আড্ডা মারার সুযোগ কখনও পাইনি। তাই স্যারের বাড়িতে এই আড্ডায় খুবই মজে গেলাম। অভিজ্ঞ সাথিরা যখন সিনেমার রসালো গল্প, নানান গ্রামীণ কেচ্ছা কেলেঙ্কারির খবর রসিয়ে বলত, মজা পেতাম খুব। এর সাথে চলত ধূমপান—অবশ্যই বিড়ি। মাঝে মাঝে সিনেমার গান, তৎসহ টেবিলের উপর তাল বাজানো অথবা সদ্য শেষ হওয়া কোনও যাত্রা-পালার গান, সংলাপ—অর্থাৎ হুল্লোড়বাজির রাম ক্যাওড়া। পরীক্ষা, পড়াশোনা তখন শিকেয়। শুধু স্যার যতক্ষণ নীচের তলায় ততক্ষণই যা মোহমুদ্গর আওড়ানো।

এরপর আমাদের নৈতিক চরিত্রের মান এত উন্নত হল যে শত্রুরা দেখলে ঈর্ষায় তাদের বুক ফেটে যেত। এরকম উন্নতি ঐ অজপাড়াগাঁ অঞ্চলে বড় একটা নজরে আসে না। স্যারের বাড়িতে যে কটি সুবোধ, সুশীল পোলাপান ছিলাম তারা বেশ চমৎকার একটি আল বেরাদরিতে দীক্ষিত হলাম এবং ধাপে ধাপে আমাদের উন্নতি

ঘটতে লাগল। টেস্ট পরীক্ষার তখনও মাস ছয়েক বাকি। আমরা নির্ভয়। কমলা টকিতে নাইট শো দেখে ভোর রাত্রে ফিরে আসছি। ইভনিং শো দেখতে গেলে বিকেল বিকেল বেরোতে হয়, স্যারের কাছে ধরা পড়ে যাওয়ার বিপদ আছে, তাই নাইটশো। সে এক অসামান্য কষ্টসহিষ্ণুতার ইতিহাস। তিন মাইল হেঁটে যাওয়া এবং শো শেষে মাঝরাত্তিরে তিন মাইল হেঁটে ফিরে আসা। শীতের রাত হলে ব্যাপারটা কীরকম দাঁড়ায় সহজেই অনুমেয়।

তখনও কিলোমিটার বা নয়া পয়সা চালু হয়নি। দূরত্ব বোঝাতে মাইল বা ক্রোশ এবং একটাকা বলতে ষোলো আনা, চার পয়সায় এক আনা। সুপারির ব্যবসা আমাদের ওখানে বরাবরই ব্যাপক। বেচাকেনার হিসেব, এগারোটা সুপারিতে এক 'গা', তার বাইশ গায় এক কুড়ি, একশ গায় একশো, অর্থাৎ একশো সুপারি বলতে ১০০ x ১১= ১১০০ বুঝতে হবে। সেই বাইশা কুড়ির এককুড়ি সুপারি বাজার হাটে বেচলে পাওয়া যেত একটাকা। এরকম দু-তিন কুড়ির ইন্তেজাম হলে 'বাইসকোপ' দেখা, গঞ্জের বিখ্যাত বাঘা রাজভোগ জন প্রতি গোটা চারেক করে সেসব দিনে কিছু ব্যাপার ছিল না। সর্বশেষ একটা করে 'কাইচি' সিগ্রেট। সুপারির অভাব আল্‌বেরাদরদের কখনই ভোগ করতে হয়নি, স্যারের বিস্তীর্ণ বাগান আছে এবং আমরা ছাড়া তাঁর বিশেষ কোন হক্‌দার বা ওয়ারিশ নেই। একটা ঘরে শুকনো করে রাখা এন্তের সুপারি বিক্রির অপেক্ষায়—মানে এন্তের পয়সা।

জীবন তখন মধুময়, রহস্যময়ও। কণ্ঠে সবসময় গান—'তুমি যে আমার, ওগো তুমি যে আমার'। অবশ্য যখন সুপারি অর্থাৎ পয়সা রম্‌রম্ তখন। অঘটনে 'ভালবাসা মোরে ভিখারি করেছে, তোমারে করেছে রাণী'। কিন্তু আল্‌বেরাদরদের সবাই যে একসাথেই এই মহৎ সুখ উপভোগ করতে পারতাম তা নয়। স্যারকে ধোঁকা দেবার ব্যবস্থাটিও বেশ বিচক্ষণতার সাথে তৈরি করা হয়েছিল। আমাদের সাথে একটি ছেলে ছিল, রাজ্জাক। তার মুখ দেখলে কোনও সন্দেহ-পিচেশ মাস্টারমশাইও বলতে পারবেন না যে এই ফেরেস্তার মতো নবীন বালক এমন অসততার ভাণ্ড। সে ছিল এক কাহার সন্তান। পৈত্রিক পেশা পুরুষানুক্রমে লাঠি, সড়কিবাজি। কাহার অর্থে আমাদের ওখানে পাল্‌কি বেহারা নয়, লাঠিয়াল। জমিদার তালুকদারি আমলে চাকরান সূত্রে জমি ভোগকারি এবং মালিকের প্রয়োজনে লাঠিবাজি। সে যাহোক, শান্ত-নম্র সুন্দর স্বভাব এবং পড়াশোনায় আগ্রহ ইত্যাদি দেখে স্যার বলতেন, তুই তো দেখছি দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ। স্যার বড় আহ্লাদে এসব বলতেন। সেই রাজ্জাকই ব্যবস্থা করে দিয়েছিল যাতে আল্‌বেরাদরির সবাই সুখ ভোগের সমান সুযোগ পায়। সে তিনটি দলে আল্‌বেরাদরিকে ভাগ করে, কোন্ দল কবে গঞ্জে যাবে তার একটি নির্ঘন্ট তৈরি করে দেয়। যাতে স্যার উপর থেকে বুঝতে না পারেন নীচে কে আছে, কে নেই। উপরে একবার উঠলে রাতে তিনি আদৌ নীচে নামতেন না। বুড়ো মানুষ। বাঁশের মই বেয়ে, কুপি হাতে ওঠানামা করা কষ্টকর।

স্যারের, রাজ্জাক, মানিক এবং আমার উপর বিলক্ষণ অন্ধ বিশ্বাস ছিল, বিশেষ করে আমার উপর। কারণ ঐ গুরুগৃহে আমি সর্বক্ষণের আরুণী। আমার বিষয়ে স্যারের ধারণা আমি তখনও পর্যন্ত ইন্টেলেক্টুয়ালী 'গাব্‌লা' যাইনি। 'গাব্‌লা' যাওয়া অর্থে মিসক্যারেজ। অন্যসবগুলো 'অসইব্যের গাছ' ওদের কিছু হওয়ার নয়। কিন্তু আমি যে তখন মোটামুটি গাব্‌লা যাওয়ার পথে এ সংবাদ তাঁর কাছে ছিল না। আমি যে আল্‌বেরাদরির একজন সক্রিয় সদস্য তার বিন্দু বিসর্গও মহাশয় জানতে পারেন নি। তাঁর ধারণা ছিল অন্য সবাই গোল্লায় যেতে পারে, আমি পারিনা। এখানে তাঁর মস্ত ভুল হয়েছিল। স্যার তাঁর মাতৃদায় কালেও নাকি কাচা কোচা, লোহার চাবি সমেত, খালি পায়ে কলকাতার রাস্তায় হেঁটে গিয়েও তাঁর ভার্সিটির পরীক্ষার নির্ধারিত কক্ষে পৌঁছে, পরীক্ষা দিতে ত্রুটি করেননি। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা তাঁকে অভীষ্ট স্তরে পৌঁছে দিয়েছিল। অনুরূপ অবস্থার একজন এতিম প্রায় কিশোর কী ভাবে যে ঈদৃশ ইল্লুতেপনায় যেতে পারে, তা তাঁর হিসেবে ছিল না।

তবে কিনা চোরের দশদিন আর গেরস্থের একদিন। ধরা তো পড়তেই হবে। সেদিন বোধহয় আমরা অতিমাত্রায় স্বাধিকার প্রমত্ত হয়েছিলাম। রাজ্জাক আর বেলায়েৎ বলে একটি ছেলে—সেদিন একটু দেরিতে গুরুগৃহে এসেছিল। তারা এমনই একটা সময়ে এসে পৌঁছোল যে, সেদিন আর কারুর পক্ষেই গঞ্জে যাবার সময় ছিল না। ততক্ষণে স্যার উপরে উঠে গেছেন। তারা দুহাঁড়ি খেজুরের রস কোত্থেকে, অবশ্যই চুরি করে, নিয়ে এসেছে। বলল, আজ আমরা সিন্নি খাব। এই সিন্নি বস্তুটি হল, খেজুরের রসে নারকোল কোরা বা নারকোলের দুধ এবং চাল সহযোগে তৈরি এক ধরনের পায়েস বা মিষ্টান্ন। এ বস্তুটি অতি বাল্যকাল থেকেই আমাদের খুব প্রিয়। শীতের মরশুমে সিউলিদের রস চুরি করে আমরা হামেশা এই অমৃত ভোজ্যটির সদ্ব্যবহার করতাম। অপহরণজনিত অপরাধে পরদিন ভোরবেলার সিউলিকৃত খামার অর্থাৎ গালাগালি ফাউ হিসেবে মিলত। সে খামারের তরিকাই আলাদা।

তো সেদিনকার মোচ্ছব হিসেবে সিন্নি ধার্য হল। একদিকে সিন্নি পাক হচ্ছে এবং তার মদির গন্ধ চারদিক আমোদিত করছে। অন্যদিকে আমরা বদের ভট্টাচার্যিরা স্থান, কাল, পাত্র ভুলে গিয়ে সিনেমার গান ধরেছি, সাথে টেবিলের তবলা। কমলা টকিজে তখন দারুন হিট্ 'বই' চলছে 'শাপমোচন'। আমাদের গান গর্জিত হচ্ছে—

'সুরের আকাশে তুমি যে গো শুকতারা'। অতগুলো বিচিত্র কণ্ঠে তার যা প্রকাশরূপ ফুটে উঠছিল, তাতে 'গানটি গর্জিত হচ্ছে' বলা ছাড়া অন্য শব্দ আমার জানা নেই। আর এই শব্দটাই যে সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, মুহূর্তকালের মধ্যেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল। টোঙ্গের উপর থেকে স্যারের ফোক্‌লা হুঙ্কার এবং ছর্‌ছর্ করে তাঁর ভূতলে অবতরণ। মহাশয় ক্রোধাতিশয্যে দ্রুততাবশত যে মইয়ের সবকটা সিঁড়ি ব্যবহার করেননি, একথা একভরি সত্য। সামনে পড়ে প্রথমেই কেষ্টা অর্থাৎ বিজয়, খেল একখানা চাপড়। মানিকটা ছিট্‌কে ডিউজ বলের মতো বেরিয়ে গেল। আমি রান্নাঘরে

সিন্নির তরিবৎ করছিলাম বলে ঝড়ের মুখে পড়িনি। অন্য যারা পালাতে পারেনি তাদের দুর্গতি দেখিনি, তবে প্রত্যেকেই দু-চার খানা চড়চাপড় খেয়েছে একমাত্র রাজ্জাক ছাড়া। সে কখন যেন তার ইস্‌লামিক ইতিহাসের বইখানা খুলে, হ্যারিকেনটি উস্‌কে দুলে দুলে পড়তে শুরু করে দিয়েছিল।

'রসুলে করীম (দঃ) এর নেতৃত্বে-নেতৃত্বে আল্লাহ্ তায়লার কুদরতে অ্যাঁ কুদরতে বদরের বদরের যুদ্ধে, অ্যাঁ বদরের যুদ্ধে মুসলমানগণ বিজয়ী হইলে-' বাক্য শেষ হওয়ার আগেই বাঘ সামনে। বদরের যুদ্ধে আর যারই হোক রাজ্জাকের জয় হল না। মার খেলনা বটে, তবে স্যার তার কানটি ধরে—পড়া দেখাচ্ছ? অ্যাঁ পড়া?—বেরো, বেরো এ বাড়ির থেকে—কতকগুলো কুষ্মাণ্ড—যাঃ—বলে একেবারে দরজার বাইরে বার করে দিলেন। অবস্থা বেগতিক দেখে সিন্নির হাঁড়ি নামিয়ে, উনুনে জল ঢেলে আমিও চম্পট। অপরিসীম গুরুবল, আমি রান্নাঘরে থাকায় স্যারের নজরে পড়িনি।

বাইরে এসে দেখি মূর্তিমানেরা সব অন্ধকারে শীতের মধ্যে পুকুর-ধারে বসে কুঁই কুঁই করছে। অতঃপরের সংলাপ চান্দ্রদ্বীপি কথনে না বললে ন্যাড়া ন্যাড়া লাগবে, তাই সেই ভাষায়ই বলি। রাজ্জাক বলে, মুইতো বিনাদোষে খেদানি খাইলাম। এহন কাইল যদি আবার বাজানের ধারে কয়েন তো মোর অইয়া গেল। বেলায়েৎ বলে, ক্যা? সিন্নি খাবা না? রসের সিন্নি? কাইল বেন্‌ইয়া কালে রসওলাগো খামারডাই খালি খাবা? এ কথায় সবার পেটের মধ্যে ক্ষিদে যেন হঠাৎ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। আহারে, আমাদের সাধের সিন্নি, সে বোধহয় 'আফুডাই' গেল। কেষ্টা অর্থাৎ বিজয় বরাবরই বাস্তব বুদ্ধির ছেলে। সে বলে, আরে, হাড়িডা লইয়া আয়না কেউ পাকঘর থিকা। কপালে যা আছে তো অইবেই। সিন্নিডা হুদাহুদি নষ্ট হয় কেন? আর লগে এট্টা গেলাসও আনিস। গেলাসে অবশ্য সিন্নি খাওয়ার নিয়ম নয়, কিন্তু পাত্রাভাব। অতএব ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গ্লাসে করে খাওয়া। হাড়িতে ডুবাও, খাও। সিন্নিটা নামিয়ে রেখে বুদ্ধিমানের কাজই করেছিলাম। যেটুকু সিদ্ধ হওয়া বাকি ছিল, হাঁড়ির গরমে ততক্ষণে তা দিব্য তৈরি হয়েছে এবং ঠাণ্ডা আর ঘন হয়ে জিনিসটা বেশ সুস্বাদুও হয়েছে।

হাঁড়ি শেষ হতে সময় লাগেনা বিশেষ কিন্তু তারপর? স্যার যে দরজার কাছেই বসে আছেন তা বুঝতে পারছিলাম সবাই। কারুরই সাহস হচ্ছিল না গিয়ে ক্ষমাটমা চাইবার। বস্তুত এরকম ক্রুদ্ধ হতে তাঁকে বিশেষ দেখিনি আমরা। সবাই এবার আমায় পাকড়ালো, তুই যা, যাইয়া বেয়াকের অইয়া ক্ষমা চা—তোরে কিছু কইবে না। বিজয় বলল, সেই ভাল, তুই গেলেই নিরাপদ। তুই তো প্রায় তাঁর পোষ্য পুত্র। কিন্তু আমার সংকট যে আরও গভীরে, সেটা ওরা বুঝছে না। আমি তো জানি আমাকে তিনি কতখানি স্নেহ করেন। আমার এহেন পরিণতিতে তিনি যে কতখানি দুঃখিত এবং ব্যথিত হবেন সেকথা এরা কেউ বুঝবে না। এইসব ভেবে আমার খুব আত্মগ্লানি হল। কী অবস্থা থেকে আমাকে স্যার কোথায় তুলছিলেন, আর আমি কী করে চলেছি। কিন্তু সেসব তো আছেই, এখন কাছে যাই কী করে? বললাম, ভাই দেখ, আমরা বেশ কিছুদিন

ধরে যা খুশি তাই করে যাচ্ছিলাম। স্যার কিছু বলেন নি। আমাদের উপর তার নিশ্চয়ই একটা বিশ্বাস ছিল যে পরীক্ষা এগিয়ে এলে আমরা নিশ্চয়ই হুঁশিয়ার হব। কিন্তু আজ তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে। তিনি প্রকৃতই রেগে গেছেন আজ। এ অবস্থায় আমাদের সবারই একসঙ্গে গিয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত।

সবাই আমার কথার যাথার্থ্য স্বীকার করলেও পালের গোদারা কেউই এগিয়ে এল না। নৈশ বিদ্যার্থীদের মধ্যে একজন ছিল ওখানকার এক অতি সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। কিন্তু বার কয়েক চেষ্টা করেও সে ম্যাট্রিকের চৌকাঠ পেরোতে পারেনি। বয়সে আমাদের অনেকেরই কাকার বয়সি। সে সকাতরে আমায় বললে, ভাইডি আর যে যাউক আমি কিন্তু যাইতে পারমু না। এই নিয়ে আমার চাইরবার। তার থিকাও বড় কথা—আমার চরিত্তিরডাও ভাল না, একথা স্যারে জানেন। এহন হেইসব লইয়া তোগো সামনে যদি দুকথা কয়, তোরা পোলাপান মানুষ, বোজোই তো।

'—' দা আমাদের ক্লাসে সবচেয়ে বয়স্ক সহপাঠী। যৌবনিক চাপল্য এবং প্রদাহে সে ইতিমধ্যেই এ অঞ্চলে বেশ নাম করে ফেলেছে। এমনকি ঐ সময়কার সামাজিক মাৎস্যন্যায়ের সামূহিক সুযোগগুলোও সে নির্বিচারে ব্যবহার করছে। একটি বনেদি ভূস্বামী পরিবারের অসামান্যা রূপবতী একটি কন্যাকে যে সে প্রায়শই নিভৃতে পায়, একথা বহুবারই সে আমাদের বলেছে। তাছাড়া সেই সুন্দরীর ভাই-এর সাথে সে যে গঞ্জের বিশেষ গলিতে যাতায়াত করে তাও কারুর অজানা নেই। অতএব তার এখনকার আশঙ্কা অমূলক নয়। তার মতো আরও দুএকজন আমাদের মধ্যে আছে—কিছু কম বেশি খ্যাতির অধিকারী। তা এরকম এক পশ্চাৎপট কাঁধে নিয়ে এখন আমরা স্যারের সামনে কীভাবে যাব, সেই সমস্যার সমাধান কিছুতেই করতে পারছি না। ব্রাহ্মণ কুমার যাবে না, বিজয় দুই চাপড় খেয়েছে, তার যাওয়ার সাহস নেই, রাজ্জাককে স্যার কান ধরে বার করে দিয়েছেন, মানিক আমাকে ছাড়া এক-পা নড়বে না ধনুর্ভঙ্গ পণ করে বসে আছে—বাকিদের তো কথাই নেই। তাই বাধ্য হয়ে নিজের ঘাড়েই দায়িত্ব নিয়ে এক পা, দু পা করে ঘরের দিকে এগোই। পায়ের শব্দ শুনে ঘর থেকে হুঙ্কার—কে? বলি— আমি স্যার। পরবর্তী নির্দেশ—শুধু তুমি আসবে আর কেউ না। অর্থাৎ আমার রান্নাঘরে থাকাটা নজর এড়িয়ে গেছে। ঘরে ঢুকতে জিজ্ঞেস করেন, তুই ছিলি কোথায়? জলসায় তো দেখলাম না। হরিহরি ! জান বাঁচানোর এ মওকা ছাড়ে কোন 'পাড়ায়'? অবলীলাক্রমে মিথ্যে বলি, আমি তো পায়খানায় গিয়েছিলাম। হঠাৎ গণ্ডগোল শুনে বেরিয়ে দেখি সব পুকুর পাড়ে। তা আপনি এত রাত্রে নীচে এলেন কেন? শরীর ঠিক আছে তো? এসব কথা যতটা করুণ এবং মিহি করে বলা যায় তার কসরৎ চলল। পায়খানায় যাওয়ার কথায় স্যার একটু ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। জিজ্ঞেস করলেন, এত রাত্রে পায়খানায় গেলি, পেট খারাপ হয়নি তো? অসময় ! বলি, না তেমন কিছু না ঐ একটু আমাশা মতন—মানে শাকটা সকালে একটু বেশি খেয়ে ফেলেছিলাম।—পুরো নিশ্চিন্ত করানো নেই। বুঝতে পারছি বুড়ো এখন আমার শরীর বিষয়ে চিন্তিত এবং সে কারণে রাগের পারদ নামছে। প্রথমে তাঁর আস্থাটা

পুরোপুরি অর্জন করা জরুরি। জানতে চাই, হঠাৎ মনে হল আপনার গলা শুনলাম, কাকে যেন বকছেন। তা সবাই পুকুর পাড়ে কেন?

: খেদিয়ে দিয়েছি।

: সে কী কেন? ওরা কী করেছে?

না, একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। কী হয়েছিল তা পায়খানায় গেলেও না শোনার মতো নয়। তাই সেটা ঢাকা দেওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি বলি, মনে হচ্ছিল কে যেন গান গাইছিল। তারপর আপনার বকাবকি।

: তাহলে তো শুনেছোই । একী মানুষে সহ্য করতে পারে? কতগুলো গোরু। সবকটা ফেল করবে, এ আমি লিখে দিতে পারি। বলে দে কাল থেকে কেউ যেন এখানে আর না আসে। আমি পড়াতে পারব না। তার মানে আমি ছাড়া আর সবাই। যাক্‌গে, ভাবলাম, আগে নিজের খুঁটাটা তো পোক্ত করি, তারপর ওদের ব্যবস্থা করা যাবে। বলি, ঠিক আছে। মনে হচ্ছে আপনার খুব রাগ হয়েছে। আর এরাও—সত্যি এতো হল্লোড়পনা কী ভালো? সে যাক, অনেক রাত হয়েছে, আপনি এবার উঠুন তো আগে আমি উপরে দিয়ে আসি, নইলে শরীর খারাপ হবে। চলুন। বলে হাত ধরে আস্তে আস্তে মই এর কাছে গিয়ে বললাম—

: আপনি যে অন্ধকারে মই বেয়ে নেমে এলেন, যদি পড়ে যেতেন? কী সর্বনাশ হত বলুন তো?

: পড়েই তো গিয়েছি। বাঁ-পাটায় বেশ লেগেওছে।

সাততাড়াতাড়ি কুপি ধরে পা-টা দেখলাম। জিজ্ঞেস করলাম, মচকায় নি তো? একটু চুন হলুদ গরম করে দেব?

: না, তার দরকার হবে না। তুই আলোটা ধর আমি উঠি। আর ওদের বলে দিস যা বললাম।

: ঠিক আছে সে আমি কাল দেখব'খন। আপনি উত্তেজিত হবেন না। আপনি অসুস্থ হলে আমি বিপদে পড়ব। বুড়ো উপরে উঠে যেতেই এক লাফে পুকুর ধারে গিয়ে খুব চেঁচিয়ে বলতে লাগলাম, যাতে স্যার উপর থেকে শুনতে পান, তোরা পেয়েছিস কী, অ্যাঁ? স্যার পড়ে গিয়ে পা মচ্‌কে একসা কাণ্ড করেছেন। তোরা তো সকালে উঠে যে যার বাড়ি চলে যাবি। স্যারকে নিয়ে আমি কী করব তখন? তখন সমস্বরে সবাই—সত্যই মচ্‌কাইছে না ভাঙ্গছে? এঃ এহন উপায়? এইসব জোরে জোরে বলতে থাকে। আমি আস্তে করে জানাই, ন্যাকামি আর কোরো না। বুড়ো চটেছে বেজায়। যাহোক করে উপরে তুলে দিয়ে এসেছি। মিথ্যে কথা যা বলেছি তাতে সাত পুরুষের নরক দোজখ, জাহান্নাম সবকয়টাই একসাথে হবে। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এবার চলো তো বাছারা টুঁ শব্দটি না করে গিয়ে গুটি গুটি শুয়ে পড়। হ্যাঁ, কাল থেকে তোমাদের সবার আসা বারণ। শুধু আমি থাকব আর স্যার—আর কেউ না। সবাই অবশ্য জানত এটা ফাঁকা আওয়াজ। সকালে স্যার সব ভুলে যাবেন।

— চব্বিশ —

পিছারার খালের চৌহদ্দির ক্ষুদ্রতা এবং শূন্যতা কাটিয়ে বড়খালের সোঁতায় ভাসতে ভাসতে প্রথমে তারুলি ইস্কুল, তারপর কীর্তিপাশা ইস্কুলে এসে আমার জীবন এবং মন-মানসিকতার বিস্তার ঘটেছিল। পিছারার খাল এভাবেই ক্রমশ পিছনে মিলিয়ে যাচ্ছিল। আমি আস্তে আস্তে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর স্রোতকে অবলম্বন করছিলাম। চারদিকের ব্যাপক অবক্ষয় এবং ধ্বংসের বিরুদ্ধে আমার সেই প্রাণপণ লড়াই একসময় আমাকে শিখিয়ে দেয় যে জীবন সর্বৈব নিঃসঙ্গ নয়।

পারিবারিক নিষেধের লক্ষ্মণগণ্ডি পেরুনোর লড়াইটা জিতে গিয়ে আমার শক্তি ও সাহস অনেকটা বেড়ে গিয়েছিল বলেই ব্যক্তিকভাবে আমি এরপর একেকটা বাধার পাহাড় ডিঙোতে পারছিলাম। আমার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস, আমার চেতনার বিভিন্ন অনুষঙ্গ যা বাবা এবং জেঠামশাইয়ের কঠিন নিষ্পেষণে শৈশবকাল থেকে চাপা পড়েছিল, কীর্তিপাশার ইস্কুলের চৌহদ্দিতে পড়ে তা মুক্তি পেল। অশ্বিনীবাবুর শিক্ষা এবং সাহচর্য এ ব্যাপারে আমার সহায়ক হয়েছিল। সাধারণ মানুষদের ঘরের সাধারণ ছেলেদের সঙ্গে মিশে সাধারণ হবার শিক্ষা পেলাম। জীবনে এটা আমার সবচেয়ে বড় লাভ। যতদিন ইস্কুলে ছিলাম, এখানকার সাধারণ মানুষদের খেলাধুলো, যাত্রা থিয়েটার, পড়াশোনার পরিবেশ ইত্যাদির উত্তাপ যথেষ্ট পেয়েছি। কিন্তু পোড়া কপালে তা অধিকদিন স্থায়ী হল না। স্বৈরাচারী শাসকদের ব্যাপক কদাচার, ভেদনীতি, জঙ্গিশাহী অবিমৃষ্যকারিতা দেশকে এক অন্ধকার গর্তের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। আমরা বড় হতে হতে এইসব নিদারুণ অবক্ষয় এবং হতাশার শিকার হচ্ছিলাম। ব্যক্তিকমুক্তি যেটুকু অর্জন করেছিলাম, সাম্প্রদায়িক কারণে তা কোনওভাবেই আমাদের মতো সংখ্যালঘু ছেলেদের রাষ্ট্রীয় মূল স্রোতে পৌঁছে দিতে পারেনি। সেখানে বাধা ছিল হিমালয়-প্রমাণ।

আমাদের স্বাভাবিক বিকাশের এই বাধাটা শুধু রাষ্ট্রের তরফ থেকেই ছিল, একথা বললে ভুল হবে। ওখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অভিভাবকদের দায়ও এ ব্যাপারে যথেষ্ট ক্রিয়াশীল ছিল। কিন্তু ইতিপূর্বের আলোচনায় সে কথা যথেষ্ট বলা হয়েছে, অধিক নিষ্প্রয়োজন। মোদ্দা কথা হল, যে আর্থব্যবস্থায় ইতিপূর্বের সমাজ বিধৃত ছিল, তা ধ্বংসে হলে এবং নতুন কোনও আর্থব্যবস্থা সৃষ্টি না হলে গোটা সমাজটিই পিছারার খালটির মতো শুকিয়ে যেতে থাকে। একদার সংস্কৃতি সমৃদ্ধ এইসব গ্রামগুলোকে দিনদিন লক্ষ্মীছাড়া হতে দেখতে দেখতে বুকের মধ্যে এক সতত বিষণ্ণতার বৃক্ষ যেন স্থায়ী শিকড় গেড়ে বসছিল। কীর্তিপাশা ইস্কুলের চৌহদ্দির উষ্ণতা সেখানে সাময়িক প্রলেপমাত্রই ছিল। স্থায়ী আরোগ্যের ঔষধ ছিল না। বিভিন্ন ঋতুকালীন সব বর্ণাঢ্য উৎসবগুলোর দিনে অন্তরস্থ বিষাদ বৃক্ষের পাতা ঝরানোর বিষণ্ণতা জন্মের মতো কায়েমি হয়ে থাকল, আমাদের জীবনে।

স্থানীয় মুসলমানেরা উচ্চ নীচ শ্রেণী নির্বিশেষে কোনও আলাদা সংস্কৃতির অধিকারী ছিল না। শুধুমাত্র ধর্মীয় উৎসবই তাদের একান্ত নিজস্ব সংস্কৃতি। নিম্নবর্গীয় জনেদের

লোকায়ত সংস্কৃতির ধারক উভয় সম্প্রদায়ের নিম্নবর্গীয়রাই। কিন্তু শুচিবাইগ্রস্থ কট্টর মোল্লাপন্থীরা ক্রমশ তাদের উপর নিষ্পেষণ চালাতে থাকলে সংস্কৃতির এই ধারাটি শুকিয়ে যেতে থাকে। শৈশবে শোনা এবং দেখা জারি, সারি, মারফতি, কথকতা, রামযাত্রা, কিস্‌সা এবং ইত্যাকার হাজারো লোকরঞ্জক অনুষ্ঠানগুলো আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যেতে থাকে। এইসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, এমনকী কীর্তন, রয়ানি প্রভৃতির আসরেও মুসলমান নিম্নবর্গীয়দের ব্যাপক উপস্থিতি এবং অংশগ্রহণ লুপ্ত হতে থাকে জেনারেল প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের শাসন কালেই। কারণ মিলিটারি শাসকদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য মোল্লাতন্ত্রের হাত শক্ত করা এবং তাদের প্রতিপত্তির ক্ষেত্র বিস্তৃত করার প্রয়োজন হয়েছিল। সেই প্রয়োজনের কর্মকাণ্ডের চাপে এই আবহমান সংস্কৃতি অতিদ্রুত বিলুপ্তির পথে চলে যেতে থাকে। এই কর্মকাণ্ড অবশ্য বহুকাল আগে থেকেই শুরু হয়েছিল, কিন্তু এদেশীয় নিম্নবর্গের মানুষেরা, হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে, তাদের সাংস্কৃতিক আত্মীয়তার শক্তির দ্বারা তা প্রতিহত করতে সক্ষম ছিল। মোল্লাতন্ত্র শুরুতে, অর্থাৎ মোগল, পাঠান রাজত্বকালে যে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেনি, জঙ্গি পাকিস্তানি আমলে তা পুরোপুরি করতে পেরেছিল। সেই আমলে ইসলামি ধর্মপ্রচারকেরা শুধুমাত্র ধর্মান্তর করণের জন্যই সচেষ্ট ছিলেন এবং এদেশীয় সমাজের বর্ণাশ্রমী নির্যাতনে ক্লিষ্ট নিম্নবর্ণকে ইসলামে দীক্ষিত করার জন্য এক অনুকূল পরিবেশ লাভ করেছিলেন। তাঁরা এর দ্বারা কোনও সাংস্কৃতিক বিভাজনে সচেষ্ট হননি। উপমহাদেশীয় স্বাধীনতা আন্দোলন এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম হলেই এই বিভাজন ক্রমশ আত্মপ্রকাশ করতে থাকে এবং ফৌজি দখলদারির পরে তথাকথিত ইসলামি সংস্কৃতি স্থাপনার ধুয়ো ধরে মোল্লাতন্ত্র এই লোকায়ত সংস্কৃতির উচ্ছেদ কল্পে এক ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে।

হিন্দু নিম্নবর্ণীয়দের দেশত্যাগ শুরু হলে এই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে যে শূন্যতা তৈরি হয়, নিম্নবর্গীয় মুসলমানেরা হয়ত তা পূরণ করতে পারত, কিন্তু সেই সময়টাতেই মোল্লাতন্ত্র তাদের উপর ফতোয়া জারি করে এই সংস্কৃতির মূলে কুঠারাঘাত করে। ধর্মীয় কড়াকড়ি, সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় রক্ত চক্ষুও মোল্লাদের এই জিহাদের জন্য যথেষ্ট মনে না হওয়ায় তারা এই সব সংস্কৃতির মাধ্যমগুলোর ভিতরে অনুপ্রবেশ করে তার একটা সাম্প্রদায়িক আকৃতি দেয়। এইসব কার্যকলাপই পঞ্চাশের শেষ এবং ষাটের দশকের প্রথমার্ধে তারা সম্পন্ন করে।

লোকায়ত সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান মাধ্যম ছিল জারিগান। শুধু আমাদের অঞ্চলেই নয়, গোটা পূর্ব বাংলার সব জেলাগুলিতেই জারিগানের প্রাধান্য ছিল। অতি শৈশবে দেখেছি আমাদের বাড়িতে শারদোৎসব শেষ হলে জারিগানের আসর বসতো। সেখানে গায়ক এবং শ্রোতারা প্রায় সবই নিম্নবর্ণীয় / বর্গীয় হিন্দু মুসলমান। সেই সময়ের একটি গানের কথা মনে আছে। মূল জারিগান শুরু হবার আগে প্রস্তাবনা হিসেবে সাধারণত বন্দনা গান হয়। কিন্তু যতদূর মনে আছে, এই গানটি কোনও কোনও জারিগানের আগে বন্দনার পরিবর্তে গাওয়া হত। গানটি হচ্ছে—

হারে পিছন দিকে চাইয়া দ্যাখ রে
তর ডুইবা গেল বেলা
দিন থাকিতে ভাসাও মন তোমার
ভবপারের ভ্যালা।।
সুন্দর দালান ঘর বাড়ি
হায়রে সবই ছাড়িয়া
যাইতে হইবে তোমায়
হায়রে দুনিয়া ছাড়িয়া।।
আইছ ভবে যাইতে হবে
মরণ আপন নয়
দিন থাকিতে ও পাষাণ মন
একবার ডাক দয়াময়।।

অথবা—

পরথমেতে আল্লার নামটি নিতে করলাম শুরু।
অনাথের নাথ গো আল্লা দয়া কর গুরু।।
গুরু গুরু বলতে আমার এহোজনম গেল।
নিজ গুরুর সংগে আহা দেখা নারে হইল।।
গুরু যেমন ভবের মাঝে আরকে এমন হবে।
গুরুর নামে কত অধম হেলায় তোইরে যাবে।।
আহা গুরু কল্পতরু তুই নৌকার ব্যাপারী।
সমুদ্দুরে ধরচি পাড়ি গুরু হও কাণ্ডারী।।
কারে ডাকি দিনবন্ধু কারে ডাকি নাথ।
কেমনে পাইব আমি তার হাকিকত।।
তুমি বিনে মা এই অধমের নাইত কোন গতি।
আমার জিব্বায় বইসে যোগাও কথা লক্ষ্মী সরস্বতী।।

এইরকম সব গান গেয়ে মূল জারিতে যাওয়া হত। সাধারণত জারি গাওয়ার নিয়ম হচ্ছে উপস্থিতমতো পদ্যাকারে কাহিনীর রচন এবং বিন্যাস। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাহিনীটি থাকে প্রচলিত কোনও উপাখ্যান, যেমন কারবালার যুদ্ধের করুণ আখ্যায়িকা, খত্‌নামার কাহিনী, নমরূদ বাদশার জারি, চাচা ভাতিজার যুদ্ধ, মাদার মণির গান, লক্ষমতীর পালা এইসব। বরিশালের নিজস্ব জারি শুনেছি গুণাবিবির গানে। এই কাহিনীগুলো সবই প্রায় করুণ রসাশ্রিত। শ্রোতারা চোখের জলে বুক ভিজিয়ে রাতের পর রাত ধরে এই সব শুনত। কিন্তু যেমন আগে বলেছি, পঞ্চাশের শেষ এবং ষাটের দশকের গোড়ার দিকে এইসব জারিগানগুলো পদ এবং কাহিনী বিন্যাসের ক্ষেত্রে কুৎসিত ভাবে পরিবর্তন ঘটিতে মোল্লা মুছল্লিরা এর অসাম্প্রদায়িক চরিত্রটিকে নষ্ট করে দেয়। এখানে দুয়েকটি সেরকম প্রচেষ্টার উদারহণ দেব।

.....কেহ বলে বাদশাজাদা
বলি কিছু তবে,
আরব্য শহরে একটি
জোবান পয়দা হবে।
সেই জোবান পয়দা হবে
দুরন্ত জোবান,
কলেমা ফড়ায়ে হিন্দু
করিবে মুসলমান।
দেওড়া বাইংগ্যা দূর করবে
শিব ও দুর্গা কালী,
আহ্নিক পূজা ত্যাগ
আর নর বলি।
খাসী কোরবানী কইরবে
গাই করিবে জোবে,
জাত আবরু মাইরা সবের
ইজ্জাত উম্‌রাত নিবে।

হজরত মহম্মদ আল্লাহ্‌তালার দোস্তো। পৃথিবী সৃষ্টি করার পর আল্লাহ দেখলেন কেউই মুখে আল্লাহরসুল উচ্চারণ করে না। এমনকি আদমও না। তারা—

না ফড়ে নবীর কলেমা
না ফড়ে কোরান,
ভূত পূজা আনহিক যত
করে হিন্দুয়ান।

তখন আল্লাহ তাঁর দোস্তোকে ডেকে বললেন—

—আল্লা বলে দোস্‌তো তুমি
দুনিয়াতে যাও,
দশ দুনিয়ার মইদ্যে দোস্‌তো
পয়দা যাইয়া হও।
সব কাফের মারো জব্‌দো করো
তোড়ে হিন্দুয়ানী,
গরে গরে শুনাও দোস্‌তো
কলেমার ধ্বনি।

জারিটি মূলত খুবই সুন্দর বিন্যাসে রচিত ছিল। কিন্তু উপরিউক্ত কথাগুলি উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ভাবে তার মধ্যে যে ঢোকানো হয়েছে তার প্রমাণ গোটা জারিটি শুনলে বা পড়লে ধরা যায়। এসব জারি গান আমরা ছোটবেলায় যখন শুনেছি, তখন এই

প্রক্ষিপ্ত পদগুলি গাইতে শুনিনি। পরবর্তীকালে ঢাকা বাংলা একাদেমির উদ্যোগে যখন এইসব গান জিলাওয়ারি সংগৃহীত হয়ে বই হিসেবে বের হয়, তখন দেখেছি কী ভাবে সাধারণ মানুষের নিজস্ব সাংস্কৃতিক জগতে হানাদারি হয়েছে। নচেৎ যে গানের শুরুতে লোকায়ত দেবী বিপদনাশিনীর বন্দনা করে গাওয়া হয়—

মাগো দোরি পদে
বিপদ নাশিনী,
এ্যা গো মা মা
দোরি পদে বিপদ নাশিনী।

আমি পইড়াছি মা ভবসাগরে
পইড়াছি মা ভবসাগরে,
যা করো মা এইবার
কালের ভয়ে কাঁপে কলেবর
দিবস রজনী।—

সেই জারিতে কী করে হিন্দুয়ানি খতম করার, শিব, দুর্গা, কালী ইত্যাদি মূর্তি ভাঙার কথা থাকে?

মনে আছে একটা সময়ে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যকে হিন্দুয়ানি মুক্ত করার জন্য এক ব্যাপক প্রচেষ্ট চালানো হয়েছিল। তখন নজরুলও রেহাই পাননি। তাঁর বিখ্যাত সেই 'চল চল চল'-গানটির

নবজীবনের গাহিয়া গান
সজীব করিয়া মহাশ্মশান—কলিটির 'মহাশ্মশান' পরিবর্তিত হয়ে হল 'গোরোস্তান'। কারণ মহাশ্মশান হিন্দু শব্দবন্ধ, ওটি চলতে পারে না। কারবালার জারি গানে ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি বন্দনায় গাওয়া হচ্ছে—

দক্ষিণে বন্দনা করি দক্ষিনাল সাগর
সেইখানে সদাগরি করতায় চান্দোসদাগর।

একাডেমির পুস্তকে সংগ্রুহীত জারিতে দেখি 'চান্দোসদাগর' বাদ দিয়ে 'আরবি সদাগর' করা হয়েছে। জারি গায়ক, যাঁদের বয়াতি বলা হয়, তাঁরা বন্দনা গানে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের দেবদেবী, আল্লাহ, পয়গম্বর সবারই মহিমা কীর্তন করতেন। এই ধারাটি একটি প্রাচীন পরম্পরা। জারিগান ছাড়াও পূর্ববঙ্গ গীতিকায় সর্বত্রই এই ধারা সুলতানি আমল থেকেই প্রচলিত। যেমন পীর বাতাসীর মুসলমান গায়েন, তাঁর গুরু জিন্দাগাজির কাছে বর প্রার্থনা কালে-'মক্কা মদীনা বন্দুলাম কাশী গয়াথান' ইত্যাদি গীতে হিন্দু তীর্থস্থানগুলোকে সম্মান জানাচ্ছেন, তেমনি নেজাম ডাকাইতের গীতিকার মুসলমান কবি সমস্ত লোকায়ত দেবদেবীদের প্রণাম করে গীতি আরম্ভ করেছেন এবং উপসংহারে গাইছেন 'সীতা শক্তি (সতী) মাকে মানি, রঘুনাথ গোঁসাই।' চৌধুরীর লড়াই গীতিকায়

মুসলমান গায়েন পশ্চিমে মক্কার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে 'জগন্নাথ দেউ' সম্বন্ধে বলছেন—

'বন্দি ঠাকুর জগন্নাথ
ভেদ নাই বিচার নাই বাজারে বিকায় ভাত।
চণ্ডালে রাঁধে ভাত ব্রাহ্মণেতে খায়।
এমন সুধন্য দেশ জাত নাহি যায়।
ভাত লইয়া তারা মুণ্ডে মোছে হাত
সে কারণে রাইখাছে নাম ঠাকুর জগন্নাথ।'

আর একজন মুসলমান কবি লিখেছেন—

হিন্দু আর মুসলমান
একই পিণ্ডের দড়ি
কেউ বলে আল্লা রসুল
কেউ বলে হরি।

বাংলাদেশে হিন্দু আর মুসলমানে যে রকম মেশামেশি হয়েছিল, ভারতবর্ষের আর কোথাও বোধহয় তেমনটি হয়নি। পল্লীগীতিকায় এর ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত আছে। সেই সমৃদ্ধ সংস্কৃতিকে, লোকায়ত স্তরে কলুষিত করেছে যারা, তারা আর যাই হোক বাঙালির সুহৃদ নয়। উপরোক্ত কথাগুলি বর্তমান আলেখ্যের মুখ্য আলোচনার বিষয় নয়। তথাপি উল্লেখ করলাম একারণে যে আমাদের ইস্কুল জীবনে আমরা এইসব অনাচার ঘটতে দেখেছি যা ক্রমশ তাবৎ লোকায়ত সংস্কৃতি তথা উভয় সম্প্রদায়ের আত্মিক সম্পর্ককে বিষাক্ত করে বাঙালির সর্বনাশ করেছে।

— পঁচিশ —

এবার আবার মূল কথায় ফেরা যাক। আমাদের ঐ সব গ্রামে অতি শৈশবের ক্ষীণ স্মৃতি ছাড়া কোনও রাজনৈতিক কার্যকলাপের কথা স্মরণ হয় না। একমাত্র ইউনিয়ন বোর্ডের বা সংসদীয় নির্বাচনের সময় ছাড়া কোনও রকম রাজনৈতিক উত্তেজনা কখনও দেখিনি। রাজনৈতিক দল বলতে মুসলিম লিগকেই আমরা জানতাম। কংগ্রেস নামটির সঙ্গে সামান্য পরিচয় ছিল। কিন্তু কোনও দলেরই কোনও রকম কাজকর্ম কখনও দেখিনি। না সামাজিক, না রাজনৈতিক। শুধু ইউনিয়ন বোর্ডের নির্বাচনের সময় দেখতাম প্রার্থীরা কেউ আওয়ামি লিগের, কেউবা মুসলিম লিগের এবং হিন্দু প্রার্থী হলে কেউ কেউ কংগ্রেসের প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করছেন। গ্রামীণ সাধারণ মানুষেরা এই নির্বাচন ব্যাপারটাকে প্রায় উৎসবের মতো মনে করত। রঙ বেরঙের পোস্টার, টিনের চোঙায় মুখ লাগিয়ে ক্যানভাসিং এবং বিরুদ্ধ প্রার্থীর সম্বন্ধে ছড়া আর সরস গানের নিনাদে গ্রামগুলো তখন বেশ সরগরম থাকত।

কম্যুনিস্ট পার্টির নাম খুব কমই শোনা যেত। দুএকজন লোককে জানতাম যে তাঁরা কম্যুনিস্ট আদর্শে বিশ্বাসী। তবে এই মতাদর্শটা কী তা সঠিক জানা ছিল না। আওয়ামি

লিগ, ভাসানী ন্যাপ ইত্যাদি পার্টির কথা কীর্তিপাশার বাজারে খুব শুনতাম। সাধারণ মুসলমান জনেরা মুসলিম লিগের অনুগামীই বেশি ছিল। তারা জানত মুসলিম লিগই পাকিস্তান কায়েম করেছে।

একটা ব্যাপার খুবই আশ্চর্যের যে আমাদের এই অঞ্চলের চাষিদের কোনওদিন কৃষক আন্দোলন করতে দেখিনি। অথচ গোটা এলাকায় ভূমিহীন চাষি, প্রান্তিক চাষি এবং কৃষি শ্রমিকদেরই প্রাধান্য। শৈশবের গল্প মারফত তেভাগা, হাজং ইত্যাদি আন্দোলনের কথা শুনেছি, কিন্তু তার প্রভাব আমাদের এলাকায় কিছু নজরে আসেনি।

ইস্কুলে পড়ায় সময় একজন মানুষ পেয়েছিলাম যাঁর মাধ্যমে রাজনীতি, আন্দোলন বা দেশ বিদেশের নানান খবর জানতে পারতাম। ভদ্রলোকের নাম যতীন কর্মকার। কীর্তিপাশার বাজারে যতীনবাবুর একটি সুদৃশ্য বইয়ের স্টল ছিল। এটাই ছিল তাঁর রুজি-রোজগারের উৎস। স্কুলপাঠ্য বই, খাতাপত্র ইত্যাদি ছাড়াও সেখানে পাওয়া যেত নানা বিষয়ের উপর বই পত্তর খবরের কাগজ এবং ম্যাগাজিন। আমাদের কাছে এই স্টলটির মাহাত্ম্য ছিল অসম্ভব রকমের। সেসব দিনে আমাদের সবচেয়ে যেটার অভাব ছিল, তা হচ্ছে পড়াশোনার ব্যাপারে উপযুক্ত সঞ্চালকের সহায়তা। পাঠ্যক্রম ছাড়া কি কি আমাদের পড়া উচিত, কি ভাবে পড়া উচিত তথা—সাহিত্য ইত্যাদি নিয়ে আলাপ, আলোচনা বৈঠক এইসব আমাদের আদৌ ছিলই না। যতীনবাবুর স্টলটি সামান্য হলেও আমাদের এই অভাব বেশ খানিকটা পূরণে সহায়তা করেছিল। এখানে আমাদের নিয়মিত আড্ডা হত। যতীনবাবু ছিলেন একজন অসামান্য শীলিত রুচির মানুষ। অত্যন্ত চমৎকার ভাবে তিনি তাঁর সামাজিক দায়িত্ব পালন করতেন। তাঁর এই দায়িত্ব পালনের পদ্ধতিটি ছিল একান্ত নিজস্ব ধরনের। বস্তুত ঐ সময়কালে আমাদের পরিবারস্থ অথবা সামাজিক অভিভাবকেরা এধরনের দায়িত্বের কথা আদৌ চিন্তাও করতেন না। যতীনবাবু ছিলেন এর ব্যতিক্রম। ঢাকা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রপত্রিকা তিনি তাঁর স্টলে রাখতেন। আমরা সবাই তা পড়তে পারতাম। তিনি, শুনেছি, নাকি কম্যুনিস্ট মনোভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁর কাছে আমরা দেশ বিদেশের নানার খবর, রাজনৈতিক আন্দোলনের কথা, রাশিয়া, চীন বা অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের গল্প ইত্যাদি শুনতাম।

সে সময় ঢাকা থেকে 'সমকাল' নামে একটি পত্রিকা বের হত। সেটি পাক্ষিক না মাসিক আজ আর তা মনে নেই। তবে পত্রিকাটি খুবই উচ্চমানের ছিল। যতীনবাবু আমাদের বয়সি বা আমাদের থেকে ছোট যারা তাদের দিয়ে লিখিয়ে, আঁকিয়ে সমকালে পাঠাতেন প্রকাশের জন্য। কখনও কখনও নিজে সংশোধনও করে দিতেন। আমাদের ইস্কুলের সাথে শিক্ষা বিষয়ে জড়িত না থাকলেও তিনি সবরকম সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে উদ্যোগীর ভূমিকা নিতেন। নাতিউচ্চ, কটাচোখ, ফর্সা রঙ এবং পাতলা চেহারার এই মানুষটি খুবই স্নিগ্ধ স্বভাবের ছিলেন। আমরা তাঁর কাছ থেকে নানারকম বই পত্তর নিয়ে পড়তে পারতাম। তিনি 'পড়ে ফেরৎ দিও', 'বই পরিচ্ছন্ন রেখ' এরকম নিয়মে আমাদের যথেচ্ছ বই দিতেন। নতুন এবং পুরোনো সব বইয়ের একটি চমৎকার সংগ্রহ

তাঁর ছিল। ঐ সব বই পড়ে আমরা তাঁর স্টলে নানান আলোচনা সমালোচনা করতাম। তিনিও তাতে যোগ দিতেন। এইসব আলোচনার মধ্যে রাজনীতির কথা, মার্শাল প্রেসিডেন্টের উদ্ভট বুনিয়াদি গণতন্ত্র, আমেরিকার কীর্তি কাহিনী ইত্যাদি নিয়েও যথেচ্ছ বিচার বিশ্লেষণ হত। এর ফলে মানসিক বিকাশের দিক থেকে আমরা খুবই উপকৃত হতাম।

আমরা তখন দশমমানের ছাত্র, অনেক বিষয়ই কিছু বুঝিনা। কিন্তু আলোচনার সময় বেশ উত্তেজনা বোধ করতাম। 'একুশে ফেব্রুয়ারির'—সময় যতীনবাবু সে বিষয়ের তাৎপর্য নিয়ে পাঁচকথা আলোচনা করতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐ দিনটি আমরা কখনওই ইস্কুলে উদ্‌যাপন করতে পারিনি। এটা যতীনবাবুর বিশেষ আফশোসের ব্যাপারই ছিল। ইস্কুলের মাস্টারমশাইয়েরা প্রায় সবাই হিন্দু ছিলেন বলে প্রতিষ্ঠান বিরোধী বা রাজনীতিগন্ধী কোন আলোচনা বিষয়ে তাঁরা ছিলেন অসম্ভব ভীত এবং স্পর্শকাতর। তবে যতীনবাবুকে সবাই শ্রদ্ধাসম্মান করতেন বলে আমরা তাঁর ওখানে নির্ভয়েই আড্ডা মারতাম।

এই সময় তফসীর মিঞা কীর্তিপাশায় আসেন। তিনি ছিলেন পল্লিউন্নয়ন অফিসার। প্রথম দিকে তিনি ছিলেন আমাদের পিছারার খালের আশপাশ গ্রামগুলোর উন্নয়নের দায়িত্বে। সেখানে কিছুকাল কাটিয়ে এখানে এলেন তিনি। তাঁর কাজ ছিল হিন্দুদের পরিত্যক্ত বাড়িগুলো, যেসব তখন মুসলমান মাতব্বরদের দখলে, তার ঝোপঝাড় জঙ্গল পরিষ্কার করানো, মজা পুকুরের পাঁক তুলে ফেলা বা কচুরিপানা পরিষ্কার, রাস্তাঘাটের আগাছা পরিষ্কার করিয়ে চলাফেরার উপযোগী রাখা ইত্যাদি। এছাড়া হাঁস মুরগি পালন সংক্রান্ত বা কৃষিবিষয়ক কিছু পরামর্শ দিয়ে গ্রামীণ চাষিগেরস্থদের উন্নয়নের পথে নিয়ে যাওয়া। এসব করার জন্য, সরকারি আদেশ মোতাবেক চারপাঁচখানা গ্রামের ছেলে পুলেদের নিয়ে তফসীর মিঞা একটি চাঁদতারা ক্লাব করেছিলেন। সেখানে জমায়েৎ হয়ে আমরা তাঁর নেতৃত্বে কিছুদিন এটা ওটা করেছিলাম। কখনও কখনও কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও এই ক্লাবের নির্ঘণ্ট ছিল। আইয়ুব শাহী বুনিয়াদি গণতন্ত্রের প্রথম পর্যায়ে এইসব চাঁদতারা ক্লাবের খুব হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাতে যে পল্লির উন্নয়ন কিছুমাত্র হল এমন নয়। তফসীর মিঞা জানতেন যে উন্নয়ন এ ভাবে হয়না। কিন্তু এটা যেহেতু তাঁর চাকরি, নিয়মরক্ষা তাঁকে করতেই হত।

সে যাহোক, তফ্‌সীর মিঞা মানুষটি ছিলেন চমৎকার। শান্ত, নির্বিরোধ আদ্যন্ত ভদ্রলোক এবং উপরন্তু সাহিত্য শিল্পে রসগ্রাহী। কবিতা লেখার অভ্যেস ছিল। বাবা এবং যতীনবাবুর সঙ্গে তাঁর বেশ গাঢ় হৃদ্যতা জন্মেছিল। অচিরে তিনিও আমাদের আড্ডার স্টলের একজন নিয়মিত সদস্য হলেন। বাবাও তাঁর সাথে মাঝে মাঝে আসতেন। আমরা তাঁদের আলাপ আলোচনা খুবই মন দিয়ে শুনতাম।

তফ্‌সীর মিঞা বলতেন, দেখুন সরকারের তরফ থেকে আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে পল্লি অঞ্চলের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিচ্ছন্নতা, পশুপালন পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে

গ্রামবাসী সাধারণদের সুশিক্ষা ও সুপরামর্শ দেবার জন্য। কিন্তু এই কাজের জন্য যে পরিকাঠামো এবং টিমওয়ার্ক দরকার তার কোনও ব্যবস্থা নেই। আমার মনে হয়, যেখানে গ্রামের শিকড়টাই উপড়ে গেছে, সেখানে এ প্রচেষ্টার কোনও অর্থ নেই। যতীনবাবু বলতেন, ভূমির বন্টন ব্যবস্থা সুষম না হলে গ্রামীণ কোনও উন্নয়নই সম্ভব বলে আমার মনে হয় না। আপনার কাজকর্মে পরিত্যক্ত ভিটে দখলকারী এবং নতুন গজিয়ে ওঠা তালুকদারদের খানিকটা উপকার হয়ত হবে, কিন্তু তা কিছুদিনের জন্য মাত্র। এইসব আলোচনায় তফ্‌সীর মিঞা খুব অপ্রস্তুত বোধ করতেন। কারণ 'ছাড়া' ভিটের দখলদারেরা মুসলমান এবং তিনিও মুসলমান, তাই। যতীনবাবু বলতেন, আপনার বিব্রত হবার কারণ নেই। ভাববেন না আমি ছাড়াভিটের দখলদারি বলতে আপনার সম্প্রদায়ের উপর কটাক্ষ করছি। আমি যে সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের মধ্যেও ছাড়াভিটের দখলদার আছে। হয়ত সংখ্যাগত ভাবে কম। কিন্তু তাঁরা যদি সংখ্যাগুরু হতেন, তাঁরাও একই কাজ করতেন। প্রশ্নটা গ্রামীণ উন্নয়নের সফলতা সংক্রান্ত। এইসব আলাপ আলোচনা তাঁদের মধ্যে চলত প্রায়শই। তবে সমস্যার সমাধান বিষয়ে কেউই কিছু পথের সন্ধান দিতে পারতেন না। সব আলোচনাই শেষতক্ গভীর নৈরাশ্যে ডুবে যেত। তফ্‌সীর মিঞা বলতেন, এখানের সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক বুনিয়াদটাই ধসে গেছে। শুক্‌নো গাছে পানি দিলে কী পাতা গজায়?

— ছাব্বিশ —

১৯৫৯ সালে মার্শাল প্রেসিডেন্ট বুনিয়াদি গণতন্ত্রের ফতোয়া জারি করেন। তাঁর তত্ত্ব অনুযায়ী ইউনিয়ন বোর্ডগুলো ইউনিয়ন কাউন্সিল নামে অভিহিত হয় এবং প্রেসিডেন্ট পদটির নাম হয় চেয়ারম্যান। খান সাহেবের বোধহয় মনে হয়েছিল যে একই দেশে একাধিক প্রেসিডেন্ট থাকাটা উচিৎ নয়। তাই চেয়ারম্যান। এইসময়ে ইউনিয়ন কাউন্সিলের নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয়।

এই নির্বাচনে জেঠামশাই একজন কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে উদ্যোগী হলে বাবা এবং অন্যান্য শুভানুধ্যায়ীরা তাঁকে নিষেধ করেন। বহুকাল ধরে, বোর্ডের নির্বাচনের সময় তিনি তাঁর নিজস্ব প্রার্থী দাঁড় করিয়ে যে ভাবে হোক বোর্ডটি দখল করতেন এবং পরিচালন ক্ষমতাটি নিজের হাতে রাখতেন। নির্বাচিত ব্যক্তিটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কমবুদ্ধিসম্পন্ন, প্রায় অশিক্ষিত কোনও অবস্থাপন্ন মুসলমান হতেন এবং জেঠামশাইয়ের হাতের পুতুল হয়েই থাকতেন। এই ইউনিয়ন বোর্ডের জন্য তিনি বহু মামলা মোকদ্দমা, হৈ হুজ্জোত বহুকাল ধরে করেছেন। এজন্য এবং অন্যান্য বিবিধ কারণে তাঁর প্রচুর শত্রু হয়েছিল। বোর্ড থেকে কাউন্সিলে রূপান্তরের সময় ক্ষমতার অনেক রদবদল হয়। প্রেসিডেন্টের চাইতে চেয়ারম্যানের ক্ষমতার অনেক প্রসার ঘটে। ফলে উঠতি পয়সাওলা মুসলমানদের মধ্যে এই পদের জন্য বেশ প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এই পর্বে আমি যে কাহিনীটি বলতে যাচ্ছি, তার উদ্দেশ্য হল ওই সময়েও

জেঠামশাইদের মতো প্রাক্তন ভূস্বামীরা কী ধরনের আচরণ করতেন তার কিঞ্চিৎ নিদর্শন দেখানো।

বাবা এবং অন্যান্য শুভাকাঙ্ক্ষীরা আশংকা করেছিলেন যে এই নির্বাচনে ব্যাপক গণ্ডগোল হবে। মুসলমান প্রতিদ্বন্দ্বীরা একে অন্যের বিরোধী হলেও সাধারণভাবে জেঠামশায়ের শত্রু ছিলেন। এ কারণে তাঁর সম্যক বিপদের কাবণ ছিলই। এমনকি তখন যা পরিস্থিতি তাতে তাঁর খুন হয়ে যাওয়াও অসম্ভব ছিল না। এ শুধু তিনি হিন্দু বলে নয়, এই পরিস্থিতি তিনিই সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু কারুর কথাই তিনি শুনলেন না। নির্বাচনে দাঁড়ালেন তিনি।

এই সময়টাতে আমাদের তালুকদারি নেই। তাই দাপটও সীমিত। থাকার মধ্যে ছিল জেঠামশায়ের ক্ষুরধার তীক্ষ্ণ দুর্বুদ্ধি আর স্থানীয় সাধারণের মধ্যে তাঁর বিষয়ে অসুমার কিংবদন্তি। অবশ্য তার কিছু বাস্তব ভিত্তিও যে ছিল না তা নয়। তালুকদারি থাকাকালীন সময়ে তিনি বেশ কয়েকবার আক্রান্ত হয়ে অলৌকিক ভাবে বেঁচে গেছেন। বড়দের কাছে শুনেছি 'মহালে' থাকার সময় একবার, টিনের পায়খানা ঘরের মধ্যে যখন তিনি প্রাতঃকৃত্যে রত, তখন জনৈক আততায়ী বল্লম ছুঁড়ে দুদিকের বেড়া এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছিল। তাঁর আঁ আঁ চিৎকারে কাছারির আমলারা ভেবেছিল তিনিও এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেছেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণ অক্ষত শরীরে বাইরে বেরিয়ে এসে খুবই স্বাভাবিক ভাবে নায়েব মশাইকে নির্দেশ দেন যেন অচিরেই তিনি আততায়ীর নামে খুনের চেষ্টার অভিযোগে থানায় একটি ডায়রি করেন। এখন কথা হচ্ছে আততায়ীকে তো তিনি দেখেনই নি, তার নাম উল্লেখ করে কি ভাবে ডায়রি করা। কিন্তু এসব প্রশ্ন অবান্তর। শত্রুর অভাব নেই, কারুর একজনের নাম দিলেই হল। তাতে যদি রামের জায়গায় শ্যাম সোপর্দ হয়, কিছু আসে যায় না।

আবার একবার বাড়িতে থাকার সময় কোনও এক বিশেষ ফৌজদারি মামলায় পুলিশ গ্রেফতার করতে আসলে তিনিই ইঙ্গিতে জানিয়ে দেন যে তিনি বাড়িতে নেই। পশ্চিমে কোথাও গেছেন। পুলিশদের আসতে দেখেই তিনি একটি কাঁথা জড়িয়ে বসে ঈশ্বরের নাম জপ করছিলেন। পুলিশদের ইশারায় জানিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি মৌনী আছেন। পুলিশ খালপারে পৌঁছোবার আগেই মহাশয় বৈঠকখানা ত্যাগ করে পেছনের দরজা দিয়ে উধাও। প্রতিবেশী কোনও বিরুদ্ধবাদী ব্যক্তির প্ররোচনায় পুলিশের পুনরায় আসা সম্ভব।

মহাশয় সাতিশয় ধুরন্ধর। মানুষকে পথে বসাতে তাঁর মতো নিপুণ সামন্ত কারিগর ওদিগরে আর দ্বিতীয় ছিল না। তাই মানুষের তাঁর প্রতি আক্রোশ থাকা স্বাভাবিক। বাবা এই নির্বাচন উপলক্ষে বাধ্য হয়ে তাঁর সুরক্ষার জন্য কিছু ব্যবস্থা নিয়েছিলেন, কিন্তু শুধুমাত্র ভোটটি দেওয়া ছাড়া, এ ব্যাপারে তিনি আর কোনও উদ্যোগে থাকলেন না। নির্ধারিত দিনে ভোট পর্ব শেষ হল। বাবা ভোট দিয়ে বাড়ি চলে এলেন। ভোট নির্বিঘ্নেই সমাধা হয়েছিল। জেঠামশাই ওখানেই থেকে গিয়েছিলেন, কারণ ভোটের ফলাফল ওখানেই ঘোষিত হবার কথা।

সন্ধে ছটা নাগাদ তুমুল হট্টগোলের আওয়াজ পাওয়া গেল। ভোট কেন্দ্রটি পাশের গ্রামের একেবারে প্রত্যন্তে হলেও গণ্ডগোলের মারমার কাট্‌কাট্‌ শব্দ আমাদের বাড়ি থেকে স্পষ্টই শোনা যাচ্ছিল। আমরা এমনিতেই আতঙ্কগ্রস্ত ছিলাম। হট্টগোলের তীব্রতায় উৎকণ্ঠা আরও বাড়ল। বাবা আমাদের নাপিতকাকা যদুনাথকে ডেকে পাঠালেন। তিনি হন্তদন্ত হয়ে এসে জানালেন যে খবর পাওয়া গেছে মুসলমানেরা জেঠামশাইকে ঘিরে ফেলেছে এবং ঘটনা যে কী ঘটবে বলা মুশকিল। বাবা এসংবাদে খুবই চঞ্চল হয়ে পড়লেন এবং তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে যাবার উদ্যোগ করলে নাপিতকাকা আর গ্রামের অন্য কয়েকজন তাঁকে এ অবস্থায় ওখানে যেতে নিষেধ করতে লাগলেন। বাবা জানালেন যে তাঁর পক্ষে এক্ষেত্রে চুপচাপ বসে থাকাটা নিতান্তই অসম্ভব। বরং কেউ যদি তাঁর সাথে যেতে চায় যেতে পারে। এ প্রস্তাবে নাপিতকাকা আর কোবরেজ কাকা ছাড়া আর কেউ এগোলেন না। নাপিতকাকা জিজ্ঞেস করলেন—হাথ্‌ইয়ার কিছু লমু?

: না

: নীলু কি নারায়ণ ঠাকুরকে ডাকুম?

: না। দুটি প্রশ্নের জবাবেই বাবা 'না' বলে দেওয়ায় কোবরেজ কাকা বললেন, খালি হাতে যাওয়া কী ঠিক হইবে? বাবা জানালেন যে এ অবস্থায় হাতিয়ারবন্দ্‌ হয়ে যাওয়া নিরর্থকই শুধু নয়, বিপদজনক। হিতে বিপরীত হবার সম্ভাবনা। দ্বিতীয় নীলু বা নারায়ণ যদিও বাবার খুব অনুগত, কিন্তু তাদের মুখের থেকে হাত আগে চলে। তাও বিপদজনক। প্রকৃত ঘটনাটা কী জানা যাচ্ছে না। গণ্ডগোলটা জেঠামশাই স্বয়ং করাচ্ছেন কিনা তাও বোঝা যাচ্ছে না। ঘটনাস্থলে না গিয়ে কিছুই ঠিক করা সম্ভব নয়।

বাবা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন তা বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু তাঁর এভাবে ঘটনাস্থলে যাওয়াটা বাড়ির সবার আতঙ্কের কারণ হয়েছিল। বাড়িতে মা, বড়মা, ছোট ভাই-বোনেরা ছাড়া ছিলাম আমি আর বাড়ির চাকর ফটিক। আমরা দুজনে বাড়ির সামনের দিকে নজর রাখছিলাম। যদিও বাড়ির উপর হামলা হলে আমরা কিছুই করতে পারতাম না, তবুও বাড়ির লোকদের সাহস জোগাবার জন্য আমাদের যথাসম্ভব দৃঢ় থাকতে হচ্ছিল। পাড়ার দুএকজন সমবয়সি ছেলেদের ডেকে একটু দলভারী করে নিয়েছিলাম। দুএকজন সংবাদদাতা এর মধ্যে কখনও কখনও এসে নানারকম ভয়ঙ্কর সব খবর দিয়ে যাচ্ছিল। কেউ বলছিল সে শুনেছে কম করে দশটা খুন হয়েছে। কেউ বলল, মিঞারা আজ রাতে গোটা এলাকাই জ্বালিয়ে দেবে। একজন বলল, জেঠামশাইকে একটা ঘরে আটকে রাখা হয়েছে এবং তাঁকে কেটে ফেলার মতলব করছে মিঞারা। এইরকম সব খবর আসছে আর বাড়ির মধ্যে আর্তনাদ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। পাড়ার লোকেরা ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে। ওদিকে কোলাহল এবং মার মার ধ্বনি তুঙ্গে। সব মিলিয়ে একটা নারকীয় পরিস্থিতি, যেন পঞ্চাশ / একান্নর পুনরাবৃত্তি এক্ষুনি ঘটতে চলেছে।

এইসব হুলস্থুলুর মধ্যে দেখা গেল জনা তিনেক লোক আমাদের বৈঠকখানার দিকে আসছে। তারা অত্যন্ত উত্তেজিত ভঙ্গিতে কথা বলতে বলতে আসছিল। ফটিক আর আমি তাদের লক্ষ্য রেখে বৈঠকখানার নীচে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকলাম। তারা মাত্র তিনজন এবং তিনজনের মহড়া আমরা নিতে পারব এরকম একটা প্রস্তুতি আমাদের ছিল। কিন্তু তারা কাছাকাছি পৌঁছোলে বুঝলাম যে তিনজনের একজন জেঠামশাই। যাক্, তাহলে তিনি খুন হননি। তবে যথেষ্ট উত্তেজিত। কথাবার্তায় বুঝলাম সাথের দুজন লোক মুসলমান এবং জেঠামশায়ের অনুগামী। তারা জেঠামশাইকে বোঝাচ্ছিল যে যদি তালুকদারের দোতলার ঘর থেকে জেঠামশাইকে তারা সরিয়ে না আনত তবে তিনি 'নিয্যস' খুন হতেন।

তালুকদারের নাম নান্নুমিঞা। ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল ত্রিমুখী। নান্নুতালুকদার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী। এছাড়া একজন হলেন জেঠামশাই এবং অপরজন সলিমুল্লা নামে জনৈক বিড়ি কারখানার মালিক। গঞ্জের কাছে তাঁর বিখ্যাত আলো বিড়ি ফ্যাক্টরি। বড় করে সাইনবোর্ড লাগানো আছে-'আলো বিড়ি ফ্যাক্টরি। উৎকৃষ্ট নেপানী তামাকে প্রস্তুত। প্রোঃ মহঃ সলিমুল্লাহ'। এমনিতে সজ্জন মানুষ। ব্যবসায় বিলক্ষণ দু পয়সার মালিক হয়ে দশচক্রে এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠার লোভে ভোটে দাঁড়িয়েছেন। তবে তাঁর সাথে তালুকদারের বিরোধ শুধু নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য নয়। গ্রামীণ ব্যবহার অনুযায়ী আঞ্চলিক ক্ষমতা এবং জমিজমা সংক্রান্ত অনেক গূঢ় কারণই ছিল। নান্নুমিঞা যে খুব একটা হার্মাদ মানুষ তাও নয়। বিশেষত বাবার সাথে খাতির থাকায় জেঠামশাইকে অসম্মান বা হেনস্থা করার মতো সাহস বা মানসিকতা তাঁর থাকার কথা নয়। কিন্তু জেঠামশায়ের তাঁর উপর বিলক্ষণ ক্রোধ, যদিও তাঁর স্বভাবানুযায়ী প্রকাশ্যে তার স্ফুরণ নেই। ক্রোধের কারণ 'তালুকদার বক্সী বাড়ি খায়'-এবং তা প্রায় জেঠামশায়ের 'বুকের উপর বইয়া'। একারণে তাঁর সামন্ত রক্তে ব্যাপক 'টাডানি'। কিন্তু এসবই উপরের ব্যাপার। গভীরে কী আছে, তা যদি কেউ জানেন তো জেঠামশাইই। একারণে আগেই বলেছিলাম যে গণ্ডগোলটা তাঁরই তৈরি করা কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের কারণ আছে। ইউনিয়ন কাউন্সিলের ক্ষমতা সহজে ছেড়ে দেওয়ার পাত্র আর যেই হোন জেঠামশাই নন, এরকম অভিজ্ঞতা আমাদের সবারই ছিল। ইউনিয়ন কাউন্সিল হাতে থাকলে মানুষ বাধ্য হয়ে তাঁর কাছে আসবে বিভিন্ন প্রয়োজনে। গ্রাম গাঁয়ে জমিজিরেত, এটা ওটা নিয়ে হামেশা বিরোধ বিসংবাদ লেগেই থাকে। তার সালিশি নিষ্পত্তির জন্য কাউন্সিলে আসতে হবেই। এখন আর তালুকদারি নেই। অতএব, হাতের-পাঁচ ইউনিয়ন কাউন্সিলটা ছেড়ে দেওয়া আদৌ যুক্তিযুক্ত নয় তাঁর বিচারে।

এইসময় পরিত্যক্ত ভদ্র হিন্দু গৃহস্থের ভিটেবাড়ি দখল নিয়ে হিন্দু মুসলমানে, হিন্দুতে হিন্দুতে এবং মুসলমানে মুসলমানে হুজ্জোতি কম হয়নি। তালুকদার পাশের গ্রাম নৈকাঠির একনম্বর জোতদার। তাঁর লোকবল, প্রতিষ্ঠা, সরকারি আমলাদের সাথে যোগাযোগ নেহাৎ কম ছিল না। তথাপি জেঠামশাইকে যে তিনি নিকেশ করার ষড়যন্ত্র

করেছিলেন অথবা আদৌ কোনওরকম স্পর্ধা করার সাহস তাঁর হয়েছিল এটা বিশ্বাস করা কঠিন। অথচ জেঠামশায়ের সাথে যে দুজন লোক এসেছে, তারা সেকথাই বলছে। এদের একজনের নাম জনুমিএগ্রা অপরজন মোদাচ্ছের। জনুর বাবা কাসেমকে জেঠামশাই ওখানকার একটি 'ছাড়া' ভিটেয় বসত করিয়ে ছিলেন বলে জনু তাঁকে ধর্মবাপ বলে ডাকত। কাসেম নৈকাঠিতেই ছিল। এখন নতুন ভিটেতে উঠে এসে তারা সম্পন্ন গেরস্থালি পাতে। মোদাচ্ছের-কেও জেঠামশাই অনুরূপ একটি বাড়িতে বসত করাবার ওয়াদা করে রেখেছিলেন বলে সেও তাঁর খুবই অনুগত। তবে জেঠামশাই যে এদের দারিদ্রে কাতর হয়ে জমি-জিরেত সহ ছাড়া ভিটেবাড়িতে বসত করিয়েছিলেন তা আদৌ নয়। এ ব্যাপারে তাঁর নানাবিধ স্বার্থ এবং কুচক্রিপনা কাজ করছিল। তালুকদার যে ছাড়া ভিটে ভোগ-দখল করছিলেন, তা তাঁর অহংবোধকে আঘাত করেছিল বলে তিনি ভেতরে ভেতরে তাঁর উপর বিরূপ ছিলেন।

এখন জনু আর মোদাচ্ছের যে তাঁর খুন হওয়ার সম্ভাবনা বিষয়ে আলোচনা করছে এবং তালুকদারকে দায়ী করছে, এবিষয়ে তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাচ্ছে না। ভাবটা এরকম যে, এরা এরাই বলুক। তাতে 'কেইস্ জোরদার' হবে। এদের গণনার প্রাথমিক পর্যায় শেষ হলে সাধারণ জনতাকে জেঠামশাই নিজের লোক দিয়েই নিজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করান যাতে ব্যাপারটা পুরো ভণ্ডুল হয়। এদের কথায় আরও জানা গেল যে ভোটে সলিমুল্লা জিতেছেন, তালুকদার পাঁচ ভোটে হেরেছেন আর জেঠামশাই ভোট পেয়েছেন মাত্র তিনটে। একটা নিজের, একটা বাবার আলেকটা যদুনাথের। ব্যাপারটা বোধহয় তাঁর কাছেও অপ্রত্যাশিত ছিল না। জেতার জন্য তিনি দাঁড়ান নি, তাঁর হিসেব অনেক সুদূরপ্রসারী ছিল, সেটা এখন বুঝতে পারছি। সেই হিসেবের অন্যতম ছিল তালুকদারকে ঘোল খাওয়ানো এবং নির্বাচন বান্‌চাল করে একটা অচলাবস্থার সৃষ্টি করা। মামলাবাজ মনুষ্য এবং চন্দ্রদ্বীপস্থ ঈদৃশ ব্যক্তিদের স্বভাবে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাঁর এইসব কর্মকাণ্ড সম্যক বুঝবেন।

জনুকে আমরা জনুদা বলে ডাকতাম। সরলসোজা সাদামাটা চাষি। আমাদের বাড়ির সবারই অসম্ভব অনুগত। আড়ালে থেকে শুনছিলাম জনুদা বলছে, বাবা আপনেরে ঐ আজরাইলের পোয় টোঙ্গের ঘরে নেলে ক্যামনে? আর নেছেলেই বা কেডা? মুই হ্যার ক্যাল্লার নলিডা এট্টু মাপমু। জেঠামশাই জানালেন যে, তালুকদারই নাকি তাকে বলেছিলেন যে পাব্লিক খুব খেপে গেছে তাঁর উপর, তাই ওখানে থাকা তাঁর পক্ষে উচিত হবে না। তিনি তাঁর জনাদুয়েক কামলা দিয়ে প্রায় জবরদস্তি ওখানে পাঠিয়ে দেন। খুবই সরলভাবে জেঠামশাই জানালেন যে জনুরা যা বলছে তা ঠিক নয়। তিনি তো তালুকদারের ভালই চান। তবে তিনি কেন জেঠামশাইকে খুন করার কথা ভাববেন? অবশ্য তালুকদার জনু মোদাচ্ছেরদের অনেক ক্ষতিই করেছে, তবু তিনি তাঁকে সন্দেহ করতে পারেন না। সরলবুদ্ধি জনু তাঁর কথার প্যাঁচ বোঝে না। সে বলে, মোর যদ্দুর মোন লয় ঐ বৌয়ার পোয় চাইছেলে আপনের গলার নলিডায় আড়াই পোচ লাগাইয়া

খাল ধারে ফ্যালাইয়া রাখতে। মাইনসে ভাবতে গোণ্ডোগোলের মইদ্যে কেডা না কেডা এরকম করছে। বলাবাহুল্য মোদাচ্ছেরও একথায় সহমত প্রকাশ করল।

তাদের এইসব বার্তালাপের মধ্যে আমি আর ফটিক আড়াল থেকে বেরিয়ে এলাম, যেন বাড়ির ভেতর থেকেই আসছি লোকের সাড়া পেয়ে। জেঠামশাই আমার সাথে বিশেষ বার্তালাপ করেন না। ফটিককে বললেন, ভাইটিকে ডাক্। ভাইটি অর্থে বাবা। ফটিক জানাল যে তিনি যদুনাথ আর কোবরেজ মশাইকে নিয়ে নৈকাঠি গেছেন। একথায় জেঠামশাই ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বললেন, জনু, মোদাচ্ছের তোমরা এক্ষুনি যাও। ভাইটি গেছে। বেবাক ভণ্ডুল হয়ে যাবে। ও হয়ত এতক্ষণে মার দাঙ্গা শুরু করে দিয়েছে। তাহলে কিন্তু কেস মাটি। এতক্ষণে কটা মাথা ফেটেছে বা খুন হয়েছে বলা মুশকিল। তারা বলল, আমরা একজন যামু আর একজন থাকমু। আপনেরে এল্‌হা ফ্যালাইয়া দুইজন যাইতে পারিনা। কিন্তু জেঠামশাইয়ের বক্তব্য দুজনকেই যেতে হবে। কারণ ভাইটি যদি ইতিমধ্যে ঝঞ্ঝাট মুসিবৎ কিছু পয়দা করে থাকে তো কেস চৌপাট। এতক্ষণে আমার অনুমান সঠিক প্রমাণিত হয়। মহাশয় তাঁর মস্তিষ্কে গোটো ব্যাপারটির একটি ছক তৈরি করে রেখেছেন। এখন সেই ছক মোতাবেক খেলা চলবে এবং আখেরে তালুকদারের হাড়ে দূর্বা গজাবে।

জনুদা আর মোদাচ্ছের রওনা হবার আগেই বাবা, নাপিত কাকা এবং আরও কয়েকজন লোক এসে পড়লেন। জেঠামশাই বাবাকে বিলক্ষণ ভর্ৎসনা করে বললেন যে এরকম একটা পরিস্থিতিতে তাঁর ওখানে যাওয়াটা খুবই গর্হিত হয়েছে। বাবা যদিও জেঠামশাইয়ের মুখের উপর কখনওই কথা বলেন না, কিন্তু সেদিন প্রায় বিতর্কই শুরু করেলেন। জানতে চাইলেন, গণ্ডগোলটা কেন এবং জেঠামশাইকে আটকে ছিলই বা কে। জেঠামশাই বললেন, হে কথা পরে কমু। কিন্তু তুমি সেহানে গেলা ক্যান্? তোমার কী হিতাহিত কাণ্ডাকাণ্ডি জ্ঞান নাই? অরা যদি তোমারে বিসদৃশ এট্টা কিছু করতে? বাবা শান্তভাবে জবাব দিলেন যে তাঁর সঙ্গে ওরা কখনওই তেমন কিছু করবে না।

: কিন্তু তুমি আচুক্‌কা হেহানে গেলা ক্যান?

বাবা নিরুত্তর।

: মাইর ধইর কিছু কর নায়তো?

: না!

: বোজলা কী? তালুকদারেব লগে দ্যাহা অইছে?

: হ। তালুকদারের দোষ নাই কোনো।

একথায় জনুদা ও মোদাচ্ছের সমস্বরে বলে ওঠে, তয় হ্যার বাড়িতে এনারে আটকাইলে ক্যা?

: পাব্লিক খ্যাপছে দেইখ্যা। তালুকদারে জানে যে দাদার যদি ওহানে কিছু হয়, তয় হ্যারে আমি খালের চড়ায় পুঁত্‌ইয়া ফ্যালামু।

বাবা অন্তর থেকে এমনিতে সোজা মানুষ। কিন্তু তাঁর দাদা এবং সমাজের চাপে, মাঝে মাঝে বিপরীত আচরণ করে বসতেন। জ্যেষ্ঠের উপর তাঁর একটা অন্ধ ভালবাসা

ছিল। তাই তাঁর অন্যায় আচরণেও কখনও তিনি কিছু মন্তব্য কবতেন না। উপরন্তু অন্য কেউ কিছু সমালোচনা করলে বাবা ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজেও কিছু অন্যায় উগ্রকর্ম করে ফেলতেন। এটা অবশ্যই তাঁর চরিত্রে একটি বিশিষ্ট সামন্ত লক্ষণ। তবে এই নির্বাচন উপলক্ষে উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বাবা পরিষ্কার বলে দিলেন যে বর্তমান ঘটনাকে অজুহাত করে জেঠামশাই যদি তালুকদারের কোনও অহিত করেন তবে তিনি তাঁর সঙ্গে সহমত হবেন না। বাবার মতে তালুকদারের একটাই ত্রুটি, সে অত্যন্ত ভূমিলোভী। তবে সে দোষে এ ব্রহ্মাণ্ডে কেই বা দুষ্ট নয়? বিশেষত দেশভাগ পরবর্তী কালে এ ব্যাপারে ঠক্ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। জেঠামশায় বললেন. কিন্তু সেতো আমাকে খুন করার জন্যই নাকি আটকে রেখেছিল, অন্তত এরা তো তাই বলছে। বাবা বলেন, ও আটকে না রাখলেই তুমি মরতে। তুমি জাননা, আমি ভোট দিয়ে আসার সময় ওকে বলে এসেছিলাম তোমার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে। সে আমার কথা রেখেছে।

কিন্তু জেঠামশাইয়ের মাথায় তখন অন্য প্যাঁচ। মুসলমান মানেই তাঁর দুশমন। বিশেষ করে ইউনিয়ন কাউন্সিলের ক্ষমতা ভোগে তাঁর ভূমিকা থাকবে না, এ তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারবেন না। বললেন, আমাকে মারা অত সহজ না। তবে এই গণ্ডগোলটা হয়ে ভালই হয়েছে। দেখি এরা কী করে ইউনিয়ন কাউন্সিল চালায়। বাবা খুবই বিনয়ের সঙ্গে বললেন, দাদা অনেক হয়েছে এবার ছেড়ে দাও। দিনকাল পাল্টে গেছে। আমাদের সেই তালুকদারি দাপটের দিন আর নেই। চারদিকের অবস্থাতো দেখছই। জেঠামশাই সংক্ষেপে উত্তর করলেন, ছেড়ে দেব? সম্ভব নয়। উপস্থিত সবাই বুঝল, সামনে এক অত্যন্ত জটিল এবং ভীতিপ্রদ অবস্থা তৈরি হতে চলেছে। বাঘ শিকারকে চিহ্নিত করেছে। এখন শুধু ঝাঁপ দেবার অপেক্ষা। বাঘের থাবায় তালুকদার, সলিমুল্লাহ্ বা অন্য কে বা কারা যে পড়বে তার হদিস কারুরই জানা নেই।

জনু আর মোদাচ্ছেরকে তিনি বললেন যে তারা যেন সেদিনই থানায় যায় এবং যেমন কথা হয়েছে সেই অনুসারে সব করে। পরের দিন সদরের কোর্টে তাদের সাথে দেখা হবে। তারা একথা শুনে চলে গেলে বাবা জানতে চাইলেন—তাহলে কী তুমি তালুকদারকে জেলে পুরতে চাও? জেঠামশাই হেসে বললেন, না না। তুমি এসব বুঝবে না। তালুকদার দেখবে'খন আজ ভোর রাত্রেই এসে পায়ে পড়বে। তবে ঐ হিন্দুর ছাড়া ভিটে দখল করে অনেক পয়সা হয়েছে তো, এবার একটু খরচ করতে হবে। চেয়ারম্যান হবার সখ হয়েছে, হুঃ।—সলিমুল্লাহ কত ভোটে জিতল? বাবার প্রশ্ন।— আরে সেটাইতো খেলা। আমি তো জানতামই যে তিনটের বেশি ভোট আমি পাবনা। সলিমুল্লাহ জিতেছে পাঁচ ভোটে। একে জেতা বলে? সুতরাং বুঝতেই পারছ তালুকদারের একারণে একটা কেস্ করা উচিত। তুমি কী বল?—জেঠামশাই প্যাঁচ খুলছেন। বাবা বললেন, সেকথা থাক। তবে you must not put him into any serious trouble like attempt to murder. ও কিন্তু আদৌ দাঙ্গাবাজ নয়। এদেশে থাকতে হলে এইসব মানুষদের সাথে সদ্ভাব রাখা বিশেষ প্রয়োজন। জেঠামশাই

জানালেন যে যদিও এসব তাঁর জানা, তথাপি এইসব মানুষদের উপর তিনি আদৌ কোনও ভরসা করেন না। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে তিনি বললেন, He is virtually a fool and he must pay for his foolishness. তবে ভেবো না, তোমার সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা আমার জানা আছে।

সেদিন বাবা এবং জেঠামশায়ের মধ্যে যেসব আলোচনা হয়েছিল তা আজও বেশ মনে আছে। জেঠামশাই বলছিলেন, আমি জানি দেশের অবস্থা কী এবং বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের ভবিষ্যৎ যে কী তাও বেশ ভাল করেই বুঝে নিয়েছি। সেকারণেই এইসব মানুষদের উপর সামান্যতম ব্যবহারিক শিথিলতা দেখাতে আমি রাজি নই। এদেশে সংখ্যালঘুরা কোনওদিন রাষ্ট্রীর ক্রমে কিছুমাত্র গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করতে পারবে না। সে প্রচেষ্টাও প্রথমাবধি তাদের মধ্যে দেখা যায় নি। দেশভাগ হবার পর থেকে মানসিক ভাবে এরা আর এদেশের মানুষ বলে নিজেদেরকে ভাবছে না। ভারতের সংখ্যালঘু আর এখানের সংখ্যালঘুদের মধ্যে এটা একটা বড় পার্থক্য। সে অনেক ব্যাপার কত আর বলব। তবে আমার উদ্দেশ্য এই যে অন্যভাবে যখন পারছি না তখন বুদ্ধির জোরে যতটা পারি এদের সর্বনাশ করে যাব।

জেঠামশায়ের ধারণা এবং ব্যাখ্যায় এদেশে কোনওদিনই প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসনক্রম আসবে না। তাঁর ভাষ্যে 'Perhaps it's a lost land. They have already sold it to the American giants. We are lost no doubt but they are drowned totally.'

জেঠামশায়ের বিশ্লেষণে হয়ত ভুল খুব একটা ছিল না, তবে তাঁর কর্মপদ্ধতি ছিল ভয়ঙ্কর, তা মানুষের কোনও কল্যাণে কখনওই ব্যবহৃত হয়নি।

পিছারার খালের জগতে গ্রামীণ রাজনীতি এরকমই ছিল। আবার এটা জাতীয় রাজনীতির প্রচ্ছায়াও বটে। বাবার আপশোস ছিল এই যে জেঠামশায়ের মতো এমন একজন বুদ্ধিমান বিচক্ষণ লোক এরকম এক ক্ষুদ্র পরিবেশে জন্মে নষ্ট হলেন। তাঁর দুর্বুদ্ধিয়ানার ব্যাপক কর্মকাণ্ড সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে উপযুক্ত ক্ষেত্র পেলে তিনি একজন নাম-করা রাষ্ট্রপুরুষ হতে পারতেন। নিতান্ত গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে তাঁর প্রতিভা প্রতিষ্ঠা পেলনা। শুধু কমবুদ্ধি সম্পন্ন গ্রামীণ প্রতিস্পর্ধীরা তাঁর দুর্বুদ্ধির দাহে দগ্ধ হলেন। তাঁর প্রগাঢ় বুদ্ধি এবং কর্মক্ষমতা শুধু অকাজে এবং মানুষের অনিষ্টের জন্যই ব্যয়িত হল। কিন্তু এ বিচার আমার পিতৃদেবের। আমি আজও এ বিশ্বাসে স্থির যে উপযুক্ত ক্ষেত্রে বিকাশ লাভ করলে তিনি একজন ছোটখাট হিটলার হতেন এবং গোটা দেশের নিম্নবর্গীয় এবং মধ্যবর্গীয় হিন্দু ও মুসলমানদের concentration camp-এ না পাঠিয়েও শুধুমাত্র পারস্পরিক বিরোধিতার মধ্যে ঠেলে দিয়ে ব্যাপক বিধ্বংস ঘটাতে সক্ষম হতেন। তারা বুঝতেও পারতনা যে তিনিই তাদের ধ্বংসের কারণ। তারা একে অন্যের সাথে মামলা মোকদ্দমায় স্ববুদ্ধি দোষেই ধ্বংস হত, যেমন পিছারার খালের জগতের মানুষেরা হয়েছে। তিনি সব কিছুর উদ্গাতা হয়েও ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকতেন। কিন্তু তাবৎ কর্মের সূত্রটি থাকত তাঁরই হাতে।

জেঠামশাই শুনেছি কিছুকাল নাকি আইন কলেজে অধ্যয়ন করেছিলেন। অকালে পিতৃবিয়োগ বশত শিক্ষাটা সম্পূর্ণ হয়নি। এটা আমাদের ঐ অঞ্চলের ব্যাপক সাধারণের পুণ্যফল। ভাগ্যিস তিনি একজন পূর্ণাঙ্গ উকিল বা ব্যারিস্টার হননি। হলে অবস্থা যে কোথায় দাঁড়াত, ভাবলে বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে।

আমার এই ধারণার উদাহারণ হিসেবে আমি তালুকদারের পরিণতির কাহিনীটি বলব। তাজ্জব বনে গিয়েছিলাম সেদিন জেঠামশায়ের অনুমান দেখে। কী সাংঘাতিক ছক কষেছিলেন তিনি ইউনিয়ন কাউন্সিলের নির্বাচন ভণ্ডুল করার। অনুমান তাঁর অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছিল। তালুকদার সত্যিই সেদিন ভোর রাত্রে এসে হাজির হয়েছিল ভীত সন্ত্রস্ত এবং অসহায় ভাবে। দরদালানের একটা থামে হেলান দিয়ে বসে প্রথমে বাবাকে ডেকেছিলেন তিনি। বাবা এবং আমরা সবাই নীচের তলায় থাকতাম আর জেঠামশায়রা দোতলার একেবারে দক্ষিণ পার্শ্বের ঘরে। কথাবার্তার শব্দে মা এবং আমিও উঠে পড়েছিলাম। গতকালের ভীতি আমাদের তখনও প্রবল। তাই ব্যাপারটা কী তা জানার প্রয়োজন ছিল। জেঠামশাইকে খুন করার চক্রান্তের গল্পটা তালুকদারের কানে পৌঁছেছিল। তিনি বাবাকে সকাতরে বলছিলেন, দাদা, আপনে কী একতা বিশ্বাস যায়েন যে মুই বড়দাদারে খুন করার মতলবে মোর বাড়িতে আটকাইয়া রাখছেলাম? বাবা বললেন, না, আমি একথা আদৌ বিশ্বাস করিনা। আমি কী তোমাকে জানিনা? তালুকদার বাবার কথা শুনে কি রকম যেন হয়ে গেলেন। বাবার হাত দুখানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে খানিকক্ষণ ধরে হেঁচকি দিয়ে কাঁদতে লাগলেন। বাবা তাঁর কাতরতার প্রকৃত কারণ বুঝতে পারছিলেন এবং সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন। তালুকদার বলছিলেন, দাদা, মোরা বুজি এহন ক্যাওই ক্যাওরে চিনি না, বুজি না। কী যে এক দেশভাগ অইলে আর কী যে এক লোমের আজাদি পাইলাম জানি না। আছিলাম হালইয়া চাষা, এহন অইছি তালুকদার। তমো লালস যায়না। খালি হিন্দুগো ছাড়া ভিডা খাওনের লালস্। মোরা এহন হেই লালসে একে অন্যেরে হিংসা করি, সন্দেহ করি। হা-আল্লা। বাবা বলছিলেন, ওকথা থাক। ও কথা বলে লাভ নেই। কাজের কথা বলি। যে যাই বলুক, আমি থাকতে তুমি প্রাণে মরবে না। এরা সবাইই আমাকে চেনে। তবে নিজে একটু বুদ্ধি খরচ করে চলতে চেষ্টা কর। পরের কথায় নেচো না। দাদার কথায়ও না। তিনি তোমার বিরুদ্ধে কোনো কেস্ করবেন না, সে ব্যবস্থা আমি করেছি। সব কথা তোমাকে বলতে পারব না, বললেও তুমি বুঝবে না। শুধু বুদ্ধিটা ঠিক রেখে চলবে।

কিন্তু বুদ্ধি তালুকদার ঠিক রাখতে পারেনি। বাবার সাথে কথোপকথনের শব্দে বোধহয় জেঠামশায়ের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। দোতলার অলিন্দ থেকে তাঁর গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, কে ওখানে?

: বড়দাদা, মুই তালুকদার।

: কখন এলে? কার সাথে কথা বলছ?

: এই তো এহনই আইলাম। আইয়াই দাদারে উডাইসি। হেনার লগেই প্যানা পোটতে আছি।

: ভাল। তো ওদিকের খবর কী? সলিমুল্লা কী বলে?

: হে যা কয় কউক। মুই কী করুম কয়েন।

: তোমাকে কিছু করতে হবে না। যা করার আমি করব। তুমি তো জানই ভোটে কারচুপি হয়েছে। নচেৎ জেতার কথাতো তোমারই। তাই মামলা একটা করতে হবে।

: কারচুপি তো অইছেই। নাইলে দ্যাহেন, সলিমুল্লার যে ভোডগুলা বাতিল হওন জায়েজ, হেয়া এট্টাও অইলে না। আর মোর অতগুলা ভোট বেয়াক বাতিল ধরা অইলে, এডা কেমন বিচার?

: সেই কথাই তো বলছি। সেই কারণেই মামলা করা জরুরি। নাকি কও?

: মামলা করবে কেডা?

: কেন তুমি। নাকি ভয় পাচ্ছ?

: আপনে মাথার উপাব থাকলে মুই ক্যারে ডড়াই?

: ঠিক আছে। তুমি যাও। দেখি কী করা যায়। তালুকদার খুবই আশ্বস্ত হয়ে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ায়। একটু ইতস্তত করে অলিন্দের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, বড়দাদা, আপনে কী মোরে অবিশ্বাস যায়েন? জনু, মোদাচ্ছের কাইল যেয়া কইলে, আল্লায় জানে মোর হেরহম খাস্‌লত্ কোনোদিন অইবে না। মুই জানি জমিদারি না থাকলেও আপনেই মোগো রাজা। জেঠামশাই একথায় বাড়ি কাঁপিয়ে এমন এক অট্টহাস্য করলেন যে অলিন্দের চৌখুপির কবুতরগুলো ভয়ে ঝট্‌পট্ করে উড়ে গেল। বললেন, মিঞা, অন্যের মুখে ঝাল খাই না। আল্লার কুদ্‌রতে আমার চক্ষুজোড়া বেশ নজরদার। ভয় নেই। তুমি যাও। কালকের ঘটনার জন্য তোমাকে জেলে যেতে হবে না, কথা দিলাম, ইন্‌শাল্লাহ্। মুসলমানদের সাথে কথা বলার সময় জেঠামশাই এই 'ইন্‌শাল্লাহ্' শব্দটি প্রায়ই ব্যবহার করতেন তবে ব্যঙ্গার্থে। তালুকদার আদাব আরজ করে চলে যাবার সময় বাবা আবার তাকে মনে করিয়ে দিলেন, ভাইটি, মামলা ফ্যাসাদে যাবার আগে নিজের বুদ্ধি খরচ করে পাঁচবার ভেবো।

তালুকদার চলে গেলে বাবা জেঠামশাইকে বললেন, দাদা, মামলায় যেই জিতুক, তালুকদার তো শেষ হয়ে যাবে।

: ব্যাপারটা বুঝেছ তাহলে? কিন্তু ওকে তো আমি কোনো ফ্যাসাদে ফেললাম না, দেখতেই পাচ্ছ।

: এর থেকে বড় ফ্যাসাদ ওর আর কী হবে, আমি ভেবে পাচ্ছি না।

: সে ফ্যাসাদ তো ও নিজেই যেচে নিল, তুমি দেখলে। আমি জবরদস্তি তো কিছু করতে যাচ্ছি না।

: কিন্তু মামলা চালাতে গিয়ে ও তো শেষ হয়ে যাবে।

: শেষ হবে না। তবে হিন্দুদের ছেড়ে যাওয়া ভিটের রোজগারে ওর একটু গরম বেড়েছে। সেটা এবারে কিছু কমবে।

বাবা বুঝলেন, এই মামলা উপলক্ষ করে তাঁর দাদা পক্ষ বিপক্ষ সবারই বিলক্ষণ ধনক্ষয় করাবেন, যে ধনের একটা মোটা অংশ তাঁর পকেটেই যাবে। এ ব্যাপারে তাঁর

নীতিবোধের মাপকাঠিটি একেবারেই উনিশ শতকের, এমনকী বলতে গেলে মধ্যযুগীয় সামন্ত সর্দারদের মতো। অর্থোপার্জন তথা প্রতিশোধের কোনও পন্থাই তাঁর কাছে পরিত্যাজ্য নয়।

— সাতাশ —

এই মামলার নিষ্পত্তি কবে হয়েছিল, নাকি খরচের ধাক্কায় জেরবার হয়ে তালুকদার নিজেই মামলা তুলে নিয়েছিলেন আজ আর তা আমার মনে নেই। বোধহয় তুলেই নিয়েছিলেন। কেননা, মাঝে মাঝে দেখতাম তিনি জেঠামশাইয়ের কাছে এসে বলতেন,—বড়দাদা এবার আমারে অইব্যাহতি দেন, আর তো পারি না।—জেঠামশায় আড়ালে বলতেন—অইব্যাহতি চায়, এঃ আরে আগে কবরের উপার দুব্বা গজাউক, তয়না অইব্যাহতি। শালা, ছাড়া ভিডা খাবা? চেয়ারম্যান হবা। আমারে কায়দা করবা?

সলিমুল্লাও প্রচুর অর্থক্ষয় করে দেখলেন যে 'বড়বাবু মোরও খায়, শত্তুরেরও খায়।' তিনি ব্যবসায়ী মানুষ। একসময় 'দুত্তোরুনইয়া, চেয়ারম্যানগিরির ফলনাতা হরি'—বলে তালুকদারের সাথে মিটমাট করে নিয়েছিলেন বোধহয়। মাঝখান থেকে মোল্লা মৌলার দল একসময় ইউনিয়ন কাউন্সিল দখল করে নেয় এবং লম্বা কালো কুচকুচে দাড়ি চুলওলা প্রায় পীরপ্রতিম এক জনাব চেয়ারম্যান হয়ে বসেন। পীর সাহেব তখন আমাদের ওখানে বেশ একজন মান্যমান ব্যক্তি। চেয়ারম্যান হয়েই তিনি ফতোয়া দিলেন যে অতঃপর ইউনিয়ন কাউন্সিলের বিচার আচার শরিয়তি নিয়মেই চলবে। দেশটা ইসলামি, তার ব্যবস্থাপনা যদি শরিয়ত অনুযায়ী না হয় তবে পাক্-ই-স্তান অথবা ইসলাম কথাগুলোর কোনও অর্থই থাকে না। চেয়ারম্যান হবার পর তিনি মিলাদুন্নবীর এক ম্যায়ফিলে যে ভাষণটি দিয়েছিলেন, তার মোদ্দা বক্তব্য আমার আজও বেশ মনে আছে। তিনি বলেছিলেন,—বেরাদরানে ইসলাম, আপনেরা জানেন আমি আল্লাহ্ পাকের একজোন নেক্, ইমানদার বান্দা হিসাবেই এতাবৎকাল দীনের খেদমত এবং পরহেজগারিতে নিযুক্ত আছিলাম। আল্লাহ্ পাক রহমানের রহিম। তেনায় ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানরূপ বান্দার পদে আমারে বওয়াইছেন। আপনেরা জানেন, আমি আল্লাহ্ পাকের কুদরত ছাড়া অন্য কোনওকিছুই চাই না। তয়, আমার মতন একজন সামাইন্য বান্দার উপার যহন এই হেকমৎ তিনি ফরমাইছেন, তহন জানকবুল করইয়া আমি তাঁর হুকুমত মোতাবেক বেরাদরীর খিদমত করুম, এবিষয়ে সন্দেহ নাই, ইনশাল্লাহ্।- এবং তিনি অতঃপর শরিয়তি বিধি মোতাবেক কাজকর্ম শুরু করলেন।

এই শরিয়তি কানুনের একটি বিচারের কথা বেশ মনে আছে। ঘটনাটি যদিও খুবই গা ঘিন ঘিন-কর তথাপি বলতে হচ্ছে। দেলোয়ার নামে তারুলি গ্রামের একটি ছেলেকে নিয়ে এই মামলা। এই সময়টিতে আমাদের পিছারার খালের এ-পার ও-পারের প্রায় সব বনেদি গেরস্থ ভিটেগুলিই শূন্য। তার বেশির ভাগই তারুলি বা নৈকাঠির মোটামুটি সচ্ছল মুসলমানদের দখলে। জঙ্গল আগাছায় ঐ সব ভিটে এবং নারকেল সুপারির

বাগানগুলো ছেয়ে গেছে। সেসব জায়গার কিছু জেঠামশাইয়ের অথবা চলে যাওয়া মানুষদের অক্ষম শরিকদের দখলেও আছে। তখনও এইসব ভিটে বাগান চটিয়ে, গাছপালা কেটে ধানের ক্ষেত করা হয়নি। সুতরাং এইসব আগান-বাগানে কেউ যদি কিছু অপকর্ম করত, কারুরই নজরে পড়ার উপায় ছিল না। মানুষ কাঠকুটো আনতে অথবা ফলপাকড়া পাড়ার জন্য ছাড়া কখনও এসব স্থানে আসত না। তবে তারুলি নৈকাঠি বা আমাদের আশপাশের অন্যান্য স্থানের লোকেদের গোরু বাছুর এসব জায়গায় চরত।

দেলোয়ারও তাদের গোরু নিয়ে যেত এইসব বাগানে। তাদের দখলে ছিল আমাদের ওখানে চট্‌কি বাড়ির খানিকটা অংশ। খুবই সুন্দর এবং স্বাস্থ্যবান চেহারার এই দেলোয়ার প্রাকৃতিক নির্বন্ধে অথবা কি কারণে জানিনা একসময় পশুমেহী হিসেবে পরিচিতি পায়। একদিন এই চট্‌কিবাড়ির নিভৃত নারকেল বাগানে একটি সদ্যযুবতী বাছুরকে একা পেয়ে সে তার সাথে শারীরিক সম্বন্ধ করে। দুর্ভাগ্যক্রমে বাছুরটির মালিক ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে এবং আমাদের দুএকজনকে ডেকে সাক্ষী মানে। তার ইচ্ছা ছিল বোধহয় আমাদের সাথে নিয়ে দেলোয়ারকে পেটানো। কিন্তু আমরা তাতে রাজি না হয়ে তাকে পরামর্শ দিলাম চেয়ারম্যান হুজুরের শরিয়তি কাউন্সিলে নালিশ জানাতে। সেও তাই করল। হুজুর চেয়ারম্যান মজলিশ ডেকে বিচার করলেন। আমরা সবাই সেই মজলিশে উপস্থিত ছিলাম। পীর সাহেব বললেন, ইয়া আল্লাহ্ ইয়া নবী ! কেয়ামৎ কি আইয়া পড়ল? বেরাদরানে ইসলাম, হে আমার দেলের নবীর বান্দারা আপনেরা দ্যাহেন কি? এ্যাত্তোবড় মুসিবৎ পয়দা হইয়া গেল, আর আপনেরা সব খামোশ অইয়া আছেন? হায় আল্লাহ, ইয়া নসীব ! হুজুর চেয়ারম্যান আরও বললেন যে পাককোরানে এরকম না-ফরজ, না-পাক্ কাম করনের জন্য আল্লাহতায়লার যে গজবের উদাহরণ আছে, কোনও বান্দা যদি সেই বিষয় অবগত থাকে তবে তার পক্ষে এহেন নাজায়েজ কাজ করা কখনওই সম্ভব নয়। এ যেন সাদ্দুম নগরীর সেই সব অভিশপ্ত জাহেলদের বদ রূহ ভর করা 'ছাওয়াল পান' এই পাক ভূমিতে এসে হাজির হয়েছে। আজ যদি ইসলামের সেই সুদিন থাকত, তবে এইসব কুফ্‌রীদের পাথর মেরে মেরে ফেলা হত। যাহোক্, শেষ পর্যন্ত হুজুর রায় ফরমালেন যে পশুর সাথে জেনা করা অতি অপবিত্র কাজ। এস্থলে এই কর্মদ্বারা জানোয়ারটিকেও হারাম করা হয়েছে। অতএব সর্বপ্রথম এই না-পাক্ জানোয়ারটিকে হালাল করা জায়েজ। আর যে অনাচারী আদমজাত পবিত্র ইসলামে শরিক হওয়া সত্ত্বেও এহেন অপকর্ম করতে পারে, তার উপযুক্ত শাস্তি হওয়া উচিৎ দশ-ঘা কোড়া অর্থাৎ চাবুক।

ফলত হারাম পশুকে জবেহ করে হালাল করা হল এবং তার গোস্ত্ আমজনতার মধ্যে বিতরণ করা হল। অনাচারী আদমজাতকে দশঘা কোড়া মেরে তাড়িয়ে দেওয়া হল। সমবেত জনগণ, বলাই বাহুল্য এই বিচারে সাতিশয় আহ্লাদিত হয়ে হুজুর এবং ইসলামের নামে জয়ধ্বনি দিতে লাগল। শুধু গোরুর মালিক সেই গরিব মানুষটি মৃত

পশুটির নীলচে স্থির চোখের দিকে তাকিয়ে একবার 'আল্লাহ' বলে ডুকরে কেঁদে উঠে ছুটে পালিয়ে গেল।

এরপর এই রচনায় আমার পিছারার খালের জগতের কোনও সামাজিক ঘটনার কিছুই আর উল্লেখ করার মতো নেই। কেননা হিন্দু গ্রামগুলিতে গ্রাম-প্রতি দুএকটি অসহায় পরিবার ছাড়া আর কেই নেই। সুতরাং সামাজিক কর্ম, উৎসব, পার্বণ বলতেও কিছু নেই। একদার বারমাসের তেরো ব্রত পার্বণের যারা শরিক তারা এই সোঁতার মায়া কাটিয়ে কোথায় কোথায় গিয়ে কোন মিল কারখানায় কাজ করছে, না কলকাতার শহরতলিতে কোথাও মুদি দোকান বা সবজির দোকান দিয়ে বসেছে না অন্য কোনও পেশার আশ্রয় নিয়েছে জানিনা কেউ। শুধু জানি, তারা একেবারেই হারিয়ে গেছে, আর কোনওদিন ফিরবে না। ভিটে বাড়ি বাগানগুলো সব ধানের জমি হচ্ছে। ও সব জায়গায় কোনও দিন মানুষের ঘরবাড়ি ছিল, তা আর বোঝা যাচ্ছে না। শুধু যেসব পরিবারের কোনও একজন বা দুজন থেকে গেছে, তারা কিছুকাল সেইসব চলে যাওয়া আত্মজনেদের কাছ থেকে দু-একটা চিঠি পায় তখন। সেই সব চিঠিতে অনেক প্রশ্ন থাকে, আক্ষেপ থাকে এবং উপদেশও থাকত। কেউ কেউ এমনও লেখে যে তারা চলে যাওয়ায় অমুকের অর্থাৎ থেকে যাওয়া মানুষদের নিশ্চয়ই কিছু অবস্থার উন্নতি হয়ে থাকবে, কেননা বাড়িঘর জমিজিরাৎ সবই তো এখন তাদের ভোগেই লাগছে। যারা চিঠি লেখে তারা জানেনা যে এখানে যারা রয়ে গেছে তারা আর আগের তারা নেই। ছায়াশরীরের মতো শরীর নিয়ে তারা ছায়াময় একটা সমাজে বাস করছে। তাদের গেরস্থালিও ছায়া-গেরস্থালি। যা একদিন ছিল তারই ছায়া নিয়ে তারা বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ বিহীন এক জীবন কাটাচ্ছে।

থাকার মধ্যে আছেন আমাদের বাড়ির সামনের বড়খালপাড়ের জোড়া রেন্ট্রির সেই বিশাল মহীরূহ। তাঁরা অতিপ্রাচীন এবং উভয় সমাজেরই সকলের নমস্য অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের মতো। আরও হয়ত বছর তিরিশ চল্লিশ ধরে তাঁরা এমনই থাকবেন। তারপর যখন সব গাছ কাটা হয়ে যাবে, সব খাল শুকিয়ে যাবে এবং সব মাটি শুধু লোভের জমি হবে, তখন হয়ত ঐ সব থেকে-যাওয়া প্রচ্ছায়াদের কেউ বৃক্ষ-কসাইদের কাছে তাঁদেরকে অকেজো বুড়ো বলদের মতো বিক্রি করে দুদিনের অন্ন জোগাবে। এভাবেই তাঁরা একদিন অন্তর্হিত হলে বহুকাল পরে সেখানে আমি একদিন আজকের এই শূন্যতার পূর্ণ অবয়ব দেখতে পাব এবং পিছারার খালের জগতের শেষ স্মৃতিটুকুর মোহময়তা আমার লুপ্ত হয়ে যাবে। তারপর থেকে চলে যাওয়াদের মনখারাপ করা চিঠিপত্র কারুর কাছে আসবে না, কেননা স্মৃতির সোঁতা ততদিনে বিস্মৃতির চোরাবালিতে পথ হারিয়ে কোন এক অন্ধকার গহ্বরে বিলীন হয়ে যাবে, কে জানে? তখনও আজকের এই জমি বুভুক্ষু মানুষদের সন্তানেরা এই ভূমির লোল স্তন শুষে শুষে আরও ক্ষীণ প্রচ্ছায়া শরীর নিয়ে ঘুরে বেড়াবে। কিছুই আর প্রাক্তন স্বপ্নসম্ভব বর্ণাঢ্যতায় ফিরে যাবে না। বুড়ি পিসিমা আর নগেন জেঠিমার স্বপ্ন শূন্যতায় মিশে যাবে।

যেসব মুসলমান গ্রাম আজ সাময়িক রক্তসঞ্চারে আমাদের চোখে উজ্জ্বল বোধ হচ্ছে, সেগুলোও একদিন এরকমই হয়ে যাবে। কারণ সেখানের সমাজদেহেও সহস্রজিহ্ব এক লোভী অতিকায় দানব তার আশ্রয় পাকা করে নিয়েছে। অন্য সমাজকে গেলার পালা শেষ হলে সে নিজেকেই গিলতে শুরু করবে এবং তখন এই জনপদ নদীহীন বৃক্ষহীন, ছায়াহীন এক খাঁ খাঁ প্রান্তর হয়ে পড়ে থাকবে।

— আঠাশ —

সামাজিক অবস্থা যখন এরকম এক ইস্যুতে ধরনের রাস্তা ধরল, তখন আমি একনাগাড়ে আট আটটি মাস মাস্টারমশায়ের বাড়িতে কাটালাম। এই সময় থেকেই পিছারার খালের জগতের সাথে শারীরিক ও সামাজিক যোগাযোগ পুরোপুরি পরিত্যাগ করি। মাঝে বারতিনেক মাত্র বাড়ি গিয়েছি। বাবার সাথে ইস্কুলে দেখা হয়। অন্যদের সাথে হয় না। অথচ মনের সামান্যতম আনন্দটুকু বজায় রাখতে হলেও পারিবারিক যোগাযোগটুকু প্রয়োজন। সামাজিক যোগাযোগের তো আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। এখন যেন পারিবারিক সংযোগটুকুও ছিন্ন হয়ে শুধুমাত্র ব্যক্তিক অস্তিত্বের ধারাটুকু মাত্র ধরে আছি। এখানে সমবয়সি সহপাঠীরা আছে। তাদের সাথে খেলাধূলা, পড়াশোনা, গল্পগুজব সবই করছি। কিন্তু পিছারার খালের বাঁধনটুকুর ছোঁয়া আর পাচ্ছি না।

স্যারের বাড়িতে প্রথম প্রথম খুবই ভাল লাগছিল। লেখাপড়া, সেখানকার অন্যান্য ছাত্রদের সাহচর্য খুবই আকর্ষণীয় বোধ হয়েছিল। কিন্তু ক্রমশ নিজেকে বড় স্বার্থপর মনে হতে লাগল। মা এবং ভাইবোনগুলোর জন্য বড় মন খারাপ করতে লাগল। আমি এখানে দুবেলা পেট পুরে খাচ্ছিদাচ্ছি। রান্নাবান্না, ঘরদোর পরিষ্কার, গোরুবাছুরের দেখভাল ইত্যাদি কাজে পরিশ্রম হলেও, বিগত দিনগুলোর তুলনায় তা নিতান্তই সামান্য পরিশ্রম। ও দিকে বাবার মাসকাবারি চল্লিশ টাকায় বাড়িতে যে কি হচ্ছে তা জানতে পারছি না। ছোটন মাঝে মাঝে এসে ইস্কুলে খবর দেয়—অবস্থা ভাল না। আসলে আমার এবং ছোটনের রোজগার তখন বন্ধ। মাত্র দুবছর আগে দুর্ভিক্ষ গেছে। বাড়িতে আসবাবপত্র কিছুই প্রায় অবশিষ্ট নেই। সব কিছুই বিক্রিবাটা শেষ। মাস্টারমশাইকে সব খুলে বললামও একদিন, আর অনুমতি চাইলাম কয়েকদিন বাড়িতে গিয়ে থাকার। মাস্টারমশাই জানতে চাইলেন, পড়াশোনার কি হবে। আমার নিজের বইপত্তর নেই। অন্য যারা পড়তে আসে তাদের বই পড়ি। বাড়িতে গেলে সে সুযোগ হবে না। কিন্তু অবস্থা এমন যে আমার না গেলেই নয়। আবার এও ভাবছিলাম যে পড়াশোনার এখানেই ইতি কিনা। কারণ বাড়ির আর্থিক অবস্থা সামাল দিতে গেলে ছোটন আর আমাকে আবার আগের দিনগুলোর কাজকর্মতেই ফিরে যেতে হবে। ফাইনাল পরীক্ষার আর বিশেষ দেরি নেই। সবকথা শুনে স্যার খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। বুঝলাম তাঁর রাগ হয়েছে। এসব ঝঞ্ঝাটের কথা তিনি পছন্দ করেন না। তাছাড়া বাবার উপর তাঁর ক্রোধ। কি? না—'খাওয়াইতে পারে না, এতগুলা পোলামাইয়া কি দরকার? আবার বিড়ি

সিগারেট খাইয়া পয়সা নষ্ট করে।' সে কালে পরিকল্পিত পরিবার বিষয়ে কোনও সরকারি কার্যক্রম শুরু হয়নি। তখনকার দিনে অধিক সন্তান বিরূপ সমালোচনার বিষয় ছিল না। তাই মাস্টারমশায়ের রাগের কারণটি আমি বুঝতে পারলাম না। কিন্তু মাস্টারমশাই গম্ভীর। কোনও কথা বলেন না। গোরুবাছুর নিজেই মাঠে নিয়ে যান। আমার হাত থেকে দড়ি কেড়ে নিয়ে, হ্ট্ হট হট্ করে তাদের মাঠে নিয়ে ঘাস খাওয়ান, চরিয়ে আনেন। রান্নাবান্না আমিই করি, কিন্তু খাওয়ার সময় আমায় ডাকেন না। এক ফাঁকে খেয়ে নিয়ে 'টোঙ্গের ঘরে' গিয়ে শুয়ে পড়েন। আমার খুব কষ্ট হতে থাকে।

আমার সংকট একসময় তীব্র হল। বাড়ির অসহায়তার ব্যাপারটা বাবার উপর পুরোপুরি ছাড়ার কথা ভাবতে পারছিলাম না। বাবা উদাসীন প্রকৃতির মানুষ। ঘটনার তীব্রতার সময় তাঁর উদাসীনতা আরও বৃদ্ধি পায়, এমন জানি। ঘরে চাল না থাকলে তিনি 'গুরু যা করেন' বলে এখনও নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। এটা তাঁর মৌলিক চবিত্র। যদিও মাস্টারি শুরু করার পর থেকে তিনি বেশ কিছুটা দায়িত্বশীল হয়েছেন, তথাপি, ব্যাপক বিপর্যয়ে পূর্বপন্থাই অবলম্বন করে থাকেন। 'গুরু কৃপাহি কেবলম্'।

স্যারের বাড়ি 'মট্কি' ভরা চাল। পুরোনো চাল। বছরের শেষেও তা শূন্য হয় না। নতুন চাল অন্য মটকিতে। আমি যদৃচ্ছ ব্যবহার করছি। পেটপুরে খাচ্ছি। বাড়িতে চালের দীনতা ভয়াবহ। দুর্ভিক্ষের আগে এখানের বাজারে চাল বিকোত পাঁচ টাকা কাঠি। সে চাল এখন পাঁচ থেকে দশ, দশ থেকে পনেরো, এভাবে লাফাতে লাফাতে বাড়ছে। তথাপি দেশে এখন সরকারি ভাবে দুর্ভিক্ষ নেই। আমেরিকা চাল জোগাচ্ছে। টাকার মূল্যমান নিম্নগামী, দ্রব্য মূল্য ঊর্ধ্বগামী। সাধারণ রোজগারিদের নাভিশ্বাস।

ইত্যবসরে টের পাই দেশের তাবৎ ঐতিহ্যময় চাষের, বিশেষ করে ধানের উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক দানবিক বিপর্যয় ঘটে গেছে! আবহমান কালের চাষের পদ্ধতির পরিবর্তন হচ্ছে। জাপানি প্রথায় ধানের চাষ হচ্ছে, কোথাও বা নূতন ধরনের সার প্রয়োগে অভিনব উন্নত চাষ পদ্ধতির প্রবর্তনা হচ্ছে। কিন্তু বুজে যাওয়া খাল নদী জলাশয়ের সংস্কার হচ্ছে না। উন্নত চাষ প্রথার সার্বিক ব্যাপক প্রয়োগের উপরিকাঠামো নেই। ফলে কিছু ক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়লেও সার্বিকভাবে বাড়ছে না। মানুষের অভাব, দারিদ্র বেড়েই যাচ্ছে। ঐতিহ্যগত ধান যেমন, আউশ, কার্তিকদল আগুণি, বালাম এইসব অপসৃত হয়ে, আই আর এইট, ইরি, অমুক তমুক ইত্যাদি কুৎসিত নামের ধানেরা এসে মাঠ জুড়ে অধিষ্ঠান করছে। যাদের জমিতে এসব হচ্ছে তারা সব বৃহৎ চাষি। তারা কিছুকাল এই লাভের ফসল তুলল। কিন্তু সামগ্রিক ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ না হওয়ায় ঐতিহ্যের ফসলও নষ্ট হল আবার উন্নয়নও মাঝপথে মুখ থুবড়ে পড়ল। রাষ্ট্রনেতারা বা উপযাচক উপকারীরা কেউই আমার কৃষককুলকে আধুনিকতায় পৌঁছে দিতে সক্ষম হল না। ব্যাপারটা যে এরকম ভাবে হয় না, তা আমাদের দেশের কর্তারা বুঝলেন না, তাঁদের বিদেশি প্রভুরা বোঝাতেও চাইলেন না।

আমাদের বাড়ির চৌহদ্দিতে যেটুকু ধানিজমি ছিল, তার উপজের কিছু অংশ তখন আমরা পেতাম। তাতে মাস দুয়েকের মতো চালের সংস্থান হত। জেঠামশায়ের সংসারের

সদস্য সংখ্যা কম, তাঁদের খুব একটা অসুবিধে ছিল না। কিন্তু আমাদের ভাগের ঐ মাস দুয়েকের সংস্থান এবং বাবার চল্লিশ টাকায় মায়ের পক্ষে এতগুলো প্রাণীর আহার বস্ত্র সংস্থান করা প্রায় অসম্ভব ছিল।

এদিকে মহাবিভ্রাট। মাস্টারমশাই আমাকে কিছুই বলছেন না। আমি তাঁর আদেশ না পেলে বাড়ি যেতে পারছি না, এখানেও পড়াশোনায় মন দিতে পারছি না। মাস্টার মশাই আমার উপর রাগ করে আমাকেও পড়াচ্ছেন না, অন্যদেরও দেখছেন না। এই সময়টায় তাঁকে আমার বড় নিষ্ঠুর এবং অত্যাচারী বলে মনে হচ্ছিল। সেসব কথা অবশ্য এখন মনে পড়লেও নিজেকে বড় অপরাধী বলে মনে হয়। যিনি আমার জ্ঞানাঞ্জন—শলাকা, সেই মহান পুরুষকে তখন কত অন্যায় ভাবেই না মনে মনে স্বার্থপর অত্যাচারী এবং নিষ্ঠুর বলেছি। তাঁব মানসিকতাকে বোঝার কোনও চেষ্টাই তো করিনি।

এরকম সময় একদিন তাঁকে আবার ধরলাম। বললাম—আপনে আমার উপর রাগ করইয়া আছেন। আপনে না আদেশ দিলে তো বাড়ি যাইতে পারতে আছিনা। আমি কি করমু কয়েন?—মাস্টারমশাই সংক্ষেপে বললেন, আইজ ইস্কুলে তোমার বাবার লগে কথা কমু, তারপর দেহি-।—বাবার সাথে আমার বাক্যালাপ কোনও কালেই খুব একটা বেশি হত না। শিক্ষকতা গ্রহণ করার পর তাঁর যে পরিবর্তনটি ঘটেছিল, তাতে আগের মতো উদাসীন তিনি ছিলেন না বটে, তবে খোঁজখবরও খুব একটা করতেন না। এজন্য বাড়ির অবস্থার কথা তাঁর সাথে আলোচনা করা কখনওই হত না। শুধু অনটনের ভার তীব্র হলে মাস্টারমশায়ের কাছ থেকে দশবিশ টাকা ধার করতে বলতেন। মাস্টারমশাই একারণে যারপরনাই বিরক্ত হতেন। বাবার সামনেই তিনি তাঁর সমালোচনা করতেন এবং প্রায় ধমকাতেন। বাবা তাঁকে অসম্ভব শ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁর শিশুসুলভ স্বভাব জানতেন বলে কিছু গায়ে মাখতেন না। বরং নানান ঠাট্টা ইয়ার্কির কথা বলে তাঁকে আরও চটিয়ে দিতেন। মাস্টারমশাই তখন বাবাকে অন্য মাস্টারমশাইদের সামনে আক্রমণ করে প্রশ্ন করে যেতেন—যেমন, অত সিগারেট খায়েন ক্যান?

: বদঅইভ্যাস, হেয়া ছাড়া অম্বুরি তামুকটা তো এহন আর জোডাইতে পারি না, আর হেয়া সাজানের লইগ্যা চাকরবাকরও নাই,— এস্টেট যাওয়ার পর থিকা—

: আপনে আসলেই জমিদারের অপদার্থ পোলা। এস্টেটের পয়সা খালি উড়াইছেন, অথচ পোলাপানগো মানুষ করার ব্যবস্থা রাহেন নায়। হারাজীবন খালি বাবুগিরি করছেন।

: কথাডা মিথ্যা না; তয় ব্যবস্থা যদি কিছু রাখতাম হেলে পোলাগুলাও আমার মতই অপদার্থ হইতে মনে অয়।

: আপনে আমার লগে ফাইজলামো করতে আছেন, না? আমি কৈলাম সিরিয়াস। I strongly despise your whimsical life style. You must think for your children. Don't you see that they are suffering?

: হেয়ার লইগ্যাইতো কই, আপনে সেক্রেটারিরে কইয়া আমার চল্লিশ টাকাডারে একশো চল্লিশ করইয়া দেন। You are the rector. আপনের কথার এট্টা দাম আছে।

: ইস্কুলের হে ক্ষ্যামতা নাই।

: তাইলে আর কি করণ? তয়তো মাঝে মাঝে আপনার দশ বিশ টাকা ধার দিতেই হইবে। —বলে বাবা তাঁর পকেটে হাত ঢুকিয়ে টাকা নেওয়ার ভঙ্গি করতেন। কিন্তু তাঁর পকেট থেকে হয়ত বেরোত একগাছা পাটের দড়ি। বাবা সব মাস্টারমশাইদের সেটি দেখিয়ে বলতেন, —দ্যাহেন আপনেরা। স্যারের পকেটে পাওয়া গেছে। দড়ি লইয়া কি করবেন? দলায় দড়ি দেবেন? —আসলে ইস্কুলে আসার সময় হয়ত একটি গোবৎসকে মুক্ত করে দড়িগাছা পকেটেই রেখেছিলেন, তখন তা ধরা পড়ে রগড়ের কারণ হয়। বাবার প্রশ্নের উত্তরে বলেন,—গলায় দড়ি আমি দিমু ক্যান? হেয়াতো আপনের দেওয়া উচিৎ। —বাবা বলতেন যে তাঁর সেরকম কোনও ইচ্ছে নেই, যদিও কারণ আছে অনেক। তবে মাস্টারমশাইয়ের যেহেতু কোনও জাগতিক ঝঞ্ঝাট নেই, এক্ষেত্রে তাঁর সুবিধে অনেক। মরলে কেউ বিধবাও হবে না, কেউ না খেয়েও মরবে না বা কেউ কাঁদবেও না। এইসব রগড় চলত এবং মাস্টারমশাই একসময় রাগ করে বাজারের দিকে চলে যেতেন। বাবা বলতেন, চললেন। এহন বাজার থিকা এক স্যার গুড় কেনবেন আর হারারাস্তা খাইতে খাইতে বাড়ি যাইয়া আবার পুঁথি খুলইয়া বইবেন।—কথাটা মিথ্যে ছিল না।

ইস্কুলে সেদিন বাবার সাথে তাঁর কি কথা হয়েছিল জানি না, ইস্কুল ছুটি হলে বাবা আমাকে ডেকে বলেছিলেন, — উনি যেমন কইবেন, সেইরকম চলবি। বাড়ির কথা ভাবতে হইবে না। যেমন চলার চলবে। — বাবার একথায় আমি বিশেষ ভরসা পেলাম না। তাঁর বাস্তবভাব কোনও কালেই খুব তীক্ষ্ণ নয়। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম — চাউলের দাম যেভাবে বাড়তে আছে, হেতে কি ভাবে যে চলবে হেয়াইতো বুজিনা। তুমি কি অইন্য কিছু ভাবলা?

: ভাবছি বাড়িতে কিছু ছাত্তর পড়ানু। তারা রাত্তিরে ওহানেই থাকপে। এভাবে কিছু রোজগার হইতে পারে।

: এহনও কাউরে পাইছ এ রকম?

: নৈকাঠির পাছ ছয়জোন কইছে পড়বে। তয় তোর বোধহয় মাঝে মাঝে আইতে হইবে। তোর স্যারের লগে এ বিষয়ে কথা কইছি।

: স্যারেতো একদিনও আমারে বাড়ি যাইতে দিতে চায়েন না। কইলে খালি রাগ হয়েন আর থুম্বা দিয়া থাহেন।

: না আইজ হেনার লগে অনেক কথা অইছে। আসলে বৈরাগী মনের মানুষ, ঘর সংসার করেন নায়তো, সব বোজেন না ঠিকমত।

বাবার এই কথাটিতে আমার হাসি পেল। বৈরাগীতো শুধু মাস্টারমশাইই ছিলেন না, বাবা নিজেও তাইই ছিলেন। তবে দুজনের বৈরাগ্যে তফাৎ ছিল। মাস্টারমশাই সংসারধর্ম করেননি। তাঁর জগৎ শুধু পুঁথিপত্তর, ছাত্র এবং গোরু-বাছুরের সেবা। সেখানে রোজগারের ধান্দা নেই। জমির ধান অসুমার। জমি যারা চাষ করে তারাই বেশিটা নেয়,

তারপরেও যা থাকে তাতে বছরের ফসলে দুবছর তিনবছর চলে। একক মনুষ্য। ইচ্ছে হলে খান, না হলে মুড়ি, চিঁড়ে চিবিয়ে দিন গুজরান তাঁর বহুকালের অভ্যেস। পড়শিদের মধ্যে এক জ্ঞাতিগোষ্ঠী আছে। তারা মাঝে মধ্যে খোঁজ খবর করে। তাদের গুষ্ঠী বেশ বড়। ফলে মাস্টারমশাইএর 'মটকার' চাল কখন যে ফাঁকা হয়ে তাদের জঠরানল নিবৃত্ত করে তিনি তা টের পান না। সে বাড়ির দুই ডাঙ্গর ছেলে যখন-তখন এসে তাঁর অনুপস্থিতিতে 'মটকা' থেকে চাল নিয়ে যায়। আমাকে বলে — হুমান্‌ইয়া, উড়ইয়া আইয়া জুড়ইয়া বইছ, জেডায় মরলে হ্যার বিষয় খাবা ভাবছ? আমরা থাকতে হেয়া অইবে না। — আমার মাথায় এরকম চিন্তা কদাচ ছিল না। স্যারকে বলতেও পারি না। অথচ লজ্জা অপমানে অন্তরাত্মা কুঁকড়ে থাকে। এদিকে 'মটকার' চাল কমতেই থাকে। মনে মনে ভীত থাকি উনি যদি জানতে পেরে আমাকে সন্দেহ করেন?

দোতলা টিনের বাড়ি। মেঝে মাটির। অবয়ব কাঠের। মাটির মেঝেতে পোতা তিন চারটি মটকায় চাল। সেখান থেকে তোল সিদ্ধ কর, কিছু ব্যঞ্জন বা পুকুরের মৎস্যাদি সহযোগে খাও। এমত ব্যবস্থা। গৃহে কোনও রমণী না থাকায়, বাড়িটার কোনও ছিরিছাদ নেই। মেঝে শেষ কবে যে লেপা হয়েছিল তার ইতিহাস বোধকরি গৃহকর্তাও জানেন না। বর্তমানে অর্থাৎ তখন, আমি সব সামলাবার দায়িত্বে। বাড়িতে ঢোকার মুখে একটি পুকুর, যা তখন ডোবারই সামিল। সেখানে শিং, মাগুর, কৈ, খলসেদের স্বাভাবিক আবির্ভাব এবং তিরোভাব। সেখানে গ্রীষ্মে আবার নিদারুণ শুষ্কাবস্থা। তাই মাস্টার মশায়ের বিধি ছিল জলাভাবে মৎস্যদের উত্তোলন তথা মটকায় জীয়ন, মাঝে মাঝে সুযোগমতো ভক্ষণ, অবশিষ্টদের আবার বর্ষাগমে ডোবা জলভর্তি হলে পুনরায় যথাস্থানে স্থাপন। সেই সময় তাদের শারীরিক আকার এতই করুণ হত যে ভক্ষণ করার কথা কেউ ভাবতেই পারত না। মাছগুলোর গোটা শরীর একটা পাতলা চামড়ায় ঢাকা কঙ্কাল বিশেষ হত এবং তাদের মাথাগুলোই শুধু তাদের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিত। এদের জন্য মাস্টারমশায়ের বেশ একটা আহা আহা ভাব ছিল। তাঁর বৈরাগ্যের স্বরূপ ছিল এমত।

বাবার বৈরাগ্যের ধরনটি আলাদা। তাঁর সংসার ধর্ম সাতিশয় প্রবল। সন্তান সন্ততিতে আমরা ভাইবোনেরা তেরোজন। তাঁর দুইসংসারের বৃত্তান্ত আগেই বলেছি। পঞ্চাশ একান্নর দাঙ্গার অব্যবহিত পরে আমার সহোদর জ্যেষ্ঠদের, জেঠামশাই-এর সন্তানদের শেষ দুই পুত্র বাদে অন্যান্যদের এবং আমাদের দিদিকে নিয়ে বুড়ি পিসিমা এবং জেঠামশায়ের সৎমা কলকাতায় পাড়ি দেন। জেঠামশায়ের সন্তানদের মধ্যে ছিলেন তিন দিদি, একজন দাদা এবং তাঁর ছোটকন্যা। আমাদের দিদিরা, সর্বমোট চারজন, সবাই বিবাহযোগ্য। আমার ছোটদাদা সেবার ম্যাট্রিক দেবেন বলে বছরখানেক বাড়িতে ছিলেন। পাশ করে তিনিও কলকাতায় চলে যান। কলকাতায় তখন বড়দাদা রেলের চাকুরে। সার্কাস রেঞ্জ-এর একটি বাড়ির গোটা তেতলাটি জুড়ে তখন আমার দুই কাকা, এক কাকার পরিবার এবং যারা বাড়ি থেকে গেলেন তাঁরা থাকতেন। এই পরিবারের কর্তৃত্বে বুড়ি পিসিমা দীর্ঘকাল রাজ্যপাট করেন। এঁর কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। ইনি শতবর্ষ

অতিক্রম করেনও সুস্থ মস্তিষ্কে বেঁচে ছিলেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত পরনিন্দা পরচর্চা, ছোটদের উচ্ছন্নে যাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তর আক্ষেপাদি করে গেছেন।

সে অনেক কথা। বলার দরকারও নেই বিশেষ। শুধু এইটুকুই বলি যে এই ব্যাপক একান্নবর্তী পরিবারের কর্তৃত্বের মধ্যে একটি অদৃশ্য দাবার ছক সাজানো ছিল। পারিবারিক রাজনীতির দাবার ছক। সেই খেলায় 'বড়েরা' হামেশা প্রতিপক্ষের অন্দরমহলে ঢুকে মন্ত্রী হয়ে সব অসাধ্য সাধন করেছেন। শুধু মাঝপথে আমার ন্যালাখ্যাপা দাদাগুলো বাজে বিচ্ছিরি চালে দুএক ঘর এগিয়েই কুপোকাৎ। ফলে একটা সময় সার্কাস রেঞ্জের ঐ তেতলার ছকের বাইরে খোলারাস্তায় তারা নিজেদের নিতান্ত 'এতিম' হিসেবে দেখতে পায়। তারপর ভাসতে ভাসতে কখনও এ-ঘাট কখনও ও-ঘাট করে নোঙর ফেলার চেষ্টা করতে থাকে, কিন্তু কোথাও হালে পানি পায়না। সাময়িক স্থায়িত্বে যদি কোথাও আশ্রিত হয়, পরমুহূর্তেই আবার খড়কুটোর মতো এক দমকায় উড়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়ে পড়ে কোনও বস্তি অথবা গোরস্থানের পরিত্যক্ত একচালা টিনের ছাউনির নীচে। পিছারার খাল পারের আমরা দুশ্চিন্তায়, বিষণ্ণতায় দিন, মাস, বছর পার করি। তালুকদারি থাকাকালীন সময়ে বাড়ি থেকে ভারা ভারা জিনিসপত্র যেত । ইলিশের সময় ইলিশ নুন হলুদে জারিয়ে ক্যানেস্তারা ভর্তি করে মা পাঠাতেন। আমসত্ত্ব, কুলের আচার, তেঁতুল জারানো আচার, চালতের গুঁড়োর পিঠে, কাঠবাদামের মোয়া, এটা ওটা সব সাধারণ জিনিস, কিন্তু অসম্ভব পরিশ্রম এবং যত্নের সাথে তৈরি খাবারদাবার যেমন যেত, তেমনি টাকা পয়সা, দামি জিনিসপত্তরও প্রভূতই যেত, যা আমি নিজে দেখেছি। কিন্তু অনেক পরে জেনেছি এর কিছুই হয় পৌঁছোত না, না হয় আমার দাদা দিদিরা তার কিছুই পেতেন না। এ সব ছোটকথা, ছোটদুঃখের ব্যাপার হয়ত। কিন্তু আমার পিছারার খালের জগতটাও যেহেতু ছোট, তাই এগুলোই আমার জীবনের বড় ব্যথা হয়ে অক্ষয় হয়ে আছে। আজও সেই কাঠবাদাম কুড়োনোর জন্য ঘোর জঙ্গলের মধ্যে আমার আর ছোটনের দুঃসাহসিক অভিযানের কথা ভুলতে পাবি না। ভুলতে পারি না অতি কষ্ট করে আনা সাধারণ বুনো বাদামগুলো অসীম ধৈর্যে, খোলা ছাড়িয়ে আস্ত শাঁসগুলি জড়ো করে মায়ের কাছে দেওয়ার কথা এবং অবশ্যই তার একটাও নিজেরা না খেয়ে। কেউ কি কখনও জানবে আমাদের ঐ শিশু হৃদয়ের অবশ্যম্ভাবী লোভ সংবরণ করে ঐ বাদাম বা আম বা কুল বা চালতার গুঁড়োর পিঠে (যাঁরা খাননি তাঁরা কখনও অবশ্য জানবেন না) বা মিষ্টি তেঁতুলের আচার, কি ভাবে প্রাণে ধরে, দাদা দিদিরা খাবে বলে, আমরা নিজেরা না খেয়ে পাঠাতাম। কিন্তু তা যে তাঁরা পেতেন না, তখন তো তা জানিনি। সাধারণ, অতি সাধারণ তুচ্ছাতিতুচ্ছ এইসব। অথচ আমার জন্য সারাজীবনে কি যে দুঃখ বহনকারী এইসব বাস্তবতার আঘাত, তা যাঁরা আমার মতো জীবনযাপন করেননি তাঁরা বুঝতে পারবেন না।

এক একটা দিন তখন এমন যেত যে মা এবং আমি প্রায় সারাদিন কান্নাকাটি করতাম। তখন দিনের পর দিন দাদাদের একটা চিঠির প্রতীক্ষায় থাকতে থাকতে মা

ধৈর্য হারিয়ে ফেলতেন। এসব অনেক আগের কথা। প্রসঙ্গক্রমে বলছি। বাবা তখন কিছু করেন না। তালুকদারির মোটা ভাতকাপড় বিনে পরিশ্রমে লভ্য। বাবাও নিশ্চয়ই অনেক দুশ্চিন্তা করতেন, কিন্তু তা আমাদের গোচর ছিল না। পিছারার খালপারে বসে মা একা একা কাঁদতেন তাঁর দেশ ছেড়ে যাওয়া সন্তানদের জন্য। কিন্তু তাঁর এই দুঃখের জন্য, দুর্ভাগ্যের জন্য কাউকেই দায়ী করতেন না। না পরিবারের পুরুষদের, না রাষ্ট্র নেতাদের। অথচ একসময় নাকি স্বদেশিওলা নানান নেতা তাঁর হাতের 'রন্ধন খাইয়া' তারিফ করে গেছেন। সে যাক্‌গে, যেদিন কোনও চিঠি আসত কারুর এবং সংবাদে থাকত যে তারা ওখানে ভাল আছে সেদিন মায়ের রূপ যেন উছলে পড়ত। আর আমিও খুব উদ্দীপ্ত বোধ করতাম। এইসব দিনগুলো ছিল আমাদের উৎসবের দিন। সেসব দিনে মায়ের গানের গলা অসাধারণ খোলতাই হত। মেজাজ হত ফুরফুরে প্রায় রানি মহারানিদের মতো। পাড়া প্রতিবেশীরা মায়ের উচ্চকণ্ঠের গান শুনতে পেত — 'পাগলা মনটারে তুই বাঁধ।' — তারা বুঝত 'আইজ ছিরিমতী লাবণ্যপ্রভা তেনার পোলাগো চিঠি পাইছেন।' আমার মায়ের নাম লাবণ্যপ্রভা। তা সেসব দিনগুলোতে আমি মায়ের লাবণ্য উছলে উঠতে দেখেছি।

বাবাও তখন যেন উদ্যোগী হয়ে ভবিষ্যতের নানান সম্ভাব্য অসম্ভাব্য প্রকল্প নিয়ে মায়ের সাথে আলাপ আলোচনা করতেন। তখন অভাব তুঙ্গে হলেও তাকে গ্রাহ্য না করার মতন একটা সাময়িক শক্তি যেন আমরা সংগ্রহ করতে পারতাম। তালুকদারি থাকাকালীন সময়ে বাবা মাঝে মাঝে দাদাদের কাছে যেতেন কলকাতায়। জেঠামশায়ও যেতেন। কিন্তু আশ্চর্য, তাঁরা মার বা বড়মার যে তাঁদের সন্তানদের দেখার ইচ্ছে আদৌ হতে পারে, বা এ যে তাঁদের পক্ষে একটা বিষম কষ্টের ব্যাপার, একথা কোনও দিনও বোধ করেননি। আরও আশ্চর্য হচ্ছে এই যে, মা বা বড়মা, মানে জ্যাঠাইমাও তাঁদের স্বামীদের কাছে এরকম কোনও প্রত্যাশায় প্রত্যাশী হবার মানসিকতায়ও ছিলেন না। যেন তাঁরা দেখে এলেই সব ঠিক আছে। তাঁদের যেন এরকম কোনও আকাঙ্ক্ষাও ছিল না। তখনকার দিনে, আমার পিছারার খালের জগতটাই এরকম ছিল।

যখন মধ্যস্বত্ব লোপ আইন পাশ হল, তখন আমরা আর জেঠামশাই-এরা পৃথগন্ন হলাম, যখন আমাদের প্রকৃত দারিদ্র শুরু হল, তখন থেকে বাবার আর কোনও উপায় থাকল না দাদাদের কাছে যাবার। তখন তিনি, 'তোমারই ইচ্ছা হোক পূর্ণ করুণাময় স্বামী, দাও দুঃখ যত পার সকলই সহিব আমি' — এরকম উচ্চারণে অসীম এক বৈরাগ্যে মগ্ন হলেন।

এই সময়টা থেকেই মা আমার উপর আস্তে আস্তে নির্ভরশীল হতে লাগলেন। সংসারের দায়িত্বও ক্রমশ আমার উপর ন্যস্ত হতে থাকল। কিন্তু দাদাদের বিচ্ছেদজনিত কারণে মায়ের যাবতীয় ভাবনাচিন্তা এবং ভালবাসা তাদেরই দিকে প্রধাবিত থাকল খুব স্বাভাবিক কারণেই। আমি এবং ছোটন, এ কারণে কোনও দিনই, সেইসময়, বাবা বা মায়ের ভালবাসার, আদরের বা একটা স্নেহার্ত বচনেরও আস্বাদ পাইনি। ছোটরা তখন এতই ছোট যে এ সমস্যা তাদের বোধেই আসেনি। অবশ্য এজন্য আমরা বা মা বাবা

কেউই দায়ী ছিলাম না। এ ছিল দেশভাগ, খণ্ডিত স্বাধীনতা এবং কোনও পুনর্বাসন ব্যতিরেকে মধ্যস্বত্ব বিলোপের পুরস্কার আমাদের সকলের জন্য। শুধু আমার পরিবারই এই পুরস্কারের আধিকারিক ছিল না। এরকম পরিবার অনেকই ছিল।

প্রসন্নকুমারে ভর্তি হবার পর যখন মাস্টারমশায়ের বাড়িতে ব্রহ্মচর্যে স্থায়ী হলাম, তখন থেকেই মায়ের সাথে আমার বিচ্ছেদের শুরু। সাংসারিক দিক থেকে তা যেমন অসুবিধেজনক ছিল, মায়ের এবং আমার মানসিকতার পক্ষেও তা অসম্ভব ক্লেশকর। হয়েছিল। যখন মায়ের কাছে মাঝে মধ্যে যেতাম তখন ব্যাপারটি বুঝতে পারতাম। এই সময়েই মায়ের ভালবাসার গাঢ়তা আমার অনুভবে এল। স্যারের বাড়িতে প্রায় মাসখানেক থেকে, প্রথম যেদিন বাড়ি গিয়েছিলাম, সেদিনটা ছিল আমার জীবনের এক আশ্চর্য দিন। ছোট ভাইবোনগুলো উঠোনে খেলছিল। শীতের পড়ন্ত বেলা। স্কুলশেষে বাবার সাথে ফিরেছিলাম। আমাকে দূর থেকে আসতে দেখে ভাইবোনগুলো পাখির মতো কোলাহল করে উঠেছিল। ছোটবোন দুটো টলমল করতে করতে এসে ঝাঁপিয়ে কোলে চড়ে বসল। আমার কি রকম যেন কান্না পাচ্ছিল। ছোটন, তার পরের বোনটা এবং আর দুটো ভাইবোন, তাদের অসংখ্য জমানো কথা বলে যাচ্ছিল। তার মধ্যে কত নালিশ, কত অভিযোগ ! আমি সবাইকে আগলে নিয়ে যখন ঘরে ঢুকলাম, মা এক আশ্চর্য আদরে আমাকে জড়িয়ে ধরে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন আর কাঁদছিলেন। সে এক ব্যাপক কাণ্ড। জীবনে এরকম স্নেহাদর সেই প্রথম। সেদিন আমি প্রকৃত বুঝেছিলাম, দূরে থাকার কারণে মা আমার জন্য কতটা উদ্বিগ্ন। যারা আরও দূরে, তাহলে তাদের জন্য তাঁর উদ্বিগ্নতা আরও কত গভীর। এখনকার বোধে মনে হয়, আমার মায়ের অনুভূতির জগতটাই ছিল তখন প্রায় একটা বোবা পশুর মতো। বিশেষত তাঁর সন্তানদের বিষয়ে। সে অনুভূতি তাঁর নিতান্ত সাহচর্যে না থাকলে বোঝা সম্ভব ছিল না। আমি দূরে কিছুদিন থাকার পর কাছে এলে এই অনুভূতির স্বরূপ বুঝতে শিখলাম। আমরা এর আগে কখনও নিজেদের অনুভবগুলো একে অন্যের কাছ প্রকাশ করতে পারতাম না। শুধু একের কান্না দেখে অন্যে কাঁদতাম। এবার থেকে মা তাঁর দুশ্চিন্তা, দুঃখ এবং উদ্বিগ্নতার জন্য সমব্যথী হিসেবে আমাকে পেলেন। নিয়ত দারিদ্র এবং উদ্বিগ্নতার দিনগুলোতে সে আমাদের এক অপ্রমেয় আশীর্বাদ হয়েছিল, মায়ের কাছেও এবং আমার কাছেও।

আমার ছোট ভাইবোনগুলোকে, তারুলি ইস্কুলে আমার ছাত্রজীবন আরম্ভ করার আগে থেকেই, আমিই অক্ষর-পরিচয় করানো, কিছু গণিত এবং ইংরেজির প্রাথমিক জ্ঞান আমার সাধ্যমতো শিক্ষা দিতে চেষ্টা করেছিলাম। ছোটনের পরের বোনটা আমাদের পাঁচ জন ভাইবোনের পরে জন্মেছিল। এর আগে আমাব বড় বৈমাত্রেয় দিদিই ছিলেন মা বাবার একমাত্র কন্যা। তাঁর বাল্যকালে মাতৃবিয়োগের দুর্ঘটনা থাকলেও, মায়ের অভাব তাঁকে কোনও দিনই অনুভব করতে হয়নি। আগেই বলা হয়েছে যে আমার মা এসে সেই দুরূহ সমস্যার সমাধান করেছিলেন। যে সময়ের কথা বলছি তখন দিদি কলকাতায় চলে এসেছেন। তাঁর আসার সময় আমার এই বোনটা বছর দুই কি আড়াই এরকম

এবং আমাদের সর্বকনিষ্ঠ ভাইটি সদ্যোজাত। একারণে আমার এই বোনটি বাবা, মা এবং আমার কাছে অসম্ভব প্রিয় ছিল। আমার আগের ভাইবোনেরা কলকাতায় চলে গেলে বাড়িতে আমিই তখন বড়। ভাইটা ছোট বলে আর এই বোনটা এতগুলো ভাইএর পর জন্মেছে বলে আজীবন এদের প্রতি আমার একটু স্নেহের পক্ষপাতিত্বর পাল্লাভারি থেকে গেছে, তবে পরের তিনটে বোন জন্ম থেকে আমারই হাতে বড় হয়েছে বলে এবং তাদের তাবৎ 'গু মুত' ঘেঁটেছি বলে তারা যতটা আমার বোন তার থেকে বেশি যেন আমার সন্তান, এরকম একটা বোধ এখনও আমার মধ্যে ক্রিয়াশীল।

ছোট ভাইটার তখন প্রায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হবার বয়স হয়েছে। সেবার বাড়িতে গেলে ভাই দুটো এবং বোনটা বলতে লাগল, দাদার মতো তারাও ইস্কুলে পড়বে। সে এক মহাহুল্লোড়। আমি অবশ্য খুবই উৎফুল্ল বোধ করছিলাম। এরা আমার অনুপস্থিতির এই সময়টুকুর মধ্যে যথেষ্ট সাহসী এবং চট্‌পটে বা ইংরেজিতে যাকে বলে স্মার্ট, তাই হয়ে উঠেছে। বুঝলাম আমার পরিবারে একটা পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। ওদের সব আদর, আবদার, নালিশ বরাবরই আমার কাছেই হত। এখন পাছে দাদা কালই আবার অনির্দিষ্টকালের জন্য তাদের কাছ-ছাড়া হয়, তাই সবাই হল্লা শুরু করল, তারাও দাদার মতো ইস্কুলে যাবে।

আমি আমার ইস্কুলে যাবার বৃত্তান্ত ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। সেক্ষেত্রেই অত সংগ্রাম করতে হয়েছে। এখন এতগুলো ভাইবোনকে ইস্কুলে ভর্তি করার সংগ্রামটা এ অবস্থায় যে আমি কিভাবে করব, ভেবে পাচ্ছিলাম না। বাবা প্রসন্নকুমার বিদ্যালয়ের শিক্ষক বিধায় আমাকে হয়ত বিনা বেতনে পড়াবার সুযোগ পেতে পারেন, কিন্তু তিন তিনটে ভাইবোনকে ফ্রি পড়ানোর সুযোগ তাঁর ছিল না। একমাত্র ছোটভাইটাকে প্রাইমারিতে দেওয়া সম্ভব ছিল, প্রাইমারি অর্থাৎ পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত তখন শিক্ষালাভ ফ্রি ছিল। আর দুটো ভাইবোনকে ষষ্ঠ শ্রেণীতে দিতে হয়, সেক্ষেত্রে খরচ একটা অবশ্য ব্যাপার। মা বাবার সাথে আলোচনা করেও কিনারা হল না। কিন্তু কনিষ্ঠ ভ্রাতাটি আমার সেই বয়সেই যথেষ্ট বীরেন্দ্র বীর বিক্রম কেশরী হয়ে উঠেছিল। যদিও তার বিক্রম এবং তজ্জনিত অত্যাচার ভোগ করতে হত ঐ বোনটাকেই, যেহেতু তারা পিঠাপিঠি। এর মধ্যেই সে একদিন একখানা কাটাবি দিয়ে তার দিদির কর্ণচ্ছেদ করেছে এবং আমি তার কাছাকাছি না থাকলে সে যে অচিরেই একটি মাতৃঘাতী পরশুরাম হবে, এ ব্যাপারে কারুরই দ্বিমত ছিল না। এমত হওয়ার সপক্ষে তার একটা জন্মগত যৌক্তিকতাও যে ছিলনা, তাও বলা যাবে না। প্রায় পঞ্চাশের দাঙ্গা চলাকালীনই তার জন্ম, একান্নবাহান্ন সালের ডিসেম্বরের কোনও একটা তারিখে. যতদূর মনে আছে। তাই তাকে খানিকটা দাঙ্গাকারীর স্বাধিকার দেওয়া ছিলই। কিন্তু ব্যাপারটা যে একেবারে 'বিগিনস্ অ্যাট হোম' হবে এরকম ভাবনা বা দুর্ভাবনা কারুরই ছিল না। সে যা হোক্, সেই পরমাণু ব্যক্তিত্বটি এখন তার স্বাধিকার প্রকাশ করল এই আবদারে যে সে দাদার মতো বইখাতা নিয়ে ইস্কুলে যাবেই। ঠিক হল সে বাবার সাথে নিয়মিত ইস্কুলে যাবে।

তাকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি করে দেওয়া হল। বড় দুটোর জন্য তখনও কিছু করতে পারলাম না বলে কষ্ট হল।

পরের মাসে যখন বাড়িতে গেলাম, তখন ওদের দুর্দশা দেখে আমার এত খারাপ লাগল যে নিজের উপর বড় ধিক্কার জন্মাল। ওরা বাড়িতে যেটুকু পড়াশোনার চর্চা করত, অভিমান করে তাও ছেড়ে দিয়ে সারাদিন শুধু আগান-বাগান ঘুরে বেড়ায়, যেমন একসময় আমার অবস্থা ছিল। ছোট ভাইটা খুব মাতব্বরি করছিল যে, ওরা পড়াশোনা করে না, ওদের কিছু হবে না। তার প্রতিটি হাবে ভাবে সে প্রকাশ করছিল যে সে একজন বেশ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তার দাদার মতোই। দাদা এবং সে দুজনেই ইস্কুলে পড়ে এবং ওরা আগানে-বাগানে ঘুরে বেড়ায়, কিস্স্যু লেখাপড়া করে না —ইত্যাদি। তার হাবভাব দেখে মজা লাগলেও, বড় দুটোর জন্য বেশ কষ্ট হল। কিন্তু কিছু অনিবার্য কারণে ওদের ভর্তির ব্যাপারটা পরবর্তী শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখতে হল। কোনও উপায়ই ছিল না যে ওদের তক্ষুনি ইস্কুলে দিই। তাদেরকেও সেরকম বুঝ দিয়ে রাখলাম।

— উনত্রিশ —

বাবার সাথে মাস্টারমশায়ের কথাবার্তা হওয়ার দিন রাতেরবেলা পড়াশোনা শেষ হলে স্যার আমাকে নিয়ে পাটাতন বা 'টোঙ্গের' ঘরে উঠলেন। আমরা ওখানেই রাতে ঘুমোতাম। একটা বাঁশের মই ছিল সেখানে ওঠার। আলোর ব্যবস্থা, যেসব ছাত্র ওখানে রাতে থেকে পড়াশোনা করত তাদের নিজস্ব, আমি ছাড়া। আমার সব ব্যবস্থাই ছিল মাস্টারমশায়ের। বিজয় বলত—তুই পুইষ্যপুত্তুর কিনা হে কারণে এরকম ব্যবস্থা। তা সেই ব্যবস্থায় আমার বরাদ্দ একটি 'টেমি' এবং মাস্টারমশায়ের নিজস্ব প্রয়োজনে তাঁরও একটি 'টেমি'। আমাদের পড়ানো এবং তাঁর নৈশ আহার শেষ হলে, তিনি নিজস্ব টেমিটি নিয়ে 'টোঙ্গে' উঠতেন। আমি পড়া শেষ হয়ে গেলে আলো নিবিয়ে উঠে যেতাম। সেসময় অবশ্য তিনি ঘুমোতেন না। ঐ ক্ষীণ আলোয় বসে বসে হয় ব্যাকরণ কৌমুদী, নতুবা ইংরেজি কোনও গ্রামারের বই অথবা সংস্কৃত কোনও নাটক, কাব্য ইত্যাদি পড়তেন।

মাস্টারমশায়ের বাড়িতে কোনও ঘড়ি ছিল না। ছাত্ররাও সেযুগে ঘড়ি হাতে পড়ার মতো স্বাধীন বা বিলাসী-হবার কথা ভাবতে পারত না, তা তাদের পারিবারিক অবস্থা যেমনই হোক্। আমরা তখনও দণ্ডঘোষক পশু বা পাখির ডাকের মাধ্যমেই 'রাত কত হোলো' খবর বুঝতাম, দিনের বেলা রোদের ছায়া বা সূর্যের অবস্থান দেখে। মাস্টার মশায়ের হুকুম ছিল যে 'কুক্‌খায় তিন পাক দিলে শুইতে যাবা'। কুক্‌খা বা কুক পাখি নাকি প্রতিপ্রহরে একবার করে 'পাক' দেয়। প্রহরঘোষণার আর একটা মাধ্যম ছিল শেয়ালের ডাক। আমি অবশ্য কোনওদিনই কুক্‌খা দুবার পাক দেওয়া পর্যন্তও জেগে থাকতে পারতাম না। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসত। এজন্য বিরক্ত মাস্টারমশাই আমাকে জাগিয়ে রাখার একটি অভিনব দাওয়াই-এর ব্যবস্থা করেছিলেন। তখন লম্বা চুল রাখা

স্টাইল ছিল। মাস্টারমশাই চুলের গোছার সাথে একটি বেশ শক্ত সুতো বেঁধে আড়ার সাথে অন্যপ্রান্তটি বেঁধে রাখতেন। উদ্দেশ্য, বসা অবস্থায় ঝিমোলে চুলে টান পড়বে, ঘুম চটে যাবে এবং আমি আবার পড়তে শুরু করব। কিন্তু এ দাওয়াই একদিন ভুল প্রতিপন্ন হল। এক উষাকালে মাস্টারমশাই যখন তাঁর নিয়মিত প্রাতঃ কাব্যোচ্চারণে বাঁশের মই বেয়ে, 'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল। কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল' ইত্যাদি আবৃত্তি করতে করতে নামলেন, দেখলেন 'শিশু শিরে সূত্র বন্ধন যুক্ত অবস্থায় অক্লেশে ঘুমাইতেছে। তাহার কিছুমাত্র বিকার নাই।' 'তাহার আপন পাঠেতে' মনোনিবেশেরও কিছুমাত্র উদ্যোগ নাই। রাত কাবার। আমি ঐ অবস্থায়ই রাতটি পার করেছি। ঘুমের কিছুমাত্র বিঘ্ন হয়নি। মহাশয় সম্ভবত আসন্ন পরীক্ষাজনিত ত্রাসে আমার 'কুক্‌খার পাক পর্যন্ত' পড়াশোনা করারও অতিরিক্ত প্রহর অতিক্রমে যৎপরোনাস্তি আনন্দ হৃদয়ে পোষণ করে একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু প্রত্যুষের দৃশ্য তাঁকে যে আনন্দিত করে নি সেকথা বলা বাহুল্য। ফলে আদেশ পরিবর্তিত হল। কুক্‌খার দুই পাকের পর তিনি যখন 'টোঙ্গে' উঠতেন, আমাকে সাথে নিয়ে ওঠাই বিবেচকের কাজ বলে ধরে নিয়েছিলেন। আমাদের দেশের প্রাজ্ঞপুরুষেরা কিছু দেশজ ভাষায় আপ্তবাক্যের সৃজন করে গেছেন। তার মধ্যে একটি অনুপম বাক্য হচ্ছে—'পোলাপানের হাতে লোয়া (লোহা), শয়তানে মারে গোয়া' কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা না করাই শ্রেয়, ছুঁৎবাইগ্রস্তেরা হামলা করতে পারেন। তবে আভাসে বলি বাচ্ছাদের হাতে তীক্ষ্ণ লৌহাদি থাকলে ইবলিস্ (আলায়েসাল্লাম) তাদের উপর সওয়ার হয়ে, তাদের দিয়ে নাকি নানা 'আকাম' করায়। কথাটি যে যথার্থ, এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে সাধারণত গাধারা অথবা চিরকুমারেরা। কারণ গাধাদের বুদ্ধি নেই আর চিরকুমারদের জাগতিক কাণ্ডজ্ঞান পূর্ণ নয়। ইব্‌লিস (আঃ) কাণ্ডজ্ঞানহীন চিরকুমারদের যে কিভাবে কাজে লাগায় তার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত আমার সঞ্চয়ে আছে। তবে চিরকুমার হলেও মাস্টারমশাই রসহীন ছিলেন না। তাঁর সাথে একসঙ্গেই যদিও আমাকে উপরে উঠতে হত, তিনি কিন্তু তখন আমাকে পাঠ্যপুস্তক পড়ার জন্য নিপীড়ন করতেন না। তখন পাঠ্যবর্হির্ভূত বই পুস্তক নিয়ে তিনি গল্প জুড়তেন। এটা তাঁর পড়াবার একটা কৌশলও ছিল। তাঁর কাছে পাঠ্য পুস্তকের পড়াটাই একমাত্র পড়া বলে বিবেচিত হতনা। এভাবেই তাঁর কাছে আমার কিছু কিঞ্চিৎ সংস্কৃত কাব্যনাটকের পাঠ রপ্ত হয়েছিল। আশ্চর্য ব্যাপার ছিল এই যে কুপির ঐ ম্লান আলোয় তিনি যখন এসব পাঠ ব্যাখ্যাতেন তখন আমার ঘুম উধাও হয়ে যেত। আজ এই প্রায় বৃদ্ধকালে সেইসব মধুর স্মৃতি যেন বেদনার মতো বাজছে। বর্ষার রাতগুলোতে যখন তাঁর টিনের চালার উপর বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটাগুলো চড়বড় করে পড়তে আরম্ভ করত, তখন তাঁরই শেখানো 'মেঘদূতমের' শ্লোক ঐ বারিপাতের ছন্দের সাথে মিলিয়ে আমার কিশোর কণ্ঠের সুরে আবৃত্তি করতাম—

মার্গং তাবচ্ছৃণু কথয়তস্ত্বৎপ্রয়াণানুরূপং
সন্দেশং মে তদনু জলদ! শ্রোষ্যসি শ্রোত্রপেয়ম্।

খিন্নঃ খিন্নঃ শিখরিষু পদং ন্যস্য গন্তাসি যত্র
ক্ষীণঃ ক্ষীণঃ পরিলঘু পয়ঃ স্রোতসাঞ্চোপযুজ্য॥

জলভার যুক্ত মেঘের গমন পথটি কেমন হবে শিপ্রাতটের কবি তাই তাকে বলে দিচ্ছেন। নব বর্ষার নবীন জলদ মেঘ, সে তো পাতলা, হালকা মেঘের মতো চলতে পারবে না, তাকে অনেক হিসেব করে চলতে হবে বলে কবি তাকে পথনির্দেশ করে দিচ্ছেন। তার এখন নবীন যৌবন। সে এখন যদৃচ্ছ ঊর্ধ্বগগনচারী হতে পারবে না। সোজাসুজি কোনও রাস্তাও তার নেই। তার রাস্তা সহজ নয় তাকে এঁকে বেঁকে কত কসরৎ করেই না যেতে হবে। কখনও সে তার দেহ-ভার কোনও উপত্যকায় খানিক বর্ষণে হাল্কা করে নেবে, কখনও বা কোনো পর্বত দুহিতা নির্ঝরিণীর সুপেয় স্বাদু জলে কথঞ্চিৎ বল সংগ্রহ করে নেবে। এই সব শ্লোক আবৃত্তি করার সময় নানান চিন্তা আমার মনে জাগরূক হত। এই যে মেঘ, যেমন দক্ষিণ সমুদ্র থেকে তার ভারি শরীর নিয়ে এতদূর এসে আমাদের টিনের চালায় চড় বড় করে তার দেহভার লঘু করল, তেমনি আরও অগ্রসর হয়ে সে যেন সত্যিই কোনও নির্ঝরিণীর জল পান করে বলশালী হয়ে স্বকার্য সাধনে গমন করতে পারে। আমার শঙ্কা হত যে এত শীঘ্রই সে বলক্ষয় করলে কি ভাবে অতদূর পথের প্রান্তে অলকা পুরীতে গমন করবে?—মাস্টারমশাই আমার আবৃত্তি এবং আশংকার কথা শুনে খুব খুশি হয়ে আরও অনেক শ্লোক আমাকে শেখাতেন। সে সব আর আজ স্মরণে নেই। তবে সেসব দিনে অতিরিক্ত খুশি হলে যে তিনি পকেট থেকে বার করে এক আধচাকা পাটালি উপহার দিতেন তা দিব্যি মনে আছে। কাব্যরসের মিষ্টত্বের চাইতে পাটালির মিষ্টত্ব যে অধিক ধ্রুপদী এবং কালজয়ী এর দ্বারা সে তত্ত্ব নিশ্চয় প্রমাণ হয়। মাস্টারমশাই নিজে গুড় খুব পছন্দ করতেন, আমাকেও প্রায়ই এই উপহারটি দিতেন। আমিও সেসব দিনে এর প্রকৃত গুণগ্রাহী ছিলাম। তবে যাই বলিনা কেন, কাব্যরসের মিষ্টতার সাথে গুড়ের মিষ্টতার কোনও নিকট সম্বন্ধ আছে বলে ডাঙ্গর বয়সে কোনও প্রমাণ পাইনি।

কথায় কথায় অনেক কথাই ব্যাপক ভাবে আসছে। স্মৃতিচারণার এ এক ব্যামো। মূল কথা থাকল এক পাশে পড়ে, 'বিষয়ান্তর এসে' তাকে প্রায় অচ্ছুৎ করে তুলল। তখন সে যেন 'বড়মিঞা', তার তরিবৎ তখন প্রধান হয়ে ওঠে।

সেদিন টোঙের ঘরে গিয়ে মাস্টারমশাই বলেছিলেন, তোর বাবার লগেতো আইজ্ঞ কথা হইল। মনে হয়, মাঝে মাঝে তোর বাড়ি যাওন দরকার। ছোডো ছোডো ভাই বুইনেরা, তোর মায়, এ্যারা তোর লইগ্যা রোজই ফোঁপায়। আমি কই তুই সপ্তাহে পাঁচদিন এহানে থাক, বিষ্যুইদবার ইস্কুলের পর বাড়ি যাইয়া শনিবার আবার আবি। শুক্কুর বার ছুটির দিনডা ওগো লগে থাকলি। ভাইবুইন গুলার ল্যাহা পড়াডাও এট্টু দ্যাখ্যা লাগে।

মাস্টারমশায়ের কথায় আমার মাথা থেকে একটা বিরাট বোঝা নেমে গেল। তাঁর আশঙ্কা হয়েছিল বাড়ি গিয়ে সংসারের হালে আবার নিজেকে পুরোপুরি জড়িয়ে না

ফেলি, তাহলে তো পড়াশোনার ইতি হয়ে যাবে। বাবার সাথে কথা বলে তাঁর সে আশঙ্কা দূর হয়েছিল।

যাহোক, তাঁর অনুমতি নিয়ে সেবার দুদিন নয়, এক সপ্তাহের জন্যই বাড়ি গেলাম, বাবা যে ছাত্র পড়ানোর পরিকল্পনা করেছিলেন তা আমার মাথায় ছিল। আশপাশ গ্রামের মুসলমান ছাত্রদের সাথে যোগাযোগ করে সাতআটজন ছাত্র পাওয়া গেল। তারা নিয়মিত পড়লে পঞ্চাশ ষাট টাকা অনায়াসে পাওয়া যাবে। বাড়িতে ঘরের অভাব ছিল না। অনেক ঘরই খালি পড়েছিল। তার একটি ঘরে তারা রাতে এসে পড়াশোনা করবে। বাবা এবং যখন আমি বাড়িতে থাকব, আমি, তাদের দুতিন ঘন্টা পড়া দেখিয়ে দেব। এতে বাড়িরও একটা সুরক্ষার বন্দোবস্ত হল। এইসব ছেলে ছোট, মাঝারি চাষিদের সন্তান। তারা আমাদের খুব ভালবাসত এবং মানতো। আগে যেসব লোকের কথা বলেছি, এরা তাদের থেকে একেবারেই আলাদা। স্বভাবে নম্র এবং ভদ্র। পড়াশোনা করার মতো যথেষ্ট আর্থিক সংগতি না থাকলেও এরা খুবই আগ্রহী ছিল। এদের বাপচাচারাও মানুষ হিসেবে খুবই সরল সোজা ছিল এবং আন্তরিক ভাবেই চাইত যে তাদের সন্তানেরা কিছু পড়াশোনা শিখুক। এরা বেশির ভাগই নিম্নবর্গীয় সমাজের। উচ্চবর্গীয়দের সাথে তাদের একটাই সমানাধিকার ছিল, তা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের। মিলাদুন্নবীর জমায়েৎ, জুম্মার নামাজ আদায়, ঈদের দিনের কোলাকুলি, এইসব ব্যাপারেই যা সমতা। নচেৎ শত ঢক্কানিনাদেও কি সারা মুসলিম জাহানে 'আলবেরাদরী'র কোনও নজির দেখা যায়? আমার পিছারার খালের আশপাশের মুসলিম পরিবারগুলোর পূর্বজরা অ-মুসলিম অবস্থা থেকে যে কারণে ইস্‌লামে শরিক হয়েছিল, অদ্যাবধি তার কোনও সুরাহা হয়নি। তারা বর্গে এবং বর্ণে যেস্থানে অবস্থিত ছিল এখনও সংখ্যাগুরুদের ক্ষেত্রে তার কোনও ব্যত্যয় ঘটেনি। দেশভাগ জনিত প্লবতার কারণে দুএকটি পরিবার হয়ত বর্গগত ভাবে ঊর্ধ্বগামী হয়ে, অনেক অর্থব্যয়ে বর্ণগত কৌলীন্য লাভ করেছে, কিন্তু তা নিতান্তই 'উল্লা তুল্লা' থেকে 'উদ্দীন' পর্যন্ত, এর বেশি নয়। হিন্দুসমাজে অবপর্ণীয়দের অবস্থা নিঃসন্দেহে আরও বেশি জঘন্য। কিন্তু সেই জিগির তুলে, ইসলামের ঘোষিত সৌভ্রাতৃত্ব নীতির ফাঁকাবুলি কপচে, তার বর্তমান সামাজিক ভেদাচারের দিকে চোখবন্ধ করে থাকাটা কম ভণ্ডামির পরিচায়ক নয়। এই পরিবস্থা ঐতিহাসিক ক্রমে 'হাদিস' সমূহের ব্যাখ্যার সময় থেকেই প্রকট। এ বিষয়ে অধমের কাণ্ডজ্ঞান নিতান্তই অনুবাদে সীমাবদ্ধ। তবুও বলছি, নারী পুরুষের অধিকারের ক্ষেত্রে কিংবা বর্ণ বর্গ বিভেদের নিরিখে কোথাওই এই বহুঘোষিত হাদিসি সাম্য বা সামাজিক ন্যায়ের ব্যাপারগুলি প্রশ্নের ঊর্ধ্বে নয়। একথা হাদিস রচনার যুগ থেকেই গ্রাহ্য ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু সেসব কথা আলোচনার ক্ষেত্রে এটা নয়, নিরাপদ তো নয়ই। বরং সে সময়ের সংখ্যালঘুদের সমাজ বিষয়ে বক্তব্য শেষ করি।

একটা সমাজ ভাঙার পর যে তলানিটুকু থাকে, তার কোনো জীবনমুখী বহতা থাকে না। সমাজের একদার সাংস্কৃতিক, নৈতিক বা ব্যবহারিক স্বাভাবিক শুদ্ধতাবোধ এ সময়

ক্রমশ নষ্ট হতে থাকে। সেই সমাজের মানুষদের আত্মসম্মান, সাহস, আত্মরক্ষার তাগিদে সংগ্রামী মনোভাব, স্বাভাবিক সম্ভ্রমবোধ সবই একে একে বিদায় নিতে থাকে। এভাবেই একে একে হ্রী, শ্রী, লক্ষ্মী, ঋদ্ধি এবং সিদ্ধি সমাজদেহ ছেড়ে চলে যায়। তলানিতে যে কটি প্রেতার্ত প্রাণী বসবাস করতে বাধ্য হয়, তারা হয়ে ওঠে লক্ষ্মীছাড়া উঞ্ছ স্বভাবের। তারা শুধুমাত্র জৈবিক নিয়মে বেঁচে থাকে, আর তাদের হতাশার বীজে আরও প্রেতার্ত সমাজধর্মহীন কিছু অনাবশ্যক জীবের জন্ম হয়। তারা শুধু পূর্বজদের পাপের ঐতিহ্যেরই উত্তরাধিকারী হয়।

এই সময়টায় পিছারার খালের আশপাশের যেকজন হিন্দু অধিবাসী ছিল, তাদের ছেলেমেয়েরা সম্পূর্ণ উঞ্ছবৃত্তিধারী হয়ে গিয়েছিল। বিশেষত একসময়কার মোটামুটি সচ্ছল এবং উচ্চবর্গীয় যারা, তারাই বেশি বেশি করে যেন লক্ষ্মীছাড়া জীবনের আবর্তে পড়ে পাক খাচ্ছিল। এদের এবং আমার নিজের পরিবারেও নানা ধরনের কুৎসিত আচরণ, ক্ষুধানিবৃত্তির নিকৃষ্টতম উপায় অবলম্বন, অনৈতিকতা এবং সম্ভ্রমহীন আচার আচরণ তখন অত্যন্ত সহজেই ঘটে চলেছিল। এই সময়টাতে আমাদের কোনও সামাজিক শিক্ষাদীক্ষা ছিল না। অভিভাবকেরা ছিলেন অসম্ভব উদাসীন। শুধুমাত্র আহার্য সংগ্রহ এবং সন্তানোৎপাদন আর কূটকচালতা নিয়েই ছিল তাঁদের জীবন যাপন। এমন কি বাড়িঘর, বাগান পুকুর ইত্যাদির দিকেও তাঁদের নজর ছিল না। বাগানের ফলন্ত গাছপালা কেটে বিক্রি করা, সুন্দর উদ্যানগুলোকে চষে চটিয়ে ক্ষেত করা, পুকুরগুলোকে সংস্কার না করা ইত্যাদি তাঁদের স্বভাব হিসেবে দাঁড়িয়ে গেল। তাদের জীবন যাপনে আর মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকল না। আগে হিন্দু এবং মুসলমান সমাজ পাশাপাশি আলাদা ভাবে থেকেও একে অন্যকে নানাভাবে প্রভাবিত করত। এখন আর তা থাকল না। গ্রামের সাজানো গোছানো রূপটি একেবারেই নষ্ট হয়ে গেল। মুসলমান গ্রামগুলোতে কিছুকাল তা যদিও খানিকটা ছিল, তাদের বিকাশোন্মুখ সামান্য মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো একসময় শহরের অধিবাসী হয়ে গেলে সেগুলোও লক্ষ্মীছাড়া হতে হতে শেষতক্ পিছারার খালটার মতোই শুকিয়ে গেল।

একটা সুন্দর জনপদ সৃষ্টি হতে মানুষের বহু, বহু বছরের তপস্যা, তিতিক্ষা, আত্মদানের প্রয়োজন হয়। কিন্তু তা যখন ধ্বংস হতে শুরু করে, তখন কত দ্রুতই না তা সংঘটিত হয়। এই পিছারার খালটির ক্ষুদ্র জগৎটিরও নির্মাণ হয়েছিল বহুশত বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সাধনায়। কত বিচিত্র জাতি, গোষ্ঠীর মানুষ, কত চণ্ডভণ্ড, মলঙ্গী, উচ্চ ও নিম্ন বর্ণের মানুষ যুগ যুগ ধরে এই জনপদটিকে নানান সম্ভারে সাজিয়ে তুলেছিল। এখন মাত্র কয়েকটি বছরের অবিমৃষ্যকারিতায় তা শ্মশান হয়ে গেল। কত তাঁতি, জোলা, কামার, কুমোরের অহর্নিশ কর্মতৎপরতার শব্দ তাদের তাঁতের মাকুর ধ্বনিতে, হাপরের নেহাইয়ের বলিষ্ঠ শব্দতরঙ্গে পিছারার খালের আশপাশের হিন্দু মুসলমান গ্রামগুলোকে জমজমাট করে রাখত, আজ সেখানে কোনও বন্য জন্তুও বসবাস করে না। কারণ তাদের বাস করার জন্যও কোনো আব্রু আর অবশিষ্ট নেই। নেই

কোনো ঝোপঝাড় জঙ্গল, লতাগুল্ম, কোনও বাগিচা, পুকুর, খাল বা বিল। সব যেন আরব্য রজনীর গল্পের ভোজবাজির মতো উধাও হয়ে গেছে।

যে সামাজিক অসাম্যের পাপে হিন্দু উচ্চবর্ণীয় সমাজ উৎখাত হয়েছে, তার কার্য কারণ বিশ্লেষণ কষ্টসাধ্য নয়। কিন্তু যারা এই ভূমিকে পবিত্র বোধে গ্রহণ করেছিল, তাদের সমাজ কি করল? সেখানে স্বপ্ন দেখার মানুষেরা কোথায় গেল? আমি মাত্র দশবছরের একটা সামান্য সময়সীমার মধ্যে তাদেরও ভিটে ছাড়তে দেখলাম। হিন্দু সমাজের পাপের উত্তরাধিকার কি তাদের ক্ষেত্রেও অর্শেছিল। নচেৎ এই শূন্যতা কিভাবে সম্ভব?

— তিরিশ —

আটান্ন উনষাট সাল। পিছারার খালের আশেপাশের ভদ্রহিন্দু গেরস্থরা প্রায় শতকরা নিরানব্বইভাগ তখন গ্রাম ত্যাগ করেছে। শুধুমাত্র নিরুপায় কিছু ভদ্রহিন্দু এবং নিম্নবর্ণীয়রা, যুগী, নাপিত, ধোপা, কামার, কুমোরেরা গ্রামে রয়ে গেছে। নিম্নবর্ণীয়দের তখনও ভরসা আছে যে, মুসলমান শাসকশ্রেণী তাদের উপর আঘাত হানবে না। পাকিস্তান শিডিউলড্ কাস্ট ফেডারেশান তখনও বেশ পোক্ত এক সংগঠন। তাদের বেশ কয়েকজন নেতা আছেন, নিজেদের জাত গোষ্ঠীর কথা এঁরা বেশ জোরের সঙ্গেই রাষ্ট্রের কাছে বলে থাকেন। কিন্তু মার্শাল প্রেসিডেন্ট ক্ষমতায় আসার পর থেকেই ব্যাপারটা অন্য দিকে মোড় নিতে থাকে। তখন মুসলিম লিগের প্রাক্তন প্রতিজ্ঞাগুলো যেন প্রায় পরিকল্পিতভাবে হারিয়ে যাবার পথে। তখন আর নিম্নবর্ণীয় বা বর্গীয় হিন্দু মুসলমানদের অভিন্ন স্বার্থের কথা ক্ষমতাসীন কায়েমি স্বার্থান্বেষী সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িকদের মনে থাকে না। অথচ পাকিস্তান কায়েম করার সময় এই নিম্নবিত্ত নিম্নবর্গ তথা নিম্নবর্ণের মানুষদের সমর্থনের জন্য মুসলিম লিগ এক অভিন্ন স্বার্থের কথা বলেছিল। লাঙল যার জমি তার এরকম 'নারা' লাগিয়েছিল। সামন্ততন্ত্রের অন্ত্যেষ্টির কথা, তেভাগার কথা, কত কিছুই না বলেছিল তারা তখন। কিন্তু যখন ভদ্রলোক হিন্দুরা মাটি থেকে উচ্ছেদ হল, যখন দেখা গেল অতি অনায়াসে ছেড়ে-যাওয়া মানুষদের জমিজমা, ভিটেমাটি করায়ত্ত করা যাচ্ছে, তখন লোভ তার জিহ্বার সংখ্যা বাড়িয়ে ফেলল। তখন বিচারটা হল এই যে যেন তেন প্রকারেন হিন্দুর বাড়িঘর জমিন্‌জায়দাদ্ দখল করি।

উচ্চবর্গীয়দের সম্পত্তি দখল হলে, তখন তাদের নজর পড়ে অপবর্গীয়/বর্ণীয়দের গেরস্থালিতে। অতএব দখলকারীরা কায়দা পাল্টাতে শুরু করে। স্বাধীনতাকালীন দাঙ্গার কায়দা, যেমন ধর্মান্তরকরণ, কোতলকরণ, দেশান্তরী হতে ছল বল কৌশলের নানাবিধ প্রয়োগ—এইসব আর থাকে না। তারা দেখেছে একজন হিন্দু ধর্মান্তরিত হলে তার সম্পত্তি দখল করা যায় না। কোতল করলে, কোনও কোনও স্থান থেকে তার প্রতিবাদ, প্রতি-আক্রমণ ঘটে। তাই ও কায়দায় আর চলবে না। তারা হিন্দুদের এবার

জাত ভিত্তিক ভাবে উৎসৃজনের কায়দাটি গ্রহণ করে। প্রথমে তাঁতি বা যুগীদের ভিটেমাটি দখল শুরু হয়। জোলা এবং তাঁতিরা কাছাকাছি বসবাসকারী, ঐতিহাসিক ক্রমে একই রক্তের মানুষ। কিন্তু তাঁতি বা যুগীরা সংখ্যায় যেমন ব্যাপক নয়, তেমনই তাদের পেছনে শিডিউলড কাস্ট ফেডারেশানের মদতও আমার ঐ এলাকায় তেমন পোক্ত দেখিনি। তাই প্রথমে তারা, তৎপরে কিছু কিছু নেতাই দেশ থেকে পালাতে লাগলেন। তবে নমঃশূদ্র জাতীয় মানুষেরা আমাদের ওখানে সহজে সব ছাড়তে রাজি হয়নি। তারাও ছিল ওখানকারই ভূমিপুত্র। বন কেটে বসত তারাও গড়েছে ওখানে। বস্তুত সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের তৃণমূল স্তরের সংঘাত এই মানুষগুলোর মধ্যে জারিত হল রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নেতাদের অপশাসন, স্বার্থান্বেষী মোল্লাতন্ত্র তথা প্রতিষ্ঠিত এবং উঠ্‌তি জোতদারদের দৌলতে। তখন আমাদের প্রথম সংহতি সংগীতের সেইসব পংক্তিগুলো হারিয়ে যেতে থাকল—

হিন্দু ও মুসলিম একপরাণের
আমরা করি না বিবাদ।

অপবর্ণীয় নমঃশূদ্র সম্প্রদায় আর অপবর্ণীয় মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংঘাত যতটা ক্ষতিকারক হয়েছিল, উচ্চ বর্ণীয় ভদ্রলোক হিন্দুর সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের কারণে উচ্ছেদ ততটা ক্ষতিকারক ছিলনা। আমাদের ঐ গ্রামগুলির নমঃশূদ্র জাতীয় মানুষরা, গ্রামীণ আচার, বিশ্বাস, লোকায়ত ধর্মাচার এবং তৎসম্পর্কীয় মেলা মোচ্ছব নিয়ে তাদেরই রক্তসম্পর্কীয় কিন্তু বিধর্মী নিম্নবর্গীয় মুসলমান প্রতিবেশীদের সাথে অনেক কাল ধরেই বেশ ছিল। ভদ্র হিন্দু গৃহস্থদের দেশত্যাগ তাদের ততটা ধ্বস্ত করেনি। তখন শুধু উচ্চবর্ণীয়রাই রাষ্ট্র প্লবতার কারণে দেশত্যাগী, প্রায় নিশ্চিহ্ন। কিন্তু এহ বাহ্য।

বিগত দুর্ভিক্ষের প্রভাব তখনও বেশ টের পাওয়া যাচ্ছে। এই সময়টায় আমি প্রসন্ন কুমার বিদ্যালয়ে এসে ক্লাশ নাইনে ভর্তি হয়েছিলাম। এই গ্রাম কীর্তিপাশা। আগে দাদী আম্মার প্রসঙ্গে যে কীর্তি নারায়ণ রায়ের নাম করেছিলাম, যিনি ইসলাম কবুল করে আমাদের গ্রামের পুব প্রান্তে তাঁর বসতি গড়েছিলেন তাঁর নামানুসারেই নাকি এই গ্রামের নাম কীর্তিপাশা হয়। আমার মনে হয় কীর্তিপাশা নামটির বিষয়ে কিংবদন্তিটি মিথ্যে নয়। কীর্তিপাশার জমিদারেরা কীর্তিনারায়ণের পরবর্তীকালীন সময়ে ওখানে বিখ্যাত হন। তাঁদের বংশীয় কারুর নামে স্থানটির নামকরণের কোনও কিংবদন্তি শুনিনি। তবে যখন কীর্তিপাশার এই প্রসন্নকুমার বিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম, দেখলাম, এই স্থানটি আমাদের পিছারার খালের জগতের মতো নিঝুম নিঃশূন্য নয়। এখানে একটি বাজার, ইস্কুল এবং এর চৌহদ্দির গ্রামগুলিতে ব্যাপক নমঃশূদ্র, কৈবর্ত, কর্মকার ইত্যাদি নিম্ন বর্ণীয় হিন্দুদের বসতি থাকায়, এখানে একটা অন্য পরিবেশ বিরাজিত ছিল। গ্রামীণ সাংস্কৃতিক জীবনে যেসব অবলম্বন আমাদের বরাবর 'ওম' দিয়ে এসেছে, তার অনেকটাই এখানে লভ্য ছিল। যাত্রা থিয়েটার, মেলা, প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল, হাডুডু ইত্যাদি খেলার অনুষ্ঠান, তখনও এখানে দিব্য জমিয়ে হত। প্রসন্নকুমার বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা বেশির ভাগই হিন্দু। বাজারটি বেশ জনসমাগমে সরগরম।

পিছারার খালের ঐ নিঃশূন্য অঞ্চল থেকে বেরিয়ে এসে যখন এই জনসমাগমে পড়লাম, তখন থেকে গোটা ইস্কুল জীবনটা, অর্থাৎ প্রায় আড়াই তিন বছর বেশ আনন্দে কাটিয়েছি। ইস্কুলের সময় ছাড়াও, অধিকাংশ সময় ঐ বাজারেই আমাদের কাটত। এই সময় থেকে পিছারার খালের কথা ভুলতে শুরু করি। সেখানে তখন যুগীপাড়া, নাপিতপাড়া ছাড়া আর বিশেষ জনবসতি নেই। গোটা জিলায় 'বরিশাল রায়ট' নামক পঞ্চাশ একান্নর দাঙ্গায় ভূমিত্যাগী হয়েছিল প্রায় ছলক্ষ হিন্দু। এই দাঙ্গার পর আমাদের জেলার বিভিন্ন হাই ইস্কুলের অন্তত পঞ্চাশ জন হেডমাস্টারকে জেলে নিক্ষেপ করা হয় বলে শুনেছি। নিরাপত্তার অভাবে শত শত শিক্ষক তখন দেশ ত্যাগ করেন। ১৯৫০-৫১ সালের দাঙ্গা সংঘটিত নাহলে আমাদের এই চন্দ্রদ্বীপ এলাকার শিক্ষার হার অনেক বেশি হত এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই জেলার জনগণ বাংলাদেশে অবশ্যই আরও অগ্রগামী ভূমিকা পালন করতে পারত। এই দাঙ্গার পর থেকেই মুসলমান সমাজে গুণ্ডারা সামাজিক এবং রাজনৈতিক ভাবে হিন্দুদের উপর নির্যাতন শুরু করেছিল। হিন্দুরা এসময় থেকেই প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হতে থাকে। শিল্প, বাণিজ্য, চাকুরি ইত্যাদির ক্ষেত্র থেকে তাদের উৎসৃজন ক্রমশ ব্যাপক হারে শুরু হয়। তথাপি এই পরিবস্থার মধ্যে প্রসন্নকুমার বিদ্যালয়টি যে টিকে গিয়েছিল তার কারণ, এই গ্রামটির চারদিকে নমঃশূদ্রদের ব্যাপক অবস্থিতি এবং তারা, তখনও দেশ ছাড়ার কথা কেউ বিশেষ ভাবছে না। উপরন্তু যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, চিত্ত সুতার, মনোরঞ্জন শিকদার— এঁরা তখন রাজনৈতিক জগতের হোমড়া চোমড়া এবং তফশিলি জাতীয়দের নেতা।

কিন্তু মার্শাল আইয়ুব খান সাহেব একটু কায়েমি হয়ে বসেই এমন কলকাঠি নাড়া শুরু করলেন যে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়েরও ভিত আলগা হতে লাগল। যে কথা দিয়ে প্রসঙ্গের শুরু—এই সময়টায় সংখ্যালঘু বিতাড়ন শুরু হয় এক ভিন্ন কায়দায়। প্রত্যক্ষ দাঙ্গার দিন তখন থেকে শেষ হয়ে গেছে। নারায়ে তকদীর আল্লাহু আকবর ধ্বনি তুলে একদা যেমন 'ভদ্রলোক' হিন্দুদের পিলে চম্‌কে দেওয়া গিয়েছিল, নমঃশূদ্র বা অনুরূপ জাতির মানুষদের সেভাবে চমকানো বা কায়দা করা যায়নি। গ্রামীণ পরিমণ্ডলে দেশজ অস্ত্রের ব্যবহার এরাও ভালই জানত। তাছাড়া এখানকার সাধারণ শ্রেণীর মুসলমানেরা এবং নমঃশূদ্ররা রক্তের বিচারে, সাংস্কৃতিক বিচারে এবং রাজনৈতিক মেলবন্ধনে ছিল পরস্পরের খুবই কাছাকাছি। তাই তাদের উপর এই অকস্মাৎ আক্রমণকে তারা বিশ্বাসঘাতকতা বলেই গ্রহণ করল এবং যথাসাধ্য প্রতিরোধের জন্য সচেষ্ট হল। এই বিশ্বাসঘাতকতা মুসলিম লিগের তরফ থেকেই যে করা হয়েছিল, তাতে দ্বিমত থাকার কোনও কারণ নেই। কেননা মুসলিম লিগের তরফ থেকে স্বাধীনতার প্রাক্কালে এই মানুষদের, অর্থাৎ আধিয়ার, তেভাগা আন্দোলনকারী, বেঠবেগারি বিরোধী, সামন্ত নিপীড়িত তাবৎ অপবর্গী সাধারণ বর্ণ হিন্দু এবং মুসলমান চাষি সমাজকে এক প্রগাঢ় 'ওয়াদা' প্রদান করা হয়েছিল। এইসব মানুষ সামগ্রিকভাবেই হিন্দু সামন্তদের দ্বারা ব্যাপকভাবে শোষিত এবং নির্যাতিত ছিল।

পিছারার খালের চৌহদ্দিত যেমন, গোটা পূর্ব বাঙলায়ও তেমনি, সামন্ত শ্রেণী বলতে, হিন্দু সামন্তদেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। কিন্তু তা ছিল মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর সামগ্রিক হিসেবে। তার অর্থ এই নয় যে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যের জমিদার বা অন্য মধ্যস্বত্বভোগীরা সাধারণ এইসব মানুষদের শোষণ বা নির্যাতন করত না। আমার পরিমণ্ডলে আমি অনেক তথাকথিত তালুকদার দেখেছি যারা সাম্প্রদায়িক ভাবে মুসলমান এবং শ্রেণী শোষণ বা নির্যাতনে, অথবা আর্থিক প্রবন্ধে ওখানকার হিন্দু জমিদার বা তালুকদারদের তুলনায় কিছুমাত্র ভিন্ন নয়। সেক্ষেত্রে, লিগপন্থীরা সাধারণদের বুঝিয়েছিল যে পাকিস্তান কায়েম হলে সামন্ততন্ত্র উচ্ছেদ হবে এবং অবস্থাপন্নদের সংযত রাখার জন্য ইসলামি বিধিমতে 'জাকাত', 'খয়রাত' ইত্যাদি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। 'তেভাগা'র অনুসরণ যে পাকিস্তান কায়েম হলে স্বাভাবিক ভাবেই হবে এবিষয়ে সাধারণ চাষিদের ব্যাপকভাবে বলা হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান কায়েম হবার পর, এমন কি মধ্যস্বত্ব প্রথা উচ্ছেদ হবার পরও এই প্রতিজ্ঞা পালনের কোনওই প্রচেষ্টা হয়নি। না হওয়ার কারণটিও অবশ্য শরিয়তি ব্যবস্থার অন্তর্গত, অন্যের 'হক্কের সম্পত্তি' দখল করা না-জায়েজ, হারাম, —এমত নির্দেশ। সে সম্পত্তি হিন্দুর হলে জায়েজ এবং মুসলমানের হলে না-জায়েজ, এসব বিতর্কে তখন অন্তত কেউ যাননি। ফলত, হিন্দু উচ্ছেদ করণের কায়দাটি পাকিস্তান কায়েম হবার পর ক্রমান্বয়ে প্রথমে হিন্দু মধ্যস্বত্বভোগী, তৎপর অসংগঠিত হিন্দু অপবর্ণী এবং সর্বশেষ সংগঠিত হিন্দু অপবর্ণীয়দের (পাঠক, বর্গ ও বর্ণের ভিন্নতা এক্ষেত্রে বিচার করবেন) উচ্ছেদে তার বৃত্ত সম্পূর্ণ করে।

এখন কথা হচ্ছে, এ সংবাদ আমি কি ভাবে জানি, বা এই সব হিসেবের সূত্র কি? প্রসন্নকুমার বিদ্যালয়ে আগত এবং পাঠরত আমার সতীর্থ অপবর্ণীয় বান্ধবরাই এ তথ্য বলে, বা, তাদের হঠাৎ হঠাৎ অন্তর্ধানে আমি অন্যদের কাছে জিজ্ঞেস করে তা জানতে পারি। এইসব থেকেই, আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, নিম্নবর্ণীয়, শিডিউলড কাস্ট ফেডারেশনের অন্তর্গত মানুষরা, যারা ঐ দেশে পূর্ণ মর্যাদায় থাকতে পারবে বলে বিশ্বাস ছিল, তারাও দেশত্যাগ করতে শুরু করে। কিন্তু তারা কি কোনও ব্যাপক সাম্প্রদায়িক আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়েছিল পঞ্চাশ একান্ন সালের দাঙ্গার সময়ের মতো? না। কারণ মার্শাল প্রেসিডেন্ট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নাকি পছন্দ করতেন না, এরকম আমরা তখন জেনেছি, দেখেছিও। তবে যেটা জানিনি এবং যে কারণে অপবর্গীয়/বর্ণীয় মানুষেরা দেশ ছেড়ে তখনও নিরুদ্দেশ যাত্রা করছিল, তার কারণ নিশ্চয়ই মার্শাল প্রেসিডেন্টের ইচ্ছার মধ্যেই নিহিত ছিল যে, এরাও চলে যাক। দেশের উপর অধিক জনসংখ্যার চাপ কমুক এবং ভূমির দখলদারি বিশেষ সম্প্রদায়ের হাতে আসুক। এটা মোল্লাতন্ত্রের সদুপদেশ। জেনারেলও স্বার্থসন্ধ হয়ে তাই বুঝলেন।

এই সময়টায় দেশে, কৃষিবিষয়ক বিশেষজ্ঞরা আসছিলেন—আমেরিকা এবং জাপান থেকে। জাপানিরা অবশ্য তখনকার আন্তর্জাতিক কারণে বকল্‌মায় মার্কিনই। তখন এক

লপ্তায় অনেক জমি চাই, জাপানি প্রথায় ধানের চাষ চাই, কৃষিকর্মে ট্র্যাকটরের ব্যবহার চাই, হল্যান্ডের পদ্ধতিতে আলুর চাষের উদ্ভাবন চাই—এইসব বিষয়ে ইস্ট পাকিস্তান ইনফরমেশন, পাকিস্তান অবজার্ভার ইত্যাদি পত্রিকায় ব্যাপক লেখাপত্তর প্রকাশ হত। কিন্তু দেশের লোক যেহেতু বেহেড 'ক' অক্ষর হারাম, তাই লাল, সাদা, পীতবর্ণের সাহেবগণ গাম বুট পরে জলকাদা জোঁক, সাপ তুচ্ছ করে আমাদের ওখানে মানুষের হিতসাধনে দলে দলে আসতে লাগলেন। এরকম সময়ের একটি সরস ঘটনা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আছে বলে বলার লোভ সামলাতে পারছি না। মার্কিনি সাহেবেরা আমাদের বড় খাল পারের একখণ্ড জমিতে জাপানি প্রথায় ধানের চাষ শেখাতে এসেছেন। আমাদের ও-পারের তারুলি গ্রামের কদম আলী চাচা আশে পাশে ঘুরঘুর করছেন। মাঝে মাঝে গ্রামীণ অন্যান্য উপস্থিত লোকেদের কাছে উল্টোপাল্টা মন্তব্য করছেন। চাচা পুরুষানুক্রমে জাত চাষি। সাহেবরা প্রায় স্কেল পেন্সিল নিয়ে কায়দাটা বোঝাবার চেষ্টা পাচ্ছেন যে, ধানের চারার লাইন এমত সোজা হবে। এখান থেকে জলের প্রবাহ আনতে হবে, এই সার, ঐ ওষুধ এরকম ভাবে দিলে তবেই অধিক ফসল হবে—এইসব। দোভাষি পাকিস্তানি সাহেবরা ব্যাপারটা স্থানীয় চাষিদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু তাঁরা একটি ব্যাপারে কিছুই বলছেন না। তা হল, ক্ষেতের জলটা আসবে কোত্থেকে। ধান চাষে যতই কায়দা করা হোক আর সার দেয়া হোক্, জল না থাকলে কিছুই কিছু না। তো কদম চাচা শেষতক্ আর নিজেকে সামলাতে না পেরে, স্ব-নিরুক্তিতে বলেই ফেললেন, এইসব করলে যদি ডবল ধান অয়! তয়তো মোর বাজা গাইডারে 'ম্যাল' দিলেও বাছুর হওন লাগে।—'ম্যাল' অর্থে 'পাল' খাওয়ানো। চাচা আরও বলেছেন,—বাপদাদা পরদাদায় কইয়া গেছেন যে, আওলাদ পয়দা করণের লইগ্যা পেরোজন 'মাতৃরজ' আর 'পিতৃবীর্য'। এ্যারা দেহী খালি 'পিতৃবীর্য' দিয়াই আওলাদ পয়দা করতে চায়। তয় মোর মোন লয় এই বড় খালডারে না কাড়াইলে এহানে একগাছ বালও অইবে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে তখনকার দিনে আমাদের অঞ্চলে শ্যালোর প্রচলন ছিল না। চাচার কথায় পাকিস্তানি সাহেবরা চটেন এবং কদম চাচাকে খেদিয়ে দেন। কিন্তু, মনে আছে, তিনি নিরাপদ দূরত্বে থেকে বলে যাচ্ছিলেন,—মদন রস না থাকলে পাল খাওয়াইয়া কী অইবে অ্যা?—তোরা যা ইংরাজি করইয়া কও হেয়া বুজিনা আমি। তয়, খালডা যদি না কাডা অয় তয় এহানে বাল পাবা বাল।

তার এই কথা একসময়ে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হতে দেখেছি। কদম আলী চাচার কথার লব্জ এরকমই ছিল। তো, তাঁর এইসব কথা যখন কেউই আমল দিচ্ছে না, তিনি একটু উত্তেজিত স্বরে কথা বলতে শুরু করলেন। একারণে, জনৈক মার্কিন সাহেব বিরক্ত হয়ে তাঁকে সরাসরি জিগেস করলেন, হু আর ইউ?—এখন কদম চাচা 'ইউ' মানে তুমি তা জানেন, কিন্তু 'হু আর' তাঁর কাছে শূয়ার। কারণ, এখানে 'শ' উচ্চারণ 'হ'-য়ে হয়। এ কারণে তাঁর ক্রোধ। কি? না সাহেব 'হেনারে হুয়ার অর্থাৎ 'সুয়ার' কইছেন।' একে চাষি, তায় মুসলমান। এ কারণে শুয়োরের উপর তাঁর বিদ্বেষ এবং

ঘৃণা প্রকট। তাই চট্‌জলদি তাঁর উত্তর, 'সায়েব, হুয়ার তোমার বাফে।'—অর্থাৎ সাহেব তখন জাত্যংশে, চাচার বিধিমতে, শূকর-পুত্র।

তা এসব 'কিত্তি' তো আমাদের নিজেদের দেখা। একসময় বুঝেছি, চাচা তাঁর বেসিক প্রেমিস-এ একশোভাগ সঠিক। কিন্তু দেশি বা পরদেশি সাহেবরা তার ভাষা এবং অভিজ্ঞতাকে আমল দিচ্ছে না। বড়খালটা যে শুকিয়ে গিয়ে তার আশপাশের জমিকে 'মদনরস' বঞ্চিত করে বাঁজা করে দিচ্ছে, কদম চাচার ভাষায়—এই 'চুৎমারানির পোয়েরা হে কতা বোঝলে তো!'

— একত্রিশ —

কিন্তু মধ্যস্বত্বভোগী ভদ্দরলোক হিন্দু গৃহস্থদের দুর্দশায় কেউই ঐ ক্রান্তিকালে অশ্রুমোচন করেননি, কারণ তাঁরা পুরুষানুক্রমে যে জঘন্যতায় মানবতাকে অবমাননা করে এসেছেন তার জন্য, সাধারণ মানুষ, কিবা হিন্দু, কিবা মুসলমান, কারুরই তাদের প্রতি সহমর্মিতা থাকার কথা ছিলনা। এই জিলার ভূমি ব্যবস্থা বোধকরি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে জটিল। জমিদার এবং রায়তের মাঝখানে প্রায় আড়াই লক্ষ মধ্যস্বত্বভোগী একসময় ছিল—একথা একদা বাংলার ভারপ্রাপ্ত সচিব এল. বারলি বর্ণনা করেছেন। অতএব এই আড়াই লক্ষের এবং তাদের অনুচরদের যে বিপুল সংখ্যা, তাদের বিক্রমে তাবৎ সাধারণ মনুষ্য হামেহাল নাজেহাল। অন্তত কয়েক ডজন দুক্রান্তির মধ্যস্বত্ব ভোগীদের বাস্তেল্লাবাজি আমার জীবনেই দেখেছি। দেখেছি তাঁদের সামন্তসুলভ আচরণ। আমার পরিবারও তার থেকে ভিন্ন নয়। সেকারণে তাঁদের প্রতি সহমর্মিতা পোষণ করা সাধারণ প্রকৃতিপুঞ্জের পক্ষে যে আদৌ সম্ভব নয় সেকথা যৌক্তিক ভাবে মানি। তথাপি আমার জন্মভূমির ঐ অপবর্গীয়/অপবর্ণীয় মানুষেরা যে এঁদের দুর্দিনে, সহমর্মিতার চূড়ান্ত নির্দশন রেখেছিল তাও তো আমার অজানা নয়। তারাই তো এঁদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল তখন। দাঁড়িয়েছিল এ কারণে যে এই সব মধ্যস্বত্বভোগীদের অনাচারই একমাত্র বিচার্য বিষয় বলে তাদের মনে হয়নি। এঁদের কিছু সদাচারও ছিল। যা, প্রান্তিক মানুষদের কাছে গ্রাহ্য ছিল। তারা সেই সদাচারের প্রতি নিমকহারামি করতে পারেনি। সামন্ত বর্গীয় মানুষদের সেই সদাচার বিষয়ে গল্পকার, উপন্যাসকারেরা যথেষ্ট কথন কয়েছেন, অধিক বাগাড়ম্বরের প্রয়োজন হয় না। আমার জন্মভূমির সাধারণ মনুষ্য সেই সদাচারের প্রতি বিশ্বস্ত থেকেই বিভিন্ন সময়ের প্লবতার মুহূর্তে, এঁদের পাশে এসে দাঁড়িয়ে, তাঁদের প্রাণ পর্যন্ত বাজি রেখেছে। তারা অকাতরে প্রাণ দিয়েছে এবং নিয়েছেও। কিন্তু তৎসত্ত্বেও শেষ রক্ষা হয়নি। এজন্য ঠিক কোন্ সম্প্রদায়কে যে দায়ী বলব, তা এতকাল পরেও বুঝে উঠতে পারি না। শুধু ঘটনা পরম্পরাটুকুই যেমন দেখেছি তেমন বলতে পারি। যেমন এখন আমাকে বলতে হবে সেই সব ডাকাতির কার্যক্রম, যে ডাকাতির তরিকা এক আলাদা মাপে, যার সাথে ইতিপূর্বে আমাদের পরিচয় ছিল না।

আমাদের এই জিলার ডাকাতেরা যে সাতিশয় ডাকাত একথা সর্বজনে জানে এবং এ জন্য তারা কোনও দিনই নিজেদেরকে লজ্জিত বোধ করেনি। আমরাও এই সব ডাকাতদের ঠিক ভয়ঙ্কর অনাত্মীয় ভাবতাম না। তাদের পরিচয় আমাদের কাছে দুঃসাহসিক বীর হিসেবেই গ্রাহ্য ছিল, সমাজবিরোধী হিসেবে নয়। কিন্তু যে ডাকাতির কথা এখন বলতে যাচ্ছি তার মধ্যে বীরত্বের কিছুই নেই। তার মধ্যে কোনও নীতি নিয়মের ব্যাপারও নেই। তার উদ্দেশ্য একমাত্র ধর্ষণ, লুণ্ঠন এবং সংখ্যালঘুদের সার্বিক উৎখাত। কিন্তু এখানকার পরম্পরাগত ডাকাতিতে এই মানসিকতা ছিল না। এটাও অবশ্যই সমাজ-বিরোধী চরিত্রের। কিন্তু এই সময়কার ডাকাতি অনুষ্ঠিত হত সেই সব বাড়িগুলিতে যেখানে কিছু সম্পদ আছে এবং যুবতী অথবা কিশোরী মেয়ে আছে। প্রাথমিক ভাবে এইসব লক্ষ্যস্থল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের গেরস্থালিতেই শুরু হয়েছিল। এরকম বেশ কিছু ডাকাতি এবং তার ফল আমি চাক্ষুষ করেছি। তার মধ্যের সামান্য কিছুর উল্লেখই শুধু করব। আমাদের নায়েব মশায়ের পরিবার তখনও দেশ ছাড়েননি। তবে বাপদাদার ভিটে পরিত্যাগ করে তাঁরা তাঁদের বড় মেয়ের পাকা বাড়িতে বসবাস করছেন। বড় মেয়ে এবং জামাই সপরিবারে তখন দেশ ত্যাগ করে পাকা বাড়ির পরিবর্তে কলকাতার এক বস্তিতে, খোলার ঘরের বাসিন্দা। নায়েব মশাই তখন ঐ বাড়িতে একটি মুদিদোকান দিয়ে কায়েম হয়ে বসেছেন। পাকা বাড়ি, বাড়ির চৌহদ্দিতে বিস্তীর্ণ বাগান, নানাধরনের গাছ। ফৌজি হামলায় তাঁর নতুন কর্মস্থল পালেদের বার্মাশেল কোম্পানি পাত্‌তাড়ি গোটাতে বাধ্য হলে, তিনি মুদির দোকান দিয়ে পরিবার পরিপালনের যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। নায়েব মশায়ের দোকানটি খুব খারাপ চলত না। তাঁর পরিবারের লোকসংখ্যাও ছিল প্রচুর। দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী এবং শাশুড়ি, শালা, শালাজ এবং শালার বেটা সহ নিজের দুই সংসারের বেশ কিছু সন্তানাদি নিয়ে ঐ একই ছাতের নীচে বাস করতেন।

এক ঘোর বর্ষার মধ্যরাতে বাবার ডাকে আমার ঘুম ভাঙল। নায়েব মশায়ের বড় ছেলে আমার সহপাঠী বিধায়, আমি প্রায়শই ঐ বাড়িতে রাত কাটাতাম এবং দুইজনে পড়াশোনা করতাম। আমার পাঠ্য সব বইপত্র ছিল না বলে এরকম একটা ব্যবস্থা করে নিয়েছিলাম। তখন আমরা ক্লাস নাইনের ছাত্র। মাস্টারমশায়ের বাড়িতে তখনও আমি স্থায়ী হইনি। আমি উঠলে বাবা নাগরআলিকে ডাকতে বললেন। সে তখনও আমাদের রাখাল। দূর থেকে আর্তনাদ এবং চিৎকার চেঁচামেচির আভাস ঐ ঘন বরষা ভেদ করেও আমাদের কানে পৌঁছোচ্ছিল। নাগর বলল, 'মোন লয় নাইব মশায়ের বাড়িতে ডাকাতি অইতাছে। হাথইয়ার লওন লাগে।' আমরা তিনজনে রামদা, ল্যাজা (সড়কি) এবং 'ট্যাডা' অর্থাৎ লম্বা বাঁশের হাতলে দু' বিঘৎ দৈর্ঘ্যের লোহার খাঁজকাটা তীক্ষ্ণধার এক অদ্ভুত ভয়ঙ্কব অস্ত্র নিয়ে ঐ জলকাদায় ধাওয়া করলাম। বাইরে বেরিয়ে নাগর মধ্যরাত্রির স্তব্ধতা ভঙ্গকারী বীভৎস এক রণধ্বনি দিল। সাথে সাথে কাছে দূরের মানুষেরা, যারা তখনও গ্রামে ছিল, প্রতিধ্বনি জানাল। আমরা ডাকাতির নির্ধারিত স্থানটি

জানিয়ে দেবার জন্য গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে তাদের বুঝিয়ে দিতে লাগলাম কোথায় যেতে হবে। কিছুক্ষণের মধ্যে বেশ কয়েকজন অকুস্থলের কাছাকাছি একটি খাল-পাড়ে পৌঁছে গেলাম। তখন নাগর এবং তার শ্রেণীর মানুষেরা ডাকাতদের উদ্দেশ্যে অশ্রাব্য সব গালিগালাজ করছিল। এরা কোনও উত্তেজনা এবং সংঘর্ষের সময় যেসব ভাষা এবং শব্দ ব্যবহার করে, তার শীলিত নাম slang বা খিস্তি। বরিশালীয় ভাষায় বললে, বলতে হয় 'খামার'। নাগর খালধারে পৌঁছেই বুঝতে পেরেছিল ডাকাতরা নৌকোয় এসেছে। বর্ষণের তীব্রতায় এবং অন্ধকারের জন্য কিছুই প্রায় দেখা যাচ্ছিল না। ঘটনাস্থলে পৌঁছোনোর জন্য খালটি অতিক্রম করা আবশ্যক ছিল। কিন্তু চতুর ডাকাতেরা পারাপারের আলগা 'চার'-এর গাছটি নামিয়ে রেখেছিল। তা দেখে নাগর, চুৎমারানির পোয়ারা চার গাছড়া সরাইয়া দেছে। নাকি হ্যারগো মা বুইনের-ইত্যাদি। হালারপো হালা জারউয়ার পোয়েরা, হামনাহামনি আয়, তয়না বুজি যে এক বাপের আওলাদ্। —এইসব বাক্যবন্ধ বলেই যাচ্ছে। তার খেয়াল নেই, ছোটবাবু এবং আরও দুএকজন মুরুব্বি সাথে আছে। সে বলে,—'চারের' মায়রে তিনবার। লয়েন মোরা হাত্‌রাইয়াই খাল পার হমু। ছোটবাবু হুঁসিয়ার কৈলম, হালাগো ল্যাজা আর ট্যাডার দিকে নজর রাহন লাগে। —এ কথা শেষ হতে না হতে টং করে এক শব্দ হয়। ডাকাতদের দল উল্টোপারের একটা জায়গা থেকে সম্ভবত নাগরকে বিদ্ধ করতে চেয়েছিল তার 'খামার' অনুসরণ করে একটি সুপারিকাঠের বল্লমের দ্বারা। বাবার হাতের ল্যাজার বাটখানার ব্যবহার হল মুহূর্তে ঐ উড়ন্ত বল্লমকে দিগভ্রষ্ট করার জন্য। প্রতিরোধকারীদের মধ্য থেকে 'সাবাসি' ওঠে কেননা অব্যর্থ বিদ্ধতা থেকে নাগর রক্ষা পেল ঐ অন্ধকারের মধ্যেও। একারণে সমবেত অপবর্গী, অপবর্ণীদের খামার অসামান্য পর্দায় মাত্রা পায়।

ডাকাতরা তখন তাদের কাজ সেরে পালাবার পথে। নৌকোর শব্দ পাওয়া যায়। নাগর বলে, গুল্লিবাঁশখান না আনাডা সাইদ্যের ভুল অইছে। সাউয়ামারানির পোয়রা পার পাইয়া গেলি। গুল্লিবাঁশখান থাকলে জালের কাড়ির গাদন খাওয়াইয়া তোগো আড়ইয়া বিচিগুলান থ্যাত্‌লাইয়া দেতে পারতাম। —তার পূর্বপুরুষ বাগ্দিকাহার, অথবা নগ্দি পাইক। গুল্লিবাঁশের ব্যবহারে তাদের হস্তলাঘব এখনও কিংবদন্তি। এ অঞ্চলে তির ধনুকের চল নেই। গুল্লিবাঁশও তির ধনুকের আকৃতির, কিন্তু তার নিক্ষেপ অস্ত্র তির নয়, জালের কাঠি অথবা পোড়া মাটির 'গুল্লি'। তবে তার জন্যে নাগরকে অধিকক্ষণ আক্ষেপ করতে হল না। সে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে পলায়মান নৌকোর বৈঠার আওয়াজ লক্ষ্য করে একটি সুপারি কাঠের বল্লম নিক্ষেপ করে এবং সেখান থেকে এক তীব্র আর্তনাদ ভেসে আসে। উৎফুল্ল এবং উত্তেজিত প্রতিরোধকারীরা সমবেতভাবে মন্তব্য করে যে 'এক লাংচুনীর পোয়রে বোধায় গাথা গেছে।'

খাল পেরিয়ে আমরা যখন নায়েব মশাই-এর বাড়ি পৌঁছোই, তখন সেখানে এক ভীষণ দৃশ্য। পুরুষদের সবাইকে বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে। নায়েব মশাই-এর গায়ে মাথায় রামদার কোপ এবং গোটা শরীর রক্তে জব্‌জবে। তাঁর শ্যালক, যাকে আমরা

সবাই মামা বলে ডাকতাম, তাঁকেও প্রায় ক্ষতবিক্ষত করে ফেলে রাখা হয়েছে। নায়েব মশাই এর ছেলে, যে আমার সহপাঠী এবং বন্ধু, তাকে হাত পা মুখ বেঁধে এমন ভাবে রাখা হয়েছে, যে, সে জীবিত কি মৃত বোঝা যাচ্ছে না। সবাইকে ঐ অবস্থা থেকে উদ্ধার করে বুঝলাম সৌভাগ্যক্রমে কেউই প্রাণে মারা পড়েন নি। কিন্তু চরমতম বীভৎসতা দেখতে হয় নায়েব মশাই-এর মেয়েটাকে উদ্ধার করার পর। সবাইকে পাওয়া গেলেও তার হদিস পাওয়া যাচ্ছিল না। কাকিমা অর্থাৎ নায়েব মশাই-এর স্ত্রী শুধু উন্মাদের মতো চিৎকার করে যাচ্ছেন,—ও রে মোর রূপাই কৈ? ও রে তোরা দ্যাখ, হ্যারে বুজি উডাইয়া লইয়া গেছে। ও রে ধন পেরাণ তো গেছেই, মোর জাইত মানও বুঝি গেছে। —তাকে উদ্ধার করা হয় বাড়ির পেছন দিকের নির্জন অংশের ঢেঁকিঘর থেকে। তার বয়স বড়জোর তেরো চৌদ্দ হবে, তবে একটু বাড়বাড়ন্ত গড়নের। সে একটা বোবা পশুর মতো গোঁ গোঁ আওয়াজ করছিল। তার চোখে না ছিল কোনও ভাষা, না স্বাভাবিক হুঁশ। তাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে আসার পর নায়েব মশাই-এর পরিবারের সবাই এক ব্যাপক আক্ষেপে সমস্বরে কান্নাকাটি জুড়ে দেয়। লজ্জা আর হতাশায় ভেঙে পড়ে। বস্তুতই এ এক তীব্র আপশোসের ব্যাপার। বাপ, ভাই বা অন্য অভিভাবকের যদি তাঁদের কিশোরী বা যুবতী স্ত্রী, কন্যাদের ইজ্জতটুকুও রক্ষা না করতে পারেন, তবে বেঁচে থাকার সার্থকতা কোথায়? আর এ কথা তো সবাই জানেন যে অক্ষতযোনি কিশোরীর উপরে বলাৎকারের তুল্য সর্বনাশ আর হয় না। আমার সতীর্থ বন্ধুটি তখন আমাকে জড়িয়ে ধরে শুধু একটা কথাই বলে যাচ্ছে,—অরগো হাতে তো রামদা আছেলে, আমারে আগে কাডইয়া ফ্যালাইলেনা ক্যান?

কিন্তু এই নতুন পদ্ধতির ডাকাতিতে 'কাড্ইয়া ফ্যালাবার' নীতি ছিল না। যে সব মানুষ এই ডাকাতির মদতদাতা, তারা খুনখারাপি বিষয়ে একটু 'নাজুক' হয়েছিলেন, কারণ আগেই বলেছি, মার্শাল প্রেসিডেন্ট সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা নাকি আদৌ পছন্দ করেন না। পছন্দ না করার কারণ হয়ত সাগর পারের পশ্চিমি গার্জেনদের হিসেবি তর্জন। কিন্তু দেশের অতটা নিম্নস্তরে তার রূপায়ণ খুব সহজ কর্ম নয়। তাই এই সাম্প্রদায়িক ডাকাতির উদ্ভাবনা। এই সব ডাকাতির মদতদাতা ছিল নতুন অর্থ এবং ক্ষমতার অধিকারী কিছু মানুষ, যারা বিগত দাঙ্গাগুলোর সময় সংখ্যালঘুদের রক্ষকের ভূমিকা নিয়ে কৌশলে জমি, বাড়ি, সম্পত্তির মোটা ভাগ অধিকার করে নিজেদের অবস্থার ব্যাপক উন্নতি ঘটিয়েছিল। তারা অবশিষ্ট উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদেরও যথেষ্ট খাতিরমহব্বত করত। বিপদে অভয় দিত। আবার তাদের পোষা বদ্মশাদের ব্যবহারও করত ডাকাতির এই নতুন প্রকল্পে। সংখ্যালঘুদের যুবতী বা কিশোরী কন্যাদের সহজে ভোগ করার উদ্দেশ্যে তাদের ছেলেরাও এইসব বদমাশদের সাথে ডাকাতিতে অংশগ্রহণ করত। এই বদমাশগুলো যখন লুটের কাজে ব্যস্ত থাকত, তাদের মালিক পুত্রেরা তখন ধর্ষণে উন্মত্ত হত। নায়েব মশায়ের বাড়ির ঘটনায় আমি এই সত্য উপলব্ধি করেছিলাম। তাঁর পাশের আরেকটি বাড়িতেও প্রায় অনুরূপ ঘটনার কথা আমি জানতাম। সেখানে মারামারি, রক্তারক্তি

বা লুট কিছুই ঘটেনি। শুধুমাত্র সে বাড়ির একটি সুন্দরী কন্যার লোভে এইরকম ভদ্র ঘরের জনাকয়েক সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের যুবক সিঁদ কেটে ঘরে ঢুকে, মেয়েটিকে বলাৎকার করার প্রয়াস পেয়েছিল। কিন্তু মেয়েটির সঠিক অবস্থান অন্ধকারে নির্ধারণ করতে না পেরে, তার বিধবা বুড়ি জেঠিমাকে জাপ্‌টে ধরেছিল। বুড়ি বিকট চিৎকার করে ওঠায়, তারা পালিয়ে গিয়েছিল। আমি জানতাম তারা কারা। তারা সেদিন বাড়াবাড়ি করতে পারেনি এজন্যেই যে কেউ চিনে ফেললে সামাজিকভাবে তারা অপদস্থ হবে। হিন্দু এবং মুসলমান—উভয় সমাজেই তারা যথেষ্ট মান্যগণ্য ছিল।

এভাবে একের পর এক ডাকাতি শুরু হলে বাকি ভদ্রগৃহস্থরা ক্রমশ বাধ্য হয় নিকটবর্তী শহরে, নচেৎ পশ্চিমবঙ্গে পাড়ি দিতে। তাদের বাড়িঘর, জমিজায়গা, এইসব তালেবরদের হাতেই অর্পণ করে যেতে হয় তাদের। ঘটনা ঘটার পর এঁরা এসে দুঃখ করতেন। দেশের হাল দিন দিন কি হচ্ছে, তা নিয়ে আপশোস করতেন। বলতেন, নাঃ আর বোদায় আপনেগো রক্ষা করতে পারলাম না। কি আছেলে আর কি অইলে? আহা! এ দ্যাশে ক্যার যে ইজ্জত করুম আর ক্যারই বা গিবত্ করুম হে কতা আল্লা মালিকই জানেন। —এঁরাই তখন বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে জলের দামে অথবা দেখাশোনা করবার 'অছিলায়' বিষয় সম্পত্তি দখল করতেন। মুখে বলতেন, ভাব্যেন না যে সুবিদা নিলাম। সম্পত্তি ব্যাক আপনেগোই রইল। আল্লাকস্‌ম, মুই এ্যার অছি। তয় অবস্তা তো দ্যাখতেই আছেন। যায়েন, নিজেগো জাগায় নিজেগো মাইন্‌ষের মইদ্যে যাইয়া, দেইখ্যা শুনইয়া এট্টা ব্যবস্তা করইয়া আয়েন ও পারে যাইয়া। মোরাতো আছিওই। ফিরইয়া আইয়া ব্যাক্ কিছুই সহিসলামত্ পাইবেন, ইন্‌শাল্লা। 'নিজেগো জাগা'! 'নিজেগো মানুষ'! যারা দেশ ছেড়ে চলে গেছে তারা কি আমাদের 'নিজেগো মানুষ'? যাদের সাথে আছি তারা কি 'নিজেগো নয়', এ দেশটা তবে 'আমাগো জাগা' নয়? তবে নিজেদের মানুষ আর নিজেদের দেশ কোথায় পাব? তার জন্যে আরও হাজার বছর ধরে হাজার বার উদ্বাস্তু হব, কিন্তু তবুও কি কোথাও ঠাঁই পাওয়া যাবে? অথবা আজ যে আমার ভূমি দখল করে, ছলে বলে, কৌশলে আমাকে উদ্বাস্তু করছে, সেও কি আখেরে স্থায়িত্ব পাবে? বাঙালি কি কোনও দিনই নিজের কুঁড়ে ঘরে নিজের মতন করে বাঁচবে? তার সন্তান কি আদৌ দুধে ভাতে থাকবে? সে কী আর আদৌ 'দেশের মানুষ' থাকবে, না যে 'দেশ' নামক বোধকে দুখণ্ড করে দুটি অবোধ্য জাতিরাষ্ট্র তৈরি হয়েছে—তাদের কোনও একটির 'নাগরিক' বা 'সিটিজেন' নামক অচেনা অস্তিত্বে পরিচিত হবার প্রয়াস চালিয়ে যাবে জীবনভর, আর শুধু পরস্পরের রক্ত ঝরাবে? এরকম হাজার প্রশ্ন তোলা যেতে পারে, কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভেদাচার, ভ্রাতৃবিদ্বেষের এই নির্বোধ আচরণ, ব্যক্তিক এবং সাম্প্রদায়িক লোভ অথবা সর্বোপরি আত্মহননের এই প্রগাঢ় মর্ষকাম বোধকরি তাকে আরও বহু, বহুকাল ধরে উদ্বাস্তু করেই রাখবে এবং তা সম্প্রদায় নির্বিশেষেই।

এরকম ডাকাতি ঘটানোর সময় ডাকাতরা বলে দিত যে এরপরও যদি তারা দেশ না ছাড়ে তবে একেবারেই নিকেশ করে দেওয়া হবে। কোনও কোনও ঘটনায় নিকেশ যে করা

হত না এমনও নয়। কিন্তু রাষ্ট্রীয় কায়দা কানুনও এসময় এমন ছিল যে এসব ঘটনাকে সাধারণ ডাকাতির অতিরিক্ত কিছু বলে মনে করা হত না। সরেজমিনে আসা পুলিশ, দারোগারা তাদের তদন্ত কার্যের অছিলায় এই উৎপীড়িত মানুষগুলিকে যৎপরোনাস্তি নাস্তানাবুদ করত এবং ফলত তাদের আতঙ্কের মাত্রা বৃদ্ধিই পেত। ডাকাতি বা খুন হলে খুনের কোনও কিনারাই হত না। উপরন্তু, হতভাগ্য গৃহস্থদের উপর আক্রমণকারীদের আক্রোশ আরও বৃদ্ধি পেত। সারাদিন তথাকথিত হিতৈষীদের স্তোক এবং আশ্বাস বাক্য শুনে আশ্বস্ত থাকলেও সন্ধ্যার আঁধার নামলেই আতঙ্কের শুরু। ঘরের 'ছাইচে' পাতার খচ্‌মচ্‌ বা যে কোনও প্রাকৃতিক শব্দও বুকের রক্ত হিম করে দিত। আগের মতো ঘন বুনোট বসতি নেই। রক্ষক হিসেবে রাষ্ট্রও একচক্ষু ষণ্ডের মতোই নিষ্ঠুর। তার ভাব চরিত্র বোঝা দায়। সে যে কোন চোখটায় কখন অন্ধ তা বোঝা ভার। তার শিঙের গুঁতোটাই শুধু টের পাওয়া যায়, অন্ধ চোখটার উদাসীনতাজনিত স্বস্তি কখনওই পাওয়া যায় না।

পূর্বোক্ত ঘটনাটি ঘটার পরদিন থানা পুলিশ আসে। দারোগার বজরা ঘাটে লাগে। সেই দারোগা আলবোলায় তামাক খান। বজরা থেকে নেমে অকুস্থল পর্যন্ত হেঁটে আসার সময় অনুগমনকারী চাপরাশিকে সেই আলবোলা বহন করে নিয়ে আসতে হয় আর সতর্কতার সঙ্গে মাঝে মাঝেই কলকের আগুন উস্‌কে দিতে হয়। তার সামান্যতম অন্যমনস্কতায় দারোগা সাহেবের মৌতাত টাল খেলে, তিনি তার দিকে তাকান রুদ্রচোখে। মুখে শুধু সামান্য উচ্চারণ—বান্দীর বাচ্চা খ্যাল্‌ রাহনা?

নায়েব মশায়ের বাড়ির ডাকাতির তদন্তে যে দারোগা সাহেব সরেজমিন করতে এলেন তাঁর চাকরি সাহেবি আমলের শেষের দিকের। মেজাজ মর্জিতে ঘোরতর সাহেবি। স্বভাবটা লম্পটের। বয়স বছর আটত্রিশ চল্লিশ হবে। তা তিনি এসে প্রথমে বাড়ির এবং পাড়া প্রতিবেশী পুরুষদের পুছ্‌তাছ্‌ করলেন। নানারকম লেখাজোখার কাজ এবং ডাকাতদের দ্বারা ভাঙচুরের চিহ্নাদি মাপজোক করে প্রতিবেশীদের বললেন যে, এবার তিনি শুধু বাড়ির লোকদের সাথে কথাবার্তা বলবেন, তাঁরা যেন ওখানে আর ভিড় না বাড়ান। ফলত সবাই নিরাপদ দূরত্বে, আগান-বাগান বা গাছতলায় গিয়ে বিশ্রাম নিতে লাগলেন। দারোগা সাহেব প্রথম থেকেই আমাকে খুব পছন্দ করছিলেন. সে কারণে কাছাকাছি কোথাও অপেক্ষা করতে বললেন, যেন ডাকলে পাওয়া যায়। একটি ছোট ঘরে বসে তিনি তাঁর কাজকর্ম চালাচ্ছিলেন। সব কাজ শেষে তিনি নায়েব মশাইকে বললেন, দ্যাখেন আমাগো চাকরিডাই একটা আহাম্মকির কাম। আফ্‌নে একজন মুরুব্বি মানুষ বোঝেনতো সবই, তয় জানবেন, কত্তইব্যের খাতিরেই আমাগো অনেক কিছুই করণ লাগে। এইত দ্যাহেন্‌, আপনের মাইয়ারে এহন এই কত্তইব্যের খাতিরে যে কতা গুলান আমারে জিগাইতে অইবে, হেয়াতো আপনেগো সামনায় আমি জিগাইতে পারিনা। তয় ডাহাতির মামলা, আইনত ব্যাক্‌ কিছুই আমার জানোন লাগে। ব্যাফারডা আপনে নিশ্চই বোজতে পারতাছেন। তয়, ইনসাল্লা। আপনের মাইয়ায়ও মোরও মাইয়ারই ল্যাহান। —অর্থাৎ তিনি তাকে কিছু বিশেষ প্রশ্ন করতে চান। সেসব দিনে

এ বয়সের একজন মানুষের তেরো চৌদ্দবছরের মেয়ে থাকা অসম্ভব ছিল না। আজও হয়ত নেই। অতএব, সেরকম একজন মানুষ, আবার তিনি যদি একজন রাজপুরুষ হন, সেখানে আপত্তির কিইবা থাকে? এইসব টালবাহানায় দারোগা সাহেব প্রায় ঘণ্টাখানেক ঐ হতভাগিনী ধর্ষিতাকে আটকে রাখেন। দরজা বন্ধ থাকে। আমি এবং আমার সেই বন্ধু, নায়েবমশাইয়ের ছেলে, দুজনেই নানারকম অশ্লীল সম্ভাবনায় বন্ধ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে একে অন্যের দিকে তাকাতেও পারছিনা। ভিতর থেকে অস্ফুট স্বরে নানান অর্থপূর্ণ শব্দ কানে এসে আঘাত করতে থাকে। আমরা অসহায় ভাবে অপেক্ষা করতে থাকি কতক্ষণে ঐ দরজা খোলা হবে এবং পৃথিবীতে সব কুৎসিত সন্দেহের অবসান হবে। কিন্তু সন্দেহ অবসানের কোনও সম্ভাবনাই ছিলনা। ভিতরের অর্থপূর্ণ শব্দ ক্রমশ আমাদের কানে দ্রুত পর্দায় ধ্বনিত হচ্ছিল। আমরা খুব ক্ষীণ করুণ এক কান্নার ব্যথা আমাদের সব অনুভূতি দিয়ে সহ্য করতে বাধ্য হচ্ছিলাম। অসহায়তা আমাদের এক 'সংকটের' গভীরতম গহ্বরের শেষ পাতালে যেন পৌঁছে দিচ্ছিল এবং সেরকম এক মুহূর্তে আমাদের সামনে ঐ নারকীয় দরজা উন্মুক্ত হল। আর আমাদের সেই মন্দ কপালি, হতভাগিনী বোনটি মুখে কাপড় গুঁজে, আমাদের কারুর দিকে তাকাতে না পেরে, হেঁচ্‌কি তুলে কাঁদতে কাঁদতে তার মায়ের কোলে গিয়ে আছড়ে পড়ল।

দারোগা আমাকে ভিতরে ডেকেছিল তখন। তার মুখ চোখের অবস্থা, কপালের ঘাম এবং বেশবাসের ধরন দেখে, তাকে আর দারোগা সাহেব বলে সম্মানিত সম্বোধনের কথা ভাবতে পারছিলাম না। তাকে একটা সদ্য রতিক্লান্ত কুকুরের মতো দেখাচ্ছিল। তথাপি যেহেতু সে একজন উর্দিপরা রাজপুরুষ, আমাদের তৎকালীন অসহায়তায় তার আদেশ মেনে নিয়ে আমাকে ভিতরে যেতেই হল। তখন যা বয়স তাতে স্ত্রীপুরুষের গুপ্ত ব্যবহার বিষয়ে আমরা একেবারেই অজ্ঞ একথা বলবনা। লোকটা আমাকে ভিতরে ডেকে বলল, বুজলানি, ব্যাপারডা খুবই সিরিয়াস। সি হ্যাজ বীন রেইপ্‌ড। রেইপ্‌ড বাই থ্রি। আহা এ্যাতডুক মাইয়াডা!—কিন্তু তার এই আপশোসক্তি সত্ত্বেও আমি ঠিকই বুঝতে পেরেছিলাম যে, সি হ্যাজ বীন রেপ্‌ড নট বাই থ্রি, বাট বাই ফোর।

লোকটা এরপর অনেক কিছুই বলে। আমি এ ব্যাপারে কাউকে সন্দেহ করি কিনা জানতে চায়। অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভাবে এবং খুশির ভঙ্গিতে সে আমাকে জানায়ে যে আমরা যদি একটু সহায়তা করি তবে তার পক্ষে অপরাধী শনাক্তীকরণ কিছুমাত্র কঠিন হবেনা। এখানে যদি আমার পক্ষে খোলাখুলি কিছু বলার অসুবিধে থাকে, আমি নিশ্চিন্তে বজরায় গিয়ে তার সাথে বাতচিৎ করতে পারি। তিনি তাতে খুশিই হবেন। আমার অবশ্যই এই ডাকাতির বিষয়ে কিছু জানানোর ব্যাপার ছিল। সবই সন্দেহক্রমে, তবে তা যুক্তির দিক থেকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। একথা জানাতে লোকটা আমাকে খুবই খাতির দেখিয়ে তার বজরায় নিয়ে যায়। আর সেখানে যাবার পরপরই খানিকক্ষণের মধ্যে আমি বুঝতে পারি যে এই লোকটা শুধু লম্পটই নয়, একটা চূড়ান্ত সমকামীও এবং তার লক্ষ্য পূরণের জন্য সে সততই সুযোগ সন্ধানী।

কিন্তু মানুষকে এমন কতগুলো ঘটনার মোকাবেলা করতে হয় যখন বীভৎসতার জন্য হোক বা ঘটনার তীব্র বাস্তবতার জন্যেই হোক সে ব্যাপারটাকে অস্বীকার করতে চায় প্রাণপণে। আমার অবস্থাও সেই সময়টায় সেরকমই দাঁড়ায়। দারোগার ব্যাপারটা যেন ঘটেইনি এবং আমরা দুই বন্ধু নিতান্তই মিথ্যে সন্দেহে কষ্ট পাচ্ছি এরকম আকাঙ্ক্ষা আমার মনের মধ্যে কাজ করছিল। তার উপর, সেই লোকটা আমার সাথে এত অমায়িক ব্যবহার করতে শুরু করল যে আমার মানসিক আকাঙ্ক্ষা ক্রমশ প্রত্যয়ে দাঁড়িয়ে গেল এবং মানুষটিকে আমরা যে অন্যায়ভাবে সন্দেহ করছি একারণে একটু অপরাধবোধও হতে লাগল। সে আমাকে নিয়ে আমাদের খালের ঘাটের দিকে যেতে যেতে খুবই অন্তরঙ্গ ভাবে অনেক কথাবার্তা বলতে লাগল। আমি তখন সবে উঠতি বয়সি এক সাধারণ গ্রাম্য কিশোর, যুবক বলা সাজেনা। আমাদের গ্রামগাঁয়ের মুরুব্বি লোকবা এই বয়সটাকে আদৌ পাত্তা দেন না, বা কোনও গম্ভীর আলোচনার যোগ্যও বোধ করেন না। কিন্তু দারোগা সাহেব আমাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার মধ্যে নিয়ে গেলে, আমি যাবপরনাই বিগলিত হই। সে বলে যে, অপরাধী যারা তারা যে মুসলমান সম্প্রদায়ের সে বিষয়ে তার কোনও সন্দেহ নাই। সে প্রায় আঠারো বছর ধরে 'দারোগাগিরি' করছে এবং বেশির ভাগ সময়েই এই দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গে তার কর্মস্থল। সব জায়গায় ঈদৃশ অপরাধীর সংখ্যা হিন্দুর চাইতে মুসলমানই অধিক। সে একজন প্রাক্তন ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেটের, যিনি আমাদের জিলাসদরে বহুকাল কাজ করে গেছেন, একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করে স্বধর্মীয় মানুষের বিপক্ষেই বলে যে, সাহেব বলেছিলেন, This race (Mohamadans) may be ended but never be mended. দারোগার মতে, যদিও এ তার স্বজাতির নিন্দা, তথাপি কথাটি সত্য। এইসব মুসলমানরা আদপেই ইমানদার মুসলমান নয় এবং এদের জন্যই তার স্বজাতির নিন্দা সাহেবেরাও করে গেছে এবং হিন্দুরাও করে। আসলে এরা প্রকৃতই ছোটলোক। কিন্তু সে যা হোক্ আমি যদি তাকে একটু সহায়তা করি, তবে তার পক্ষে অপরাধীদের পাকড়াও করা খুব একটা শক্ত হবে না। আমাকে তার খুবই বুদ্ধিমান ছেলে বলে মনে হয়েছে। আমার কথা তার কাছে যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সে কথা বার বার সে আমাকে জানায়।

বজবাটি বাঁধা আমাদের ঘাটের সেই রেন্ট্রির শেকড়ে। আমি ওই রকম একজন রাজপুরুষের উষ্ণ অভ্যর্থনা এবং কথাবার্তায় প্রগাঢ় আপ্লুত হয়ে ইতিপূর্বের কুৎসিত সন্দেহের কথা বেমালুম ভুলে যাই। স্বাভাবিক কারণেই আমি বা আমরা তখন স্থানীয় বেশির ভাগ মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষী। সাম্প্রদায়িকতার বিষ তো আমাদের মধ্যে প্রায় পরম্পরাগত। তাই এরকম একজন মবমী রাজপুরুষকে সহায়তা করা সমীচীনই বোধ করি। আমি জানাই যে এই ডাকাতির মূল আসামি বলে আমি যাকে মনে করি তার নাম 'ছালাম'। তার সাথে তার গ্রামের কে বা কারা অংশ গ্রহণকারী তা বলা মুশকিল, তবে ছালাম যে একনম্বর, এরকম সন্দেহ করার নির্দিষ্ট কারণের কথাও দারোগাকে আমি বলি।

ছালামকে নায়েব মশাই তাঁর বাড়িতে পাহারাদারির কাজে রেখেছিলেন। ঐ সময়টায় কামলাগিরি, রাখালি এবং পাহারাদারি এই সব কাজের জন্য এরকম ব্যবস্থা আমাদের ওই পিছারার খালের এলাকায় খুবই জরুরি ছিল। এরা দিনের বেলায় ক্ষেতের কাজ, গোরু বাছুর সামাল দেওয়ার কাজ ইত্যাদি করত, আর রাতের বেলা দুতিনবার বেরিয়ে 'হুঁসিয়ার', 'জাগোওও' অথবা 'খবরদারী হোওওও'—বলে হাঁক পাড়ত, যেমন আমাদের বাড়িতে নাগরালিভাই ছিল তেমনই। নাগরালি ভাই-এর ইমানদারি এবং কর্তব্যনিষ্ঠার উপর আমাদের কোনওদিন সন্দেহের কারণ ঘটেনি। তবে যেহেতু ঐ সময়টায় পড়াশোনার খাতিরে আমি নায়েব মশাইয়ের ছেলের সাথে প্রায়শই রাত কাটাতাম, ছালামের কিছু উৎপটাঙ্ ব্যবহার আমার নজরে পড়েছে। সে ছিল এক তাগড়া জোয়ান। আমাদের ও অঞ্চলে এইসব মুসলমান যুবকদেব যথাসময়ে বিয়ে শাদি হওয়া খুব সহজ ছিল না। হলেও এরা হিন্দু যুবতী, এমনকি মাঝবয়সি মহিলাদের প্রতিও বড়ই আকাঙ্ক্ষী ছিল। ছালামকে আমি কয়েকবারই লক্ষ্য করেছি যে সে নায়েব মশাইয়ের মেয়েকে কিছু বিরক্ত করে। ব্যাপারটা ঠিক প্রেমপ্রণয় জাতীয় নয় বলেই মনে হয়েছে। গ্রামীণ মেয়েরা স্নানের ঘাটের পৈঠায় বসে যে সহজতাটুকু উপভোগ করে, সেখানে হঠাৎ গিয়ে পড়লে আমরা তার মর্যাদার জন্য পথান্তর গ্রহণেই অভ্যস্ত। কিন্তু ছালামের মতো ইবলিস মার্কা ইতররা তখন ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে মেয়েদের এই গোপনীয়তাটুকু তারিয়ে চাখে। শুধু তাই নয়, তারা যে ব্যাপারটা দীর্ঘসময় ধরে উপভোগ করেছে, হঠাৎ ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে তা জানিয়েও দেয়। এসব জঘন্যাচার আমার নজর এড়ায়না। অথবা,—'এক গেলাস পানি খাওয়াও বলে', উৎকট ভঙ্গিতে লুঙ্গিটা বিশেষ স্থান অবধি তুলে বসে পড়ে। হাত থেকে জলের গ্লাস নেওয়ার সময় অতিরিক্ত স্পর্শন ইত্যাদিও নজরে পড়েছে। কেননা, এসব বিষয়ে, স্বাভাবিক কারণেই আমাদের নজর রাখতে হত তখন। আমি খুব গূঢ় ভাবে কতগুলো কার্য-পরম্পরা এই ডাকাতির বিষয়ে লক্ষ্য করেছি এবং তা দারোগাকে সরলভাবেই জানাই।

আমি বলেছিলাম যে, ও ডাকাতির রাত্রে নায়েব মশায়ের বাড়িতে থাকেনি, যদিও সে পাহারাদার হিসেবে ওই বাড়িতে প্রতি রাতেই থাকে। সে যে ওই রাতেই থাকবেনা, সে কথা সে পূর্বাহ্নে নায়েব মশাই বা বাড়ির অন্য কাউকে বলেও নি। আবার ডাকাতির পরদিন সকাল আটটা নাগাদ সে ওখানে এসে খুবই আপশোসের সাথে জানায় যে সে আগের রাতে একটা বিশেষ কাজে অন্যত্র ছিল বলে আসতে পারেনি। কিন্তু সেই 'অন্যত্র' জায়গাটির যে অবস্থানের কথা সে বলে, তা নায়েব মশায়ের বাড়ির থেকে বড়জোর হাজার দেড়েক কি দুয়েক গজ দূরের একটি কুটির। রাতে বর্ষণ ইত্যাদির প্রাবল্য সত্ত্বেও আমরা যারা ছুটে এসেছিলাম, তারা যদি ঐ চিৎকার, কান্না ইত্যাদি শুনতে পারি, অতটুকু তফাতে থেকে সে কেন তা শুনতে পায়না তা বোঝা খুবই কষ্টসাধ্য। উপরন্তু সে বা তার সঙ্গী যারা ঐ কুটিরে আগের রাতে অবস্থান করেছিল, তা ছিল নায়েবমশায়ের এক নিকট প্রতিবেশীর খামার বাড়ির মতো। ভদ্রলোক ইউনিয়ন

বোর্ডের কেরানি। সবাই বলত, কেরানি চৌধুরী। গাঁয়ের বাড়িতে এঁরাই মান্যমান মানুষ। তা যাহোক, তাঁর বাড়ির দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে রেখেছিল ডাকাতরা। তাঁরাও চিৎকার চেঁচামেচি শুনেছেন। কিন্তু বেরোতে পারেননি। পরের দিন তাঁদের রাখাল এসে ঘরের দরজার বন্ধন খোলে। অথচ তার কয়েক গজ দূরে অবস্থিত, ছালামরা নাকি কিছুই শুনতে পায়নি। দারোদা আমার এই কথাগুলো খুবই মনোযোগের সাথে নোট করছিল এবং উৎসাহ দিচ্ছিল এই বলে যে এসব অতি গুরুত্বপূর্ণ খবর। সে বলল, খানদানি বাড়ির পোলাপানেগো বুদ্দির লগে কি হাইল্যা চাষার বুদ্দির তুলনা অয়? - খান্দান্ এট্টা ব্যাপার, হেয়া হিন্দুরই হউক, চাই মোছলমানের। সে আমাকে বলে যে আমি যে-বাড়ির 'আওলাদ্' তাঁদের মান্যতা দেয়ার মতো শিক্ষা তার আছে। তার খান্দানও এক 'বহোৎ উচা তরিকার'। বাল্যাবধি সেও খুবই 'রহম সহম' এবং উচ্চ আদর্শে মানুষ। তার খানদানে কোনও বদরক্তের 'ইল্জাম' আছে একথা 'কোনও খান্কীর আওলাদ' বা 'চুত্মারানির পোয়'ও বলতে পারবে না। এরকম এক ভাষায়ই সে এসব তথ্য জানায়।

এইসব বার্তালাপের সময় আমরা তার বজরায় গিয়ে বসেছি। বজরা অতিশয় সুসজ্জিত এবং শোভন। তার প্রকোষ্ঠের শেষপ্রান্তে 'হুজুরের খাসকামরা', যার একদিকে দুজন মানুষের বসার মতো শোভনীয় আরাম কৌচ এবং বেশির ভাগ অংশ জুড়ে একটি মনোরম 'বিস্তারা' মানে বিছানা। খুবই ছিম্ছাম্। দারোগা সেখানে গিয়ে তার ধড়া চুড়া বদল করে ঘরোয়া লুঙ্গি গেঞ্জিতে সহজ হলেন এবং আমাকে নিয়ে বসলেন। বসার পরই এই প্রথম তার মুখে অন্য জগতের অন্য শব্দ শুনলাম। এর আগে এরকম একটিও শব্দ তার মুখে উচ্চারিত হয়নি। পিছারার খালের জগতে এইসব শব্দ সাধারণ অপবর্গীরা, চাষিরা অক্লেশে অহরহ বলে এবং আমরা বাল্যাবধি তা শুনে অভ্যস্তও। কিন্তু বাবা, জেঠা বা অনুরূপ গুরুজনদের মুখে এসব শব্দের ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলাম না বলে দারোগার এই শব্দ ব্যবহার আমাকে আহত করে। জ্ঞানাবধি আমরা এসব শব্দকে 'অসভ্য কথা' বলে জেনেছি, যদিও সাধারণ্যে এর ব্যবহারকে কখনওই অশ্লীল বোধ করিনি। এখন দারোগা ঈদৃশ শব্দাবলির ছররা ছিটোতে থাকে, আর আমি নিজেকে ক্রমশ কণ্ডূয়িত করতে থাকি। ছালামের তাবৎ কথা শুনে, তার মধ্যে যেন এক অসম্ভব উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। সে বলে, এইসব জালিমেরাই এছলামের বদনামির লইগ্যা দায়ি। এ্যারা খালি চায় কোত্খুনে এই য়িন্দু ছেম্রীগো সিনার কাপুর সরাইয়া — এই ছ্যামরারা অইছে সাইদ্যের না-পাক্ আর হাবিয়ার কীড়া। এ্যারা মাতারীগো দুইডা জাগাই খালি চেনছে। — দারোগা ক্রমশ এই রকম বিন্যাসে যাচ্ছিল আর আমার একখানা হাত তার দুই উরুর মাঝখানে রেখে চোখের কৌতুকে আমাকে অশ্লীল ইংগিত করছিল। বজরার মাল্লারা এসব দেখে খুব জোরেই বলাবলি করছিল, 'ছ্যামড়ার কিস্মৎডা সাইদ্যের ভাল। ছায়েবের ন্যাক নজরে পড়ছে।' আমি ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছিলাম, সারা শরীরে একটা ঘিনঘিন ভাব নিয়ে আমি আবার আমার পুরোনো বিষণ্ণ, ভুলে যেতে

চাওয়া, সন্দেহে ফিরে যাচ্ছিলাম। কিন্তু পুলিশ দারোগা ভয়ের বস্তু। তাছাড়া আমাদের তদানীন্তন অসহায়তার জন্যও কোনও বিদ্রোহ করতেও পারছিলাম না। মামারা ব্যাপারটিতে আমাকে উৎসাহিত করে যাচ্ছিল অতি উচ্চৈঃস্বরেই। জীবনে এতটা অসম্মানিত এবং ক্লেদাক্ত নিজেকে কখনই বোধ করিনি। যাহোক, একসময় ব্যাপারটা শান্ততায় এলে দারোগা আমায় বলল,—আসলে বোজলা কিনা তোমার কথাই ঠিক। ছোমেদইয়াই হ্যার দলবল লইয়া এই ডাকাতিডা করছে। তয়, এ্যার মইদ্যে এট্টু অন্য সোমস্যাও আছে। ঐ মাইয়াডিও কৈলম খুব সুবিদার না। দ্যাহ এ্যাতকাল দারোগাগিরি করছি। মনুষ্য চরিত্তির কিছুতো বুজি? না কি কও? সুইজ যদি মোড়ায়, সুতা ঢোকতে পারে না। তয় বোজলা কিনা, এহানে পুলিশের কিছু করার নাই। ডাহাতিডা করাইছে ঐ ছেমরীই। ক্যান? না হ্যার মহব্বত ঐ ছালামইয়ার লগে। এ্যামনে তো সুবিদা করতে পারে না, হেকারণ কায়দা করইয়া এট্টু গাদান খাইলে।

একথা স্বীকার করতে গেলে, ঐ ত্রয়োদশী বা বড়জোর চতুর্দশী মেয়েটাকে যে পরিমাণ বুদ্ধিশালিনী এবং ধান্দাবাজ বলে মানতে হয়, তার মধ্যে কোনওকালেই আমরা ঐ পরিমাণ বুদ্ধিবৃত্তির বা ধান্দাবাজির আভাস প্রত্যক্ষ করিনি। দারোগা আরও জানাল যে এ নিয়ে তার বেশি কিছু করা সম্ভব নয় একটিই কারণে, যে, যদি ছালামকে ধরা হয়, তবে ঐ মেয়ের জারিজুরি 'বেয়াক ফাস অইয়া যাইবে।' বিশেষত হিন্দু সমাজে তো তার এক ভয়াবহ ফল ফলবে। যা সমাজ একখানা, অতএব ঐ বয়সি একটি মেয়ের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে দারোগা কিভাবে এতবড় একটা কাণ্ড করতে পারে? ব্যাস্, ডাকাতির সুরাহা ঐ পর্যন্তই। এরপর আর কিই বা বলার থাকে? তবে এ সময়কার অনুরূপ ডাকাতির কথা আরও শয়ে হাজারে বলা যেতে পারে। কিন্তু সে সব বলে এবং ক্রমান্বয়ে রক্তাক্ত হয়ে হয়ে আমরা কোথায় গিয়েই বা পৌঁছোতে পারি? আবার এই সব কৌশলী ডাকাতি, অসহায়া রমণী, যুবতী বা কিশোরীদের উপর এই নির্বিকার ভোগ ক্রমশ সাধারণ এবং নিম্নবিত্ত মুসলমান সমাজেরও সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়, কেননা, তখন অসহায় সংখ্যালঘুদের উৎখাতের প্রয়োজন আর থাকে না। কিন্তু যেসব দৈত্য বোতল থেকে বেরিয়ে এসেছিল, তারা থাকে, আর থাকে তাদের এই ভোগ এবং লুণ্ঠনের অভ্যেস।

— বত্রিশ —

একসময় মানুষের বাঁচা বা মরার অধিকার সবই জমিদার তালুকদার বা তাঁদের নায়েব গোমস্তাদের মুখের কথার উপরই নির্ভর করত। এ কিছু নতুন কথা নয়, তবুও প্রসঙ্গক্রমে বলতে হচ্ছে। নায়েব মশায়, তাঁর জমানায় এ অঞ্চলে অসংখ্য ঘটনা ঘটিয়েছেন যে কারণে সাধারণ চাষি প্রজাদের ভিটে-ছাড়া, গ্রাম-ছাড়া হতে হয়েছে। মানুষ খুন হয়েছে সাধারণ পশুর মতো। নারী লুণ্ঠিত হয়েছে অকাতরে। আমি এমনও শুনেছি যে নায়েব মশায়ের বাঁধা মেয়েমানুষ থাকা সত্ত্বেও তাঁর মাঝেমাঝেই স্বাদ

পাল্টাবার ইচ্ছে হত এবং পাইক লেঠেলরা সে ব্যাপারে তাঁকে আদৌ হতাশ করত না।

ছনুমিরধা বলে এক আধপাগলা কিন্তু অসম্ভব ন্যাওটা 'মিরধা' আমাদের তালুকদারি চলে যাওয়ার পরও বহুকাল বাড়িতে আসত। তালুকদারি বিলোপের বিষয়ে কেউ কিছু বললে, সে খুব মুখ খারাপ করে 'দক্ষিণী খামার' দিত। কিছুতেই বিশ্বাস করত না যে এখন আমরা আর তার মালিক নই। যখনই আসত, কাঁধে করে হয় একটা অতিকায় চিতল মাছ বা অনুরূপ কিছু নিয়ে আসত। অতদূরের পথ পাড়ি দিয়ে আসতে আসতে সেসব হয়ত পচে গোবর হয়ে যেত। কিন্তু বারণ করলে শুনত না। তার ধারণা ছিল, মালিকের কাছে খালি হাতে যাওয়া গুনাহ্।

তার কাছে, নায়েব মশায়-এর বাড়ির ঘটনা ঘটার পর শুনেছি যে ব্যাপারটি আপশোস এবং দুঃখজনক হলেও 'নাইবের এঁডা পাওনা'। সে বলেছিল, 'ভাইডি এয়া হ্যার পাপের শাস্তি। হে যে ক্যাতো বিধবার সব্বনাশ করছে হেয়াতো মুই জানি। মুই যে মেরধা।' কিন্তু পাপের শাস্তির এই ধারাটি ব্যাখ্যা করা বড় সহজ নয়। বিশেযত নায়েব মশাইয়ের বাড়ির ঘটনাটি কোনও বদলা নেওয়ার ঘটনা নয়। তবে ছনুর বিচারেও বোধহয় কোনও কার্যকারণ ছিল, যা অস্বীকার করা যায় না।

এ প্রসঙ্গে আরেক জন মানুষের কথা বিশেষ করে মনে পড়ে। তার নাম আহমেদ মোল্লা। পাশের এক মুসলমান গাঁয়ের মানুষ। পেশায় এককালে ছিল ডাকাত। সবাই তাকে আহমেদ ডাকাত বা ডাকাত মোল্লা বলেই ডাকত। এ কথায় কে কি ভাবনে জানিনা, তবে আমাদের জিলায় একদল মানুষ ডাকাতি ব্যাপারটাকে পেশা হিসেবেই গ্রহণ করেছিল, তা বহুকাল আগে থেকেই ডাকাতি, নগিদগিরি, লাঠিয়ালি বা এরকম সব ভয়ঙ্কর কাজকে আমাদের এখানকার মানুষেরা বর্গ বর্ণ নির্বিশেষে খুব একটা নিন্দনীয় পেশা হিসেবে দেখত না। এসব তাদের কাছে খুবই সহজ স্বাভাবিক আর আট দশটা সাধারণ পেশার মতোই। একথা সবাই জানেন যে এই ভূভাগ বা তার অন্তর্গত অঞ্চল সমূহে প্রকৃতি অতি ভয়াল এবং নিষ্ঠুর। এখানে বসতির শুরু থেকেই তাদের একদিকে মোকাবেলা করতে হয়েছে অতিশয় হিংস্র জন্তু, সাপ, বাঘ, কুমির ইত্যাদির সাথে, অপরদিকে প্রকৃতির সাথে, যে প্রকৃতি কখনও বন্যা, কখনও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস কখনও বা ঝড়ের তাণ্ডবে তাদের জীবন ছিন্ন ভিন্ন করার প্রয়াস পেত, করতও। কিন্তু যারা এখানে প্রথম বসত করতে এসেছিল, তারা এইসব ভয়ালতার বিষয়ে শুরুয়াতেই ওয়াকিবহাল ছিল বলে তাদের লড়াই হামেহাল জারি রেখেছিল। কারণ তারা জানত যে এখানেই তাদের বসত গড়তে হবে, যেহেতু এখানে জমি উর্বরা এবং নদীখাল সমূহ মৎস্যের খনি বিশেষ।

প্রথমে এসেছিল কৈবর্ত ধীবর জাতীয় মানুষেরা। তারা এই নবীন ভূমিতে দেখেছিল অসুমার খাল, নদী এবং জলাভূমি, যাদের বুকের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় সব বিচিত্র ছোট, বড় এবং অতিকায় মাছেরা। চন্দ্রদ্বীপ অঞ্চল তখন সমৃদ্ধ জনপদ। নৌকাযোগে একদিন,

দেড়দিনে সেখানের গিরদে বন্দরে মৎস্য নিয়ে পাড়ি দেওয়া যায়। কিন্তু সমস্যা ছিল ভূমিতে বসবাস করার। কারণ সেস্থান তখন সুন্দরী অরণ্যের, গোল হোগলের নিভৃত অন্তঃপুর। সেখানের রাজাধিরাজ দক্ষিণ রায়। ডাঙায় তিনি এবং তাঁর সাকরেদেরা, জলে কুমির কামট। ধীবর কৈবর্তেরা প্রথমে তাদের রমণীদের আনেনি। নিজেরা থাকত নৌকোয়। মাছমারার জন্য অনুষঙ্গ ছাড়াও তারা নৌকোতে রাখত ভল্লা, রামদা, ল্যাজা, সড়কি, গুল্লিবাঁশ এবং জালের লোহার কাটি, আর অন্যান্য নানান মারণযন্ত্র। বন্য পশু ছাড়াও তাদের লড়তে হত মগ, পর্তুগিজদের সাথে। তারা মোহনায়, মোহনায়, ঝোপঝাড়ের আশেপাশে তাদের 'পিনিস' নিয়ে অপেক্ষা করে থাকত ওত পেতে, কখন এইসব মানুষদের নৌকো তারা লুঠ করবে, তাদের বন্দি করে নিয়ে যাবে তমলুকের, পিপলির বা চাটগাঁর দাসবাজারে, কিংবা সাগরের মাঝ দরিয়ায়, যেখানে এদেরকে বিক্রি করে দেবে বিদেশি দাসব্যবসায়ীদের কাছে। তাই এইসব প্রতিকূলতার সাথে সংগ্রাম করতে গিয়ে এই মাছমারা মানুষেরা আস্তে আস্তে এ অঞ্চলে স্থায়ী বসতির কথা ভাবে, আর একসময় তা শুরুও হয়ে যায়।

সে এক দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস। মানুষ তা কোনও ভাবেও ধবে রাখেনি, সবার তা মনেও নেই। যাদের কাছে তা জানতে পারি, তারা শুধু ঐসব অসামান্য লড়ুয়ে মানুষদের অধস্তনদের কেউ কেউ। আমাদের আহমেদ মোল্লা ছিল সেরকমই এক মানুষ। পরম্পরাগত জীবনে তাই ডাকাতির পেশা তার বা তার মতো মানুষদের ক্ষেত্রে কিছু অভাবনীয় নয়। তার পূর্বপুরুষেরা এভাবেই জালিয়া থেকে হালিয়া হয়ে বসত গড়তে শুরু করেছিল এখানে। কিন্তু সে আবাদ তেমন ব্যাপক নয়। ব্যাপক আবাদ শুরু হয় যখন উচ্চবর্ণ এবং বর্গের মানুষেরা, রাজা নবাবদের কাছ থেকে পাট্টা নিয়ে এসে এদের নিয়ে গ্রাম পত্তন শুরু করে তখন। এখন বিচার্য এই যে উচ্চবর্ণীয়রা নবাব, রাজাদের খেয়ালি পাট্টার জোরে যে দখলদারি করে সেটা ডাকাতি, না এইসব মানুষেরা প্রথমাবধি যে লড়াই-এর মাধ্যমে তাদের দখল জারি রাখতে চায় সেটা ডাকাতি। এ প্রশ্নের উত্তর ইতিহাস একেক সময় একেক ভাবে দিয়েছে। তবে এক্ষেত্রে উত্তরটি বোধ হয় খুব সবল নয়। বিভিন্ন পারিবারিক ইতিকথার শ্রুতি এবং স্মৃতি অনুযায়ী এস্থানেব আবাদকারী এবং যাঁরা আবাদ করিয়েছেন, তাঁদের প্রতিষ্ঠা প্রায় সমসাময়িক। ব্যাপারটা এমন ঘটেনি যে এখানকার আদি চণ্ডভণ্ড, মলঙ্গী, ধীবরকৈবর্ত বা হালিয়াকৈবর্তরা সব বন আবাদ করে ফসলি জমির ব্যবস্থাদি এবং নিজস্ব গৃহস্থালি স্থাপনা করার পর উচ্চবর্ণীয়রা এসে তা দখল করে রাজপাট বসায়। সেরকম ঘটনাও বেশ কিছু আছে এবং তা অবশ্যই ডাকাতিরই নামান্তর। আবার বেশ কিছু উদ্যোগী পরিশ্রমী মানুষও যে এইসব আদি মানুষদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রতিকূল শক্তির সাথে লড়াই করেই একসময় প্রাধান্য পেয়েছেন একথাও মিথ্যে নয়। আমি নিজেই এই দুই ধরনের ভূস্বামীদের এ অঞ্চলে দেখেছি এবং সামন্ত প্রথার লোপ হলেও এই জাতীয় ভূস্বামীদের কোনও কোনও পরিবার এখনও এ অঞ্চলে বেশ ক্ষমতাশালী। দুএকটি হিন্দু পরিবারও এখনও এখানে

বেশ দাপটের সাথে যে আছেন, পরবর্তীকালে তাও আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে। তবে ভূস্বামী মাত্রেই ডাকাত অবশ্য ছিলেন এবং আহমেদ মোল্লাদের মতো ডাকাতদের সৃষ্টিও তাঁদেরই অবদান।

কিন্তু যে আশ্চর্য ব্যাপারটি আমার নজরে পড়েছে, তা হল, শোষক শোষিতের সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও এক ব্যাপক কামারাদারীর পরম্পরায় তাঁরা খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন। এই সম্পর্কটির বিষয়ে কোনও তাত্ত্বিক আলোচনায় না গিয়ে আহমেদ মোল্লার কাহিনীটি বলাই বোধ হয় যথেষ্ট হবে। তবে এই কামারাদারীর বিষয়ে একটি অনুমানের কথা বলে নিই। আমার ধারণা, স্থানীয় ভয়াল প্রকৃতি এবং বহিরাগত মগ, পর্তুগিজাদি দস্যুদের বিরুদ্ধে একত্রে লড়াইয়ের দীর্ঘকালীন অভ্যেসের জন্যই বোধহয় এই কামারাদারীটি তৈরি হয়েছিল। এখানের অধিবাসীবা, বর্গবর্ণ নির্বিশেষেই এক অসামান্য উর্বর ভূমির প্রসাদ লাভ করেছিল, যেখানে ফসল ফলবার জন্য, ভূমিতে বলিষ্ঠ কৃষকদের পদচারণই যথেষ্ট। কঠিন লৌহময় হলশীর্ষের প্রয়োজন এই ভূমির কদাপি ছিলনা। কিন্তু ভূমি হাসিল করার এবং তাকে সতত শাসনে রাখার সংগ্রাম, প্রতিনিয়ত এঁদের করতে হয়েছে। সে সংগ্রাম, যা প্রকৃতি এবং লুণ্ঠনকারী বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে সমবেত অধিবাসীগণের ; পরে কালের গতিতে তা ভূমির বহুমাত্রিক উপস্বত্বতায় এক জটিলতম বহুমুখী সংগ্রামে পর্যবসিত হয় এবং ফলে আহমেদ মোল্লাদের মতো মরসুমি ডাকাতদের উদ্ভব ঘটে।

আবার এখানকার ভূমিপুত্রদের স্বভাবপ্রকৃতির রুক্ষতার কারণও বোধহয় এটাই। এত সংগ্রাম করে যে জমি তারা হাসিল করেছে এবং যে জমির প্রসব ক্ষমতা এমন অনবদ্য, তার প্রতি এই মানুষদের মমতা অবশ্যই যে মাত্রাতিরিক্ত হবে, তা কিছু আশ্চর্য নয়। ফলত তারা বর্গবর্ণ ক্রমেই একটু অতিমাত্রায় উচ্ছ্বাস আর আবেগপ্রবণ, আবার রুক্ষতায়ও তা হঠাৎ ওঠা সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের মতোই। সামান্য এদিক-ওদিক হলেই যেমন ফয়সালার অস্ত্র নিমেষে ঝলসে ওঠে, তেমনি শুধুমাত্র মুখের কিছু মিষ্ট কথায় ভালবাসার বন্যা নামে দুচোখ বেয়ে আনন্দাশ্রুর ধারায়। সবটাই এখানে সরাসরির ব্যাপার, প্যাঁচঘোচের বালাই নেই। একটা লংকা গাছ ছাগলে খেলে, যেমন ছাগলের মালিক খুন হয়ে যেতে পারে, তেমনি একখানা গোটা ফলন্ত মাঠের ফসল লুঠকারী যদি এসে জমির মালিকের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চায়, তখন অপরাধী এবং সেই ক্ষেতের মালিক দুজনেই পাল্লা দিয়ে পরস্পরের গুণকীর্তন করে, এ বলে, — মুই দুষী, ও বলে মুই।

তা এই হল এখানের মাটির দোষ বা গুণ, যে যেমন মনে করে। যস্মিন দেশে যদাচার। যে কথা আগেই বলেছি এই আহমেদ মোল্লাদের ডাকাত হওয়ার প্রসঙ্গে, যে ভূস্বামীরাই তাদের একসময় ডাকাতে পরিণত হতে বাধ্য করেছে। কিন্তু তা আবাদের যুগের বহু পরের কথা। আহমেদ মোল্লারা ডাকাত হয় তাদের পরদাদাদের হাসিলি জমি হারাবার পর। আমার এই এলাকার তাবৎ ইতিহাসই হচ্ছে জমি ডাকাতির ইতিহাস। জমির ক্রমান্বয়ী বিকাশের মাধ্যমে উন্নততর বা কাঙ্ক্ষিত কোনও সামাজিক

বিন্যাস পিছারার খালের ভূখণ্ডে ঘটেনি। ফলে আহমেদ মোল্লাদের মতো ডাকাতরা যেমন একসময় সামাজিক ভাবেই এসেছে, তেমনই এসেছে নায়েব মশায়ের বাড়িতে যারা ডাকাতি করেছিল, কৌশলী ডাকাত, তারাও। কিন্তু আহমেদ মোল্লার মতো ডাকাতরা আমাদের যত কাছের মানুষ ছিল, পরবর্তীরা ছিল ততটাই দূরের।

মোল্লাদের ডাকাতি ছিল মৌসুমি বা মরসুমি ডাকাতি। যখন মাঠে কাজ আছে বা অন্য রুজি রোজগারের ব্যবস্থা আছে, তখন যে ডাকাতি করে সে 'একছের লক্ষীছাড়া।' মোল্লারা তখনকার দিনে ডাকাতি করত অনটনের টোটায়, যখন পেটের নাড়ি 'গুটলি' পাকিয়ে 'হাঅন্ন' 'যো অন্ন' করত, তখন। ঐসময় মালিকদের গোলায় ধান পচে, আর সাহা, সাউদ, মহাজনেরা 'সুদের ট্যাহা' ছ্যাপ্ দিয়া গুনইয়া' সিন্দুকে তোলে। সেই সময়ইতো ক্ষেতমজুর, দিনমজুর, ভূমিহীন আহমেদ মোল্লারা রামদা, সড়কি, ল্যাজা নিয়ে ডাকাতি করতে বেরোত সেইসব বাড়িতে, যেখানে মানুষের খাদ্য মুনাফার খাতিরে পচে এবং যার উৎপাদক এই আহমেদ মোল্লাদের মতো ডাকাতরাই। তাই এই ডাকাতির কারণ সংখ্যালঘু খ্যাদানো, লোভ বা মাৎসর্য নয়, এর কারণ ক্ষুধা। ফলত, এই ডাকাতির একটা নীতি নিয়ম ছিল। তারা সাধারণত মেয়েদের ইজ্জত নিয়ে নষ্টামি করত না। যদি দলের মধ্যে কেউ তেমন করার চেষ্টা করত তবে তার শাস্তি তারা দলের সর্দারদের হাতেই চূড়ান্ত ভাবে পেত। এরা অকারণে মারদাঙ্গা কবত না, বাধা পেলে করত। তখন দুএকটা খুন খারাপি হয়েও যেত। তা এসব খুন আমাদের জিলার চরিত্রানুযায়ী খুব একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় নয়। ডাকাতি ছাড়াও জমিজমার হাঙ্গামায় খুন ছিল খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। খুন হলে তারা ধরাও পড়ত এবং নির্ধারিত সাজাও ভোগ করত। সেও হিসেবের মধ্যেই ছিল। তবে মোল্লার হাতের খুনের কিনারা কোনও দিনই হয়নি, এরকম শুনেছি। তার খুনের ব্যাপার নিয়ে মামলা হলে দেখা যেত আহমেদ ঘটনার দিন সদর হাসপাতালে তার বহুদিনের পুরোনো পিত্তশূল বা অম্লশূলের বেদনার জন্য চিকিৎসাধীন। সদর হাসপাতালের বড় ডাক্তারের কাগজপত্তর সে তখন দাখিল করত আদালতে।

মোল্লার গল্পটি যে কারণে বলা, তা হল, আগে যে কৌশলী ডাকাতির কথা বলেছি তার সাথে এর মৌলিক পার্থক্যটি জানানো। মোল্লা বছরের মধ্যে বেশ কিছু সময় জেলে থাকত। বাকি সময়টা, অন্য দশজন সাধারণের মতো চাষি গেরস্থি, উৎসব পার্বণে কাটত তার। ছেলেপুলে ছিল এক দঙ্গল। বিবি দুখানা। নিত্য তিরিশদিন অভাব লেগেই থাকত। তবে আমাদের আঞ্চলিক বিচারানুযায়ী বললে বলতে হয় — 'মানুডা ডাহাইত আছেলে ঠিকোই, তয় হ্যার পেরাণডা আল্হে সাইদ্যের ভাল।' সে ছিল খুবই বুঝদার ডাকাত। কারণ সে নিজের বা আশপাশ হিন্দু মুসলমান গ্রামে কখনওই ডাকাতি করত না। তার কাজ কারবার, ব্যাপারাদি ছিল সাধারণ ব্যাতিরেকে এবং দূর তিরন্দাজি ধাঁচের, তবে মুশকিল হত যদি অন্য কোনও দলের নিশানা তার আশপাশ গাঁয়ের উপর পড়ত তখনই। তখন সে নিজে তাদের সাথে কথাবার্তা বলে ব্যাপারটা নিষ্পত্তি করার প্রচেষ্টা চালাত, অথবা নির্দিষ্ট অসৎ লোকের বাড়ি চিহ্নিত করে সেখানে নির্দিষ্ট নিয়মে তাদের

কাজ করতে বলত। কিন্তু এরকম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে সে গাঁয়ে ঢোকার পথে সদলে দাঁড়িয়ে থেকে মহড়া নিত প্রতিপক্ষের। একারণেই বেশি সংঘর্ষের মধ্যে যেতে হত তাকে এবং লাশ পড়ত অনিবার্য ভাবেই। ফলশ্রুতি জেলবাস। খুব কঠিন শাস্তি দেওয়া যেত না তাকে, কারণ প্রমাণাভাব, যেমন আগেই বলেছি।

একবার এরকম এক মৌসুমে সে যখন তার বাৎসরিক নিয়মের জেল খাটছে, তার একটি ছেলের কলেরা হয়। এসব রোগে সে যুগে গ্রামে যা ব্যবস্থা নেওয়া হত তাই হল। হোমিওপ্যাথিক অষুধ অথবা পীরের জলপড়া। উভয়েরই অর্থমূল্য কম এবং সহজে আয়ত্ত বিধায় মানুষ ঐ পন্থায়ই যেত। মোল্লার ছেলেটি মরেই যেত যদি বাবা এবং তাঁর সাকরেদ নারায়ণ ঠাকুর উদ্যোগী হয়ে তাকে গঞ্জের স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে উপযুক্ত চিকিৎসা না কবাতেন। কিছুকাল আগেও কলেরা শুরু হলে আমাদের ওখানে পাড়া-কে-পাড়া উজাড় হয়ে যেতে দেখেছি। গঞ্জেও তখন তেমন কিছু ব্যবস্থা ছিলনা। এই সময়টায় কিছু ব্যবস্থাদি হচ্ছিল। একারণে ছেলেটা বেঁচে গেল।

আমাদের ছোটবেলা থেকে দেখেছি সমাজে যারা আহমেদ মোল্লার মতো স্বভাবের মানুষ, তাদের প্রতি বাবা, নারায়ণ ঠাকুর ইত্যাদিরা একধরনের দুর্বলতা পোষণ করতেন। এইসব মানুষ সম্ভবত তাঁদের দুঃসাহসিক জীবন যাপনের জন্যেই তাঁদের স্নেহ ভালবাসার আধিকারিক হত। কিন্তু সবাই আহমেদ মোল্লার মতো মানুষ ছিল না। তারা এই স্নেহ ভালবাসার সুযোগ নানান ভাবে গ্রহণ করত। কখনও বা বলেও বেড়াত যে অমুকবাবু, তমুক গ্রামে ডাকতি করার সময় তার বা তাদের সাথে ছিলেন। অথবা তাঁর নির্দেশেই এরকম একটি ডাকাতির কাজ করতে তারা বাধ্য হয়েছে। এমনকি পুলিশি জেরার সময় পর্যন্ত তারা বাবার মতো মানুষের বিরুদ্ধে পর্যন্ত এরকম জবানবন্দি দিয়েছে। বাবার ঘরেই জানলা ভেঙে ঢুকে তাঁর পাঞ্জাবি থেকে সোনার বোতাম বা অন্যান্য সামগ্রী চুরি করতে দ্বিধা করেনি। একারণে বাবাকে বিপদে পড়তে না হলেও অনেক সময়ই অত্যন্ত অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়তে হয়েছে। বিপদ না ঘটার কারণ অবশ্যই সামাজিক প্রতিপত্তি।

তবে আহমেদ মোল্লা এ ধরনের আচরণ কোনও দিনই করেনি। বাবার সাথে তার অত্যন্ত সৎভাব ছিল। তাঁকে অসম্ভব মানতোও সে। অনেক বারই তাকে বলতে শুনেছি,—য্যারা নেক্ ইমানদার মানু, ভাগছাড়া কহনও খারাপ কাম করেনা, মোনাফেকি, বেএনছাফি করেনা, হ্যারগো তো বেয়াকেই ভাল পায়। লেকিন্, মোর ল্যাহান্—দোজোখি কিরার লইগ্যা ভাবে কেডা, অ্যাঁ? মোরেও যে ভাল পায় হেমানুষডার দিল আল্লায় কি দিয়া বানাইছে, অ্যাঁ? —কিন্তু তথাপি আহমেদ তার 'ডাকাতি ব্যাপার' অর্থাৎ ব্যবসা তখনও ছাড়তে পারেনি। বাবা, নারায়ণ ঠাকুর তাকে এ নিয়ে অনেক বললেও সে পেরে ওঠেনি ; পেরে ওঠা সম্ভবও বোধ করি ছিলনা। চাষের কাজ যে কটা দিন সে করতে সুযোগ পেত, সেই রোজগারে অতগুলো সন্তান এবং দু-দুখানা বিবিকে ভাতকাপড় দেওয়া সম্ভব ছিলনা। তাছাড়া সে কাজ করত পরের জমিতে আধিয়ার হিসেবে। নিজের হালগোরু জমি কিছুই ছিলনা। যেটুকু গতরের জোরে করতে পারত,

তার আধা ভাগের বেশির ভাগ চলে যেত হাল, বলদ, কামলা এবং তার জেলখাটা কালীন অনুপস্থিতিজনিত কারণে বাড়তি কামলার হিসেব মেটাতে। আমাদের জিলায়, বিশেষত আমাদের ঐ পিছারার খালের চৌহদ্দিতে মেয়েলোকের ক্ষেতে কাজ করার রীতি নেই। যদিও তাবৎ কৃষি জগতে, রাঢ়ে বঙ্গে বা সারা বিশ্বে 'মাগী এবং মিন্‌সে' গণকে 'রোয়ার' সময় 'বিছান্‌' সমেত ব্যস্ত দেখা যায় 'রোপার' কাজে কামে, হাঁটু কাপড়ে পাছা উঁচু অবস্থায়। কিন্তু তা নিম্নতট দক্ষিণপূর্ববঙ্গের এই অঞ্চটিতে নয়। আমাদের চাষিবৌরা মরদদের সাথে 'বেলাহাজি' ভাবে 'হোগা' উঁচু করে কোনও দিনই রোপা রোয়নি। কারণ তাদের মরদেরা ব্যাপারটি আদৌ পছন্দ করেনি আবাদের প্রথম থেকেই। পাঠক, বোধকরি খেয়ালে রেখেছেন, এ অঞ্চলে বসতি স্থাপন কালে পুরুষেরা যে প্রথমে মেয়েদের নিয়ে আসেনি সে কথাটি আমি বলেই রেখেছিলাম। তো, এরকম একটি সৃষ্টিছাড়া নিয়ম সে কারণেই অভ্যাসে এসে গিয়ে থাকবে। সে যা হোক একারণে মোল্লার বিবিরাও চাষের কাজ করে কোনও দিন সংসারের উপকারে আসতে পারেনি। তবে তারা যে একেবারে বসে খেত তাও নয়। ধান কুড়োনো, ধানভানা চিঁড়েকোটা, মুড়ি খই ভাজা ইত্যাদি আর্থ কর্ম তারা নিয়তই করত। কিন্তু তথাপি কি মোল্লার ডাকাতি ছেড়ে দেওয়া সম্ভব ছিল? তাছাড়া এসব 'ব্যাপারীগিরির' অন্য হাজার ফ্যাক্‌ড়া থাকে। এই ব্যাপারীরা সবাই এ কথা জানে যে এই ব্যাপারীগিরিতে ঢোকা যত সহজ 'ছাড়ন তত' সহজ নয়। তুমি ছাড়লেও, দলের লোক তোমাকে ছাড়বেনা ; ছাড়বেনা যারা তোমার একর্মের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় পাহারাদার তারাও। কারণ — 'তুই যদি এ কাম না করবি, মোগো চলে ক্যামনে'? অর্থাৎ 'তুই বা তোরা এ কাম করবি, জেলও খাড়্‌বি আবার ছাড়াও পাবি। হে কারণ চিন্তা নাই। মোরাতো আছিই।' কিন্তু 'তুমি ব্যাপারী হবা, ব্যাপার করবা না। এ দেউলা এই ব্যাপারে নাই।' পেটের দায়ে এই ব্যাপারের ব্যাপারী হয়েছিল যারা একদা, তারা তখন কি একথা ভেবেছিল? কিন্তু ভাবেনি বলে, 'ব্যাপারের' কায়দা কানুন পাল্টানো যাবে ইচ্ছেমতো এমন স্বাধীনতা ১৪ই আগস্ট ১৯৪৭ সালের মধ্যরাত্রে কি কেউ বলে দিয়েছিল? দেয়নি। আহমেদ মোল্লাও, সেকারণে, বাবা বা নারায়ণ ঠাকুরের নিয়ত সুপরামর্শ সত্ত্বেও এই 'ব্যাপার' ছাড়তে পারেনি।

'ব্যাপার' এবং 'ব্যাপারী কথাগুলো এতক্ষণ যে অর্থে ব্যবহার করেছি, তার সামান্য টীকা প্রয়োজন। আমাদের অঞ্চলে 'ব্যাপার' অর্থে 'ঘটনা' নয়। ব্যাপার মানে ব্যবসা। ডাকাতি একসময় আমাদের ঐ জগতে একধরনের ব্যবসায়ই ছিল। যারা ব্যবসা করে তারা ব্যবসায়ী বা ব্যাপারী। ডাকাতি যেহেতু একটি ব্যবসা বা 'ব্যাপার' তাই, যারা ডাকাতি পেশায় আছে তারাও ব্যাপারী। আমি তাদের পারস্পরিক পেশার উল্লেখের সময় এই শব্দটির ব্যবহারই জেনেছি। তারা সংক্ষেপে এই শব্দটিরই ব্যবহার করত। যেমন কেউ যদি জানতে চাইত, 'অমুকে কি করে?' উত্তর হত, —'হে তো ব্যাপারী।' অর্থাৎ সে ডাকাত।

ব্যাপারের পেশা পরিত্যাগ করে স্বাভাবিক গেরস্থ জীবনে ফেরা বড় সহজ কর্ম ছিল না সেকালে। একালেও যে তা খুব সহজসাধ্য তাও বোধকরি কেউ বলবেন না।

কিন্তু আহমেদ মোল্লাকে 'ব্যাপারের কাম' ছাড়তে হয়েছিল। তার মতো মানুষের বোধহয় এই 'কাম' ছেড়ে দেওয়া ছাড়া মানসিক ভাবে আর কোনও উপায় ছিলনা। আগেই বলেছি, আমার ঐ অঞ্চলের লোকদের বিশ্বাস ছিল যে, আহমেদ মোল্লা 'ডাকাইত অইলেও মানুডা ভাল', তাই সে যখন দেখল যে তার 'পোলাডা' দুজন বিধর্মীর বদৌলতে 'জানে বাচ্ইয়া গেলে', তখন তাঁরা দুজন তার কাছে 'গুরুর গুরু, পীরের পীর, আল্লাহর ফেরেস্তা', তার মতো মানুষের জীবনে আল্লাহর এমন কুদরত কায়েম হতে পারে, একথা বিশ্বাস করা তার পক্ষে অসম্ভব। সে জেলে বসে বাবা এবং নারায়ণ ঠাকুরের সেই প্রচেষ্টার কথা শুনেছিল যে তাঁদের চেষ্টায়ই তার ছেলে বেঁচে গেছিল। কিছুদিন বাদেই সে ছাড়া পেয়েছিল এবং বাবার পায়ের কাছে বসে কসম খেয়ে বলেছিল, মুই আল্লা মাবুদ জানিনা, আগম্ নিগম্ কোরাণ হাদিছ মোর মাতায় থাউক্। মুই, খালি জানি আল্লায় মাইনসের রূপ ধরইয়া মোর ছাওয়ালডারে বাচাইলে। তো মুই কই, আল্লাহ পাক স্বয়ং মাইনসের রূপ ধরইয়া মাইনসের মইদ্যেই থাহেন।—মোল্লা কসম খেয়ে বলেছিল যে জীবনে সে আর ডাকাতি করবে না, এমন কি উপোস করে যদি মরেও যায়, তবু না। এ বৃত্তান্ত আমার একেবারেই বাল্য বয়সের। পরবর্তীকালে যে মোল্লাকে আমি দেখেছি সে প্রকৃতই একজন আলাদা মানুষ। সে যে একদা একজন দুর্ধর্ষ খুনি, ডাকাত ছিল, তখন তাকে দেখলে কেউ তা বলতে পারত না।

যে কথা আগে বলছিলাম, আহমেদ কখনই বাবার স্নেহের সুযোগ নিত না। তার পরিচিত কোনও ব্যাপারী যদি সে রকম সুযোগ নিত তবে সে ভীষণ কাণ্ড করত। এরকম একটি কাণ্ডের গল্প শুনেছিলাম। আমাদের বাড়ির সেই যে ফটিকের কথা আগে বলেছি, তার বড় ভাই 'লাড়ইয়া' ছিল মোল্লার দলের একজন ব্যাপারী। তবে সে খুনখারাবির মধ্যে বোধহয় থাকত না। এরা দুভাই ছোটবেলা থেকেই হাত সাফাইএ বেশ দড় ছিল। ফটিক শেষ পর্যন্ত ছিঁচকে চোরই থেকে গেছে। কিন্তু লাড়ইয়া আহমেদ মোল্লার শাগরেদি করে কালেদিনে বেশ নামকরা ব্যাপারী হয়ে উঠেছিল। সে যা হোক, ছোটবয়সে মাতৃহীন হওয়ায় এরা আমার মায়ের তত্ত্ব তালাশে থাকত। বাবাও এদের খুব স্নেহ করতেন। তা একবার নাকি এক দশধারার মামলায় সে পুলিশকে জানায় যে বাবার নির্দেশেই তাকে ডাকাতিটি করতে হয়েছিল। কিন্তু পরস্পর বিরোধী বক্তব্যে অভিযোগটি সে প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি এবং ফলত কিছুদিন জেল খাটে। বেরিয়ে এসে বাবার পা ধরে ক্ষমাটমা চেয়ে সে যখন নিশ্চিন্ত তখন একদিন তার ওস্তাদ আহমেদ মোল্লার হাতে সে বেদম মার খেয়ে দেশছাড়া হয়। মোল্লা তার ঐ বদমায়েশিটা জানতে পেরেছিল। দীর্ঘকাল আমাদের অঞ্চলের কেউ আর লাড়ইয়ার দেখা পায়নি। তবে একবার পুজোর সময় আমরা তাকে দেখেছিলাম। মোল্লার হাতে মার খেয়ে সে পালিয়ে গিয়েছিল নাকি পশ্চিমবঙ্গে। সেখানেও নানান দুঃসাহসিক ব্যাপারাদি করে জেলটেল খেটে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করে। বহুবছর পর যখন সে আমাদের পিছারার খালের জগতে এল, ততদিনে সবার রাগ ধুয়ে জল। প্রায় নায়কের মর্যাদায় সবাই তাকে নিল

সেদিন। মজার ব্যাপার এই যে পশ্চিমবঙ্গে তার ব্যাপারাদির গল্প সে নিজেই বলেছিল। মনে আছে, একটা আধুলি, সোনার আংটি একটা, একগাছা হার এইসব হঠাৎ করে গিলে ফেলে আবার উগরে বার করে দিয়ে সে সবাইকে তাজ্জব করে দিচ্ছিল। এ ধরনের চোরাইমাল গায়েব করার জন্য সে নাকি সীসের বল দিয়ে কি ভাবে গলায় একটা পকেটমতো তৈরি করে নিয়েছিল, অভ্যেস করে করে।

আহমেদ মোল্লাকে ডাকাত হিসেবে জেনেছি গল্পকথায়। জ্ঞান হবার পর তাকে দেখেছি মানুষের একনিষ্ঠ একজন সেবক হিসেবেই। বাবার কাছে কসম খাওয়ার পর মোল্লা তার দল ভেঙে দিয়েছিল। দলের সবাই হয়ত ব্যাপারের কাজ ছাড়েনি, কিন্তু মোল্লা কাঁচা সবজির ব্যবসা শুরু করেছিল তার নতুন পেশা হিসেবে। এছাড়া খাল বিল নদীতে জাল বেয়ে মাছ ধরত সে। সেটাও তার জীবিকার অঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। একদা সে ডাকাত ছিল বটে, কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি তার আদৌ ছিলনা। বরঞ্চ কোনও রকম গণ্ডগোলের আঁচ পেলে সে তার পুরোনো শাগরেদদের নিয়ে আমাদের এলাকাগুলিতে টহলদারি করত রাতে বিরেতে। সব মানুষের সাথেই ছিল তার সুন্দর সম্পর্ক। মাঝেমাঝে আমাদের কর্তাদের কাছে এসে যখন বসতো, আপশোস করত তার অন্ধকার জীবনের নানান কৃতকর্মের জন্য।

তার সাথে সেসব দিনে, শীত বা বসন্তের রাতে, জ্যোৎস্নাপক্ষ থাকলে, সুপারি কাঠের ডিঙিতে বড় খাল পেরিয়ে, গাবখানের নদীতে ঝাঁকি জাল নিয়ে মাছ ধরতে যেতাম। বড়খাল পেরোনোর সময় যখন বৈঠা হাতে মোল্লা ডিঙির পাছায় বসে একহাতে বৈঠা চালাত, আর হাতে ডাবা হুঁকোটা নিয়ে গুড়ুক গুড়ুক করে টান মেরে তার ফেলে আসা জীবনের নানান রোমাঞ্চকর কাহিনী বলত, আমরা বড় শিহরিত হতাম। তারই কীর্তিকাহিনী বলত সে, কিন্তু আমরা তার বলার ভঙ্গিতে গল্পের স্বাদ পেতাম। বেশ চমৎকার একটি ধরন ছিল তার কথনের। কখনও কখনও গান গেয়ে উঠত, যদিও গানের গলা ছিলনা তার। গলা না থাকলেও একটা ভাবের আবেগ থাকত তার গানে— যেটা, আমাদের ঐ এলাকার বেশির ভাগ চাষি বা সাধারণ মানুষ মাত্রেরই একটা চমৎকার সম্পদই বলা যায়। তবে তার গলার খামতি পুষিয়ে দিত নাগরআলি ভাই। সে তখন আমাদের বাড়ির রাখাল, পাহারাদার 'তথা' অনেক কিছু। মাছ ধরা পর্বে তার উপস্থিতিও আমার এক চমৎকার স্মৃতি। গল্প করতে করতে মোল্লা হঠাৎ গেয়ে উঠত— সে গানের কলি বড় হাহাকারের—

কত আশায় ভাসাইলামরে এএএ-
আহা এমোর সাধের তরী খান।
কূলে না পৌছিলামরে বন্দু—
তাই কান্দে এ পরাণ

নাগরআলিভাই সাথে সাথেই দোহার দিত এবং একসময় সে-ই মূল গায়ক হয়ে গেয়ে যেত—

কি কারণে, কেবা করে এ এ রে এএএ—
আন্ছান এ ইনছান্
আহা, কুলের তালাশ
দ্যাও মোর বন্দু গো
কান্দে এ পরাণ।

মানুষের জীবন কি কারণে, কে যে এমন 'আনছান' করে দেয় এবং সময় কেন যে তাকে দন্ধায়, তার হদিস কেবা জানে, আর কেই বা দিতে পারে।

জেবন এমনই এক রঙ্গ
তারে কহনও দেখি নিষ্ঠাচারে
কহনও তার তিরভঙ্গ,
তার কহন পিরীত কহন সোহাগ
কহন যে তার ভাবের উদ্বাগ
হে কতাডা জানলে বোধায়
শেতল অইত এ অঙ্গ।
শ্যাখ নাগরালি কয়
কিসের থিহা কিবাঅয়
হে কতা কেউ কইত যদি
ছাড়তাম না হে মধুর সঙ্গ।

— এরকম এক বিন্যাসে নাগরালিভাই মোল্লার গানের বিস্তৃতি ঘটাত। অল্পশিক্ষিত অথবা অশিক্ষিত বলে, যাদের আমরা বারবার তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে এসেছি তারা কিন্তু মাটির গুণে হোক বা যে কোনও কারণে এমত দার্শনিক ভাবে ভাবিত এবং ব্যক্ত হয়, এ আমার একান্ত অভিজ্ঞতা।

ডিঙি যখন বড়খাল ছেড়ে গাঙের জলে পড়ত তখন মোল্লা বলত, বাজানেরা তোমরা কেউ একজোন এহন পাছায় বও, একজন যাও গলুইএ। নাওহান য্যান্ কাইত্তার না অয়। নাও কাইত তো বেয়াক কাইত। তোমরা আর য্যারা য্যারা নাওয়ে আছ, হগ্গলের মৌয়াত। তয়, হেকারণ ভাবইয়া লাভ নাই। হায়াত থাকলে বাচ্পা, মৌযাত আইলে মরবা। মরণ বাচন খোদার নাচন। তয়, পাছায় যে থাহে হ্যারও কিছু মেন্নত থাহা জায়েজ। হ্যার হজাগ থাহন আবইশ্যক। — এইসব কথা হতে হতে খ্যাপলা জালের 'খ্যাও' এবং নৌকোর মধ্যে মাছেদের দাপাদাপি শুরু হত। তাদের রুপোলি শরীরে চাঁদের আলো ঠিকরে পড়ত। নৌকো বাইবার ঝক্মারির মধ্যে নাগরালিভাই থাকত না। তার কাজ শুধু গান আর কেচ্ছা কথন। মাঝে মাঝে মোল্লার ধরতাই। সেসব কথা ভাবলে আজও বড় মোহময় মনে হয় জীবনকে। মনে হয়, অনেক মহান মানুষের জীবনের থেকেও আমার সেই সময়কার জীবন সার্থক। আমি হয়ত সেই সার্থকতার আনন্দের কথাগুলো সঠিক ভাবে পরিবশেন করতে পারছিনা, কিন্তু সে এক অনবদ্য জীবন আমি যাপন করেছি, যা সবার ভাগ্যে ঘটে না।

মাঝরাতে, মাছ ধরা শেষ হলে মোল্লা ঘাটে এসে নৌকো বেঁধে আমাদের বাড়ির দরজায় পৌঁছে দিয়ে তবে ফিরে যেত। এমন কি নাগরালি ভাইএর সাথে পাঠিয়েও সে 'নিশ্চিন্দি' থাকত না। বাবাকে ডেকে বলে যেত,—লইয়া গেছেলাম. ফেরৎ দিয়া গেলাম। গোসা টোসা যা করবেন আমার উপর। পোলার কোনও দোষ নাই। মাছ কাইল বেয়ানে দিয়া যামু, চিন্তা নাই। —এসব ব্যাপারে বাবা আমাকে কোনওদিন শাসন করেননি।

উনিশশো উনষাট কি ষাট সালের কোনও একটা সময়। যখন মার্শাল প্রেসিডেন্ট কায়েমি হয়ে তখ্‌তে এবং আমার ঐ পিছারার খালের ক্ষীণ অবশিষ্ট গৃহস্থ বাড়িগুলোর উচ্ছেদের জন্য যখন প্রাগুক্ত কায়দায় ডাকাতির দু একটা ঘটনা ঘটে গেছে, আর মোল্লা তার প্রাক্তন শাক্‌রেদদের নিয়ে এইসব ঘটনার প্রতিরোধে খবরদারি করতে শুরু করেছে, তখন একদিন সকালে ঘুম ভাঙার মুহূর্তে জানলাম গতরাতে মোল্লা খুন হয়েছে। তার লাশ পড়ে আছে বড়খালের কিনারে এক হোগলা ঝোপের মধ্যে। জায়গাটা দাদীআম্মা যে ছৈলাগাছের আড়াল থেকে ছাবি ফেলে চিংড়ি মাছ ধরতেন তার ঠিক উল্টো পারে। মনে আছে আমাদের পিছারার খালের জগতের তাবৎ মনুষ্য সেখানে জমায়েত হয়েছিল তাকে শেষবারের মতো দেখার জন্যই হয়ত। অথবা গ্রামীণ জীবনের স্বাভাবিক কৌতূহল বশতই কিনা আজ আর মনে নেই। শুধু মনে আছে, অসম্ভব রকমের ক্ষতবিক্ষত অবস্থায়, রক্তে, কাদায়, জলে মাখামাখি হয়ে মোল্লার দেহটি অসহায় পড়েছিল সেই হোগলা ঝোপের কিনারে সম্পূর্ণ উলঙ্গাবস্থায়। মানুষটা যখন গর্হিত জীবন যাপন করত, তার এরকম পরিণতি হয়নি। যদি হত, তার একটা কার্যকারণ পাওয়া যেত। যখন যে সব আপত্তিকর, অসামাজিক কর্ম পরিত্যাগ করে, বেশ কিছুকাল ধরে এক সুস্থ সামাজিক জীবন যাপনে মগ্ন, তখন তাকে খুন হতে হল। বেশির ভাগ মানুষ জানতেই পারল না মোল্লা খুন হলো কেন? তবে আমি তো তা জেনেছিলাম।

বেশির ভাগ মানুষ না জানলেও আমি জেনেছিলাম এই হত্যার কার্যকারণ। কেননা এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিল আমার এক বাল্যবন্ধু, যার নাম অমল। বসু তাদের উপাধি। আমাদের পিছারার খালের ঠিক বিপরীতে তাদের গেরস্থালি। তাদের বাড়ি নয়, তার মামাবাড়ির গেরস্থালি ছিল সেটি। তার মা অল্প বয়সে তাকেই সম্বল করে বিধবা হয়ে তার বাবার বাড়িতেই স্থায়ী হলে ওটাই তাদের বাড়ি বলে আমরা জানতাম। সে যাহোক্, অমল ছিল আমার সময়বয়সি এবং বন্ধু। সে দেখে ফেলেছিল কী ভাবে মোল্লা খুন হয়। সেদিন সে গঞ্জে গিয়েছিল তার মামার কাছে। মামা কাজ করতেন শক্তি ঔষধালয়ে। ফিরতে একটু রাত হয়ে গিয়েছিল। তবে আমরা ওরকম হামেশাই সেসব দিনে চলাফেরা করতাম। নদীর পারের রাস্তা ধরে আমাদের বড় খালের মুখ অবধি এসে, বাঁ হাতে রাস্তা নিতে হয় গ্রামে আসার সময়। আমাদের বড় খালটাও তখন বাঁহাতি। ডান দিকের দুএকটি গ্রাম পেরোলেই আমার দাদীআম্মার গ্রাম তারুলি। বাঁ হাতের সাঁকো বা 'চাড়' পেরোলেই নৈকাঠির হাট যার পেছনের গ্রামটির নামও

নৈকাঠি। তারুলি গ্রামটা বেশ বড়। আমাদের গ্রাম এবং নৈকাঠির উল্টো পারের গোটা এলাকাই প্রায় তারুলির মধ্যে পড়ে। অমল আসছিল তারুলির দিকের ডানহাতি রাস্তা ধরে। মেটে জ্যোৎস্নায় পরিচিত রাস্তায় চলতে অসুবিধা হয়না। কখনও কখনও মেঘ সরে গেলে কাছে দূরের অনেকটাই পরিষ্কার দেখাও যায়। দাদীআম্মার বাড়ির সামনের ছৈলা ঝোপের কাছাকাছি এসে অমল 'আল্লাহ'—বলে একটা আর্তনাদ শুনেছিল এবং স্বাভাবিক সতর্কতা বশত ছৈলা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়েছিল। সেখান থেকেই সে দেখতে পায় কয়েকজন মানুষ একটা ডিঙি নৌকোর মধ্যে একজনকে কুপিয়ে যাচ্ছে। আর্তনাদটা প্রথম আঘাতের পরই থেমে যায়। অমল দেখেছিল, ঐ লোকগুলো, তারপর, চ্যাংদোলা করে দেহটা হোগলা ঝোপের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে ডিঙিটা তারুলির কিনারে ভিড়িয়ে উঁচু পাড়ের উপরে উঠে পড়ে। তারা চারদিক ভাল করে নজর করে নিশ্চিন্ত হয় যে কেউ তাদের দেখেনি, তারপর ধীরে সুস্থে আবার নৌকোয় উঠে উত্তরমুখী চলতে থাকে। তখন ভাঁটার টান। নৌকোর গতি ধীর। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে অমল যখন বাড়ির রাস্তা ধরে, তখন তার পা চলছে না। শরীর এবং অন্তরাত্মা ভয়ে আতঙ্কে হিম হয়ে আছে। ও দেখেছিল নৌকোয় যারা যাচ্ছে তাদের মধ্যে একজন তার চেনা। সে জব্বর। বাউলকান্দা গ্রামের একজন নামজাদা মানুষের মেজ ছেলে সে, যে মানুষটি পঞ্চাশ একান্নর দাঙ্গার সময় একহাজার দাঙ্গাবিরোধী ভলেন্টিয়ারের সর্দার ছিলেন। জব্বার সেরকম মান্যবান ব্যক্তির পুত্র হয়েও ছিল একটা দুধর্ষ ডাকাত, খুনি এবং লম্পট।

অমল পরের দিনই একথা বাবার কাছে বললে, বাবা তাকে এবং আমাকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন, খবরদার একথা আর কাউরে কইওনা। তোমরা কিন্তু কিছু দ্যাহ নায়, জানোও না। আমরা ভেবেছিলাম একথা শুনে বাবা হয়ত কিছু একটা করবেন। কিন্তু তাঁর কথা শুনে এবং পরিস্থিতির গুরুত্ব আঁচ করতে পেরে আমাদের বুকের রক্ত হিম হয়ে গিয়েছিল। বাবারা নিশ্চয়ই তখন অন্য কোনও বিভীষিকার পূর্বাভাষ অনুমান করেছিলেন। আমরাও, তখন আমাদের যা বয়স, তদনুযায়ী আঁচ করতে পারছিলাম অনেক কিছুই। খেলার মাঠে, ইস্কুলে, মাছ ধরার সময় বা খালে ঝাঁপানোর মুহূর্তে নিশ্চয়ই আমরা টের পাচ্ছিলাম যে সংখ্যাগুরুদের মধ্যে ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীরা আমাদের অবাঞ্ছিত মনে করছে এবং এবারকার উচ্ছেদের ধরনধারণ, কৌশল আগেকার চাইতে আলাদা এবং এর প্রভাব পঞ্চাশ একান্নর চাইতে অনেক বেশি স্থায়ী হবে। কারণ এবার সাধারণ বর্ণহিন্দু ছেড়ে নিম্নবর্ণীয় মানুষদের পালা, যারা পাকিস্তানকে স্বাগত জানিয়ে মুসলিম লিগকে সমর্থন করেছিল একসময়। উচ্চবর্ণীয় হিন্দু সমাজের শোষণ তথা জাতিবিদ্বেষের প্রকোপে পতিত নমঃশূদ্র ইত্যাদি তফশিলি জাতীয় মানুষেরা খুব স্বাভাবিক কারণেই হয়ত মুসলিম লিগের তৎকালীন আশ্বাসনে নিজেদের উদ্ধারের সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু একসময় সাম্প্রদায়িক ভিন্নতার বর্বর পশুটা সেইসব সম্ভাবনাকে তছনছ করে দিয়ে তার নখদন্ত ব্যাদান করে তাকে আক্রমণ করে বসল।

— তেত্রিশ —

মোল্লার খুন আমার চোখ খুলে দিয়েছিল ব্যাপকভাবে। যতদূর মনে আছে আমি তখন ক্লাস নাইনে পড়ি এবং খুব ছোট নই। নানান ঘাত অভিঘাতে এমনিতেই তখন আমরা বিভিন্ন ব্যাপারে অসম্ভব অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছি যা ঐ বয়সে আমাদের হওয়ার কথা ছিলনা। এর মধ্যে যখন মানুষ খুন হতে দেখার চরম অভিজ্ঞতাও লব্ধ হল, তখন আমাদের শৈশব, কৈশোর আর আনন্দময় থাকল না। আমরা নাগরালির গান কেচ্ছা, মোল্লার সাথে মাছ ধরার জ্যোৎস্নাময়রাত্রির রহস্যময় মাধুরীর জগৎ থেকে ছিন্ন হয়ে অকস্মাৎ যেন এক রৌদ্রদগ্ধ খা খা মাঠের ফাটলওয়ালা বাস্তব হা-মুখের সামনে অসহায়ভাবে নিজেদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। যেন, যে কোনও অসতর্ক পদক্ষেপে আমরা ঐ ফাটলের হামুখে পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারি। সংসারে এমন কোনও অস্তিত্বকে তখন আমরা চোখের সামনে অথবা মানস চিন্তনে দেখিনা, যা এই আতঙ্ক থেকে. বিভীষিকা থেকে আমাদের রক্ষার কোনও মাভৈঃ বাণী উচ্চারণ করতে পারে। না এমন কোনও সাম্প্রদায়িক বা জাতীয় নেতা, কোনও গোষ্ঠীপতি, কোনও দণ্ডনায়ক, এমনকি কোনও অলৌকিক অস্তিত্ব বা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে পর্যন্ত আমরা তখন রক্ষক হিসাবে ভাবতে পারছিলাম না। বস্তুত ঐ সময়টিতে আমরা মানুষ এবং ঈশ্বর সবার উপরেই বিশ্বাস হারিয়ে একটা গভীর অন্ধকার আবর্তে পাক খাচ্ছিলাম।

আমাদের অত্যন্ত পরিচিত, সতত মঙ্গলকামী, চমৎকার ধর্মপ্রাণ এবং হিতার্থী মানুষদের সন্তানেরা হঠাৎ করে কিরকম যেন বদলে যাচ্ছিলেন। যাঁদের বাড়িতে বড়দের কারুর সাথে গেলে তাঁরা অপার আনন্দে আমাদের গ্রহণ করতেন, তাঁরা এই সময়টায় কিরকম যেন অচেনা অজানা হয়ে গেলেন এবং যেসব কথা তাঁরা কোনও দিন আমাদের বলতেন না, বা কেউ বললে সরবে প্রতিবাদ করতেন, তাঁরাই এখন সেরকম সব কথা বড়দের না হোক, আমাদের বলতে দ্বিধা করছিলেন না। আমরা, সংখ্যালঘুরা চলে গেলেই তাঁদের মঙ্গল হয়, তাঁদের জমি জমা, সম্পত্তি বাড়ে, এরকম একটা আকাঙ্ক্ষা তাঁদের আচরণে প্রকাশ পেতে থাকে। এইসব চরিত্রের মানুষদের মদতেই জব্বার এবং তার সহযোগীরা আমার পিছারার খালের পবিত্রতাকে সম্পূর্ণ ধর্ষিত করতে থাকে।

জব্বার ছিল এক অসম্ভব হার্মাদ। তার বাপের সাথে সে সহমত ছিলনা। তার দলের লোকেরা নবজাত রাষ্ট্রের স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছাচার হিসেবে নিয়েছিল। সাধারণ হিন্দু মুসলমানদের কেউই তাদেরকে পছন্দ করত না। গ্রামীণ লোকায়ত ধর্মীয় মেলাগুলো তখনও সাধারণ হিন্দু, মুসলমান মানুষদের সম্মিলন এবং আনন্দের স্থল ছিল। হিন্দুরা সেখানে সামান্য পূজা অর্চনা করত বটে, তবে তা এমন কিছু ব্যাপক ছিলনা যে তাতে অন্য সম্প্রদায়ের ধর্মহানি ঘটতে পারে। সেখানে সবাই পরম আনন্দে মেলার সুখ পেত। কিন্তু এই জব্বার এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গরা সেইসব স্থানে জুয়া খেলা, নেশা ভাঙ্ করা, লুট, মেয়েদের প্রতি অশালীন ব্যবহার ইত্যাদির সূচনা করে একে একে সব বন্ধ করতে বাধ্য করে। জাতকরণী খোলা, পঞ্চ দেবতার খোলা,

গলুইয়াখোলা, কামেশ্বরী খোলা প্রভৃতি লোকায়ত ধর্মীয় স্থানগুলোতে নীল ষষ্ঠী বা বাংলা নতুন সংবতের প্রথমদিনে মেলা বসতো। গ্রামের বুড়ি আধবুড়ি বিধবারা, যাঁরা জীবনের সব আনন্দ এইসব দেবদেবীদের অর্চনার জন্য রাখি করে রাখতেন, তাঁরা এসময় বড় মধুর আনন্দ উপভোগ করতেন। এই সময় তাঁরা সবাই পূজার থানে একত্র হয়ে একদিকে যেমন উৎসাহ সহকারে পূজার্চনার জোগাড়যন্ত্র করতে ব্যস্ত থাকতেন, তারই ফাঁকে ফাঁকে তাঁদের সুখ দুঃখের নানান কথা, বিগত জীবনের স্মৃতিচারণ এইসব করে ক্ষণিক স্বস্তি পেতেন। তাঁরা সাধারণত হয় ভাইয়ের সংসারে, না হয় দেবর বা ভাসুরের সংসারের আশ্রিতাই বলি বা মিনিমাঙনা ভাতকাপড়ের দাসীই বলি, ও রকম জীবনই কাটাতেন। যতদিন হাতে রথে, ততদিন কদর। শয্যা নিলে এর লাথি ওর ঝাঁটা এইতো ছিল তাঁদের জীবন। তাই এই সময়টিতে সবাই যখন একত্রিত তখন নানান কথার মধ্যে একটু এর নিন্দা তার নিন্দা না হওয়াটাই আশ্চর্যের। অতএব, কার ভায়ের বৌ কারে কতবার 'দুদ্ কলা দিয়া কাল সাপ পুষছি' বলে, আর কার ছোট অথবা বড়জা কাকে কবার 'ভাতারখাগী দেওর সোয়াগী' বলে গঞ্জনা দেয় তারও এক দিব্য আদানপ্রদান এই দেবস্থানেই ঘটত। তবে সব মিলিয়ে মেলাগুলো তখন জমত বড় চমৎকার। হিন্দু মুসলমান সব অপবর্গীরা এই মেলায় প্রকৃতই আনন্দ উপভোগ করত। মোদক ময়রারা তাদের মিষ্টান্ন নিয়ে, মনিহারি দোকানিরা তাদের কাচের চুড়ি, পুঁতির মালা, রাঙের গহনা নিয়ে বা চানাচুর, বারভাজা, ছোলামটরভাজা, ফুট তরমুজের ব্যাপারীরা তাদের তাবৎ পসরা নিয়ে দুপয়সার ব্যবসা করত। তালপাতার ভেপুঁ, বাঁশের বাঁশি, বেলুন, চুলের কাঁটা, মাথার ফিতে, চুড়ি এটা ওটা এমন কি দা, কাস্তে, কোদাল, লোহার কড়াই, হাতা, খুন্তি, বঁটি সবই এইসব মেলায় পাওয়া যেত, যা অন্যসময় দরকার হলে হয় গঞ্জ থেকে, নতুবা কীর্তিপাশার বাজার থেকে কিনে আনতে হত। কিন্তু তা আনতো পুরুষেরা। মেয়েরা তো আর দেখে শুনে কিনতে পারত না, যেমন এই মেলায় তারা পারছে। ছেলেরা বা পুরুষেরা কি এসবের ভালমন্দ আদৌ কিছু বোঝে? এইসব নিয়ে মেলা।

কোথাও একটা বট গাছের নীচে দূর কোনও গ্রামের এক পরিবার তাদেরই এখানকার এক কুটুম বাড়ির লোকেদের সাথে সেই বছরান্তে মিলিত হয়েছে। এখানকার কুটুমরা বলছে,—'আইজ যাওন নাই। কাইল দুফরে খাইয়া লইয়া, বিশ্রাম করইয়া হেই বিকালে হ্যানে রওনা দেবেন, থাইক্যা যায়েন।' কুটুমদের তালেবর বলছেন,—'থাকতে কি কোনও আফইত্য আছে, না হেয়া ক্যারো অসাদ? তয় বোজেন তো, গোরুবাছুর, ঠাকুর নারায়ণ, হ্যারগো তত্ত্ব তালাশের ব্যবস্তা করইয়া আই নায়। হ্যারা উপসি থাকপে, বোজেন তো সব।' —অবশেষে মীমাংসা হয়-'তয় জ্যৈষ্ঠে কৈলম পোলাপানেগো পাডাইবেন। আম কাডালের সোমায় হ্যারা যেন আয়, —নাইলে কৈলম তিরুডি ধরুম্।'—এইসব কথাবার্তা নিয়েই এই মেলা। গলুইয়া খোলার মেলার প্রান্তে বেউখির, শশীদের বড়খাল। সেখানে সার সার ডিঙি। মেলা শেষে সবাই যার যার

বাড়ি ফিরবে। কাছের যারা যাবে হেঁটে। দূরগ্রামের লোকেরা ঐসব নৌকোয়। মেলা মানে মেলামেশা। তোমরা ক্যামন আছ? আমাগো চলতাছে মোটামুটি। কিখাবা সোনারা? আয়ো এট্টু রসগোল্লার দোকানে যাই। কয়ডা কইরা খাবা কও? লজ্জা করবা না, আমি তোমার মাউসা। আয়ো। —কোথাও এইসব। আবার কোথাও, —না বেয়াই, খন্দপাতির অবস্থা আমাগো উদিগে এবার একছের পিছ্‌লা। এইত দ্যাহেন দ্যার কুড়া জমিতে মরিচ বোনলাম। মনে হাউস, খন্দ যদি মনমতন অয় বড় মাইয়াডার গয়না একলগেই গড়াইতে দিমু। বিয়াতো ঠিকই অইয়া আছে জানেন। তো মরিচচারা গুলান হেইযে টাক্কুরইয়া মারইয়া রইলে, হেয়াতে গয়নাতো ভাল একগাছ সোনার বালও অইবে না। কিযে এক পোহা লাগছে, গাছের বেয়াক পাতাগুলান বেক্কুরা দিয়া কেরমোশো হুগায়। একারণ মনে শান্তি নাই। —এরই মধ্যে ব্যাপারীদের সাথে কোন্দল চলে ক্রেতাদের। —এইডুক এউক্কা তরমুজ হ্যার দাম দু'পয়সা? মোগো গেরামে তো এয়া কেউ মাগ্‌না দেলেও নেনা। এয়ারে তরমুজ কয়? মোর বুড়ইয়া দাদার হোলডাও তো এরথিহা বড়। —ব্যাপারী নির্বিকার জানিয়ে দেয় যে সেক্ষেত্রে খরিদ্দারের উচিত তার 'বুড়ইয়া দাদার হোলডা' খাওয়া। '—হালার চরউয়া বাঙ্গু মারানীর পো, তোরগো চরউয়া তরমুজের ফলনাতা হরি'। 'এয়া কি চরউয়া তরমুজ যে মাগনা খাবি?' —এও এক কলরব এবং মেলায় এইসব হয়। রসিকেরা রস নেন, ঝগড়ুটেরা ঝগড়া করে। তবে এই সব কিছু নিয়েই এই মেলাগুলোর ব্যাপারস্যাপার এবং তা এক ব্যাপক আনন্দের জগৎ হত। এরই মধ্যে দল বেঁধে নট্টমশায়রা, তাঁদের বাদ্যবাজনা বাজিয়ে মেলার উদ্যম তুঙ্গে তুলে দিতেন মাঙ্গনায়। তাঁরা গলুইয়া খোলার পাশেই একটি গ্রামের বাসিন্দা। জাত্যংশে অবশ্যই ডোম, কিন্তু আমরা তাঁদের কদাপি তুই তোকারি করতাম না, সম্বোধন করতাম নট্টমশায় বলে। তাঁদের মধ্য থেকে অনেক বিখ্যাত ঢুলি, তবলচি বা শানাইওয়ালা একসময় আমাদের দেশে ব্যাপক নাম করেছিলেন শিল্পী হিসেবে। নটবর নট্ট, নাথু নট্ট ইত্যাদিদের কথা আমার আজও মনে আছে।

এ সমস্ত চিত্রই পঞ্চাশ একান্নর দাঙ্গা এবং তার ফলশ্রুতি স্বরূপ যে ব্যাপক দেশত্যাগ ঘটেছিল তার পরবর্তী চিত্র। পিছারার খালের আশপাশের সাধারণ হিন্দুরা সেই প্লবতায় প্লাবিত হয়নি বলেই এইসব মেলাগুলি জীবন্ত ছিল। একারণে উচ্চবর্গীয় এবং বর্ণীয়দের সংখ্যা খুব অধিক ছিলনা বলে, তখনও মানুষের অনুপস্থিতি জনিত সমস্যা ঠিক ততটা অনুভব করিনি। অবশ্যই বিশেষ বিশেষ পরিবারগুলোর দেশত্যাগে অসম্ভব যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু তাঁরা সংখ্যায় খুব অধিক ছিলেন না বলে ব্যাপক শূন্যতা বোধ করিনি। কিন্তু এইসব সাধারণ হিন্দুরা দেশত্যাগ করতে শুরু করলে বড়ই একাকীত্বের নৈরাশ্যে নিমজ্জিত হলাম, কারণ তখনও সাধারণ মুসলমান সমাজের সাথে একাত্মতা ঘটেনি। ভদ্র হিন্দু গৃহস্থদের দেশ ত্যাগের পর, আমাদের একাত্মতা স্বাভাবিক কারণেই সাধারণের সাথে ঘটেছিল। এবার তারা যখন দেশত্যাগ করতে শুরু করে তখনই দাদীআম্মার দৌলতে আমার একাত্মতার প্রসার ঘটে সাধারণ মুসলমান

সমাজের সাথে। সে এক দীর্ঘ পরিক্রমা। কিন্তু সেকথা রেখে, যে কাহিনী বলছিলাম, তার বিস্তৃতিতে যাওয়া প্রয়োজন। ঐ সব সুন্দর মেলার অন্ত কি ভাবে ঘটল। তার কাহিনী খুবই প্রাসঙ্গিক।

জানি, যাদের এখন এইসব মেলার অন্ত্যেষ্টির জন্য দায়ী করব, তারা অথবা তাদের ঘনিষ্ঠ, আত্মীয়েরা আজও ঐ পিছারার খালের চৌহদ্দিতে না হলেও তার আশপাশে বেঁচে বর্তে আছে। তারা এ বিষয়ে প্রশ্ন তুলতেই পারে। তথাপি সে ঝুঁকি নিয়েই আমার অভিজ্ঞতার দলিল রেখে যেতে চাই। জব্বার বা তার দলের লোকেরা, যারা নবলব্ধ রাষ্ট্রের স্বাধীনতাকে নিজেদের স্বেচ্ছাচারের ছাড়পত্র বলে জেনেছিল এবং অবশ্যই একদল ক্ষমতাসীন ব্যক্তি তাদের এমত শিক্ষায় তথা আশ্বাসে আশ্বাসিত করেছিল—তারা সবাই এই স্বপ্নের জগতকে ছিন্নভিন্ন করেছিল। এইসব লোকই সাধারণ হিন্দু এবং মুসলমানদের এই মিলনের মহামেলাগুলিকে ধ্বংস করে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক বিরোধ সৃষ্টি করে, যার, সমাধান আজও হয়নি। এইসব হার্মাদেরা অর্থাৎ জব্বার, হানিফ, মুসা ইত্যাদি নামের লোকেরা মেলায় জুয়ার আড্ডা বসাত, কিশোরী মেয়েদের পেছন পেছন ঘুরে তাদের শারীরিকভাবে বিরক্ত করত, আবার যারা সমকামী চরিত্রের (যেমন জব্বার) তারা সুন্দর মুখ ছেলেদের আড়ালে ডেকে নিয়ে যৌন নিপীড়ন করত। কখনও তারা দলবদ্ধভাবে ময়রা, মোদকদের দোকানের সামনে হল্লা জুড়ে দিয়ে, সেই সুযোগে রসগোল্লার ক্যানেস্তারা টিন, সন্দেশের বারকোশ বা খুরমার ঝুরি তুলে নিয়ে কাছাকাছি কোনও জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে খেয়ে নিত।

জব্বার ছিল অতিমাত্রায় ইন্দ্রিয়বিলাসী এবং সুযোগসন্ধানী। সে যেকোনও হিন্দু কিশোর কিশোরীকে সুযোগমতো পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ত তাদের উপরে। আমি যখন ক্লাস ফাইভে ভর্তি হয়েছিলাম, তখনই তার এই লালসার ব্যাপারটি জেনে গিয়েছিলাম। পরে ক্লাস নাইনে যখন ভর্তি হলাম তখনও তার এমত আচরণ আমাকে মোকাবেলা করতে হয়েছে। ঐবয়সে দেখতে বোধ হয় দিব্য ছিলাম। ওদের বাড়ির সামনে থেকেই আমাকে স্কুলে যেতে হত। আমার যাওয়ার সময়টায় ও ওদের বাড়ির সামনের পিঠেকড়া গাছটার পাশে দাঁড়িয়ে থাকত, আর আমাকে একা পেলেই কুৎসিতভাবে ডাকত। ব্যাপারটা জবরদস্তির পর্যায়ে গেলে আমি ছুটে পালাতাম। সে কিন্তু এরকম আচরণ করে আনন্দ পেত এবং যেখানে সেখানে তার দলবলের সাথে সরবে এইসব প্রচেষ্টার বিষয় নিয়ে মস্করা করত। ব্যাপারটা অসহ্য হওয়ায় ক্লাসের কিছু বয়স্ক ছেলেদের নিয়ে একদিন জব্বারকে বেদম প্রহার দিয়েছিলাম। দল বেঁধে কাজটা করেছিলাম বলে ও খুব ভয় পেরে গিয়েছিল। আমার সাথে বেশ কয়েকজন মুসলমান ছেলেও একাজে সঙ্গী হয়েছিল।

যখন মুসলমানি শাস্ত্র বিষয়ে কিছু পড়াশোনা করছিলাম, তখন জেনেছি যে কোরানে এই সমকামীত্ব, সীমালংঘন ইত্যাদি বিষয়ে আল্লাহ্ কি ভাবেই না আদমজাতদের সতর্ক করেছেন। সাদাম বা সোডোম নগরীর ধ্বংসের বিস্তৃত বিবরণ, লূতের কাহিনী বাইবেল বা কোরান মারফত কেই-বা না জানে। কিন্তু এরা যে নিজেদের ইসলাম অনুসারী

ঘোষণা করেও ঐ পাপের অনুসরণ করত, তা আমার কাছে বড় অদ্ভুত মনে হত। ইসলাম বা শান্তি এই বিশ্বে কায়েম হওয়ার বিষয়। জন্মসূত্রে কেউ তাই মুসলমান হতে পারেনা। ইসলাম বা শান্তিকে যে বা যারা কায়েম করে তারাই মুসলমান। সে বা তারা যদি অন্য সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করেও শান্তি কায়েমের জন্য, পরহেজগারির জন্য বা ইমানের জন্য জীবনপাত করে এবং হযরতকে এই শান্তির প্রতীক বলে স্বীকার করে তবে সে বা তারাই মুসলমান। একথা যদি সত্য এবং শরয়িত মোতাবেক হয় তবে পৃথিবীতে মুসলমানের সংখ্যা হাতে গোনার মতো। আর এই জব্বার ইত্যাদিরা, তাদের মুরুব্বিরা এমন কি রাষ্ট্রপ্রধান আয়ুবখান সাহেব, রাষ্ট্রপতি জিন্নাহ্‌পুনজা সাহেব বা পাকিস্তানের বর্তমান নাগরিক, উজিরে আজম, উজিরে আলা, সিপাহ্‌সলার, কেউই মুসলমান নন। কারণ আমার সেই বয়সের উপযোগী ইসলামি চর্চায় আমি তাঁদেরকে ইসলাম বা শান্তির অগ্রদূত হিসেবে দেখিনি। বরং আমার এমতই মনে হয়েছে যে, এদেশীয় তাবৎ মুসলমানেরাই জন্মসূত্রে মুসলমান, কর্ম বা আচরণ সূত্রে নন। যাঁরা কোরান, হাদিস ইত্যাদি নিষ্ঠার সাথে পাঠ এবং অনুধাবন করেছেন, তাঁরা একথা নিশ্চয় মানবেন। এদের পূর্বজরা যেহেতু মুসলমানি ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, তাই তাঁদের বংশজরা আজ মুসলমান। অর্থাৎ কিনা ইস্‌লাম এই ভূমিতে প্রচারিত হবার পর আর শরিয়ত মোতাবেক ইসলাম থাকেনি, যারা ইসলাম কবুল করেছিল, তারা পরম্পরাগত লোকধর্মের সাথেই একে একসময় আত্মীকরণ করে নিয়ে একধরনের জীবনচর্যা তৈরি করে নিয়েছিল। আমার এই মূল্যায়ন শুধুমাত্র গ্রামীণ সাধারণ মুসলমানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সেখানে যারা বদমাশ প্রকৃতির তারা বদমাশই থেকে গেছে, ইসলাম তাদের কিছুমাত্র শোধন করতে পারেনি। আর যারা সৎ প্রকৃতির তাঁরা মানবিকই থেকেছেন, অন্যধর্মের প্রতি সহনশীল মনোভাব নিয়ে তাঁরা তাঁদের স্বাভাবিক সততাকে আশ্রয় করেই জীবন যাপন করেছেন। সেখানে কোনও গোঁড়ামির দাসত্ব তাঁরা করেননি। কিন্তু যখন সংখ্যালঘুদের ভূমিদখল এবং তাদের উচ্ছেদ প্রয়োজন বলে বোধ হল তখনই একদল মানুষ নিজেদেরকে খাঁটি ইসলামি বলে প্রচার করতে লাগল। এই তথাকথিত প্রকৃত ইসলামিরাই পিছারার খালের আশপাশের বা এরকম অজস্র পিছারার খালের গ্রামীণ জগতকে ধ্বংস করে ব্যাপক মানুষের ক্ষতি সাধন করে। তারা বুঝল না যে তাদের এই কার্যকলাপে সংখ্যালঘুদের থেকে সংখ্যাগুরুরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে শেষ পর্যন্ত। আপাতদৃষ্টিতে শুধু সংখ্যালঘুদের বাস্তুত্যাগটাই সবার নজরে পড়ে, কিন্তু এই সময়ে সব গ্রামীণ মানুষেরাই ছিন্নমূল হয়, কেউ আগে কেউ পরে। এ ব্যাপারে হয়ত জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অনেক কর্মকাণ্ডই দায়ী, তবে আমি শুধু আমার ঐ বয়সের প্রত্যক্ষ আঞ্চলিক অভিজ্ঞতাটুকুই বলছি। এই জব্বার এবং তার দলবলেরা তাদের ইসলামি মুরুব্বিদের দ্বারা পরিচালিত ছিল এবং তাদের মুরুব্বিরা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মুরুব্বিদের দ্বারা। এ কথা আমি পরে বুঝেছি। আমি গোটা উপমহাদেশের হিন্দু এবং মুসলমানদের কথা বলছিনা। কিন্তু যেসব বুদ্ধিজীবী বা ভুক্তভোগী মনে

করেন যে শুধুমাত্র সংখ্যালঘুরাই এখানে দেশ-ভাগের জন্য ছিন্নমূল হয়েছিল তাঁরা বোধ হয় জানেন না যে দাঙ্গা পরবর্তীকালে কিছুদিন সংখ্যালঘুদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে ধনী হলেও সংখ্যাগুরু জনেরা একসময় ছিন্নমূল হন এবং পিছারার খালের জনপদবসতির মতো সমৃদ্ধ বসতিগুলি একেবারেই রিক্ত হয়ে যায়। কারণ এখানে যখন সংখ্যালঘু গৃহস্থদের ডাকাতি করার মতো আকর্ষণীয় কোনও সম্পদ অথবা আকর্ষণীয়া যুবতী বা কিশোরী কেউ থাকেনা, তখন জব্বারদের মতো ডাকাতদের নজর পড়ে তাদের নিজস্ব কৌমের সেই সব মানুষদের গেরস্থালিতে যেখানে সম্পদ এবং যুবতী উভয়ই যথেষ্ট লভ্য এবং লোভনীয়। তাদের এই নজর থেকে তাদের পোষক মুরুব্বিরাও বাদ পড়ে না। ফলত একসময় তাঁরাও গ্রাম ছাড়তে শুরু করেন। জমিজমা মুনিষ মাহিন্দারের জিম্মায় রেখে, কাছাকাছি শহর গঞ্জের বাসাবাড়িতে বা শহরের নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যান। ফসল ওঠার সময় এসে তাঁরা ব্যাপারীদের কাছে সেসব বিক্রিবাটা করে নগদ টাকাটা গঞ্জ বা শহরে লেনদেন করেন। গ্রামের শ্রীবৃদ্ধির কথা কেউ আর ভাবেন না, প্রয়োজনও বোধ করেন না। নিতান্ত ভূমি-নির্ভর মুনিষ মাহিন্দরেরাই গ্রামে থেকে যায়, আমার দেখা স্বপ্নের মতো গ্রামগুলো আস্তে আস্তে এভাবেই পুরোটা ধানক্ষেতের মতো রূপ নেয়। কিন্তু খাল নদী, পুকুর জলাশয়গুলোর সংস্কার না হওয়ায় সেই ক্ষেত ক্রমশ প্রেতার্তা রমণীর মতো কুৎসিত মূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কদাচিৎ পথচারীদের যেন মুখ ভ্যাংচায়। আমার অভিজ্ঞতা এরকম এক পথচারীরই এবং অবশ্যই আমি পিছারার খালের সুন্দর ভুবনের সেই প্রেতার্তা মূর্তি প্রত্যক্ষ করেছি।

স্যার বলেছিলেন, তোরা একটু পড়াশোনা করে মানুষ হ', আমি দেখে একটু সুখ পাই। তা আমাদের মানুষ হবার উপক্রমণিকা তিনি যতটুকু দেখে গিয়েছিলেন তার থেকে বোধহয় আমাদের অমানুষ হওয়ার কৌমুদীটি তাঁর নজরে বেশিই পড়েছিল। পড়ারই কথা। তবে তার হিসেবপত্র আমরা কিছু রাখিনি। সত্তর সালের কোনো একটা সময়ে তিনি মারা যান। তখন আমি পশ্চিমবঙ্গে। চিঠি মারফত অফিসে বসে খবর পেয়েছিলাম মনে আছে। সেদিন পিতৃশোক অনুভব করেছিলাম। অপিসে সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিল যে একটা দামড়া ছেলে বুড়ো মাস্টারমশাইয়ের মৃত্যু সংবাদে হাউহাউ করে তার ডেস্কে বসে কাঁদছে এবং জনৈক সহকর্মী তাকে বাড়িতে পৌঁছে দিতে যাচ্ছে।

স্যারের প্রসঙ্গ শেষ করা যায় না। আজ এই প্রায়-বৃদ্ধ বয়সেও যখন তাঁর কথা মনে পড়ে বুকের মধ্যে তোলপাড় হয়, ইচ্ছে হয় আবার ছুটে যাই সেই সময়টিতে যখন রাস্তায়, বাজারে, ইস্কুলে দেখা হলেই জড়িয়ে ধরে, গালে দাড়ি ঘষে দিতেন আর পকেট থেকে একচাকা পাটালি বা আখের গুড় বার করে হাতে গুঁজে দিয়ে বলতেন, নাও গুড় খাও।

স্যার সেই ইস্কুলের ধর্মঘটের সময় যাদের উদ্দেশ্যে বিশেষ করে মানুষ হবার আকাঙ্ক্ষা জানিয়েছিলেন সেই মুসা এবং হাকিম তখনই যথেষ্ট অমানুষের পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। এখন তাদের বিষয়ে কিছু বলব।

ছাত্রাবস্থা থেকেই তারা অন্য জীবনে আকৃষ্ট হয়েছিল। সেই হার্মাদ জব্বার ছিল তাদের নেতা। তারা, সেই আমাদের ক্লাশ নাইন টেনের সময় থেকেই নিয়মিত জুয়া খেলত, গঞ্জের বেশ্যালয়ে যেত এবং আরও সব উল্টোপাল্টা কাজকর্ম করত। সংখ্যালঘু মেয়েদের ভোগ করার একটা ব্যাপক প্রবণতা তাদের মধ্যে ছিল। হাকিম পরে কিছুটা ধাতস্থ হয়ে চাকরি নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যায়। মুসা পুরোপুরি জব্বারের দলভুক্ত হয়। আমার উপর ওর কি কারণে জানি না একটা অন্ধ আক্রোশ ছিল। খেলার মাঠে, ইস্কুলে বা বাজারে যখনই ও আমাকে কায়দায় পেত, খুবই অসম্মান, হেনস্থা এমনকি মারধর পর্যন্ত করত। বলত, তোরা এহনো এ দ্যাশে আছো ক্যা, অ্যাঁ? তোগো জাইতের ব্যাক্‌গুলান যহন গেছে, তোগো থাহনের দরকারডা কী? একদিন বাজারের একটা কাপড়ের দোকানে এইসব কথা তুলে ও আমাকে বড় মেরেছিল। বয়স এবং শারীরিক শক্তিতেও আমার চেয়ে বড় এবং শক্তিশালী ছিল। নির্মমভাবে কিল, চড়, লাথি, ঘুষি মারতে মারতে বলেছিল, তোরা হিন্দুরা এহানে থাকলে মোগো উন্নতির কোনো আশা নাই। হালার পো হালারা হিন্দুস্থান যা। তার প্রহারে আমি যতটা না শারীরিক ব্যথা পেয়েছি, অপমানিত হয়েছি তার চেয়ে ঢের বেশি। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছেলে বলে ঐ অসম্মান আমার মর্মে আঘাত হেনেছিল বড় ভীষণভাবে। আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছিল। তখন আমার বয়স বড়জোর তেরো চৌদ্দ হবে। ও তখন সেতেরো আঠারো। প্রতিশোধ নেবার মতো সাহস, সুযোগ বা শক্তি আমার তখন ছিল না। ঐ বয়সের ছেলেদের মধ্যে ঝগড়া, বিরোধ, মনোমালিন্য বা হাতাহাতি হতেই পারে। পরে আবার সব ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু এ ব্যাপারটি সেরকম ছিল না। তখন আমরা দুজনেই ক্লাস নাইনে পড়ি। এই ঘটনার প্রতিশোধ আমি নিয়েছিলাম দুবছর বাদে যেদিন ম্যাট্রিকের রেজাল্ট জানতে পারি সেদিন। সেদিন বাজার ফেরৎ বাড়ি ফিরছি। হঠাৎ নায়েব মশাইয়ের ছেলে, আমার সহপাঠীর ডাক শুনে দেখি ও এবং মুসা ছুটতে ছুটতে আসছে। আমি তখন কীর্তিপাশার খালের একটা হাতল বিহীন ব্রিজের উপর। ওরা ওদের বাড়িতে ডাকাতি হবার পর গঞ্জের কাছে একটা বাসা ভাড়া করে থাকত। ও একটা গেজেট নিয়ে এসে দেখাল যে আমি ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছি এবং অন্যান্য প্রায় সবাই আশানুরূপ ফল করেছে। মুসা থার্ড ডিভিশন পেয়েছে। ও বলছিল, তোর রেজাল্ট যে ভাল হইবে সেটাতো আমরা জানতামই। তা আমরা সবাই মিলইয়া খুব খারাপ ফল করি নাই। একযায় মুসা বলল, তোরা হিন্দুরা যদ্দিন এদ্যাশে থাকপি, মোরা কী ভাল কিছু করতে পারমু? হেয়া পারমুনা। য্যারা খ্যাতা পত্তর দ্যাহে, হ্যারাও তো হিন্দু। মোগো কিছু ভাল হউক হেয়াকি হেরা চায় না করে? ওর ওই কথায় আমার মাথায় হঠাৎ রক্ত চড়ে গেল। ও সব সময়ই জাতের দোহাই দিত আর মনে করত হিন্দু মাস্টাররা সবাই ওদের কম নম্বর দিয়ে অপদস্থ করার চক্রান্তে সামিল। নিজেদের সম্বৎসরের অপকর্ম বা পড়াশোনা না করার হিসেব ওরা রাখত না। এই হিসেব নিকেশের কারণেই আমার মাথায় রক্ত চড়ে গিয়েছিল। মনে পড়ে গিয়েছিল

দুবছর আগের সেই অপমানের জ্বালা। তার সেই কিল, চড়, লাথি, ঘুষির ব্যথা যেন নতুন করে আমাকে ক্লিষ্ট করল। সেদিন বয়সোচিত কারণে শারীরিক ভাবেই আমি দুর্বল ছিলাম। আজকের চিত্র ভিন্ন। আজ আমি যথেষ্ট বলিষ্ঠদেহী। এই উত্তেজক মুহূর্তে তাই আমার ক্রোধ কোনো হিসেব করল না। হাতল বিহীন ব্রিজের উপর দাঁড়ানো মুসাকে তাই ক্রোধান্ধ হয়েই একটা লাথি মারলাম এবং মুহূর্তে সে অদৃশ্য হয়ে খালে। বন্ধু বলল, তুই এডা করলি কী? এহন উপায়? বললাম যে উপায় কিছু নেই। ঐ হারামজাদার এতদিনের বদমায়েশির একটা বদলা নেওয়া গেল। ভালই হল, এখন থেকে একটু সমঝে চলবে। এদেশে থাকতে গেলে সমানে সমানেই থাকতে হবে। নইলে পেয়ে বসবে। আমি জানতাম যে মুসারাই সব নয়, আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী অনেক অন্য ছেলে আছে, তারাও মুসলমান। তারা ব্যাপারটা বুঝবে। মনে ত্রাস একেবারে হয়নি তা নয়। যদি ওরা দল বেঁধে কিছু করে? সেরকম চেষ্টাও যে পরে ওরা করেনি তা নয়। যতদিন দেশে ছিলাম এই শত্রুতা থেমে থাকেনি। কিন্তু যেসব চমৎকার ছেলে আমাদের বন্ধু ছিল, তাদের জন্য ওরা বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি।

মুসা এরপরে আর পড়াশোনার জগতে থাকেনি। ১৯১৯ সালে, যখন আমি পশ্চিমবঙ্গে এবং যখন বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ পুরোদমে চলছে, তখন একদিন অমল বসু আমার আপিসে এসে হাজির। সে দেশ থেকে পালিয়ে এসেছিল যুদ্ধের মধ্যেই। মুসা এবং জব্বারের শেষ পরিণতির কথা তার কাছেই জানতে পারি। আমাদের এ অঞ্চলে তখন পূর্ববাংলা সর্বহারা পার্টির ব্যাপক উপস্থিতি। পার্টির সর্বাধিনায়ক সিরাজ শিকদারও তখন ঐ অঞ্চলে। মুসা, জব্বার এরা সবাই রেজাকার, আল্‌বদর ইত্যাদি দলে মিশে যথেচ্ছ অত্যাচার করছিল তখন। অমলও সেই সময় সিরাজ শিকদারের দলের একটা গ্রুপের সাথে ছিল। এই সময় একদিন মুসা আর জব্বারকে তারা ধরে ফেলে। গ্রুপের ছেলেরা হিন্দু কমরেডদের অনুরোধে নাকি তাদের হাতেই দুজনকে ছেড়ে দেয়। যে গলুইয়া খোলার মেলায় তারা একদা যথেচ্ছাচার করে সংখ্যালঘুদের নির্যাতন করত, সেখানেই একটা অশ্বত্থ গাছের নীচে কি এক দেবীস্থানে ওদের হাড়িকাঠে ফেলে নাকি বলি দিয়েছিল অমলেরা। জব্বারদের বলি দেবার সময় নিশ্চয়ই আহ্‌মেদ মোল্লার কথা মনে পড়েছিল বোসউয়ার। আমাদের ঐ অঞ্চলের মানুষদের স্বভাবানুযায়ী মনে পড়াটাই স্বাভাবিক।

— চৌত্রিশ —

তৎকালীন আমার এই হতভাগ্য মাটির আর একটি ঘটনার উল্লেখ করব এবং পাঠক সাধারণের জ্ঞাতার্থে দলিল রাখব, কীভাবে আমার সেই চমৎকার ভূখণ্ডে মানুষেরা মানুষের দ্বারাই চূড়ান্ত অবনমিত এবং অপমানিত হয়ে প্রায় শূন্যে বিলীন হয়ে গেল। অবক্ষয়েরও বোধ করি কিছু নিয়ম থাকে। তারও আর্থ সমাজ তথা প্রাকৃতিক কিছু নির্বন্ধ থাকে সে সূত্র ধরে সন্ধিৎসু জনেরা সেই অবক্ষয়ের কার্যকারণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত

করতে পারেন। কিন্তু এই স্থানের অবক্ষয় এবং তজ্জনিত সন্তাপের কার্যকারণ সূত্র এত জটিল যে খুব সাধারণ রেখায় তাকে অবয়বে আনা যায় না। এই অবক্ষয়ের কোনও বিধ্বংসী মাতৃবর্ণও নেই, নেই কোনও ধ্রুবপদী সুর। কিংবা কোনও স্বাভাবিক গ্রামীণ লোক-পরম্পরায় ছন্দে বা পটের চিত্রেও তা এতাবৎ কোনও পটুয়া, ভাটিয়াল অথবা ভাওয়াইয়া রমণী বা পুরুষ এর কোনও রোদসী চিত্র বা সুর সৃষ্টি করেছেন, এরকম অভিজ্ঞতাও আমার নেই। এ এক অভিশাপ মুখর সময় সম্ভবত, যখন, লোকশিল্পীরা পর্যন্ত এর চিত্র, সুর, কথকতা বা কোনও কিছুই ধরে রাখার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না, অথবা তার ফুরসতও পান না। বোধহয় তখন একদিকে লোভের লুণ্ঠন, আরেকদিকে আতঙ্কের পলায়নই শুধু ছবি। কিন্তু হায়! এরকম ছবিতে কি কোনও শিল্পী মাতৃবর্ণ দ্যাখে? অথবা কোনও লোকশিল্পী কি কোনও সুরের বুনোট করতে পারে? এ যে স্বদেহ কণ্ডুয়ন করে পায়ের আঙ্গুল থেকে শুরু করে স্বদেহ ভক্ষণের চিত্র। এ নিয়ে কিছু সৃজন করা তো—অবক্ষয় নিয়ে নির্মাণ। অবক্ষয়ের রূপকল্প কি জীবনধর্মী শিল্পীরা করতে পারেন?

যেমন এখন এই সময়কার যে ঘটনাটির বিবরণ দেব, শিল্পরসিক সজ্জনেরা বলুন এর সুর বা চিত্র সৃজন করা কি একজন শিল্পীর পক্ষে সম্ভব? না, তা আদৌ করা সঙ্গত। সে শিল্প তো রসগ্রাহীকে ক্রমশ এক উষর প্রান্তরের তীব্র যন্ত্রণায় দগ্ধাবে। —তথাপি এ বোধ হয় আমাদের ভবিতব্য এবং তাকে আমাদের গ্রহণও করতে হবে। শিল্পীর যেমন এক্ষেত্রে অব্যাহতি নেই, তেমনি আমরাও, যারা শ্রোতা বা দর্শক, তারাও এই যন্ত্রণাকে এড়াতে পারিনা।

ডাক্তার বাড়ির কথা শুরুয়াতে অনেকই বলেছি। কিন্তু সে বাড়ির মেয়েদের বিষয় যাই কিছু আলোচনা করে থাকিনা কেন, তারা যে একেবারে স্বৈরিণী জীবনে চলে গিয়েছিল, একথা নিশ্চয়ই বলিনি। তাদের ঐ শহর থেকে আসা তথাকথিত মামাদের বিষয়ে ব্যাপারটি ছিল পারিবারিক প্রয়োজন এবং তাদের যৌবনিক প্রদাহজনিত সমস্যা। পারিবারিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রটি তৈরির দায় তাদের ছিল না অবশ্যই। সেক্ষেত্রে সে দায় তাদের অভিভাবক-অভিভাবিকাদের, যৌবনিক প্রদাহের দায়ে, এসব ক্ষেত্রে ঠিক কাকে যে দায়ী করা সমীচীন তা জানিনা। কিন্তু এখন যে কাহিনীর বিন্যাস করতে যাচ্ছি তার সাথে যে রাষ্ট্রিক ব্যবস্থাপনার যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ, একথা সকলেই মানবেন। কারণ এইসব লোচ্চা, লম্পট এবং লুম্পেনদের সেসময় রাষ্ট্রই ছেড়ে দিয়েছিল সংখ্যালঘুদের অবশিষ্টতম মানুষদের উচ্ছেদকল্পে। এটা ছিল একটা জঘন্যতম সময়।

আমাদের খানাবাড়ির চৌহদ্দিতে যে ধোবার বাড়িটি ছিল, সেখানে আশপাশ জনেদের বেশ একটা আড্ডার ব্যবস্থা ছিল। ঐ বাড়ির ধোপানিবুড়ি ছিল এলাকার ধাইমা। তার চিঁড়ে, মুড়ি, ছোলা, বাদাম ভাজার ব্যবসাও ছিল। আর ছিল দুধের ব্যবসা। ফলে ওখানে সব সময়ই বেশ জনসমাগম ঘটত। দুপুরের দিকে সাধারণ মেয়ে বৌয়েরা, কাম কাজ শেষ হলে ধোপানির সামনের দলুজে গল্পগাছা, লুডো, বাঘবন্দি খেলায় সময় কাটাতো।

ঐসময় পুরুষরা সেখানে যেত না সাধারণত। ব্যাপারটা প্রায় একটা অলিখিত নিয়মের মতোই ছিল বহুকাল ধরে। ওপারের তারুলি এবং আমাদের এপারের পাশের গ্রাম নৈকাঠির মুসলমান ছেলেমেয়েরাও সেখানে প্রায়ই আসত। ধোপানি ছিল খুব খরজিহ্ব রমণী এবং তার এখানে কোনওরকম চঞ্চলতা প্রকাশ করতে কেউ সাহস পেতনা।

ডাক্তারবাবুর এক মেয়ে যাকে আমরা কুট্টিদি বলে ডাকতাম সে একদিন এরকম এক দুপুরবেলায় ধোপানির বড় বৌ-এর সাথে দলুজে পাতা চাটাই-এর উপর বসে লুডো খেলছিল। ধোপানি আমাদের বড় দিঘিটির শান বাঁধানো ঘাটলায় বোধহয় ধান শুকোতে গিয়ে থাকবে। আমি মুড়ি না কি আনতে গিয়েছি, কুট্টিদিদের লুডো খেলতে দেখে আমিও বসে গেলাম। আমরা যখন খেলায় বুঁদ, তখন সেখানে পাশের গ্রামের মালেক আসে হঠাৎ। সে মোটামুটি অবস্থাপন্ন বাড়ির ছেলে। ইস্কুলের গণ্ডি পেরিয়েছে। পরিচয়ে তালুকদার, তবে এই তালুকদারি যতটা পদবী ততটা শব্দার্থগত নয়। এরকম তালুকদার তখন আমাদের ওখানে আনায় গণ্ডায় তৈরি হচ্ছিল। প্রকৃত তালুকদারির সাথে এই পদবীর বিশেষ কোনও সম্পর্ক ছিল না। কেউ কোনও উপায়ে খানিকটা সম্পন্ন হলেই গাঁয়ের লোকেরা তাকে তালুকদার বলত। সে যাহোক, মালেক ওই সময়কার নিয়ম অনুযায়ী বেশ তালেবর। তার সম্পর্কে নানান কানাঘুষো শোনা ছিল আমাদের। তার হাবভাবে আমাদের উভয় সমাজের মেয়েরাই বেশ সন্ত্রস্ত থাকত। মালেক আসতে তাই, কুট্টিদি এবং ধোবাবৌ দুজনেই একটু আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। দলুজের সামনের অংশে একটা ঢেঁকি পাতা ছিল। সে সেটার উপর এসে বসে খুবই অন্তরঙ্গের মতো জিজ্ঞেস করে, —ধোপাদিদি নাই? গেছে কৈ? —ধোপাবৌ কোনও রকমে জানায় যে সে ঘাটলায় ধান শুকোতে গেছে। একথার পর, ধোপানির সাথে প্রয়োজন থাকলে তার সেই ঘাটলায় যাওয়াই সঙ্গত। কিন্তু সে হঠাৎ ঢেঁকি থেকে নেমে চাটাইয়ে বসে এবং—'ও তোমরা বুজি লুডু খ্যালতে আছ? মোরও লুডু খেলা খুব ভাল লাগে। হেই ছোডবেলা এ্যারগো বাড়িতে কত খেলছি।' —বলে কুট্টিদিকে ইংগিত করে। ধোবাবৌ—মুই এট্টু ঘাডের থিহা আই, বলে আড়ালে চলে যায়। তখন আরও বিব্রত অবস্থা। কুট্টিদি আর আমি না পারছি খেলতে না পারছি উঠে যেতে। অথচ মালেক তখন কুট্টিদির সাথে খেজুর আলাপ করেই যাচ্ছে। যেন সে কুট্টিদির কত আপনজন। —'ডাক্তারবাবু আছেন ক্যামন? হেনারে অনেক দিন দেহিনা।' —'বড় বুইনের বিয়াডা তোমরা কৈলম ভাল দেও নায়। বিপনা দাস হ্যার থিহা কোমছে কোম পোনারো বছরের বড়। এরহম বুড়া জামাই লইয়া হে করবে কি?'—এইসব কথাবার্তা এবং ইংগিতপূর্ণ চোখ টিপুনি। আবার এই কথার সূত্র ধরেই,—'তোমারওতো বিয়াডা এহন দেওয়া লাগে। ডাক্তারবাবু যে কি করেন বুজিনা। দিনকালের যা অবস্তা, এ্যারপর তুমি যুদি বেজাতের লগে বাইর আইয়া যাও, তহন কি তোমারে দোষ দেওয়া যাইবে? তোমারওতো এট্টা ঐযারে কয় শরীল অর্থাৎ কিনা শরীলের উশুল মাশুল আছে।'—কুট্টিদি প্রথম দুএকটা প্রশ্নের হুঁ হাঁ গোছের উত্তর দিয়ে উঠে পড়ার চেষ্টা

দেখে। কেননা মালেক ক্রমশ অদম্য হয়ে উঠতে থাকে। কিন্তু তাতেও পরিত্রাণ নেই। —'কি বাড়ি যাবা? লও মুইও ঐ দিগেই যামু ঠিক করছি। এক লগেই যাই। আরে শরমাও ক্যান্? মোরা বেজাত বলইয়া কি একলগে দুই পাও হাঁটতেও পারুম না? কি যে চুৎমারানইয়া সোমাজ তোমাগো!'—বলে সে উঠে দাঁড়ায়। আমি বাল্যাবধি এই ধরনের মানুষের হারামজাদাপনার কাণ্ড দেখতে অভ্যস্ত। ঐ ঘটনার সময় খুব ছোটও নই, অন্তত মানসিক দিক দিয়ে। মালেক উঠে তার সাথে চলতে শুরু করে। ধোবার বাড়ি থেকে কুট্টিদিদের বাড়ি যাবার পথ খুব কম নয়। তাছাড়া সে পথ নির্জন এবং জংলা। মাঝে মাঝে আম, জাম, তেঁতুল বা বট অশ্বত্থের ব্যাপক বাগান এবং ছাড়া ভিটা। সেখানে কুট্টিদির মতো একজন সুগঠিতা যুবতীকে একা অরক্ষণীয়া পেলে ভোগ করার আকাঙক্ষা শুধু মালেক গুণ্ডা কেন অনেক সচ্চরিত্র যুবকেরও হতে পারে। অবস্থার গতিকে আমি হতভম্ব। কুট্টিদি তখন দৃষ্টিপথের মধ্যে এবং প্রায় ছুটছে। মালেক তার পিছে। যেন বাঘ তাড়া করছে হরিণীকে। 'অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।' হরিণীর মাংসই তার শত্রু। ধোবাবৌ-এর হঠাৎ আবির্ভাবে আমার হতভম্বতা কাটে। সে বলে, ভাই, তুমি লগে লগে যাও। আইজ না জানি কি কাণ্ড ঘটে। মালেকইয়া কৈলম একছের মালউয়া। অর কোনও বিশ্বাস নাই কিন্তু।—আমি একটু পা চালিয়েই চলছিলাম। কিন্তু আমার কাছে এটা পরিষ্কার ছিল না যে কোনও অঘটন ঘটলে আমি মালেকের সাথে কি ভাবে লড়ব। আমাকে দেখে মালেক বলে, বড়গো ব্যাপারের মইদ্যে ছোড়রা ক্যান্? তুমি বাড়ি যাও। অর লাগে মোর ম্যালা কতা আছে। —আমি শুধু এটুকু বলতে পেরেছিলাম—কুট্টিদির লগে তোমার কোনও কতা নাই। দ্যাহনা, হে ক্যামন ডড় পাইয়া দৌড়াইতে আছে। তুমি হ্যার লগে কতা কবা না, কইয়া দিলাম হ। সে অদম্য, বলে, —কমু না ক্যা? হ্যার লগে মোর ভাব। তুই লগে লগে আও ক্যা? তোর ঠেহাডা কি? এই বলে সে ছুটে এসে আমাকে বেধড়ক কিলঘুষি মারতে শুরু করে। আমি হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে হতচকিত বনে যাই। কুট্টিদি ছুটতে থাকে। মালেক চেঁচিয়ে বলে, —আইজ পার পাইলেও আমি তোমারে উডামু, এডা জানইয়া রাহ। আইজ এই মালাউনের পোয়রে এট্টু দেইখ্যা লই। —এইসব কথার সাথে সাথে আমার উপর তার আক্রমণ তীব্র হলে, আমি পরিত্রাণ খুঁজি। আশেপাশে কেউ নেই। এই হুড়াহুড়ির সময় একখণ্ড বাঁশের টুকরো আমার সামনে পড়ে। একতরফা মার খেয়ে এবং কুট্টিদির ঐ অসহায়তা দেখে তখন আমার মাথায় খুন চেপে গিয়েছিল। ঐ বাঁশের টুকরোটো হাতে পেয়ে আমি মালেককে অন্ধের মতো আক্রমণ করেছিলাম। একটা আঘাত তার পা লক্ষ্য করে চালালে সে বসে পড়ে। বোঝা যায় তার খুবই লেগেছে। এই সুযোগে আরও গোটা দুই ঘা মেরে ছুটে পালিয়ে যাই। কুট্টিদি ততক্ষণে তাদের বাড়ি পৌঁছে গেছে।

ব্যাপারটা মারামারি পর্যায়ে চলে না গেলে হয়ত কাউকে বলতাম না। কুট্টিদিও খুবই স্বাভাবিক কারণে আমাকে চুপ থাকতে বলেছিল। কিন্তু আমি যেহেতু মার খেয়ে

পাল্টা মেরে বসেছিলাম এ কারণে বড়দের ঘটনাটা জানানো প্রয়োজন ছিল। আমি ঘটনাটা প্রথমে আমাদের প্রতিবেশী এবং জ্ঞাতি কোবরেজ কাকা এবং তারপর ধোপাঝিকে বললাম। ধোপানিকে আমরা ধোপাঝি বলেই ডাকতাম।

কোবরেজ কাকা একজন বেশ অকুতোভয় মানুষ ছিলেন। তাঁর এই অকুতোভয়তার প্রথম কারণ তাঁর পেশা এবং দ্বিতীয় মস্তিষ্কে সূক্ষ্ম বোধের অভাব। পেশায় যেহেতু কবিরাজ এবং আমাদের ওখানে পাশকরা ডাক্তার যেহেতু আদৌ ছিল না, সে কারণে আমাদের উভয় সম্প্রদায়ের কেউই ডাক্তার, কোবরেজদের ঘাঁটানো সুবুদ্ধির বলে বিবেচনা করত না। তাছাড়া কোবরেজ কাকা প্রায়শই সামাজিক দুর্নীতি আর ধোঁকাবাজির বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করতেন। যাত্রা থিয়েটার করার দিকে কাকার খুব ঝোঁক ছিল এবং নিজেকে একজন অসামান্য অভিনেতা মনে করতেন। রোগা লম্বা চেহারার এই কোবরেজকাকা, আমাদের ছোটবেলায় খুবই আকর্ষণীয় ছিলেন সবার কাছে। সব চেয়ে মজার ছিল নাটকীয় ঢঙে তাঁর স্বগতোক্তিগুলো। মাঝে মাঝেই শুনতাম তিনি বলে যেতেন, —আমার লগে চালাকি চলবে না। আমি জাত বৈদ্য, কবিরাজ, রোগী দেহাইতে আবানা, অষুদের বদলে বিষ দিয়া দিমু হ্যানে, দোয়াদশ দণ্ড কাল তড়পাইতে তড়পাইতে মরবে। মোর একগাছ লোমও ছেড়তে পারবে না কেউ, হ। —কাকে বলতেন, কেনই বা বলতেন ঠিক বোঝা যেত না। তবে তাঁর যে অদম্য সাহস ছিল তার তুলনা নেই। দাঙ্গা ফ্যাসাদ, চুরি ডাকাতি, বিষয়ে তাঁর কোনো চিন্তা বা দুর্ভাবনা ছিল না। দাঙ্গার ভীতি যখন তুঙ্গে তখনও তাঁর বক্তব্য—আউক না কাটতে, একছের পার পাইয়া যাইবে, হেয়া পারবেনা। মরতেই যদি অয় এক আদ্‌টারে মারইয়াই মরুম।—দেশ ছাড়ার কথা কেউ বললে খুব খেপে যেতেন। বলতেন,—ক্যান? দ্যাশটা ক্যাওর বাপের একলার? যেসব মানুষ সোজা সরল বুদ্ধির, আমার মনে হয় তাঁরা একটু বেশি স্পর্শকাতর হন। তাঁদেরই নানান কারণে নানান মর্মবেদনা বেশি ভোগ করতে হয়। কোবরেজ কাকা একটু ছিটেল্‌ও ছিলেন।

কবিরাজি ব্যবসায়ে তাঁর পসার ছিল না, কিন্তু হাতযশ ছিল। অবস্থাপন্নরা তাঁকে খুব একটা ডাকতেন না, কিন্তু গরিব গুর্বোরা হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে তাঁর উপর খুবই নির্ভর করত। তিনিও এইসব মানুষদের রোগ ব্যাধি. বিপদ আপদে ছুটে যেতেন। একারণে তাঁর একটা প্রতিপত্তি ছিল তাদের মধ্যে। আমার জেঠামশাইকে তিনি শত্রু মনে করতেন, কিন্তু বাবাকে খুব ভক্তি করতেন! তবে আড়ালে যাই বলুন, জেঠামশাইকে সামনাসামনি কখনওই কিছু বলতেন না।

আমি তাঁর কাছে গিয়ে কুট্টিদির ঘটনাটি বলতে কাকা ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে সম্ভবত ছেলের বৌ-এর কাছ থেকে কিছু শুনে ধোপাঝি সেখানেই এসে পড়েছে। কাকার সাথে তার এসব গূঢ় বিষয়ে প্রয়োজনে আলোচনা হত। এখন ধোপাঝিকে দেখে কাকা আগুন। বললেন,—আমি মালেকইয়ার রক্ত দশশন করুম একথা তোরে কইয়া দিলাম 'ছুডি'। ও হালার পো হালায় ভাবছে কি, অ্যাঁ? আমরা

মরইয়া গেছি?—ধোপাঝি অর্থাৎ 'ছুডি' বা ছোটি আমাকে দেখিয়ে বলল যে আমার উপর মালেকের আক্রোশ পড়তে পারে কারণ সে দেখেছে মালেক খোঁড়াতে খোঁড়াতে গেছে। আমার কপালের সামনেটা বেশ ফুটে উঠেছিল। কাকা বললেন, ওতো আত্মরক্ষা করছে। ওরে মালেকইয়া মারলে ক্যান? —ধোপাঝি বলল—কতা হয়ত্য, তয় এ ব্যাপারে ছোডবাবুর লগে বন্দেজ না করইয়া কিছু কওন ঠিক না। লয়েন মোরা হ্যার লগে এট্রু বন্দেজ করইয়া দেহি।

কোবরেজ কাকা বাবার নিতান্ত ন্যাওটা, একথা আগেই বলেছি। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজি হলেন যে, হ্যাঁ এটা একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এবং বাবার সাথে এবিষয়ে পরামর্শ করা কর্তব্য। বাবা অবশ্য তাঁর চিৎকার চেঁচামেচি শুনে ততক্ষণে ধারণা করে নিয়েছেন যে কিছু একটা বিপত্তি ঘটেছে। 'নইলে পাগল চেচায় ক্যান্?' কাকা ধোপাঝিকে নিয়ে আমাদের বাড়ির দিকে রওনা দিলে আমি স্বাভাবিক ভীতিবশত আড়ালে চলে গেলাম। কাকা বলতে বলতে চললেন, বোজলানি ছুডি, ঐ শাস্তরে যে কইছে, হে কতা একশো ভাগ হয়ত্য-কি? না—

শ্যাহের লগে করবা দোস্তি
মুগইর রাখফা মদ্যস্তি
যদি শ্যাখ রোহে
মুগইর মারবা কোহে।—

পশ্চিমবঙ্গানুবাদে অবশ্যই সব 'হ' গুলো 'খ' হবে। কাকা বলতে বলতে যাচ্ছিলেন, মেয়াগো দ্যাশে থাকতে অইলে এ মন্তর ছাড়া উপায় নাই। হালারা আসলেই হুদা শ্যাখ। —আমি বাবার সামনাসামনি গেলাম না। কাকা আর ধোপাঝি বাবার সামনে হাজির। বাবা দরদালানে একটা চৌকির উপর যেমন বসে থাকতেন, বসেছিলেন। দুজনকে দেখে বললেন,—কিছু এট্টা ঘটছে বোজতে পারছি। কিন্তু তুই চেচাইতে আছিলি ক্যান্? —কাকা বললেন,—চেচামু না, আপনে কয়েন কি? মালেকইয়া হালার পো হালায় কুট্টিমনুরে টালায়। আর হ্যার পিরতিবাদ করতে যাইয়া আমাগো পোলায় মাইর খায়? এ্যাতোবড় সাহস! —কাকা সাতিশয় ক্রুদ্ধ। বাবা তাঁকে আর কিছু জিজ্ঞেস না করে ধোপাঝিকে বিস্তারিত বলতে বলেন। ধোপাঝি বাবাকে গোটা ব্যাপার খুলে বললে বাবা কোবরেজ-কাকাকে জিজ্ঞেস করেন—তুই করতেডা চাও কি?

: মালেকইয়ারে পিডামু।

: হেথে লাভ? তুই আইজ হ্যারে পিডাবি, হে কাইল তোরে পিডাইবে। কুট্টিমনুর কথাডা চিন্তা করছ? এই মাইর পিটে হ্যার সোমস্যাডা কি অইবে? তুই এট্টা আস্থা পাডা।

: তয় করণ কি?

: করণ, মাইর খাওয়ানো। মালেকইয়ারে হ্যার জাতের মাইনষের হাতে ছ্যাঁচা দেওন লাগবে। বোজঝো। চেচাবিনা, কায়দায় চলার সোমায় এহন। চেচাইলে এই বুড়াবয়সে

আমার হাতেই মাইর খাবি। —কাকা এবার একটু দমিত। কারণ বাবার কথার উপর তিনি কথা বলেন না। ধোপাঝি ছোটবাবুর রীতকানুন জানে। সে বলে, —ছোডো বাবুর বুদ্ধিই ঠিক, আর হে বেবস্তা মুইই করমু হ্যানে। এস্তাজ আর নুরুলেরে কমু হ্যানে ওপারের কয়েকজনেরে লইয়া য্যান্ মালেকইয়ারে খাসী বানাইয়া দে। —একথা অতি ভয়ঙ্কর। এরকম প্রতিশোধ শুধু আমার এই চন্দ্রদ্বীপ অঞ্চলের সেলিমাবাদ পরগনায়ই স্বাভাবিক। বাবা জানেন ধোপাঝি একাজ করাতে অবশ্য সক্ষম, কেননা এস্তাজদ্দি এবং নুরুল, এই দুই বাপ বেটাকে সে যা করতে বলবে, —তারা তা করবে। তার সবিশেষ কার্যকারণও আছে। এস্তাজ তার 'হাত্উয়া' আর নুরুল এস্তাজের পোলা। দুজনেই 'কাজইয়ায়' বেশ দড়। তাই বাবা সাততাড়াতাড়ি—না না না অতডা না। তুই আগে আমার পরামশ্শডা শোন, তারপর কি করতে অইবে ঠিক করবি। —তারপর তিনজনে কিসব পরামর্শ হয় গোপনে, যা আড়ালে থেকে আমি ঠিক শুনতে পাইনা। তবে বুঝতে পারি মালেকের অদৃষ্টে আমার প্রহারই শেষ প্রহার নয়। তার কপালে একটু অধিক 'মাইর' অপেক্ষা করে আছে এবং সেটা অকস্মাৎ আসবে তার জাতভাইদের তরফ থেকেই। এর বেশ কয়েক দিন পর শোনা গেল, গঞ্জ থেকে ফেরার পথে মালেককে কে বা কারা যেন তার বাড়িতে অচেতন অবস্থায় পৌঁছে দিয়ে গেছে। তারা বাড়ির লোকদের বলেছে যে 'খালপারে পড়ইয়া আছেলে, বাড়ি দিয়া গেলাম।' মালেকের ডান পা'খানা সারা জীবনের মতো অকেজো করে দিয়েছিল তার আক্রমণকারীরা। পরে বুঝেছি, তালুকদারি বুদ্ধির এই প্যাঁচটা বাবার মাথায়ও খেলত। তবে জেঠামশায়ের মতো এটা তাঁর পছন্দের বস্তু ছিল না। নুরুল বলেছিল, —বোজলা কিনা আঘারউয়া ষাড় আর মালউয়া মন্দেগো ওষুধ এট্টাই, বাশের চাচ্ দিয়া আড়ইয়া বিচি দুইডা তোলাইয়া দেওয়া। তয় ছোডবাবুর নিষেদ, হে কারণ খালি ঠ্যাংডাই ল্যাংড়া করইয়া দিলাম।

— পঁয়ত্রিশ —

অনেকদিন আগের পুরোনো কথার পসরা নিয়ে বসেছি। সব কথা একক একটি নির্দিষ্ট ক্রমে সাজানোর স্মৃতি-প্রবহণ নেই আর। পিছনের দিকে যতদূর সম্ভব দৃষ্টি প্রলম্বনের চেষ্টা সত্ত্বেও এক অনিবার্য কুয়াশা তার তাবৎ অস্তিত্বকে আচ্ছন্ন করে এলায়িত বিশৃঙ্খলায় তাকে বিপর্যস্ত করে ফেলে। কখনও এমনও বোধহয় এসব তো এই সেদিনের ঘটনা। এরই মধ্যে কি মহাকালের রথচক্র এতটা পথ অতিক্রম করেছে? কালের গতি অবশ্যই অতি কুটিল।

কিন্তু জীবন তো থেমে থাকেনা। তার অবিরাম প্রবাহই কালের গতিকে অস্তিত্বমানতায় সত্যগ্রাহ্য করে তোলে। নচেৎ কালের আর কীইবা অবয়ব আছে? জীবনের সেই চলমানতাকে আশ্রয় করে, তার কিছু কিঞ্চিৎ পদচিহ্নের ছবি যারা ফুটিয়ে তুলতে চাই, তাদের প্রদোষকালীন কুয়াশাকে নবীনেরা অবশ্য ক্ষমা করবেন, এমত

প্রত্যাশা। আমরা কুয়াশাচ্ছন্নরা শুধু উচ্চারণ করতে পারি— তেহিনো দিবসা গতাঃ।

কিন্তু সেকথা উচ্চারণ করার সময় যখন দেখি বড় খাল পারের ঐ পিতামহ পিতামহী সদৃশ বৃক্ষ দম্পতি এখনও সজাগ সতর্ক—তখন এ উচ্চারণ স্তব্ধ হয়। এক অনির্বচনীয় কারণে মৌনমূক হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয় সেই কুলপতি, কুলপত্নী দম্পতির দিকে। তাঁদের বয়স দুই শতক ছাড়িয়ে আর খানিকটা। তাঁরা বাক্য বলেন না। ইশারা ইংগিতে পাতা ঝরিয়ে শাখা কাঁপিয়ে নির্দেশ জারি করেন। "প্রাকৃতিক নির্বন্ধের মধ্যে আমি নিদর্শন রেখেছি তোমরা সেখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর।" ঐ কুলপতি বৃক্ষ দম্পতি তো আমাদের অহি নির্দেশক প্রাকৃতিক নির্বন্ধ। আমরা কেন তাদের কথার বা ইচ্ছার মান্যতা দিচ্ছি না?

কোরান পুরাণের কথা ছেড়ে দিলেও একটা সত্য তো জানতে মন চায়ই, — তাহলে কী? কিন্তু সেই দার্শনিক প্রশ্নের ক্ষেত্র এ নয় এবং অতঃপর আমরা এ বৃক্ষ দম্পতিকে স্থিতিশীল মেনে নিয়েই পরবর্তী কথকতাতে যাব।

যে কথাগুলো এখন বলতে যাচ্ছি তার অধিকাংশই একান্ত ব্যক্তিগত জীবনের সংগ্রামের কথা। জগৎ সংসারে একথায় হয়ত কারও তেমন কোনও প্রয়োজন নেই। তথাপি বলছি একারণে যে, একটি সাম্প্রদায়িক দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছেলেকে কী ভাবে সেদিন তার বাঁচার পথ তৈরি করতে হয়েছিল তার খানিকটা পরিচয় হয়ত এ আলেখ্যে পাওয়া যাবে। সংখ্যালঘুরা তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক অর্থে শহরে, নগরে এবং গ্রামে, সেসব দিনে কী বোঝাতো তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বিশদ জানবেন না। তখন শহর নগরে শিক্ষিত, কলেজ ভার্সিটির ডিগ্রিধারী হয়েও হিন্দু যুবকেরা কোনও সরকারি সংস্থায় কর্ম পাবার অধিকারী নয়। ব্যবসার ক্ষেত্রে, তাদের ওপর নজরদারি, যেন তারা মুনাফার অর্থ হিন্দুস্থানে না পাঠাতে পারে, যদিও তখন তাদের গেরস্থালি এপার-ওপারে স্বাভাবিক ভাবে বিভাজিত এবং অর্জিত অর্থের বিভাজন নৈতিকভাবেই অবশ্য কর্তব্য। আলেখ্যের পাঠক/পাঠিকাদের উদ্দেশে জানাই তখনকার সামাজিক রীতি অর্থাৎ আত্মীয় প্রতিপালন, কর্তব্য করণ ইত্যাকার বিষয় সমূহ অধুনাকার নিয়ম থেকে ভিন্নতর বোধে এবং অভ্যাসে/নিয়মে ছিল। যৌথতার মূল্যবোধ তখনও বাস্তব। অতএব, রাষ্ট্রীয় নিয়ম সেক্ষেত্রে যে পর্যায়েই থাকুক, সামাজিক নিয়মের সাথে তার ভিন্নতা ছিল। ফলে এই দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকেরা, এবিষয়ে বিশেষ সংকটে আকুল ছিলেন। মনে রাখতে হবে, বিভাজিত মাতৃভূমির এই পূর্বপ্রান্তে পশ্চিম প্রান্তের মতো Re-patriation ব্যাপারটি ঘটেনি। শুধু কিছু বিশেষ পরিবার সম্পত্তি বদল করে নিজেদের স্বার্থ বজায় রেখেছিলেন। নচেৎ, তুমি কার, কে তোমার? ইত্যাদি।

হিন্দুজনেরা, যারা পঞ্চাশ-একান্নর গণহত্যা সত্ত্বেও এখানে মাটি কামড়ে পড়ে ছিল। তারা দাঙ্গার আতঙ্ককে গুরুত্ব না দিয়ে 'লড়েই থাকব'—একরম এক মানসিকতার অধিকারী ছিল। এর কারণ ছিল এই যে পিছারার খালের জগতে দাঙ্গা বলতে যা

বোঝায় তা বিশেষ ঘটেনি। সেখানে একটিও খুন দাঙ্গাজনিত কারণে হয়নি, হয়নি তেমন বলাৎকারও। শুধু অন্যান্যস্থানের গণহত্যা, ধর্ষণ, খুন, রাহাজানি, অগ্নিসংযোগ ইত্যাকার বিষয়ের ঘটনা, তথা গুজবের জন্যই—এ অঞ্চল শূন্য হতে থাকে। এ অঞ্চলের মুসলমান সম্প্রদায়, যেহেতু বহুকাল থেকে হিন্দু সামন্ত এবং উচ্চবিত্তদের মুখাপেক্ষী ছিল এবং তাদের ইসলামে রূপান্তরিত হওন খুব দীর্ঘ দিনের ঘটনা ছিলনা, তাই তারা অন্যস্থানের মতো হিন্দু বিদ্বেষী হিসেবে প্রতিভাত হয়নি। তথাপি যে তাদের ভয়ে ভদ্র হিন্দু সমাজ ভীত হয়েছিল, তার কারণ নিহিত ছিল হিন্দু সমাজের নিজস্ব সমাজ-নিয়মে।

কিন্তু সামাজিক জটিল নিয়মে এই সাধারণ মুসলমান শ্রেণীই বোধহয় ভদ্রহিন্দু গেরস্থদের দেশত্যাগ জনিত কারণে আখেরে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাদের রুজিরোজগারের উপর, চাষবাস গেরস্থালির উপর এক অকস্মাৎ অশনিঝঞ্ঝা বয়ে গেল যেন। এরা, অর্থাৎ এই সাধারণ অপবর্গী মুসলমান নমঃশূদ্র ইত্যাদিরাই ছিল আমার ঐ অঞ্চলের ভূমিপুত্র তথা মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রজাসাধারণ। রাষ্ট্রীয়কল্পে যেসব ঘটনা ঘটে গিয়েছিল, তারা তার মর্ম কিছুই বুঝতে পারেনি। ফলত, তারা, এই দক্ষিণপূর্ব সমতট বঙ্গে প্রাক্তন বিশ্বাসেই বহুকাল স্থায়ী ছিল। তারা নিমকহারাম এবং নিমকহালাল, ইসলামের এই দুটি আদর্শকে এক অসম্ভব বিশ্বাসে হৃদয়ে পোষণ করত। কুখ্যাত বরিশাল রায়ট বা দাঙ্গায় এদের বিশেষ ভূমিকা ছিলনা। অবশ্যই কিছু উগ্রমনুষ্যের কথা সর্বদাই স্বতন্ত্র। হিন্দু উচ্চ বর্ণীয়দের প্রাক্তন কৃতকর্ম এবং উঠতি কিছু উচ্চাভিলাষী মুসলমানদের ষড়যন্ত্র এই দাঙ্গার জন্য দায়ী একথায় কোনও মিথ্যাচার নেই। এই হিন্দুদের পরিত্যক্ত বাড়িঘর, জমিজেরাত ইত্যাদি সম্পত্তি দখল করা যত সহজসাধ্য ছিল, তার সংরক্ষণ অথবা ভবিষ্যত উন্নতির বন্দোবস্ত করা তত সহজ ছিলনা। দখলকারীরা যতদিন সম্ভব এইসমস্ত বাগান, বাড়ি, পুকুর ইত্যাদির উপজসমূহ ভোগ করার পর যখন স্বাভাবিকক্রমে এসবের বিনষ্টি হল, তার পুনর্নির্মাণ করতে সক্ষম হলনা। না হওযার কারণ এধরনের গার্হস্থ্য বিষয়ে তাদের শিক্ষার অভাব। একারণে একসময় এইসব উপজ দখলকারীরা কর্মহীন হয়ে পড়ল। চুরি, ডাকাতি এবং নৈরাজ্যের আধিক্য এসময় থেকেই ঘটতে লাগল। এই সময় থেকেই তারা, অর্থাৎ যারা 'পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনার' উপজে তার দখলকারী মালিককে সন্তুষ্ট করেও নিজেরা কড়ায় আনা রোজগার করছিল, তাদের সোনার ডিমপাড়া হাঁসটি মরে গেল। আর তারা তখন তাদের পোষকদের উপর লোভের তথা সহজ আয়ের থাবাটি উত্তোলন করল। তখন আর ধর্ম বা সম্প্রদায়ের ভেদ বিচার থাকল না। নিম্নবর্ণীয় হিন্দুদের মধ্যে যারা এদের সহযোগী হল একমাত্র তারা ছাড়া বাকি সবাই দেশত্যাগে উদ্যোগী হল। তাঁতিরা তাঁত বোনা বন্ধ করল, কারণ তাদের পুঁজি ডাকাতেরা লুট করে। কামারেরা লোহার কাজ কর্ম ছেড়ে দিল। যেহেতু কাজ করিয়ে কেউ মজুরির পয়সা দেয়না, শুধু চোখ রাঙায়। এইভাবেই তাঁতি, কামার, ছুতোর, কুমোর ইত্যাকার যাবতীয় পেশার সাধারণ মানুষ দেশ ছাড়তে শুরু করল।

কেন? না, তাদের আর থাকার উপায় নেই। তাদের রুজি রোজগারের উপর এক অচেনাভূত তার অন্যায় থাবা গেড়ে বসেছে। এইসব পেশাবলম্বনকারীরা ছিল এই প্রত্যন্ত বাংলার গ্রামীণ বিশ্বের স্তম্ভ স্বরূপ। একদা তারা, সম্প্রদায় নির্বিশেষে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পর্তুগিজ, মগ এবং অন্যান্য হার্মাদদের মুখোমুখি হয়ে লড়াই দিয়েছে, তথা নিজেদের মান, মর্যাদা, গেরস্থালি রক্ষা করেছে। আজ তাদের নিজেদের মধ্যে বিরোধ। কেউ কিছুই বুঝতে পারছেনা। কেন এমনটি হল?

যে ডাকাতদের সহায়তায় মুসলমান সমাজের লোভী উচ্চবিত্তেরা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করতে প্রয়াসী হয়েছিল, এখন তারা নিজেরাই এদের হাতে নিগৃহীত হচ্ছে। এ কারণে এরাও গ্রাম ত্যাগ করে একে একে শহর নগরে প্রবাসী হচ্ছে। সুন্দর সাজানো এই গ্রামগুলিকে এই ভাবেই আমি রিক্ত হতে দেখেছি এবং এই ধারা ক্রমান্বয়ীই হয়েছে।

আমার পরিবারের ব্যাপক জনগণ বহুকাল আগেই দেশ ত্যাগ করেছিল। রায়বাহাদুর দাদুর পরিবার মধ্যস্বত্বের শাঁস জলের ব্যাপক সারাৎসার নিয়ে দেশভাগের অনেক আগেই দেশান্তরী। তারা তাদের আখের গুছিয়ে নিয়ে যথাস্থনে 'রায় বাহাদুর'। যে সময়ের কথা বলছি তখন আমরা 'ব্যাং বাহাদুরও নই'। মধ্যস্বত্ব লোপের সাথে সাথে আমাদের অংশের আর্থিক ব্যবস্থা একটা কুৎসিত আকারে নখদন্ত বিস্তার করে আত্মপ্রকাশ করল। এইসময় এই পরিবারে আমাদের জন্ম, বাল্যকাল এবং কৈশোর। পরিবারের কেউ লন্ডনে পড়াশুনা করে, কেউ গ্রামে গোরু চরায়, এরকম এক অবস্থা, যদিও তারা একই পরিবারের সন্তান। কিন্তু এসব তথ্য তত্ত্ব চুলোয় যাক। বরং অন্য কথায় যাই। অন্য কথা এই যে আমার বাবা, বহুকাল আগের থেকেই নাকি জেঠামশাইকে বলেছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গের কোথাও পারিবারিক একটা স্থিতিস্থাপনা প্রয়োজন। জেঠামশাইও তালুকদারি থাকাকালীন সময়ে বর্ধমানের নীলপুরে বেশ কয়েক বিঘা জমির ব্যবস্থা করেছিলেন। উদ্দেশ্য, আমাদের দেশের বাড়ির মতোই বিরাট বিশাল আড়ম্বরে এক নারকেল, সুপারি, ধানমান, কলা, কচু সমন্বিত একটি সমৃদ্ধ গেরস্থালির পত্তন। জেঠামশাই বলেছিলেন যে সব কিছু গুছিয়ে দেশের সবাইকে বর্ধমানে পাঠিয়ে দেবার পরেও তিনি দেশেই থেকে যাবেন। দেশ তিনি ছাড়বেন না। যতদিন তা না হয়, ততদিন কলকাতার বাসায় পরিবারের ব্যাপক জনেরা থাকবে। কিন্তু জেঠামশায়ের সে সব গুছানো আর কোনওদিনই হয়নি। সে জমির গতি কী হল, তাও আমরা কেউ জানতে পারলাম না। জেঠামশাই অবশ্য শেষ পর্যন্ত দেশেই থেকে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের মা-বাবা, ভাই বোনেদের নিয়ে ভিখিরির মতো শূন্য হাতে পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছিলেন। অবশ্য তা অনেক পরের কথা এবং অন্য লড়াই-এর বৃত্তান্ত।

টেস্ট পরীক্ষার পর যখন বাড়িতে কিছুদিন ছিলাম তখন বাবার সাথে সাংসারিক কিছু কথাবার্তা বলার প্রয়োজন বোধ করলাম। কথাবার্তা বলতে আর কিছুই না, দেশের তদানীন্তন অবস্থা এবং তার প্রেক্ষিতে কর্তব্যাকর্তব্য। বোনেরা, ভাইয়েরা আস্তে আস্তে

বড় হয়ে উঠছে। তাদের, বিশেষত বোনেদের বিষয়ে কী করা যায়, সংসারের প্রয়োজন দিন দিন বেড়ে চলেছে, জিনিসপত্রের দাম ক্রমশ আকাশছোঁয়া হচ্ছে। বাবার চল্লিশ টাকা মাইনের চাকরি। তাও অনিয়মিত। সব মাসে মাইনে পাওয়াও যায়না। লোকেরা ধার কর্জ আর দিতে চায়না, তা ছাড়া দেবার মতো অবস্থার লোকই বা কোথায়? বোনেদের বিষয়ে অন্য বিপদের চিন্তাও উপেক্ষা করার নয়। যদিও তারা এখনও ছোট কিন্তু দুবছর/চারবছর বাদে তো তারা বড় হবে। তখন এই হিংস্র জনপদে তাদের কী ভাবে রক্ষা করব? অর্থাৎ সব দিক দিয়েই ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা এবং আতঙ্ক। এইসব নিয়ে বাবার সাথে কথা বলে বুঝলাম যে তাঁর নিজস্ব কোনও নির্দিষ্ট ধ্যান ধারণা এ ব্যাপারে নেই। সম্ভবত তখনও তিনি তাঁর দাদার উপর বিশ্বাস রেখে চলেছেন যে তিনি নিশ্চয়ই কিছু একটা করবেন। তাঁর এমত বিশ্বাসে আশ্বস্ত হতে পারলাম না। এর কিছুকাল আগে আবার কলকাতার যৌথ বাসাবাড়ি ভেঙে পরিবার ছত্রখান। ছত্রখান হবার প্রধান কারণ মধ্যস্বত্ববিলোপ এবং তালুকদারির পয়সার আনাগোনা বন্ধ। যদিও সেখানে তখন যতজন লোকই থাকুক, দুইজন কাকা এবং আমার বড় দাদা মোটামুটি ভাল চাকরি করেন। বাসাবাড়ির ভাড়া সামান্য, যদিও তার আয়তন বিরাট। দিদিদের তিনজনের বিয়ে হয়ে গেছে। এক জেঠতুতো দিদি এবং এক বোনের তখনও হয়নি। খুব একটা অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। তবু ভূতের বোঝা কে বয়? এক্ষেত্রেও ভূত আমার বাবা এবং তার বোঝা আমার পাঁচ দাদা। তাঁদের মধ্যে একজন রেলে কর্মরত। বাকিরা ছাত্র। শুনেছি বাড়ি ভাড়া বাকি পড়ার দায়ে এই বাসাটি অত্যন্ত অসম্মানজনক অবস্থায় উচ্ছেদ হয় এবং ভূতের বোঝারা ছাড়া বাকি সদস্য সদস্যারা নিজনিজ জনেদের নিয়ে সুবিধাজনক জায়গায় সুখের সংসার গড়তে চলে যান। শুধু ভূতের বোঝারা প্রায় বায়ুভুক নিরাশ্রয় অবস্থায় সেই সহায়সম্বলহীন মহানগরীতে ভাসমান।

এতসব কথা বলার কারণ, এই যে, আমাদের তৎকালীন মধ্যস্বত্বভোগী সমাজের বাবা কাকা জেঠাদের কর্তব্যজ্ঞান, কর্মবিমুখতা, স্বার্থপরতা কোন স্তরে নেমে এসেছিল, তারই নমুনা দেখানো। তখন যে সময় তাতে যৌথ সম্পত্তি থাকলেও যৌথ পরিবার ভেঙে পড়ছিল। এক্ষেত্রে তো যৌথ সম্পত্তিই লুপ্ত। অতএব ব্যক্তি বিশেষকে দোষারোপ করে লাভ নেই। শুধু আশ্চর্য বোধ হয় এই ভেবে যে, শুধুমাত্র খাস জমিগুলোর সুষ্ঠু ব্যবস্থা করার চিন্তাটা মাথায় থাকলেও, কি দেশের বাড়িতে, কী পশ্চিমবঙ্গে পরিবারটির দুর্গতির কারণ ছিলনা। কিন্তু আমাদের মতো পরাশ্রয়ী মধ্যস্বত্বভোগী পরিবারগুলোর ক্ষেত্রে এই জাতীয় নিগ্রহ যেন নির্ধারিত ছিল।

এইসময়ে দেশের বাড়িতে আমাদের অবস্থা যত খারাপই হোকনা কেন, মাথার উপর অন্তত প্রাচীন ছাদটি ছিল। আমার দাদাদের তাও ছিলনা। তাঁরা তখন এ-গলি সে-বস্তি করে করে খড় কুটোর মতো ভেসে বেড়াচ্ছিল। আমি তখন তার কিছুই প্রায় আন্দাজ করতে পারিনি। সেসময় নিতান্ত অল্পবুদ্ধি এবং বয়সও অল্প। উপরন্তু

নিয়ত দারিদ্র এবং অনাহারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে করে আমার মন মানসিকতা অত্যন্ত বিকৃত হয়ে পড়েছিল। তখনও আমি শহর নগর দেখিনি। সেখানে অসহায় ভাবে জীবন যাপনের সংগ্রাম কেমন হয়, সে বিষয়ে বাস্তব কোনও জ্ঞানও জন্মেনি। জন্ম থেকে একটা বদ্ধ অবস্থার মধ্যে বসবাস করার জন্য, ব্যাপক জীবনের বৃহৎ বা মহৎ কিছু সংস্পর্শে না আসার কারণে, বিশেষত কোনও সৎশিক্ষা না পাওয়ায় আমার মধ্যে কোনও স্বাধীন বিচারবুদ্ধি বা সুষ্ঠু কাণ্ডজ্ঞানের জন্ম হয়নি। যথাসময়ে ইস্কুলে পাঠানো হয়নি বলে বাইরের জগতের কোনও শিক্ষাই তখনও আমার লাভ হয়নি। বাড়িতে যে সব ধর্মপুস্তক, পুরাণাদি ইত্যাদি পড়তাম আর পাড়া প্রতিবেশী বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের কাছ থেকে চিরন্তনী উপদেশ পেতাম, সেসবই আমার চরিত্র এবং মানসিকতা গঠন করেছিল। বস্তুত ঐ সময়টায় আমি একটা কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ধর্মভীরু এবং অকারণ নীতিবাগীশ হিসেবেই বেড়ে উঠছিলাম। ইস্কুলে যাবার পরও আমার এই মানসিক বদ্ধতা দূর হয়নি।

এইসব কারণেই দাদাদের সেই দুর্দিনে, সেই অসহায় অবস্থায়, দেশ থেকে তাঁদের কত কুৎসিত চিঠিপত্রই না লিখেছি। পরে বুঝেছি আমাদের দেশের বাড়িতে যতই দুরবস্থা থাকুক না কেন, তাঁদের পক্ষে তখন কিছু করার কোনও উপায়ই ছিলনা। কিন্তু আমি অযথা বাক্যবাণে তাঁদের মনে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছি এবং কষ্ট দিয়েছি। আসলে দেশের ঐরূপ মাৎস্যন্যায়ের জন্য একটা ব্যাপক নিরাপত্তাহীনতা, ভাইবোনদের ভবিষ্যৎ চিন্তা, নিজের পড়াশোনার অনিশ্চয়তা আমাকে যেন ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল।

টেস্টের ফল প্রকাশে আর বিশেষ দেরি ছিল না। দেখতে দেখতে পরীক্ষা মিটে যাবে। পাশ করলে কর্তারা আমাকে কলেজে ভর্তি করবেন কিনা, করলেও শহরে থেকে পড়াশোনা করার দায় বহন করা তাঁদের ক্ষমতা তথা মনমানসিকতানুযায়ী হবে কিনা, না হলে আমি কীভাবে সেই ব্যয়ভার নির্বাহ করব, এইসব চিন্তায় বড় ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলাম। এরই ফল দাদাদের কাছে লেখা ঐসব চিঠিপত্র। বাবা মনে মনে কী চিন্তা করতেন জানি না, তবে মা, এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে, উত্তর দিতেন, 'ঠাকুর যা করেন তাই হবে।' আমি ধার্মিক মনোভাবাপন্ন হলেও, তাঁদের মতো ঠাকুরের উপর নির্ভরশীল ততটা ছিলাম না। তাই বাস্তবের কথাটা আমাকে ভাবতে হচ্ছিল।

আজকাল বাবা মায়েরা সন্তানদের শিশুকাল থেকেই কত যত্নে পড়াশোনার ব্যবস্থা করেন। সেইসময়কার মানসিকতা থেকে তা কত স্বতন্ত্র! এখন অবশ্য একটি দুটি সন্তান, তাই তাঁদের পক্ষে তা সম্ভব হয়। তবে মানসিকতার পরিবর্তনও যে একটা ব্যাপার সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। বোধ করি তখনকার দিনে, বিশেষত যে অবক্ষয়ের সময় বিষয়ে এ আলেখ্য রচনায় প্রয়াসী হয়েছি, তখন পিছারার খালের মতো জগতের মধ্যবিত্ত/মধ্যস্বত্বভোগী জীবদের প্রেতাকৃতি বংশজরা জীবনের রস বঞ্চিত হয়ে এরূপ উদাসীন, উদরসর্বস্ব এবং বিকৃত রুচির জীব হিসেবে পরিণত হয়েছিল। শুধুমাত্র শিক্ষা শিক্ষণ নয়, স্বাস্থ্য, অন্নবস্ত্র, বাসস্থানের মেরামতাদিকরণ তথা গার্হস্থ্য, সমস্ত প্রকার কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়েই সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যবিহীন হয়ে এক নিকৃষ্ট জৈবিকতা অবলম্বন

করেছিলেন তাঁরা। এর মূল কারণ শুধুমাত্র দেশভাগ, দাঙ্গা এবং তজ্জনিত আতঙ্কই নয়, এর অন্যান্য অনেক কারণ ছিল। সবকথা লিখতে গেলে রচনা অকারণ গুরুভার হয়ে পড়বে। সে যা হোক, ভেবে দেখলাম, পরীক্ষা পাশের পর কলেজে পড়াশোনা কস্মিনকালেও হবার সম্ভাবনা আমার অন্তত নেই। যদি কৃতকার্য হই, তবে ঝালকাঠি বন্দরে অথবা বরিশাল শহরে গিয়ে চাকরির চেষ্টা করব। চাকরি পেলে সবাইকে নিয়ে একটা বাসাভাড়া করে থাকব। সেখানে হয়ত অধিক লোকসমাগমে ডাকাতি, বলাৎকার ইত্যাদির ভীতির হাত থেকে খানিকটা রক্ষা পাব। নতুন স্থানে, নতুন মানুষজনের সাহচর্যে একাকীত্বের বিষণ্নতাও অনেকটা ঘুচবে। সেসব স্থানে অনেক হিন্দু এবং সজ্জন জনের বসবাস। গ্রামের নিত্য শূন্যতাবোধ, নিত্য অনিশ্চয়তার হাত থেকে বাঁচতে পারব। এমন কী অদৃষ্ট প্রসন্ন হলে আজ না হয় কাল প্রাইভেটে পরীক্ষা দিয়ে পরবর্তী শিক্ষার ধাপগুলি অতিক্রম করতে পারব। ঝালকাঠি বন্দরকে সেসব দিনে আমরা শহরই বলতাম এবং সেই তথাকথিত শহরের প্রতি একটা তীব্র আকর্ষণ এমন কী ভালবাসাও ছিল। সেখানে কিছু পরিচিত জন ছিল সমবয়সি। তাদের কথাবার্তা, পোশাক আশাক এবং জীবনযাপন প্রণালী আমার মতো ছেলেদের কাছে বড় স্বর্গীয় বলে বোধ হত। এইসব চিন্তায় মন বড়ই প্রফুল্ল হল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও উপলব্ধি করলাম, শুধুমাত্র ম্যাট্রিক পাশ করা অপরিণত বয়সি একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের পক্ষে কোনও চাকরি জোটানো আদৌ সম্ভব হবে কী? বস্তুত প্রবল মানসিক হতাশা এবং নৈরাশ্যকে ভোলার জন্য, এতক্ষণ আমার কল্পনাপ্রবণ মস্তিষ্কে এইসব স্বপ্নের আনাগোনা হচ্ছিল। এগুলো বাস্তবে সম্ভব নয় জেনেও তখনকার মতো বেশ উজ্জীবিত বোধ করলাম। আপাতত টেস্ট পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়া এবং ফাইনালের জন্য প্রস্তুতিই প্রধান কাজ বলে গণ্য হল। অবশ্যই তৎসহ ছাত্র পড়ানো এবং অন্যান্য সাংসারিক কাজকর্ম তো ছিলই।

অধুনা ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার ক্ষতি হতে পারে এই ভেবে মা-বাবা তাদের কোনও সাংসারিক কাজে নিয়োগ করেন না। সেই যুগে, অন্তত আমাদের এলাকায় বিষয়টি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত, আগে ঘর গেরস্থালির কাজ, পড়াশোনার বিলাসিতা পরে। আমার বাবা প্রায়ই বলতেন, পড়ইয়া আমারে রাজা করবা? তার থিহা রান্ধনের কাষ্ঠ কাডইয়া আনো। খালের থিহা জল লইয়া আয়ো। অত পড়নের কী অইছে?—এসব কথা তখনকার দিনে পিছারার খালের জগতের বাবাদের প্রায় অমোঘ নির্দেশ ছিল। আমাকে আমার গোটা কৈশোর এবং বাল্যকাল তথা প্রাথমিক যৌবনকাল ধরে এই সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়েছে। কখনও আমার এমনও মনে হয়েছে, পড়াশোনা করা যেন এক অপরাধ, যার জন্য গুরুজনেরা অবশ্যই শাস্তি দিতে পারেন। যেমন ধরা যাক ভোরবেলা উঠে খাতাপত্তর নিয়ে পড়তে বসেছি, এমন সময় মায়ের আদেশ—আইজ এট্টু বাজারে যাওন লাগবে। অথচ বাড়ির কর্তা তখন কাষ্ঠাসনে বসে গড়গড়ায় ধূম্রপানে নিমগ্ন। তিনি (তখনও) বাবু। তাঁর পক্ষে ঝোলা-খালুই (বরিশালে 'খাড়ই' বলে, যাতে মাছ আনা হয়) হাতে দেড় মাইল হেঁটে বাজারে যাওয়া নেহায়ৎ অনভিজাত কর্ম।

চাকর পাট তখন আর তেমন নেই। যা দু-এক জন আছে তারা চুরি ছ্যাচ্‌রামি করে 'এ্যাড়ের মালের দাম দ্যাড় কয়।' সুতরাং 'রইল সাধের পড়াশোনা, কর বিষয় ভাবনা।' দেড় মাইল দূরে বাজার, সেখান থেকে সওদা আনো, তাও—'কিছু নগদ কিছু বাকি। টুকিটাকি দিও ফাঁকি।' এই অবস্থায় সন্তান কতটাই বা প্রকৃত মনুষ্য হিসেবে তৈরি হতে পারে?—তারপর নাকে মুখে গুঁজে ইস্কুলে যাও-না-যাও বয়েই গেল।

এখন তো ছেলে মেয়ে পড়া সেরে উঠলে বাবা বইপত্র ব্যাগে ভরে দেন, তো মা ক্লাস সেভেনের ছেলে বা মেয়েকে পর্যন্ত চান করিয়ে, খাইয়ে দিয়ে, জামাকাপড় পরিয়ে ইস্কুল বাসে/গাড়িতে/রিক্সায় তুলে দিয়ে টাটা-বাই বাই,—বাবাই ঠিকমত হোমওয়র্ক জেনে এসো কিন্তু। তারপর দল বেঁধে মায়েরা, ছুটির আগেই বাবাই সোনাদের আনার জন্য ইস্কুলের কম্পাউন্ডে উন্মাদিনী যশোদা। সবাই একটা ব্যাপারে একমত যে বাবাই সোনাদের বড় কষ্ট, আহা! এই ব্যাপারটিও যে খুব সামাজিক স্বাস্থ্যসম্মত, এমত বোধ হয় না, তবে আমাদের পিছারার খালের তদানীন্তন সন্ততিরা আমাদের বাবা, কাকা, জেঠাদের কাছে যে নিতান্ত আপদ হিসেবে গণ্য হচ্ছিলাম তা বোধহয় আরও জঘন্য। কারণ আমাদের জন্মের জন্য আমরা বা আমাদের মায়েরা আদৌ দায়ী ছিলাম না। মূল দায়িত্ব অবশ্যই কর্তাদের ছিল। এই বিষয়ে একটি উদাহরণ দেওয়ার লোভ সামলাতে পারছিনা। আমাদের দেশের এক গোঁসাই ঠাকুরের স্ত্রী সদাই অন্তস্থা থাকতেন। কেউ যদি জিজ্ঞেস করত, —গোঁসাই, দুলালের মায় আছেন ক্যামন?—উত্তর অতিদ্রুত, ক্যামন আর? কোলে এউক্কা, ক্যাখে এউক্কা, এউক্কাতো দেখছই হবায় হোগাঘেষে (অর্থাৎ হামাগুড়ি দেয়)। তমোও মাগীর তলপ্যাট উচা। অর্থাৎ আরেকটি আগতপ্রায়। —প্রশ্ন কর্তা অতিরিক্ত প্রশ্ন করলে, বলতেন, দ্যাহ, ঘরের বৌ খালি প্যাডে ঘুরইয়া বেড়াইবে হেয়া মুই ভাল ঠেহিনা। অএতব, এক্ষেত্রে তদানীন্তন সামাজিক মানসিকতা বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না।

— ছত্রিশ —

টেস্টের ফল খারাপ হল না। প্রথম না দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিলাম, সেকথা আজ আর মনে নেই। তবে ফল আশানুরূপই হয়েছিল। আশানুরূপ বলছি একারণে যে আমি বাল্যাবধি কখনও কোনও বড় আশা করতে সাহসী ছিলাম না। অতি বাল্যকাল থেকে অসম্ভব দুঃখ দারিদ্র এবং তজ্জনিত সংগ্রাম/সংঘাত আমাকে এমন এক দীন/অকিঞ্চিতৎকর মানসিকতার অধিকারী করেছিল যে আমি কোনওদিনই এক দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হইনি। সংগ্রাম মানুষকে সাধারণত দৃঢ়, আত্মবিশ্বাসী এবং কঠোর বাস্তববাদী করে গড়ে তোলে। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে ঘটনাটি কখনওই তেমন হয়নি। আমি গড়ে উঠেছিলাম এমন এক বিরুদ্ধ প্রকৃতি নিয়ে, যেখানে মানুষ ক্রমশ নিজের আত্মবিশ্বাস, সংগ্রামের অহংকার, দৃঢ়সংকল্পতা ইত্যাদি স্বাভাবিক অর্জনগুলো হারিয়ে ফেলে। এ এক বিপরীত নির্মাণ, যেখানে সে নিজেকে শুধু অন্যের

করুণা, কৃপা, দায় ইত্যাদির উপরই নির্ভরশীল ভাবে। সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত অধিকারের অহংকার বা স্পর্ধা নিয়ে, মাথা উঁচু করে সমাজে দাঁড়াতে পারে না। দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকতার আধিকারিকেরা এই মানসিকতার মর্ম সম্যক বুঝবেন। এরা সবসময় জীবন সংগ্রাম অব্যাহত রেখেও নিজেদের সবার 'আভারি' বলে গণ্য করে। যেন—তোমাদেরই দয়ায় বেঁচে আছি হে, তোমরা করুণা কর।

সে যাহোক, টেস্টের ফল দেখে মাস্টারমশাইয়েরা খুব উৎসাহ প্রদান করলেন। যে কোনও প্রয়োজনে তাঁদের সাহায্যের আশ্বাসও দিলেন। সেসব দিনে প্রাইভেট পড়ার বিশেষ চল ছিলনা। শহর গঞ্জে যতটুকু ছিল, গ্রাম গাঁয়ে তাও নয়। তবে শিক্ষকদের দরজা সবার জন্য সর্বদা খোলাই থাকত। জিজ্ঞাসুদের সহায়তা পাবার অসুবিধে তেমন ছিলনা।

আমার প্রপালক-শিক্ষকমশাই-এর কাছে আর কয়েকটা দিন কাটিয়ে কিছু বিশেষ বিশেষ বিষয় জেনে বুঝে নিলাম। তারপর তাঁর অনুমতিও নিয়ে বাড়ি চলে এলাম। কিছু পুরোনো বইপত্র সংগ্রহ করে নিয়েছিলাম তাই অধ্যয়নে অসুবিধের কারণ থাকল না। অসুবিধের কারণ ছিল শুধু অঙ্কে। টেস্টে অঙ্কে তিরিশ না বত্রিশ মতো পেয়েছিলাম। টুনুর (সহপাঠিনী) অঙ্কে বিলক্ষণ মাথা—আমার নিদারুণ দৈন্য। তার সাথে আমার তীব্র প্রতিযোগিতার সম্পর্ক। এতদিন যেমন-তেমন চলছিল, কিন্তু এবার তো বোর্ডের পরীক্ষা। অতএব এক ভয়ানক দুশ্চিন্তা মাথায় চেপে বসল। অন্যান্য বিষয় নিয়ে ভাবিত ছিলাম না। ইংরেজি, বাংলা, ইতিহাস, ভূগোল এবং সংস্কৃতে আমার নম্বর ভালই থাকত। অঙ্কই একটা বিশেষ সম্যসা হয়ে দাঁড়াল। অন্তত ষাট নম্বরও যদি না পাই তো লজ্জায় মরে যাব। আমার আগের ইস্কুলের সেই ব্রাহ্মণ মাস্টারমশাইকে একদিন এই সমস্যার কথা জানালাম। তিনি বললেন—পরীক্ষার তো এখনও তিন মাস বাকি। আমি কয়েকটা নিয়ম তোকে দেখিয়ে দিচ্ছি। রোজ দুপুরে দুঘন্টা করে অভ্যেস করে যা, দেখবি ভয়ের কিছু নেই। অঙ্ক ব্যাপারটা কৌশল মাত্র। —তাঁর সাহায্য নিয়ে এবং ক্রমাগত অভ্যেস করে দিন পনেরো কুড়ির মধ্যে দেখলাম বেশ কিছু নিয়ম আমার আয়ত্ত হয়েছে এবং মনে বেশ আত্মবিশ্বাস বোধ করতে লাগলাম।

ইংরেজি এবং বাংলা, ক্লাসের অনেকের চাইতেই আমি শুদ্ধ লিখতাম। তবে ইংরেজিতে কথা বলতে গেলে জড়তা কাটাতে পারতাম না। আমাদের মাস্টারমশাইরা ভাষার ব্যাকরণগত শুদ্ধতার প্রতিই মনোযোগ দিতেন এবং তাতেই সন্তুষ্ট থাকতেন। ভাষার প্রসাদগুণ বা সাহিত্যিক সৌকর্য কীভাবে রচনায় আসতে পারে, তা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। তাঁরা ভাষার (কি ইংরেজি, কি বাংলা) বিবর্তনগত অগ্রগতি বিষয়ে খুব একটা ওয়াকিবহালও ছিলেন না। নিজেরাও গতানুগতিক পন্থায়ই চলতেন। উচ্চারণের শুদ্ধতা, শব্দচয়নের দক্ষতা অথবা ভাবগর্ভী বাক্য নির্মাণের জন্য কেউই বিশেষ যত্নশীল ছিলেন না। ফলত ব্যাকরণগত শুদ্ধতাই ছিল একমাত্র মাপকাঠি যার নিরিখে তাঁরা বলতেন—অমুক ভাল ইংরেজি বা বাংলা লেখে। বরিশালে এ নিয়ে একটি মজার

গল্প আছে। ইংরেজ শাসন আমলের কোনও একটা সময়ে সদর শহরে একজন সদ্যাগত বিলিতি হাকিম নাকি তাঁর অপিসের ব্যানার্জি, মুখার্জি নামধারী বাবুদের ব্যাকালাপ এবং লেখাপত্র দেখে খুব সংকটে পড়েছিলেন। তিনি তাঁর পূর্বসূরী অর্থাৎ যাঁর স্থলে তিনি দায়িত্বভার গ্রহণ করার জন্য এসেছিলেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে এই বাবুরা যে ভাষা ব্যবহার করেন তা কি ভাষা। তাঁর বোধ হয় ভ্রম হয়েছিল যে এটা ইংরেজি ভাষার কোনো উপভাষা কিনা। পূর্বসূরী অভিজ্ঞের হাসি হেসে তাঁকে বললেন যে এটা dialect নয়। প্রকৃতই ইংরেজি ভাষা। নবাগত হাকিম একথা শুনে যখন প্রায় 'দশায়' পড়ছেন তখন পূর্বসূরী সহাস্যে তাঁকে বলেছিলেন, —'বৎস, তোমার বিচলিত হইবার কোনও হেতু নাই। ইহা আমাদিগের শিক্ষারই সুফল। আমাদের ইহা দেখিবার কোনও প্রয়োজন নাই. বুঝিবারও না। What one Banerjee writes another Mukherjee understands আমাদের কাজ চলিয়া যাইতেছে। ইহাই যথেষ্ট জানিবা। আমরা কেহই এই ভাষা সঙ্গে করিয়া হোমে লইয়া যাইতেছিনা। তুমি নিশ্চিত থাকিতে পার।' যাহোক, এসব কথা প্রায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর আগেকার। শুধু বরিশালই নয় গোটা উপমহাদেশের সাধারণ শিক্ষক ছাত্র তথা কর্মচারীরা এরকম ইংরেজিতেই অভ্যস্ত ছিলেন। এখন আধুনিক বিশ্ব জানে যে এই উপমহাদেশীয় ইংরেজি সাহিত্যই সর্বত্র বাজার মাৎ করছে। আমিও সেইরকম ইংরেজিই লিখতাম এবং তা অনাদৃতও হয়নি। এতো গেল ইংরেজির কথা। বাংলা মাতৃভাষা। তদুপরি ছোটবেলায় ইস্কুলে দেওয়ার ব্যাপারে গার্জেনদের অনাসক্তি থাকায় এবং পরীক্ষা নামক হ্যাপা সামলাতে হয়নি বলে, বাড়ি বসেই অনেক প্রাচীন বাংলা সাহিত্য অধ্যয়ন করেছিলাম। বাড়িতে প্রাচীন সাহিত্য, পুরাণ ইত্যাদি এবং একদার বিভিন্ন বিখ্যাত পত্রপত্রিকার বাঁধানো বহু গ্রন্থ ছিল। ইস্কুলে যেতে না পারার খেদে সেসব বুঝে না বুঝে গোগ্রাসে গিলতে পেরেছিলাম। তার মধ্যে একটা বড় সংখ্যা ছিল নাটকের। আজও তার অনেক নাম মনে পড়ে। ক্ষীরোদ বিদ্যাবিনোদের নাট্য কাব্য আলিবাবা এবং জনা ইত্যাদি গিরিশ ঘোষের নানান নাটক এবং নাট্যকাব্য তথা অনুবাদ নাটক খুব পড়েছিলাম তখন। গল্প উপন্যাসের তো কথাই নেই। এসব কারণে বাংলা ভাষার উপর আমার কিছু স্বাধিকার জন্মেছিল, যদিও তার ঢঙ প্রাচীন। আজও বাংলা বানানের প্রাচীন রীতি আমি পরিত্যাগ করতে পারিনি। আমার স্মৃতিশক্তি সেইসব দিনে খুব খারাপ ছিল না। ইতিহাসের একটি স্তবক একবার পড়ে হুবহু বলে যেতে পারতাম। ফলে ইতিহাস, ভূগোল বা অনুরূপ অন্যান্য বিষয়গুলো নিয়ে আমি চিন্তিত ছিলাম না। ভীতি ছিল শুধু অঙ্কে যে কথা প্রথমেই বলেছি। বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রী এগ্রিগেটের নম্বর তুলতো সাধারণত অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদির সাহায্যে। উর্দু, আরবি বা সংস্কৃত কখনও এ ব্যাপারে সহায়ক হত। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে নম্বর তোলার বিষয় দাঁড়িয়ে ছিল বাংলা ইংরেজি, সংস্কৃত এবং ইতিহাস। ভূগোল বা অন্য বিজ্ঞানের বিষয়ে আমার একেবারেই আকর্ষণ ছিলনা।

অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে সংস্কৃত বিষয়ে কিছু স্মৃতিচারণা না করে পারছিনা। যদিও আজ সংস্কৃত আমাকে প্রায় পরিত্যাগই করেছে, কিন্তু ঐসব দিনে এই ভাষাটির প্রতি আমার প্রগাঢ় প্রেম ছিল। তবে আমার প্রপালক অধ্যাপকের অভীপ্সা অনুযায়ী আমি যথেষ্ট পরিশ্রমী ছিলাম না বলে প্রকৃতভাবে এই ভাষা এবং সাহিত্যে আমি কিছুমাত্র অগ্রসর হতে পারিনি। তিনি আমাকে সংস্কৃত শিক্ষা দেবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেননি। আমারও ভাষাটি বড়ই মধুর বোধ হত। কিন্তু ব্যাকরণের কাঁটাতার ছিঁড়ে এগোনো বড়ই কঠিন ছিল। অধ্যাপক বলতেন, যদি একটু ধৈর্য ধরে এগোতে পার, দেখবে কত মজা। —না, আমি ধৈর্য ধরে এগোতে পারিনি। তারপর একসময় পরীক্ষা এসে গেল। আর উপায় থাকল না। তথাপি অধ্যাপক বলেছিলেন, অন্তত একটু কাব্য নাটকগুলো পড়ে দেখো এবং বোঝাব চেষ্টা কর। —সেই সুবাদে কিছু কাব্য এবং নাটকের সাথে পরিচিতি লাভ হয়েছিল। একারণে আজও গর্ব করি। মনে হয়, যারা সংস্কৃত নাটক বা কাব্য কিছুমাত্র অধ্যয়ন করেনি, তারা রসসাহিত্য বিষয়ে অনেক কিছুই জানতে বা অনুভব করতে পারল না। তারা প্রকৃতই মন্দভাগ্য। আমার গর্ব বা গৌরব এই যে আমি যত সামান্য অধ্যয়নই এবিষয়ে করিনা কেন, আমার গুরু একজন প্রকৃত রসবেত্তা ছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকেই এইসব রসের মাহাত্ম্য উপভোগ করার শিক্ষা আমি পেয়েছি। একথাও বলব যে আমার এতাবৎকালের জাপিত জীবনে সেই রসাস্বাদন প্রায় এক অনৈসর্গিক প্রচ্ছায়া প্রদান করে চলেছে।

উজ্জয়িনীর কবির সেই মেঘ আমার পিছারার খালের আকাশে সেদিন যে স্নিগ্ধচ্ছায়া নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল, আজও তার সেই মেদুরতা আমাকে পরিত্যাগ করেনি। এই প্রায় বৃদ্ধকালেও তাই নববর্ষাগমে অধ্যাপকের শ্লোকোচ্চারণ আমার কণ্ঠ থেকে নির্গত হয়ে মেঘকে যেন আরও রমণীয় এবং উপভোগ্য করে তোলে—

'জাতং বংশে ভুবনবিদিতে পুষ্করাবর্তকানাং—'

যদিও আকাশের এই মেঘ আদৌ পুরষ্করাবর্ত মেঘ নয়। সে এক নিতান্ত ছোটলোক নিম্নচাপীয় ঘনঘটা, তথাপি এই শ্লোকের মাহাত্ম্যে তা আর বিচারে থাকে না। আর স্মৃতির রসায়নে অধ্যাপকের মুখখানি উজ্জয়িনীর কবির মুখের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়।

— সাঁইত্রিশ —

উনিশশো একষট্টি সালের মার্চ মাসে আমাদের ফাইনাল পরীক্ষার দিন ধার্য হল। তারিখটা মনে নেই। পরীক্ষাকেন্দ্র আমাদের গ্রাম থেকে তিন মাইল দূরের বন্দর শহর ঝালকাঠির গভর্নমেন্ট স্কুল। তিন মাইল রাস্তা হেঁটে গিয়ে রোজ পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। সেখানে কোথাও থাকতে হবে। সেসব দিনে ওখানে থাকার ব্যবস্থা করা হত সাধারণত আত্মীয় বা পরিচিত কারুর বাড়িতে। মেয়েদের জন্য বোর্ডিং-এর ব্যবস্থা মোটামুটি একটা ছিল। ছেলেরা সাধারণত এর-ওর বাসাতেই থাকত এবং হোটেলে

খেত। বাবা জেঠামশাইকে এ বিষয়ে বললে, তিনি জানালেন যে, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। থাকা খাওয়ার জায়গার অভাব নেই। বাবাও নিশ্চিন্ত হলেন। জেঠামশাই আমাকে ডেকে বললেন,—এ অতি আনন্দের কথা যে তোমার মতো ছেলেও ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিচ্ছে। তুমি যে এতটা এগোতে পারবে তা আমি আশা করিনি। টেস্টে শুনলাম নাকি ভালই করেছ। বেশ, আমি তোমাকে নিয়ে যাব এবং যা ব্যবস্থা করার করব। আমার কর্তব্য আমি করব, যেমন করি। তুমি কী করবে তুমি জান। তবে এ পরীক্ষাটা কিন্তু ইস্কুলের পরীক্ষা নয়। —চুপচাপ শুনে যাওয়াই রীতি। তাই মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম। জেঠামশাই আবার বললেন, পাশ করতে পারবে বলে মনে হয়? —কোনও রকমে বললাম, দেখি চেষ্টা করে। তিনি বললেন, But in the year nineteen hundred and etc, I had gone to appear in the Matriculation examination and nobody had to accompany me. But I had been honoured with a first division. And you, you say that you will try—pooh! তাঁর কথার ধরনই ছিল এরকম। শুধু তিনি নন, ঐ সময়ে পিছারার খালের জগতের গার্জেনদের কেউই সন্তানদের পড়াশোনা বা কোনও ব্যাপারে উৎসাহব্যঞ্জক কিছু বলতেন না। জেঠামশায়ের বিশেষতা ছিল যে তিনি উৎসাহব্যঞ্জক কিছু বলতেনই না, উপরন্তু তীব্র বিদ্রূপে একেবারে হাড়মজ্জা জ্বালিয়ে দিতেন। কিন্তু তাঁর সহায়তা ছাড়া গতি নেই, যেহেতু আমার নিজস্ব কোনও পরিচিত লোক বন্দর শহরে থাকলেও, জেঠামশায়ের অগোচরে সেখানে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিলনা।

পরীক্ষার আগের দিন সকালে একটি টিনের বাক্সে বইপত্তর এবং জামা কাপড়গুলো সাজিয়ে নিলাম। জামা কাপড় বলতে মায়ের হাতে সেলাই করা একটি মার্কিন কাপড়ের ইজের, তদনুরূপ একটি জামা এবং একটি লুঙ্গিই ছিল সম্বল। এ ছাড়া তৃতীয় বস্ত্র হিসেবে একটি গামছাও আমার ছিল না। লুঙ্গিটি প'রে স্নান এবং তার সাহায্যেই গা-মোছার কাজ। বাকি সময় ঐ একমেবাদ্বিতীয়ম্ ইজের আর জামাটির ব্যবহার। অত্যন্ত ছোটবেলা থেকেই এরকম ব্যবস্থায় অভ্যস্থ। সুতরাং মনে কোনও দুঃখ বা অভাববোধ ছিলনা। জীবন সায়াহ্নে বসে যখন এই স্মৃতিচারণা করছি তখন পোশাক আশাকের যে প্রাচুর্য তা দেখে বরিশালীয় একটি মজার প্রবাদ মনে আসে—

মাটি খাঁটি
সোনা আধা
কাপড় কেনে গাধা।

বাস্তবিকই পরবর্তীকালে আমরা গাধার মতোই জামা কাপড় কিনেছি এবং ব্যবহার করেছি। তবে আমি কোনওদিনই ঐ ইজের আর জামার কথা ভুলিনি এবং অত্যন্ত শখের বস্ত্রও প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে মানুষকে দিয়ে দিতে আমার বাধেনি।

বলতে ভুলে গিয়েছি সঙ্গে একটি বিছানার পুঁটুলিও নিয়েছিলাম। কিন্তু তার বিস্তৃত বিবরণ অনাবশ্যক।

বন্দর শহরে তখনকার দিনে হোটেল বলতে বোঝাতো যেখানে পয়সার বিনিময়ে ভাত খেতে পাওয়া যায়। হোটেল এবং বোর্ডিং সেখানে ছিলনা। তিন মাইল রাস্তা পার হয়ে যখন গঞ্জে পৌছোলাম, তখন বেলা প্রায় দশ এগারো। সূর্যের অবস্থান দেখে এমতই অনুমান। ঘড়ি বস্তুটা তখন কদাচিৎ লোকের হাতে দেখা যেত। যাহোক্, জ্যেষ্ঠতাত আমাকে নিয়ে তুললেন একটি হোটেলে। হোটেল মালিক আমাদের পাশের গাঁয়ের ছেলে। সম্প্রতি এখানে একটি টিনের চালাঘরে ভাত বেচার হোটেল খুলে বসেছে। চৈত্রমাস। সুতরাং রোদের তাত্ খুব একটা কম নয়। তখনও আমরা বিদ্যুতের আশীর্বাদের কথা স্বপ্নেও ভাবিনা। এই হোটেলে খাওয়া এবং এককোণের মেজেতে (মাটির) থাকার ব্যবস্থা হল। জেঠামশাই উপস্থিত পরিচিত এবং অপরিচিত জনেদের সামনে বেশ খানিকক্ষণ বাতেল্লাবাজি করলেন। মাঝে মাঝেই তাঁর ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করার কথা এবং আমার যে আদৌ পাশ করার সম্ভাবনা নেই তা বিশদ করে বলে চলে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন যে, খাবারের দাম বাবদ পয়সা তিনি হোটেল মালিককে যথাসময়ে দিয়ে দেবেন। আমি যেন কোনওমতেই স্বাধীনভাবে চলাফেরা না করি, কারণ, এই শহর অতি ভয়ঙ্কর স্থান—ইত্যাদি।

কিন্তু সত্যি বলতে কি হোটেলটিকেই আমার ভীষণ স্থান বলে মনে হল। একখানা দোচালা টিনের ঘর। তার মধ্যে অহরহ মানুষ আসছে খাচ্ছে, গল্পগুজব করছে। চারদিকে দরমার বেড়া। হাওয়া বাতাস ঢোকার পথ নেই, তার উপর অহরহ চিৎকার—'এখানে পেট চুক্তি ওখানে পাইস্।' 'এহানে ডাইল দে, ওহানে আর এক পেলেট ভাত'—এইসব আদশে সে এক বীভৎস কাণ্ড।

অবস্থায় যতই দুঃস্থ থাকি বাড়ির বিস্তৃত পরিধিতে আলো হাওয়ার অভাব ছিলনা, এত কোলাহলও কোনওদিন শুনিনি। এখন এরকম একটি অবস্থায় পড়ে চারদিকে অন্ধকার দেখতে লাগলাম। তার উপর হোটেল-মালিকের ভ্রূকুটি। জেঠামশাই যতক্ষণ উপস্থিত ছিলেন ততক্ষণ তার মূর্তি ছিল এক, তিনি চলে যেতে না যেতেই সে প্রচণ্ড বিরক্তি এবং ক্রোধে অন্যমূর্তি ধারণ করল। জেঠামশাইকে এখানকার সকলেই ভয় করত। তার বিলক্ষণ কারণও ছিল যা আগে বেশ কয়েকবার বলেছি। তিনি লোক মোটেই সুবিধের ছিলেন না। এই হোটেল মালিকও বলা বাহুল্য, নিশ্চয়ই জ্যেষ্ঠতাতের দ্বারা কখনও না কখনও নিগৃহীত হয়ে থাকবে। এখন আমায় বাগে পেয়ে সে তার ঝাল ঝাড়তে শুরু করল। সে উপস্থিত জনেদের উদ্দেশ করে বলতে লাগল—দ্যাহছেন দেহি। একী উদ্বাগ অ্যাঁ? হেনায় তো হুকুম দিয়াই খালাস। মুই এ্যারে এহন কোথায় বাহি? পোলাডায় তো আইছে পরীক্ষা দেতে। তো এহানে পড়বে ক্যামনে?—সমবেত লোকজনেরা সবাই তার কথার যুক্তি স্বীকার করল। আমি লোকটির বিরক্তি এবং ক্রোধের মধ্যে কিছু অন্যায় দেখলাম না। তাছাড়া জেঠামশায়ের স্বভাব তো আমি বিলক্ষণ জানি, তিনি আমার থাকা খাওয়ার জন্য যে একে আদৌ কোনও পয়সাকড়ি দেবেন বা দিলেও কবে নাগাদ সে অঘটন ঘটবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই. কিন্তু

তবুও জেঠামশায়ের বিরুদ্ধে এরকম প্রকাশ্য সমালোচনায় আমি খুবই দুঃখ পাচ্ছিলাম এবং অস্বস্তি বোধ করছিলাম। আমার অস্বস্তি লক্ষ্য করে হোটেল মালিক আমাকে তার কাছে ডাকল, বলল, তুমি ভাইডি মনে কিছু করইও না। হেনারে এ সব কিছু কতা কওনেরও দরকার নাই। তয় আমার অবস্থাডা তো বোঝতে পারতে আছ। যাউক, আগে তুমি খাইয়া তো লও, পরে দেহি কী করণ যায়। —লোকটি মানুষ হিসেবে খারাপ ছিলনা। আমার খাওয়া শেষ হতে-না-হতে সহপাঠী এবং প্রাণের বন্ধু মানিক এসে হাজির। সে এবং আমাদের অন্যান্য আরও কয়েকজন সহপাঠী বন্দব শহরের একটি ইস্কুলের একজন মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে থেকে পরীক্ষা দেবে এরকম ঠিক ছিল। এই মাস্টারমশাই একসময় প্রসন্নকুমার বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন এবং ঐ অঞ্চলেই তাঁর আদি বাড়ি ছিল। একসময় তিনি মিলিটারিতে চাকুরি করতেন এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বর্মাফ্রন্টের লড়াইএ আহত হয়ে অসবর নেন। পরবর্তীকালে শিক্ষকতাই পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। মানুষটি অসম্ভব পরোপকারী, দুঃসাহসী, সুদর্শন এবং সুশিক্ষিত। তাঁর বাড়িটি ছিল দোতলা একটি টিনের ঘর। অবস্থা আদৌ সচ্ছল ছিল না। তথাপি প্রতিবছর তাঁর নীচের তলাটি আমাদের ইস্কুলের ফাইনাল পরীক্ষার্থীদের জন্য ছেড়ে দিতেন। তখনকার দিনে বন্দর শহরেও বিদ্যুৎ বাতির প্রচলন বড় একটা ছিলনা। খুব অবস্থাপন্নদের বাড়িতেই সে ব্যবস্থা ছিল। ছাত্ররা এই মাস্টারমশায়ের বাড়িতে থাকার সময় যে-যার বিছানাপত্তর এবং একটি হ্যারিকেন নিয়ে যেত। খাবার দাবারের বন্দোবস্ত হোটেলে। এই মাস্টারমশাইকে আমরা ডাকতাম ডব্লু (ডব্লিউ) স্যার বলে।

মানিক আমার অবস্থা দেখে বলল, —তুই তো এহানে থাকতে পারবি বলইয়া মনে অয়না। এক কাম কর, আমার লগে ডব্লু স্যারের বাসায় চল। তিনি আপত্তি করবেন না—আমি বললাম, কিন্তু হ্যারিকেন? আমার তো হ্যারিকেন নাই। —ও বলল, রেক্টর স্যারের বাড়িতে আমরা এক কুপিতে যদি এতকাল পড়ইয়া আইতে পারি, এই কয়ডা দিন পারমু না? —হোটেল মালিকও সেই রকমই বলল। সে বলল, তোমার ভয় নাই। তোমার জেডারে এসব আমি কমুনা। হেনায় এসব জানতে পারবেন না। এ ভালই অইল। আমারও এট্টা দুশ্চিন্তা গেল। রোজ দুইবেলা এহানে আইয়া খাইয়া যাইও, যহন খুশী। তোমার ভাত আলাদা থাকবে। —এরপর আর কথা কী? আমি তো মনে মনে তাই চেয়েছিলাম। এ একেবারে সাক্ষাৎ ভগবানের আশীর্বাদ। আমি মানিকেব সঙ্গে চলে গেলাম। ডব্লু স্যারের কোনও আপত্তি হলনা। ওখানে থেকে এবং হোটেলে খেয়ে দিব্য পরীক্ষা দিতে লাগলাম।

কিন্তু আমার অদৃষ্টে বোধহয় আরও অনেক লাঞ্ছনা বাকি ছিল। পরীক্ষা শেষ হতে তখনও দুদিন বাকি। হঠাৎ ব্যাপক জ্বর সহযোগে সারা গায়ে হাম উঠল। প্রথমদিন শুধু জ্বর। ভাবলাম ঠাণ্ডা লেগে হয়েছে এমনি সেরে যাবে। কিন্তু পরের দিন গোটা শরীর হামে ভর্তি হয়ে গেল। স্যারকে দেখাতে, তিনি বললেন যে এর নাম 'মৈষারুন্তি'।

খুবই ছোঁয়াচে। আর একটা দিন পরে হলে সমস্যা ছিলনা। জানাজানি হলে সবাই আতঙ্কিত হবে। পরীক্ষার হলে জানতে পারলে তো কথাই নাই। তিনি আমাকে ব্যাপারটা গোপন করতে বললেন এবং কোনওরকমে সেদিনকার পরীক্ষাটা দিতে বললেন। ভাগ্য ভাল ঐ শেষ দিনের পরীক্ষাটা ছিল ঐচ্ছিক। না দিলেও ক্ষতি ছিল না। কিন্তু স্যার বললেন, কষ্ট সহ্য করতে শেখো। এর এমনিতে কোনও চিকিৎসা বা ওষুধপত্র নেই। তবে অন্যদের থেকে একটু আলাদা থাকতে হবে এবং ঠাণ্ডা লাগানো চলবেনা। মুখের গোটা দেখে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে বলবে, ডিম খেয়ে অ্যালার্জি হয়েছে। — তাঁর কথামতো পরীক্ষাটা দিলাম। তবে জ্বর এবং অসহ্য ব্যথায় সারা শরীর যেন ক্রমশ ভেঙে পড়ছিল। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা, একটা বেহুঁশ অবস্থা নিয়ে পরীক্ষাপর্ব শেষ হল।

পরীক্ষার শুরু থেকে শেষদিন অবধি সহপাঠীদের বাড়ি থেকে তাদের বাবা, কাকা, জেঠাদের কেউ না কেউ, তাদের খোঁজখবর নিতে আসতেন, আমার কেউ আসতেন না। অবশ্য এটা যে তাঁরা অভিসন্ধি করে করতেন, তা নয়। তাঁদের এ ব্যাপারটা প্রয়োজন বলেই বোধ হত না সেসব দিনে। আমিও এরকম আশা পোষণ করিনি কোনওদিন। তবে অস্বস্তি হত যখন সহপাঠীরা বা তাদের গুরুজনেরা এ ব্যাপারটা নিয়েও কোনও প্রশ্ন করত তখন। তাদের বাবা, কাকা, জেঠাদের সঙ্গে আমার জনেদের যে ঠিক কী কারণে তফাৎ এবং কেন তাঁরা আমাদের এইসব বিষয়ে মনোযোগী নন, তা সহপাঠীদের বোঝাবার কোনও উপায় আমার ছিলনা। ব্যাপারটায় শুধুমাত্র অভ্যস্তই ছিলাম, এর কারণ কর্তাদের বিকৃত অভিজাত্য বোধ না উদাসীনতা, তা আজ পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারিনি।

পরীক্ষা শেষ হলে অসুস্থ অবস্থায়ই বাড়ি ফিরে এলাম। আমার কোনওদিনই খুব একটা রোগ ব্যাধি হতনা। অপুষ্টিজনিত কারণে অন্য আর পাঁচটা পাড়াগাঁয়ের ছেলেদের মতো রোগাডিংলা ছিলাম এই যা। কিন্তু এই হাম জ্বর আমাকে ভীষণ কাহিল করে দিল। বেশ কয়েকদিন ভোগার পর জ্বর এবং হাম ভাল হল বটে, কিন্তু শরীরটা ভেঙে চুরে হয়ে দাঁড়াল একটা না খেতে পাওয়া নেংটি ইঁদুরের মতো। চলতে গেলে মাথা ঘোরে। অনেকক্ষণ বসে থেকে ওঠার সময় চক্কর লাগে। চোয়ালের হনু দুটো বিশ্রী রকম উঁচু হয়ে গিয়েছে—অর্থাৎ সে এক কন্দর্পকান্তি অবস্থা।

পরীক্ষা পরের দীর্ঘ অবসর। শুধুমাত্র ছাত্র পড়িয়ে সময় কাটে না। বাড়িতে থাকতেও মন চায়না। গ্রামে সমবয়সি কেউই নেই। পাশের মুসলমান গ্রামগুলোর ছেলেরা ফুটবল খেলতে খেলার মাঠে আসে, কিন্তু প্রায়ই সংখ্যায় কম হওয়ার জন্য খেলা হয়না। কাজেই আমাকে আড্ডামারা বা মনের খিদে মেটাতে যেতে হয় সেই কীর্তিপাশার বাজার অঞ্চলে। কিন্তু আমার বাড়ি থেকে ওখানে যেতে দীর্ঘপথ পাড়ি দিতে হয়। মেঠো রাস্তা ধরে অন্ধকারে বাড়ি ফেরা, বেশ ভয় ভয় করে। এমন জনহীন, নিঃশূন্য সব স্থান পাড়ি দিতে হয় যে মনে হয় পৃথিবীটা এখানে এসে শেষ হয়ে গেছে, আর এরপরেই এক অতল গহ্বর, একটু অসতর্ক পা ফেললেই অস্তিত্বহীন হয়ে যাব। কী

অসম্ভব নিঃসঙ্গ সেই জীবন এবং কী নিরানন্দময় যে সেকথা বুঝিয়ে বলা দুষ্কর। নির্জনতাপ্রিয় মানুষ যারা তারাও বোধকরি এ রকম একটা অবস্থা পছন্দ করবেনা। এতো ঠিক নির্জনতা নয়, এ হল জনহীনতা। এখানে এই সেদিনও ব্যাপক জনবসতি ছিল। আজ আর নেই। সেই জনবসতি ও গেরস্থালির স্মৃতিটি মনে আছে, তার চিহ্নগুলো ছড়িয়ে আছে চারদিকে। কোথাও একটা ভাঙা ঘাটওয়ালা পুকুর। তার ঘাটের সিঁড়িতে ফাটল ধরেছে। কোথাও বা একটা সমাধিমন্দির সারা গায়ে লতা, পাতা, ঘাস গজিয়েছে। কোথাও একটা দোলমঞ্চ বা তুলসীমঞ্চ। এরা সব আছে, কিন্তু মানুষ নেই। এতো নির্জনতা নয়। বরং স্মৃতিগুলো যদি না থাকত, এটা যদি একটা বিশাল বনভূমি হত তাহলে বেশ হত। যা হোক এই করে করেই দিন কেটে গেল এবং একসময় পরীক্ষার ফল বেরুল। গ্রামে খবর আসতে দুচার দিন দেরি হল। কারণ খবরের কাগজ অন্তত তিন দিনের বাসি না হলে সেসব দিনে আমবা গ্রামের পোস্ট আপিসে পেতাম না। পরীক্ষার ফল তখনকার দিনে গেজেটে বের হত। খবর নিয়ে এলো আমার আবাল্য সুহৃদ এবং সহপাঠী, আমাদের একদার নায়েব মশাইয়ের ছেলে। সে একটি গেজেট নিয়ে এক সকালে কীর্তিপাশা বাজারে হাজির। মনে পড়ে, বাজার শেষে বাড়ি ফেরার সময় তার সাথে একটি ব্রিজের উপর আমার দেখা। সে অত্যন্ত উত্তেজিত। গেজেটটি মেলে ধরে সে দেখাল, আমরা বন্ধুরা সবাই বেশ ভাল ভাবে পাশ করেছি। আমার ফল তো আশার অতিরিক্ত ভাল। তখনকার দিনে গ্রাম গঞ্জের ইস্কুলে আজকালকার মতো গণ্ডায় গণ্ডায় ছাত্রছাত্রী ফার্স্ট ডিভিশান পেত না। নম্বরও এত কাঁড়ি কাঁড়ি উঠত না। সেক্ষেত্রে ফার্স্ট ডিভিশানে পাশ করে একটি ন্যাশনাল স্কলারশিপ পেয়ে আমি এতই আপ্লুত হলাম যে খবরটি আদৌ সত্য কিনা বিশ্বাস করতে ভরসা হচ্ছিল না। বিগত কুড়ি বছরের মধ্যে আমাদের ইস্কুলে কেউ ফার্স্ট ডিভিশান পায়নি। তার উপর ডিস্ট্রিক্টে পজিশান এবং জাতীয় বৃত্তি। নিজের বাস্তব অবস্থিতি এবং চেতনা পর্যন্ত লুপ্ত হবার মতো অবস্থা আমার তখন। সমস্ত শরীর জুড়ে দ্রিদিম্ দ্রিদিম্ শব্দে এক বাদ্য বাজছিল। কিন্তু টুনু, মানিক এরা সব সেকেন্ড ডিভিশান পাওয়ায় বড়ই দুঃখিত বোধ করলাম। তারা ফার্স্ট ডিভিশান পাবার উপযুক্ত ছিল। বিশেষ করে টুনু তো বটেই। তবে পরবর্তীকালে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলোতে তার এই গ্লানি দূর হয়েছিল।

একটি কথা এইসূত্রে বলে নেওয়া দরকার। টুনুরা দুইবোন যে কো-এডুকেশান স্কুলে পড়াশোনা করে এ সংবাদ আগের স্কুলে থাকার সময়েই আমি জানতাম এবং বিষয়টি আমার কাছে খুবই আশ্চর্যের ছিল। আমাদের ওখানে পঞ্চাশের দশকের শেষ এবং ষাটের দশকের শুরুতে ব্যাপারটা খুব সহজ ছিলনা। তার উপর তারা ভদ্র হিন্দু পরিবারের মেয়ে। আমি আমার পিছারার খালের চৌহদ্দির পরিমাপে ব্যাপারটি বিচার করেছিলাম তখন। পরে যখন কীর্তিপাশা ইস্কুলে ভর্তি হই তখন বুঝি সেখানের বাতাবরণে কিছু ভিন্নতা ছিল। সেই ভিন্নতার কারণ এই যে, সেখানে একটি বাজার,

স্কুলটি এবং একটি পোস্ট আপিস ছিল। আর আশেপাশের গ্রামের অধিবাসীরা ছিল নমঃশূদ্র জাতির। কীর্তিপাশা গ্রামটিতেও বর্ণহিন্দুর সংখ্যা নিতান্ত কম ছিলনা। কাছাকাছি মুসলমান গ্রামগুলোর অধিবাসীদের সাথে সামগ্রিক ভাবে সৌহার্দ্যও ভালই ছিল। ফলে, সংখ্যালঘুদের মনে খুব একটা ভীতি বা অকারণ আতঙ্ক ছিলনা। বদমায়েশদের সংখ্যা যে একেবারে ছিলনা তা নয়, তবে তারা কখনওই যা খুশি তাই করতে পারত না। এ অঞ্চলে যেহেতু এই একটি ইস্কুলই ছিল, তাই সম্প্রদায় এবং ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে ইস্কুলটিকে সবাই সযত্নে রক্ষা করতে চেষ্টা করত।

আমার সহপাঠী, সহপাঠিনীরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের কৃতকর্মে খুশিই হল। গেজেট পাবার দিন ইস্কুল ছুটি ছিল। তাই আমরা প্রত্যেক সতীর্থকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে খবর দিয়ে এসেছিলাম। পরের দিন ইস্কুলে সবাই উপস্থিত হলে সমবেত ছাত্র এবং শিক্ষকদের মধ্যে আনন্দের ধুম পড়ে গেল। সবার দৃষ্টিই বিশেষ ভাবে আমার উপর। সে এক অদ্ভুত উত্তেজনা। মাস্টারমশাইয়েরা সবাই প্রাণ ভরে আমাকে আশীর্বাদ করলেন। হেডমাস্টারমশাই পকেট থেকে একটা কুড়ি টাকার নোট বের করে দপ্তরি বিরুদার হাতে দিলেন বাজার থেকে রসগোল্লা আনার জন্য। সেটা উনিশশো বাষট্টি সাল। কুড়ি টাকার তখন অনেক দাম। তখনও ষোলো আনায় একটাকার হিসেব চলছে এবং এক আনায় একটা বেশ বড় আকারের রসগোল্লা পাওয়া যায়। তাই কুড়ি টাকার রসগোল্লায় ছাত্র শিক্ষক এবং উপস্থিত অন্য দুচারজনের দিব্য কুলিয়ে গেল। পরীক্ষার ফল ভাল হলে আজকের দিনেও যথেষ্ট উত্তেজনা হয়ে বটে, তবে তখনকার দিনে, বিশেষ করে গ্রামের ইস্কুলগুলিতে যে ধরনের আনন্দ উত্তেজনা হত তার সাথে এর তুলনা হতেই পারে না। তখন তো এত ছাত্রও ছিলনা, ইস্কুলও ছিলনা। তাছাড়া আমাদের ঐ অজ গাঁয়ে আনন্দ, উত্তেজনার উপলক্ষ আজকের দিনের মতো ছিলই বা কী। এখন তো গ্রামে থাকলেও শহরের উত্তেজনা আনন্দ সহজেই ভোগ করা যায়। সেসব দিনে তা কল্পনাই করা যেত না। একমাত্র হাডুডু, ফুটবল খেলা আর যাত্রা রয়ানি কীর্তন গান এইসবই ছিল আনন্দ উৎসবের উপলক্ষ। তাই ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফলাফল ছিল আপামর জনজীবনে এক বিশেষ উত্তেজনার বিষয়, তা কোনও বাড়ির ছেলেমেয়ে যদি পরীক্ষার্থী নাও হত তবুও।

মাস্টারমশাইয়েরা সেদিন সমবেতভাবে আমাদের রেক্টর স্যারকে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানালেন। তিনি ব্যতীত যে এরকম ভাল রেজাল্ট ইস্কুলে হওয়া সম্ভব হত না, সে কথা বার বার বললেন। বস্তুতই তাঁর নিঃস্বার্থ অধ্যাপনা এবং বাড়িতে ছাত্রদের স্থান দিয়ে তাদের বিশেষ ভাবে শিক্ষা দান ব্যতীত এরকম ভাল ফল আশাই করা যায়নি। অথচ তিনি ইস্কুল থেকে বা তাঁর বাড়িতে যারা বিশেষ ভাবে সাহায্য নিত সেইসব ছাত্রদের কাছ থেকে কোনো অর্থই গ্রহণ করতেন না। আজকের দিনে পয়সার বিনিময়েও ছাত্রছাত্রীরা তাদের শিক্ষকদের কাছ থেকে অত সহায়তা পায় কিনা সন্দেহ।

পরীক্ষার ফল যেদিন গেজেট মারফত জানি সেদিন বাড়িতে কাউকেই কিছু বলিনি। কারণ ইস্কুলে যতক্ষণ না প্রকৃত খবর আসে ততক্ষণ নিশ্চয়তা নেই। ভাগ্য সারা জীবন

আমাকে নিয়ে নিষ্ঠুর খেলা খেলেছে। ঐটুকু বয়সের মধ্যেই অঢেল লাঞ্ছনা ভোগ করেছি বলে কোনও আকস্মিক আনন্দকেও কোনওদিন উচ্ছ্বাসভরে উপভোগ করতে পারিনি। আমি চেয়েছিলাম জেঠামশাই খবরটা আনুন এবং বাড়ির সবাইকে জানান। তিনি তাঁর ইস্কুলের রেজাল্ট আনার জন্য সদরে গিয়েছিলেন। তাঁর ইস্কুল থেকে সেবছরই প্রথম পরীক্ষা, তাই হেডমাস্টারমশাই হিসেবে তাঁকেই রেজাল্ট আনতে যেতে হয়েছিল। তিনি আগের দিনই গিয়েছিলেন, কারণ আমরা যেদিন গেজেট পাই সেদিনটা ছিল ছুটির দিন। আমি শুধু মাকে বলেছিলাম যে আমার রেজাল্ট সম্ভবত ভাল হয়েছে, এরকম শুনেছি। তবে এখনই কাউকে বলার দরকার নেই। জেঠামশাই সন্ধে নাগাদ ফিরলেন এবং বাবাকে ডেকে বললেন, He has got a first division and won a scholarship. I am happy. আমি কাছাকাছি ছিলাম। এগিয়ে গিয়ে দুজনকে প্রণাম করে বললাম, আমি সকালে গেজেট মারফত খবরটা পেয়েছি। বাবা অবাক হয়ে বললেন, কিছু বললিনা তো। বললাম, মাকে বলেছি। আসলে আমার ভেতর তখন আনন্দের সঙ্গে তীব্র অভিমান কাজ করছিল। ইস্কুলে ভর্তি হওয়া তক্, আমার যে পরিমাণ লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল তার উপযুক্ত একটা জবাব আমার দিতে ইচ্ছে করছিল। আমার আশাতীত কৃতকার্যতাই আমার জবাব এরকম একটা বোধে আমি আর কিছুই বললাম না। যাহোক বাবা এবং জেঠামশাই খুশিই হয়েছিলেন বোঝা গেল।

প্রকৃত খুশি এবং উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন সেদিন আমার মা। কোনও আনন্দদায়ক ঘটনা ঘটলেই মা তাঁর গুরুদেবের উদ্দেশে ভোগ নিবেদন করতেন। তাঁর গুরু ছিলেন কিরণ চাঁদ দরবেশজি। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন বলে দরবেশজি এবং আমার ঠাকুরদা মশাই পরস্পর খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। একারণে দরবেশজি আমার মা এবং বাড়ির আরও অনেকের মন্ত্রগুরু ছিলেন। মা প্রতিদিন সকালে স্নান করে এবং সন্ধ্যায় গা ধুয়ে আমাদের বাড়ির সিংহপালংকের উপর বসে বেশ খানিকক্ষণ সাধন ভজন, বাংলা গীতা পাঠ, দরবেশজি অনূদিত জপজী পাঠ করে তার পর গৃহকর্মে ব্যস্ত হতেন। সিংহপালংকের উপর অন্যান্য গুরুঠাকুর এবং ঠাকুর দেবতাদের সাথে দরবেশজির একখানি ছবি ছিল। সে যাহোক আমার কৃতিত্বের খবরে মা সেদিন সব ঠাকুরকে খিচুড়ি ভোগ দিলেন।

আগেই বলেছি মায়ের পড়াশোনা তেমন কিছু ছিলনা। অত্যন্ত বাল্য বয়সে পিতৃহীন হলে আমার একমাত্র মামা এবং মা খুব সামান্যকালই ইস্কুলে পাঠাভ্যাস করতে পেরেছিলেন। মামা খুব অল্প বয়সেই পশ্চিমবঙ্গের পলতায় মহালক্ষ্মী কটনমিলে শ্রমিকের চাকরি নিতে বাধ্য হন। মাকে তাঁদের মামারবাড়িতে রাখেন। তাঁদের বাড়ি ছিল ফরিদপুরে। সেখানে মায়ের যে আদৌ কোনও সমাদর ছিল তা নয়। নিতান্ত নিরুপায় হয়েই তিনি তাঁদের গলগ্রহ হয়েছিলেন। আমার পরীক্ষার ফল বেরোবার দিন সন্ধেবেলা থেকে মা অনেক রাত পর্যন্ত গান এবং তাঁর জীবনের নানান গল্প আমাদের শোনান। সেই সব কথাই এখন বলছি।

বড় চমৎকার গানের গলা ছিল মায়ের। মায়ের মামাতো বোনেরা মাস্টার রেখে গান শিখতেন। কবি এবং সংগীতকার অতুলপ্রসাদ সেন তাঁদের কী সম্পর্কে অথবা আপন মামা ছিলেন তা আজ আর আমার মনে নেই। তবে লখনউ থেকে এদিকে এলে তিনি কখনও কখনও তাঁর এই বোনের বাড়িতে যেতেন এবং ভাগ্নীদের গানের খোঁজ খবর করতেন। সেই সুবাদে মাও তাঁর ভাগ্নী। তখনকার দিনে দূর নিকট কোনও আত্মীয়তাই তুচ্ছ ছিল না। সে যদিও অনেককাল আগের কথা, আমার কালেও দেখেছি মানুষ আত্মীয়তার সূত্র প্রলম্ব করতেই আনন্দিত হত, আরাম পেত। আজকের দিনে যেমন আমরা জেঠতুতো, খুড়তুতো, মাসতুতো ইত্যাদি এবং অনেকক্ষেত্রে সহোদর ভাই, ভগ্নীদের সাথে পর্যন্ত আত্মীয়তায় থাকিনা, আমাদের সময়ে জেঠিমা, কাকিমা, মাসিমাদের সাথে তো বটেই তাঁদের কুটুম্বদেব সাথেও বেশ হার্দিক নৈকট্য থাকত। জেঠিমা, কাকিমাদের বাপের বাড়ি আমাদের সবারই মামারবাড়ি এবং সেসব স্থানে বরিশালীয় রীতিতে বলতে গেলে বলতে হয় যে দাদাভাইয়ের (অর্থাৎ ঠাকুরদা বা দাদামশাই) ভাইয়ের বন্ধুর 'পোলা তো আমার ঘোনো (ঘন) আত্মীয়।' তা সে থাক। সেসব এখন গতস্য শোচনা।

কিন্তু গল্প তা নয়। গল্প হচ্ছে মায়ের গান বিষয়ে। তাঁর কাছ থেকেই শোনা কথার স্মৃতিচারণ। মায়ের মামাতো বোনেরা যখন গান শিখতে বসতেন তখন মায়ের কর্তব্যকর্ম ছিল হারমোনিয়ামটা নামিয়ে দেওয়া এবং গান শেষ হলে সেটা উঠিয়ে রাখা। ঐ সব দিনে মায়ের খুব গাওয়ার ইচ্ছে হত, বিশেষ করে অতুলপ্রসাদের টপ্পাঙ্গের গানগুলো। কিন্তু গাওয়ার উপায় তেমন ছিলনা। একমাত্র যখন তাঁর মামিমা এবং মামাতো বোনেরা বাইরে কোথাও যেতেন তখন আমার মা সা এবং পা টিপে ধরে কিছু নিজের মনের মতো গাইতেন। ব্যাপারটি তাঁর মামির নজরে কোনওদিন পড়েনি। মায়ের মামাতো বোনেরা অতুলপ্রসাদ সেনের টপ্পা গানগুলোও করতেন। সেই গান শুনে শুনে মা বেশ কয়েকখানা অতুলপ্রসাদী টপ্পা এবং অন্য গান তুলে নিয়েছিলেন। এই সব গান গাওয়ার যোগ্যতা বা উপযুক্ত কণ্ঠও মায়ের বিলক্ষণ ছিল।

মায়ের যখন মন প্রফুল্ল থাকত তখন তিনি এইসব গল্প খুব করতেন। আমার রেজাল্ট বেরোবার দিন রাতে যখন মা এইসব গান গল্প কবছিলেন তখন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা বলেন। এক দিন তিনি নাকি 'ওগো নিঠুর দরদি একী খেলছ অনুখন' গানটি খুব চড়া পর্দায় আবেগের সাথে করছিলেন। তাঁর মামিমা এবং মামাতো বোনেরা তখন বাড়িতে ছিলেন না। কিন্তু বিপদ ঘটল অন্য দিক থেকে। গানটি গাওয়ার মাঝপথে মা খবর পেলেন যে গানের কবি তাঁর বোনের বাড়িতে এসে হাজির হয়েছেন। একথা শুনে মা ভীষণ ভয় পেয়ে তৎক্ষণাৎ গান বন্ধ করে আড়ালে লুকিয়ে পড়েন। কবি এসে ঘরে ঢুকে পরিচারিকার কাছে জানতে চান—কে গান করছিল। ইতিমধ্যে মায়ের মামিমা এবং মামাতো বোনেরা এসে হাজিব। কবি তাঁর ভাগ্নীদের কাছ থেকে মায়ের পরিচয় জানতে পেরে তাঁকে কাছে ডাকলেন। এই অভাবিত ঘটনায় মা কাঁপতে কাঁপতে

তাঁর সামনে এসে এই স্পর্ধার জন্য ক্ষমা চাইলেন এবং প্রণাম করতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন। মা তখন অত্যন্ত অল্প বয়সি। তাঁর মামিমা তাঁকে কখনই এইসব বিখ্যাত মানুষদের সামনে বেরোতে দিতেন না। এইসব কারণে মা খুবই আতঙ্কিতো ছিলেন। কি জানি অদৃষ্টে কী শাস্তি জোটে।

কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল কবি তাঁর অবস্থাটি সম্যক বুঝলেন এবং পাশে বসিয়ে সস্নেহে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি গান থামালে কেন? তোমরা গাইবে বলেই তো গানগুলো আমি লিখেছি। তাছাড়া তুমি ভীত হচ্ছ কেন? মা বলেছিলেন, কবি তাঁর বিবাহজনিত কারণে এবং ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার জন্য স্ব-পরিবারে আদৌ সমাদর পেতেন না। তাঁর এই বোনের বাড়িতে সেকারণেই তিনি কখনও কখনও আসতেন। খুব সুন্দর স্নিগ্ধ স্বভাবের মানুষ, অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ। তাঁর কথা শুনে মা কোনওমতে বলেছিলেন, আমি তো শিখিনি কখনও তাই ভুল—। অতুলপ্রসাদ তাঁকে অভয় দিয়ে বলেছিলেন,— তুমি এখানে আমার সামনে বসে যা যা জান কিছু কর, আমি শুনব। আর আমি যখন যখন আসব, তখন তোমাকে কিছু শিখিয়ে দিয়ে যাব। মা বলেছিলেন, ঐ রকম শান্তি আমি কোনওদিন পাইনি। তবে তাঁর কাছে শেখা আমার তেমন হয়নি, কারণ এর কিছুদিন পরই আমাকে চলে আসতে হয়েছিল। দাদা তখন চাকরি পেয়েছেন।

যাহোক সেই দিনটি আমাদের ঐ সময়কার দুঃখসর্বস্ব জীবনে একটি ব্যতিক্রমী দিন। পরের দিন ভোর থেকেই মনের মধ্যে নানান দুর্ভাবনার মেঘ জড়ো হতে শুরু করল। প্রথমেই যে দুশ্চিন্তাটি মাথায় এলো তা হল, এরপর কী? এতদিন গাঁয়ের ইস্কুলে মিনিমাঙ্না পড়েছি। মানুষের দয়া এবং করুণা সম্বল করে, সবার সহায়তা ভিক্ষে করে ম্যাট্রিক তো ভালভাবে পাশ করলাম। এরপর পড়াশুনো কোথায় করব? শহর ছাড়া কলেজ নেই। সেটা ১৯৬২ সাল। একমাত্র বরিশাল বি.এম. কলেজ এবং গ্রামীণ স্তরে চাখার ফজলুল হক কলেজ—এছাড়া কলেজ নেই। দুটি কলেজের দূরত্বই আমাদের বাড়ি থেকে সতেরো আঠেরো মাইল। এর যে কোনওটিতে পড়তে হলে হস্টেল বা কারুর বাসায় ব্যবস্থা করে থাকতে হবে। যাদের খাওয়া জোটেনা, তাদের বাড়ির ছেলের শহরের হস্টেলে থাকার খরচ দেবে কে? তাছাড়া বরিশাল শহরে অথবা চাখারে আমার কোনও পরিচিত আত্মজন নেই যেখানে আশ্রয় নিতে পারি। এটুকু শুধু জানতাম যে কলেজে আমাকে মাইনে দিতে হবে না। Scholarship-এর টাকায় সেটা চলবে। কিন্তু শহরে নানান খরচের সমস্যা আছে। বইপত্র, মোটামুটি ভদ্রস্থ জামাকাপড়, বিছানাপত্র কোত্থেকে জোগাড় হবে? এইসব দুশ্চিন্তায় আমার পাশের আনন্দ মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। বাবার সাথে এসব আলোচনা করার কোনও অর্থ ছিলনা, তবু দু এক কথা বললাম। তিনি বললেন, দেখি দাদা কী বলেন। সেই চিরাচরিত দাদা-নির্ভরতা। তবে মনে একটু আশাও হল। আগের দিন তিনি আমার পরীক্ষার সফলতা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর পক্ষে অনেক কিছু করাই সম্ভব। বরিশাল সদরে তাঁর ব্যাপক পরিচিতি আছে। চেনাজানা যে কোনও একটা জায়গায় রেখে ভর্তিটা

যদি করিয়ে দেন, তাহলে আমি যে করে হোক চালিয়ে নিতে পারব এ বিশ্বাসও আমার ছিল।

সেদিনই সন্ধেবেলা বাবা জেঠামশায়ের কাছে এ বিষয়ে কথাটা পাড়লেন। জেঠামশাই এমনিতে আমার সাথে বাক্যালাপ করতেন না। কিন্তু কী ভাগ্য! বাবার কথার উত্তরে তিনি খুব সহজ স্বাভাবিক ভাবে আমাকে বললেন—আমি চাই তুমি সাইন্স নিয়ে পড়। You have done a very good result, you should go ahead with science. আমি তোমাকে ব্রজমোহন দত্ত কলেজে ভর্তি করাব ঠিক করেছি। থাকার ব্যবস্থাও হয়ে যাবে। Henceforth you are to think only for your studies. কোনও চিন্তা নেই। বলে কী? আমার দু কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। অকস্মাৎ পিছারার খালের জগতের রঙটাই যেন বদলে গেল। আমি এই আশ্বাস বাক্যে তাঁর বিগত দিনের সব দুর্ব্যবহার, নির্যাতনের কথা ভুলে গেলাম এবং তাঁকে বড় অমায়িক বলে মনে হতে লাগল। মা বাবা উভয়েই খুব নিশ্চিন্ত হলেন। বাবা জেঠামশাইয়ের উপর আমার বিরাগের কথা জানতেন। সম্পর্কটা সহজ ছিল না বলে খুব দুঃখিতও ছিলেন। এখন জেঠামশাই এইসব কথাবার্তা বলে চলে যেতে, তিনি আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে মায়ের সাথে তাঁর দাদার নানান বিবেচনা এবং গুণের কথা আলোচনা করতে লাগলেন। আমি আমার প্রাক্তন বিরাগতার কথা চিন্তা করে মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলাম।

একটা কথা সবাই বলাবলি করছিল যে আমি scholarship পেয়েছি, সুতরাং পড়াশোনার ব্যাপারে আমার কোনও অসুবিধে হবে না। কিন্তু যেহেতু আমি নিতান্ত গাঁইয়া বুদ্ধির ছেলে ছিলাম তাই এর অর্থ আমার কাছে পরিষ্কার ছিলনা। শুধু এটুকু বুঝেছিলাম যে আমাকে কলেজের মাইনে দিতে হবে না। এ ছাড়া এর অন্য কোনও যে তাৎপর্য আছে তা আমি জানতাম না। কারুর কাছে জিজ্ঞেস করতেই লজ্জা বোধ হচ্ছিল। ইস্কুল কলেজে পড়াশোনা করতে গেলে প্রতিমাসে মাইনে দিতে হয় আর পরীক্ষার সময় ফী দিতে হয়, সর্বপ্রথম ভর্তি ফীও দিতে হয়—এগুলো জানা ছিল। সারা স্কুল জীবনে দু মাসের মাইনে বাবদ মোট আড়াই টাকা দিয়ে ছিলাম, তারপর আর দেয়ার ক্ষমতাও হয়নি, দিইওনি। অতএব, কলেজের ব্যাপারটাও যদি মিনিমাঙনা হয়ে যায় তার থেকে উত্তম আর কী হতে পারে? এই চিন্তায় মন বড় খুশি হল। আমি শহরে থেকে কলেজে পড়ব, দেশের ঐতিহ্যপূর্ণ কলেজ—ব্রজমোহন দত্ত কলেজ। আমার মতো একটি নগণ্য ছেলে সেখানে সব বিখ্যাত অধ্যাপকদের কাছে পড়াশোনা করতে পারবে—এইসব মধুর কল্পনা আমাকে এতই উচ্ছ্বসিত আনন্দ এবং উত্তেজনায় পৌঁছে দিয়েছিল যে প্রায় আহার নিদ্রা পর্যন্ত বন্ধ হবার উপক্রম। এই তো আমার স্বপ্ন ছিল, সেই স্বপ্ন আজ সফল হতে চলেছে। জেঠামশায়ের উপরে আমার আর আদৌ কোনো ক্ষোভ থাকলনা। ভাবতে লাগলাম আজ পর্যন্ত যত অসম্মান, নির্যাতন তিনি আমার উপর করেছেন, সে সবই আমাকে মানুষ করাব জন্য।

অভিভাবকের কর্তব্যকর্ম হিসেবেই করেছেন। অন্তরে অন্তরে তিনি প্রকৃতই আমাকে স্নেহ করেন। তাঁকে শ্রদ্ধা করতে পারতাম না বলে মনে মনে একটা গভীর গ্লানি দীর্ঘকাল পুঞ্জীভূত ছিল। আজ সেটা একেবারেই পরিষ্কার হয়ে গেল। অন্তরে একটা নির্মল আনন্দ উপভোগ করতে লাগলাম। শ্রদ্ধাভাজনদের কোনও কারণে যদি বাধ্য হয়ে অশ্রদ্ধা করতে হয়, তার বেদনা অনেক। আমার সেই বেদনা আজ দূর হয়ে গেল। আমার মন যখন এরকম এক আবেগে পরিপূর্ণ তখন আমার ভাগ্য দেবতা বোধহয় অলক্ষ্যে ঠোঁট টিপে হাসছিলেন।

এইখানে একটা মোদ্দা কথা বলা দরকার। আমার জীবন চিরদিন আমাকে নিয়ে এমন খেলা খেলেছে, যে খেলায় কোনও পক্ষপাতহীন রেফারি ছিলনা। যে রেফারিটি ছিল সে খেলার মধ্যে যে-কোনও সময় বাঁশিটি বাজিয়ে দিয়ে খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করত। বোধহয় সে চাইত না আমি কখনওই জিতি। আমি প্রতিবারেই একজন হতভম্ব স্ট্রাইকারের মতো গোলের দিকে ছুটতে গিয়ে ডাইনে বা বাঁয়ের পোস্টের সাথে ধাক্কা খেয়ে বেশ কিছুকাল অচেতন হয়ে পড়ে থাকতাম। এই কথাটা কতখানি সত্য, পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ অনুসরণ করলে, পাঠক সম্যক বুঝতে পারবেন।

শহরে যাবার সরঞ্জাম সংগ্রহ করাটা জরুরি হল। বরিশাল শহরে ইতিপূর্বে মাত্র দুবার গিয়েছিলাম। একবার অত্যন্ত ছোটবেলায়, সে স্মৃতি কিছুমাত্র স্মরণ নেই। আরেকবার একটু বড় বয়সে। ছোট ভাইটা গাছ থেকে পড়ে গিয়ে হাত ভেঙে ফেলেছিল, তার চিকিৎসার জন্য। সাথে পাড়ার একজন কে যেন ছিল—সেও আবছা স্মৃতিমাত্র। জ্ঞানত আমার এই প্রথম শহর যাত্রা এবং বসবাস। শহরের জীবনযাপন প্রণালী, তার অলিগলি, বিভিন্ন স্থানাদি ইতিপূর্বে আমার অভিজ্ঞতায় আদৌ ছিলনা। ঝালকাঠি বন্দর শহরের যে অভিজ্ঞতা ছিল, এই শহরটির রকমসকমও তেমনই হবে, এরকম একটা ধারণা নিয়ে আমি আবশ্যকীয় জিনিসপত্র গোছগাছ করতে শুরু করলাম। মা বলেছিলেন যে শহরে জুতো পায় দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। গ্রামে আমাদের জুতোর দরকার প্রায়শই হতনা। বাজার থেকে বারো আনায় একজোড়া হাওয়াই চপ্পল কিনে নিলাম। কিন্তু জামা কাপড়ের সংস্থান করা নিতান্ত সহজ হলনা। মায়ের হাতে তৈরি, মার্কিন কাপড়ের একটি পাজামা ও একটি জামা আমার ছিল। অনেক কষ্ট করে মা ঐরকম আরেক প্রস্থ মার্কিনি জামা পাজামা তৈরি করে দিলে পোশাকের সমস্যা মিটল। কোথায় থাকব-না-থাকব তার ঠিক ছিলনা বলে বিছানার ব্যবস্থা করলাম না। একটা টিনের ছোট বাক্সে জামা কাপড়, একটা লুঙ্গি এবং গামছা, আর দুএকখানা পাঠ্যবিষয় বহির্ভূত বই সাজিয়ে নিলাম। এর বেশি আমার কিছু ছিলও না, বা তার জন্য কোনও অভাব বোধও করতাম না। তখনও শহর জীবনে পোশাকের পারিপাট্য এবং তার ভূমিকা বিষয়ে আমার কোনও ধারণাই ছিলনা। পরবর্তীকালে দেখে এবং ঠেকে শিখলাম যে সেখানের মানুষরা খাক্ না খাক্ পোশাকে পরিপাটি থাকে। নচেৎ শহর জীবনে তারা আদৌ কল্কে পায় না।

যাহোক, অবশেষে আমার সেই আকাঙ্ক্ষিত দিনটি উপস্থিত হল। জেঠামশাই আমাকে নিয়ে বরিশালের উদ্দেশে রওনা হলেন। সময়টা ১৯৬২ সালের কোনও একটা দিন। তখনও ঝালকাঠি বরিশাল মোটরবাস খুব একটা চালু হয়নি। কেনেস্তারা টিমে মোড়া দু একখানা গাড়ি খুবই অনির্দিষ্ট ভাবে যাতায়াত করত। রাস্তাটিও খুবই করুণ। একারণে জেঠামশাই মোটর লঞ্চেই যাওয়া ঠিক করলেন। আমাদের কাছাকাছি, গাবখানের নদীর একটি ঘাট থেকে আমরা লঞ্চে উঠলাম। ঘাটটি তৈরি করিয়ে ছিলেন কীর্তিপাশার রোহিনী কুমার রায়চৌধুরী মশাই। এক সময় এই এলেকাটি খুবই বর্ধিষ্ণু ছিল। খুলনাগামী স্টিমার ইত্যাদি যাত্রী এবং মালবাহী জলযানগুলি পথ সংক্ষেপের জন্য এই নদীপথে যাতায়াত করত এবং এই ঘাটে নোঙরও করত। ঘাটটির নাম ছিল রোহিনী গঞ্জের ঘাট। ঘাটের কাছাকাছি মহাশয়দের একটি কাছারি বাড়ি ছিল খাজনা পত্র আদায়ের জন্য, আর ছিল একটি বড় হাট তথা স্থানীয়া ফসলাদির বাণিজ্য কেন্দ্র। এখন অবশ্য সেসব আর কিছুই নেই। ঘাটটি বহু আগেই নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। রোহিনীগঞ্জ নামটিও খুব পুরোনো লোক ছাড়া এখন আর কারুর মনে নেই।

এই জলপথটিকে যদিও আমরা গাবখানের নদী বলি, আসলে এটি একটি কাটা খাল মাত্র। প্রাচীন জনেরা একে ধানসিদ্ধির খালই বলে থাকেন। এক সময় একটি ছোট খাল ছিল। কবি জীবনানন্দ সম্ভবত একেই 'ধারসিঁড়িনদী' আখ্যা দিয়ে অমর করেছেন। বাণিজ্যিক এবং যাতায়াতের সুবিধের জন্য সম্ভবত উনিশ শতকের কোনও একটা সময় ব্রিটিশ শাসকেরা এটিকে সংস্কার করে সুগন্ধা অর্থাৎ ঝালকাঠি নদীর সাথে শেখের হাটের নদীটির যোগাযোগ ঘটান। ফলে বরিশাল অঞ্চলের সাথে তার পশ্চিমস্থ ভূভাগের পথ অনেকটাই সংক্ষিপ্ত হয়।

যাহোক জেঠামশায়ের সাথে লঞ্চে উঠে নদীর দুই তীরের গাছপালা, গৃহস্থালি দেখতে দেখতে চলতে লাগলাম। নদীর মাঝখান থেকে তীরের দৃশ্য বড় চমৎকার। এর আগে স্টিমার বা লঞ্চে যে চাপিনি তা নয়। কিন্তু সেসব অতি শৈশবের ঘটনা, আবছা আবছা মনে পড়ে। একারণে এই লঞ্চযাত্রা আমার কাছে খুবই উপভোগ্য বোধ হতে থাকে। সাথে সাথে এও মনে হতে থাকে যে পিছারার খালের সোঁতায় ভেসে ভেসে বড় খালে পড়া, তারপর এই গাবখানের খালের বৃহত্তর পরিধি অতিক্রম করে ঝালকাঠি নদী অর্থাৎ সুগন্ধার বিস্তীর্ণতা পেরিয়ে কীর্তনখোলার আরও প্রসারতার মধ্যে পড়াটা যেন কী এক রহস্যময় ভাবে আমার জীবনের সাথে ওতপ্রোত।

তখনকার দিনে আমাদের দেশে যাতায়াত সাধারণত নৌকায়ই করতাম। লঞ্চের যান্ত্রিক ব্যবস্থা সেজন্য আমাকে খুবই মুগ্ধ করে তুলল। লঞ্চ যখন গাবখানের খাল অতিক্রম করে সুগন্ধায় পড়ল তখন উত্তেজনা আরও তীব্র হল। কী প্রকাণ্ড প্রসারতা, কী গভীর ভাব গাম্ভীর্যময় এবং অবশ্যই রহস্যময়। এর আগে সুগন্ধাকে তীর থেকে বহুবার দেখেছি। আজ তার বুকের উপর দিয়ে লঞ্চে যাবার সময় আমার হৃদয়মন যেন এক অলৌকিক বোধে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। একই সাথে ভয় এবং আনন্দের অনুভূতি

এর আগে কখনও এমন ভাবে অনুভব করিনি। অগ্রগতির সাথে সাথে নদীর ব্যাপ্তি ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছিল, আর আমি মন্ত্রমুগ্ধবৎ সেই বিশালতায় নিজেকে হারিয়ে ফেলছিলাম। নদীর পাড় ক্রমশ দূরবর্তী হচ্ছিল। গাছপালা, বাড়িঘরগুলি দ্রুতবেগে বিপরীত দিকে হারিয়ে যাচ্ছিল, আর আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন শৈশব, কৈশোরের পিছারার খালের জগৎ থেকে অতিদ্রুত অজানা এক জগতের দিকে ছুটে চলেছি। কোনও দিন আমি ঐ জগতে আর প্রবেশ করতে পারব না। এমন কি আমার সাথে আমার যে জেঠামশাই যাচ্ছেন, তাঁকেও একটা সময় আমাকে অতিক্রম করে যেতে হবে, যেহেতু তাঁর গন্তব্যস্থল নির্দিষ্ট এবং প্রত্যাবর্তনের বাধকতা আছে। আমি কখনও প্রত্যাবর্তন করলেও, তা কেবল খানিকক্ষণের প্রয়োজন সাপেক্ষে। ঐ জগতে আমি আর কোনও দিন স্থায়ী বাসিন্দা হতে পারব না। এরকম এক বোধ জন্ম নিলে আমি খুবই বিষণ্ণ হয়ে পড়লাম। মা, বাবা ভাইবোন এবং পরিচিত জনেদের থেকে, বাড়ির সেই প্রাচীন অট্টালিকা, বাগানের বৃক্ষাবলি, খালপাড়ের সেই পিতামহ পিতামহী সদৃশ জোড়া রেন্ট্রির স্নেহচ্ছায়া, এমন কি পুকুর দিঘি, ঝোপঝাড়, জঙ্গল সব কিছু থেকে আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। আমার এই চলার গতি এখন থেকে বাড়তেই থাকবে। প্রিয় কোনও স্থান, ব্যক্তি, বস্তু বা ভালবাসা কোনওকিছুই আঁকড়ে রাখতে পারব না। এই সময় আমার মনে হলে আমি বড় হয়ে গেছি! আমি এখন একজন সম্পূর্ণ একা মানুষ।

আমার এই তন্ময়তা কতক্ষণ ছিল স্মরণে নেই। একসময় যাত্রীদের মধ্যে ব্যস্ততা শুরু হলে বাস্তবে ফিরি। লঞ্চ জেটির দিকে মোড় নিয়েছে। নদীর মধ্য থেকে শহরের দিকে দৃষ্টি পড়লে তার অপূর্ব অবস্থান এবং সৌন্দর্য আমাকে মোহিত করে দিল। কীর্তনখোলা অর্ধচন্দ্রাকারে শহরকে বেষ্টন করে আছে। তীরবর্তী বৃক্ষাবলি এবং তাদের ফাঁকে ফাঁকে অট্টালিকাপ্রায় তথা ছোট বড় বাড়িগুলি অপূর্ব দেখাচ্ছিল। লঞ্চ এবং স্টিমারঘাটে অপেক্ষমাণ নানা ছোট বড় জলযানগুলির মাথায় বিভিন্ন বর্ণের পতাকাগুলি পত্‌পত্‌ করে উড়ছে। যাত্রীরা স্বাভাবিকি ব্যস্ততায় ওঠানামা করছে। সব কোলাহল এবং শব্দ ছাপিয়ে যেন কোনও এক স্টিমার তার ছাড়ার ভোঁ বাজাল। সব কিছু মিলিয়ে আমার একটা অদ্ভুত নতুন অনুভূতির সৃষ্টি হল। শহরটি সত্যই অত্যন্ত সুন্দর। আমাদের সেইসব দিনে অথবা তার আগেকার দিনে যাঁরা এ শহরকে দেখেছেন, তাঁরা জানেন যে এর ভেনিস অব বেঙ্গল নামটি মিথ্যে দেওয়া হয়নি।

জেঠামশাইয়ের সাথে নেমে তাঁর পিছন ধরে চলতে লাগলাম। তখনও জানিনা তিনি আমাকে কোথায় রাখবেন বা কী অবস্থার মধ্যে আমাকে থাকতে হবে। বাড়ি থেকে বেরোনোর পর এই দীর্ঘ পথযাত্রায় তিনি আমার সাথে একটিও কথা বলেননি। এই যে অতসব নতুন স্থান, নদী ইত্যাদি পেরিয়ে এলাম, কত প্রশ্নই না আমার মনের মধ্যে জাগল, কিন্তু সেসব জিজ্ঞেস করার মতো সাহস আমাদের ছিল না তখনকার দিনে। সে যুগে গুরুজনেরা নিতান্তই ভয়ের বস্তু। তাঁরা যদি অনুগ্রহ করে কখনও কিছু

বলেন তো বর্তে যাই। এটা অবশ্য তখনকার স্বাভাবিক রীতির মধ্যই পড়ে। আমার ক্ষেত্রে তো বিষয়টি আরও ভীতিপ্রদ অথচ নতুন স্থান বা নদ নদী ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক তথ্য তত্ত্ব বলা বা সেসব বিষয়ে পরিচয় দেওয়া তো গুরুজনদের আনন্দের বিষয়। কিন্তু সেসব সৌভাগ্যে অভাজনেরা বঞ্চিতই ছিল।

জেঠামশাই অনেক অলিগলি, বড়রাস্তা, ছোটরাস্তা অতিক্রম করে আমাকে একটি বাড়িতে নিয়ে গেলেন। বাড়িটির গায়ের উপর থেকে নীচে লম্বালম্বি ভাবে লেখা ছিল- 'আর্যলক্ষ্মী ব্যাঙ্ক প্রাঃ লিঃ।' সম্ভবত বাড়িটির কোনও একটি তলে ঐ ব্যাঙ্কের অফিসটি ছিল। সিঁড়ি ভেঙে তিন তলায় উঠে আমরা একটি ঘরে ঢুকলাম। সেখানে একখানা তক্তপোশের উপরে প্রায়বৃদ্ধ এক ভদ্রলোক বসেছিলেন। তাঁর সাথে জেঠামশায়ের আলাপচারিতায় বুঝলাম তাঁরা পরস্পরের সাথে পূর্ব পরিচিত। তাঁর সাথে নানান বিষয় কর্মের কথাবার্তা শেষ করে, আমাকে ওখানে অপেক্ষা করতে বলে জেঠামশাই কোথায় চলে গেলেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোক খানিকক্ষণ একথা সেকথা বলে, বললেন—তোমার জেঠামশাই একটু বাদেই আসবেন। তুমি বিশ্রাম কর, আমি খানিক ঘুরে আসি। বলে তিনিও চলে গেলেন। আমি একা। ঘরে একটা বইপত্তরও নেই যে পড়ে সময় কাটাব।

একা একা ঘন্টাখানেক সময় কাটানোর পর জেঠামশাই এলেন। কিন্তু যাকে তিনি সাথে করে নিয়ে এলেন, তাকে দেখে আমি বেশ ঘাবড়ে গেলাম। লোকটি আমাদের গ্রামেরই, বেশ পয়সাওলা লোকের বদ ছেলে। বিয়েটিয়ে করেনি। গ্রাম সুবাদে আমার বাবা জেঠামশাইয়ের নাতি সম্পর্ক। আমি এবং আমার পরের ভাই ছোটন ছোট বেলাকার তীব্র অভাবের দিনে যখন দুআনা এক আনা রোজে, পরিচিত লোকচক্ষুর আড়ালে জন খাটতাম তখন একদিন সে দেখে ফেলেছিল। পরে একদিন আমাদের গ্রামের পোস্ট আপিসের বারান্দায় কি একটা ছুতো করে আমাকে মেরেছিল। সম্ভবত আমাদের জনমজুর খাটার ব্যাপরটা তার পছন্দ হয়নি। কিন্তু সে আমাদের এধরনের কাজে নিয়োজিত থাকার কার্যকারণ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস পর্যন্ত না করে খুব একচোট গার্জেনি মার মারলে আমি খুবই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তার বাবা ছিলেন একজন বিখ্যাত মদ্যপ। তিনি গত হলে তাঁর পুত্রটি পিতৃপথের পরিধিটি আরও খানিকটা বিস্তৃত করে নিয়েছিল। কিন্তু সেটাও চূড়ান্ত ছিলনা তার আরও একটি স্বভাব ছিল, সে কথা যথাসময়ে বলা যাবে।

জেঠামশাই বললেন, ভালই হল, এখানে দাদুকে পেয়ে গেলাম। শহরে নগরে অজানা মানুষের কাছে তোমাকে থাকতে হবে না। দাদুই তোমার দায়িত্ব নিচ্ছে। তুমি তার সাথে চলে যাও। এখন থেকে শুধু পড়াশোনা ছাড়া অন্য কোনও দিকে মন দেবেনা। তাহলে দাদু আমি চলি—বলে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে কি মনে পড়ায় আবার ফিরলেন। হাতে প্যাকেট থেকে একখানা ফর্ম বের করে বললেন, ভুলেই গিয়েছিলাম। এই নাও ভর্তি হবার ফর্ম। ফিল - আপ করা আছে, আর এই ভর্তি ফী পঞ্চাশ টাকা আট আনা। ফর্মে সই করে কালই গিয়ে ভর্তি হয়ে যাও। লোকটিকে উদ্দেশ করে বললেন, তুমি

তো সবই জানো। সারা জীবন শুধু বোঝা টেনেই গেলাম। সে যাক্। আমার কর্তব্য আমি করলাম এখন এরা যা করে। তবে চললাম, একটু অবনী উকিলের কাছে যেতে হবে। বলে তিনি চলে গেলেন। আমি একটা কথাও জিজ্ঞেস করতে পারলাম না, কিছু বুঝতেও পারলাম না। তবে কৃতজ্ঞ বোধ করলাম এইজন্যে যে জেঠামশাই তাঁর যথাকর্তব্য করলেন। আমি এটা আশা করিনি। মনের মধ্য থেকে বহুদিন পোষিত গুরুজনকে শ্রদ্ধা করতে না-পারা জনিত গ্লানিটা দূর হল। তবে এই প্রথম এবং এই শেষ। তিনি আর কোনওদিনই এই শহরে আমার কোনও সংবাদ করেননি।

লোকটি আমার সাথে কোনওরকম খারাপ ব্যবহার করল না। বলল, আমি এখানে একটা সিনেমা হলে ম্যানেজারি করি। হলটা এখন প্রায় আমারই বলা যায়। যাহোক্ তুই চল। তোর কোনও অসুবিধে হবেনা। একটা রিক্সায় চেপে তার সাথে রাস্তা দিয়ে চলতে লাগলাম। সে অত্যন্ত খুশ মেজাজে শহরের নানান দর্শনীয় স্থানগুলি উৎসাহের সঙ্গে দেখাতে দেখাতে চলল। অনেকক্ষণ এদিক ওদিক দেখে আমরা একটা বিশাল ঝক্ঝকে প্রাসাদোপম বাড়ির গেটে গিয়ে উপস্থিত হলাম। বাড়িটি ঐ শহরের এক বিখ্যাত ধনী ব্যক্তির। তিনি তখন বেঁচে নেই। তাঁর দুই সংসারের পুত্র, কন্যা এবং এক স্ত্রী ঐ বাড়িটিতে থাকতেন। লোকটি ঐ মহিলার কি রকম যেন ভাই। সেই সুবাদে সিনেমা হলের ম্যানেজারি এবং ঐ বাড়িতে থাকা।

সকালে মা সামান্য চিঁড়ে মুড়ি কিছু খাইয়ে দিয়েছিলেন। সারাদিন আর কিছু খাওয়া হয়নি। বেলা অনেক হয়ে গিয়েছিল। বেশ ক্ষিদে তখন পেটে। হাত মুখ ধুয়ে আমরা দুজনে খেতে বসলাম। জীবনে সেই প্রথম জানলাম সে পৃথিবীতে কিছু মানুষ টেবিল চেয়ারে বসে খায়। শহর জীবনের আচরণ এবং উপকরণ বিষয়ে এভাবেই আমি অভিজ্ঞ হচ্ছিলাম। খাওয়া শেষ হলে আমার নতুন মুরুব্বি আমাকে নিয়ে বাড়িটির দোতলার একটি ঘরে ঢুকে বলল, এই ঘরে আমরা দুজনে থাকব। আমার ফিরতে একটু রাত হয়। তুই পড়াশোনা করে খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়বি। আমি আমার মতো আসব। তোর অসুবিধের কোনও ব্যাপার নেই।

ঘরটির সৌষ্ঠব এবং আয়োজন দেখে আমার মনে হচ্ছিল আমি স্বপ্ন দেখছি না তো। এত আরামের ব্যবস্থায় কোনওদিন থাকিনি, থাকব এমনও ভাবিনি। আর একবার মনে মনে জেঠামশাইকে কৃতজ্ঞতা জানালাম এবং আমার এতকালের পুঞ্জীভূত অভিমানের জন্য অনুতপ্ত হলাম। নতুন মুরুব্বির আচরণ বেশ সদয় এবং আন্তরিক। সে আমাকে একটা বিষয়ে সতর্ক করে দিল যে আমি যেন কোনও ক্রমেই এই বাড়ির কোনও ব্যাপারে কৌতূহলী না হই, কোনও কিছুতে যেন নাক না গলাই আর ছেলেমেয়েদের সাথে যথাসম্ভব না মেলামেশা করি। একজন দায়িত্বশীল অভিভাবকের মতো সে আমাকে এই কথা বলে তার অফিসে চলে গেল। ঐ দিন আর আমার করণীয় কোনও কাজ ছিলনা। বেলাও শেষ। একজন চাকর এসে ঘরের লাইটগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। টিনের বাক্সটা থেকে একখানা বই নিয়ে চেয়ারে বসে পড়তে

লাগলাম। বইখানা কার লেখা আজ আর মনে নেই। তবে বিষয়বস্তু প্রাক্-ইসলামি যুগের আরবদের ইতিহাস। খুবই চিত্তাকর্ষক বই। সহজ সরল ইংরেজিতে লেখা। বইটির মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীর লাগছিল প্রাক্-ইসলামি কিছু কবিতার উদ্ধৃতি। তার মধ্যে কিছু ছিল সম্পূর্ণ কবিতা, কিছু আংশিক। আজ ভাবতে অবাক লাগে যে ঐ রকম একটা নীরস এবং দীনতম পরিস্থিতিতেও কবিতা আমাকে অসম্ভব আকর্ষণ করত। তখন ষাটের দশকের শুরুয়াৎ। পৃথিবীর অন্য দেশের কথা ছেড়ে দিই, আমাদের বাংলা সাহিত্যেও কবিতার জগতে তখন বেশ বিপ্লব ঘটে গেছে। কিন্তু ঐ অজগাঁয়ে আমার মতো কাব্যপিপাসুরা তখনও মধু, হেম, নবীন এবং রবি ছাড়া কোনও বড় কবির কাব্য পাঠ করিনি, এমন কি রবীন্দ্র পরবর্তী নতুন কাব্যধারার কবিদের নাম পর্যন্ত জানতাম না। তখনও রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে শেষ কথা। বাবা একবার লিখেছিলেন,—

তার পরেতে উদয় হলেন
বাংলা দেশে রবি
হবু কবির আশা ভরসা
শেষ করলেন সবই।
ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান
এক কলমে লিখে
কেউ যে কিছু লিখবে পরে
গেছেন কী আর রেখে?

আমরাও এই ধারায়ই বিশ্বাসী ছিলাম। আরবদের প্রাক-ইসলামি যুগের ইতিহাস গ্রন্থখানায় যেসব কবিতার উদ্ধৃতি আমি পেয়েছিলাম তার ধরনধারণ সম্পূর্ণ অন্যরকম এবং সে কারণেই তা আমাকে মজিয়ে ছিল।

বইখানা বেশ পুরোনো। আমাদের পরিবারের এক শরিক, আমাদেরই সম্পর্কে কাকা হন, তাঁর ঘরে অনেক বইপত্র সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। তিনি নাকি খুবই পড়াশুনোর ভক্ত ছিলেন। তাঁকে আমি কোনওদিন দেখিনি। তাঁরা যখন বাড়িতে ছিলেন, তখন বাড়ির এবং আমাদের এস্টেটের সুবর্ণযুগ। বাবা বলতেন, এইসব বই বিনয়ের কালেকশান। তাঁরা বাড়িঘর ছেড়ে কবে যেন বিদেশ বিভুঁইয়ে। খুঁজেপেতে, বুঝে-না-বুঝে বইখানা স্ব-অধিকারে গস্ত করে নিয়েছিলাম। এখন যখন পড়ছি, দেখছি বড় উত্তম কাজ করেছি। বিনয় কাকারা কোনওদিন আর এই বইয়ের খোঁজ করবেন না। অতএব আমি যদি তা ভোগ করি কার কীই-বা বলার থাকতে পারে? সর্বোপরি আমরা একই বাড়িরই তো সন্তান, তাঁর উত্তরপুরুষ হিসেবে তাঁর বন্ধ ঘরের দরজার খড়খড়ি ভেঙে যদি তা আমি নিয়েই নিই কার কী বলার আছে? বই কারুর বাপের নয়। যে কেনে তারও নয়। যে পড়ে তার অবশ্যই। যেমন, দুধ খেত বলে গাই কমলাকান্তের, মালিক প্রসন্ন গোয়ালিনীর নয়। কিন্তু সে যা হোক হয়ে গেছে, আমি যে এখন বইখানা পড়ছি সেটাই আসল বাস্তব এবং আনন্দের কথাও বটে! নচেৎ বইখানা যদি সেরদরে বিক্রি

হয়ে লঙ্কা জিরে হলুদের মোড়ক হত তাহলে কি উত্তম হত? হত না। কিন্তু কথা হচ্ছে যে সব মানুষদের ইসলামে শরিক করে মহম্মদ তাদের উপর খরার খড়্গ তুলে ধরলেন তাদের গতি অতঃপর কি হল? যেসব মানুষ এরকম একটা জীবন যাপনের আনন্দে মশগুল, অবাধ স্বাধীনতা, অবাধ পান, অবাধ যুদ্ধ এবং অবাধ নারী সম্ভোগ, সেখানে তারা কদাপি কি সীমাবদ্ধতার আরোপণে সুখী হতে পারে? সুরার উপর বিধি নিষেধ আরোপ, তাদের পক্ষে খুবই ক্ষোভ এবং কষ্টের কারণ হয়েছিল। এমন কী মহম্মদের অব্যবহিত পরেও আমরা দেখি যে এক জীবন্ত সুরাপায়ী গোষ্ঠী তৈরি হচ্ছে পয়গম্বরের পরবর্তী প্রজন্মে, যেখানে পবিত্রাত্মা আবু আইয়ুব-উল-আনসারীর পুত্র পর্যন্ত একজন সভ্য। আমরা তার সুরা সঙ্গীত শুনে তাজ্জব বনে যাই—

Hand me then my cup and let alone the talk of those who reproach. Invigorate the bones whose end is decay and decomposition.

For delay in handling me over the cup or in keeping it back is the very death. But when the cup comes to me it is my very life.

সুরার উপরে সামগ্রিক নিষেধাজ্ঞাটিকে বেশ কিছু গোষ্ঠীর আরব মনুষ্য বড়ই অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখেছে। কিন্তু ভিন্ন আলোচনা থাক। বিশেষত যখন সুরা পান ইসলামে হারাম।

— আটত্রিশ —

বেশ খানিকক্ষণ ধরে বইটিতে মগ্ন ছিলাম। বাড়ির ছেলেমেয়েরা আমাদের আসার সময় থেকেই বেশ কৌতূহল সহকারে আমাকে পর্যবেক্ষণ করছিল। পরে আমার সাধারণ পোশাকআশাক, ক্ষয়াটে খর্বুটে দেহাকৃতি এবং সর্বোপরি দীন ভাব যে তাদের কৌতুকের কারণ হবে সেটা ভাবিনি। তারা এখন একা ঘরে আমাকে পেয়ে একে একে এসে উপস্থিত হল এবং নানারকম প্রশ্ন করতে লাগল। আমি তাদের সাথে সহজ হতে পারছিলাম না। তারাও সরল স্বাভাবিক আচরণ করছিলনা। কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলাম যে তারা আমাকে একটি নিরেট গাঁইয়া জীব হিসেবে শনাক্ত করেছে। এই ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটি যুবক ও একটি যুবতীও ছিল। পরে জেনেছিলাম তারা প্রয়াত গৃহকর্তার শ্যালিকা মতান্তরে দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত। তারা আমার তত্ত্বতালাশ সবিশেষ সংগ্রহ করেছিল। তাদের গায়ের রঙ তামাটে, মাথার চুল প্রায় নিগ্রোদের মতো কোঁকড়ানো এবং চক্ষু কটা। বুঝলাম জেঠামশাই এদের অপরিচিত নন এবং আমাদের একদার তালুকদারির বিষয়েও তাদের খবর আছে।

প্রসঙ্গত, বরিশাল সদরে, আমাদের তালুকদারির কালের একটি সুদৃশ্য বাংলা ছিল। যাঁরা ইসমাইল হোসেন খান চৌধুরী সাহেবের গরিবখানার (আসলে দৌলতখানা) তত্ত্ব তালাশ জানেন। তাঁরা রায়বাহাদুর ভবনের কথাও জানবেন। দুইটি ভবন পাশাপাশিই ছিল। বাংলাটি ছিল রায়বাহাদুরদেরই দখলে। আমার বাবা এবং জেঠামশাই তাঁদের

স্কুল জীবনে ঐ বাড়িতে থেকেই পড়াশোনা করেছেন। তখন অবশ্য পরিবারটি একান্নবর্তী ছিল। পরে তালুকদারি ভাগ হলে তাঁরা বড়তরফ হন এবং দেশভাগের বহু আগেই দেশত্যাগ করেন। এই সব কারণে এই বাড়ির লোকেরা আমাদের পরিচয় জানত। এখন ঐ কটা-চোখওয়ালারা আমাকে রায় বাহাদুরের বাড়ির ছেলে বলে শনাক্ত করলে আমার সম্যক সমস্যার সৃষ্টি হল। সে সমস্যা বর্ণনা করা একান্তই অসম্ভব। ওরকম একটা বাড়ির ছেলের কেন এরকম ভাবে আশ্রয় নিতে হবে এটাই তখন তাদের কাছে প্রধান প্রশ্ন। যদিও তাদের যা অবস্থা এবং আয়োজন তাতে কে আশ্রয়ী, কে চাকর তাতে তাদের কিছুই যায় আসেনা। কিন্তু যেখানে খোঁজাখুঁজি করলে কিছু আমোদ পাওয়া যায় সেখানে মানুষ খুবই অকারণ নির্মমতার দ্বারা পরিচালিত হয় এবং এক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় হলনা। অতএব আমি একটি অত্যন্ত নিষ্ঠুর উৎপীড়নের শিকার হলাম। তারা ছোট বড় নির্বিশেষে, বাক্যেবচনে এবং কার্যে আমার উপর নানাপ্রকার পরীক্ষা নিরীক্ষার আয়োজন করল। আজকের দিনে যাকে র‍্যাগিং বলা হয়, ব্যাপারটি মূলত তাই ছিল। তাদের প্রধান আমোদের কারণ হল এই যে অতঃপর রায় বাহাদুরের বাড়ির একটি ছেলে তাদের অন্নধ্বংসকারী হিসেবে সেখানে আশ্রয় নিয়েছে। কালিদাস গেয়েছেন, 'যাচঞা মোঘাবরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা'। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে সেটাই ঘটল। শহর জীবনের অমানবিক হৃদয়বৃত্তিহীনতাই আমাকে প্রথম আঘাত করল।

উৎপীড়ন ব্যাপারটা যতক্ষণ মানসিক স্তরে থাকে ততক্ষণ আত্মসংবরণ করে হজম করার চেষ্টা করা যায়। কিন্তু তা যখন শারীরিক, বিশেষ করে যৌন পর্যায়ে চলে যায় তখন উৎপীড়িতের মধ্যে এক ক্রোধ জন্ম নেয় এবং তা অত্যন্ত মারাত্মক। হয়ত তা আত্মঘাতী, কিন্তু তখন বিচার আর থাকে না। আমি আমার অনুজ অনুজাদের সামনে যেসব বাক্য বা ক্রিয়ারি কথা উচ্চারণ করা কোনওদিন স্বপ্নেও চিন্তা করিনি, বা অন্য কোথাও আমাদের গ্রামীণ মণ্ডলেও দেখিনি, এখানে তার অনুশীলন অত্যন্ত অবাধে হতে দেখলাম। এদের মধ্যে অজাচার যেন স্বাভাবিক এবং খোলাখুলি। তাদের পারস্পরিক সংলাপ, ভাষার ব্যবহার, দৈহিক আচার আচরণ আমার কাছে এত ক্লেদাক্ত বোধ হতে থাকল যে আমি বাধ্য হলাম তীব্রভাবে প্রতিবাদ জানাতে। কিন্তু ফল হল উল্টো। তারা তখন ছোটবড় নির্বিশেষে আমাকে শারীরিক লাঞ্ছনায় মনুষ্যত্বের শেষতম অবমাননায় নিয়ে গেল। আমি যদি ছেলে না হয়ে মেয়ে হতাম তবে বোধ হয় মরেই যেতাম। যৌনতা বিষয়ে এত স্থূলরুচি এবং আচরণ ইতিপূর্বে আমার অভিজ্ঞতায় ছিলনা। তাদের মধ্যে কোনওরকম সম্ভ্রম বোধের সীমানা ছিলনা। তারা নানা ধরনের যৌন সম্ভোগের বিষয়ে আলোচনা অত্যন্ত উচ্চকণ্ঠেই করছিল এবং আমার উপর সে সবের প্রয়োগও চলছিল। এবিষয়ে বিশদ বর্ণনা শালীনতা বিরোধী, তাই পাঠক পাঠিকাদের অনুমানের উপর তা ছেড়ে দিলাম।

একটা ব্যাপার আমি বুঝলাম যে আমার বাল্যাবধি যে শিক্ষা এবং মূল্যবোধ আমার ভিতরে ক্রিয়াশীল ছিল, এদের সাথে তার পার্থক্য বেশ কয়েক যোজনের। আমার

ঐ সময়টুকুর মধ্যেই একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেল যে এদের সাথে আমার কোনওদিন, কোনওমতেই কোনও যোগসূত্র স্থাপিত হবে না। প্রতিপক্ষ অবশ্য তখন অন্য এক বিশ্বাসে আস্থাবান হয়ে কণ্ডুয়িত হল। তাদের বিশ্বাস, তাদের চোখের ভঙ্গিতেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, তা হল — 'ইহা একটি উৎকৃষ্ট গিনিপিগ। ইহাকে লইয়া কিছুদিন আমোদ মজা করা যাইতে পারে। একদিনেই গোটাটা চটকাইয়া শেষ করিয়া ফেলার হেতু নাই।'

তারা আমাকে নানাবিধ চট্‌কানা দিয়ে চলে গেলে, খানিকক্ষণ আমি অচেতনের মতো পড়েছিলাম। সারাটা ঘর একটা নরককুণ্ডের মতো বাড়ির বালগোপাল এবং গোপিনীদের নানাবিধ কুকর্মের অভিজ্ঞান সহ যেন আমাকে উপহাস করছিল। খানিকটা ধাতস্থ হবার পর আমি সন্তর্পণে ঘর ছেড়ে রাস্তায় বেরোলাম। বাসা ছাড়ার সময় গৃহকর্ত্রী জানতে চাইলেন আমি কোথায় যাচ্ছি। আমি ইতিপূর্বের ঘটিত ঘটনার কিছুমাত্র আভাস না দিয়ে জানালাম যে আমি একটু নদীর ধারে ঘুরে-ফিরে আসছি। তিনি কিছু আপত্তি করলেন না। আমি ঐ দঙ্গলের অশ্লীল আচরণ থেকে মুক্ত হয়ে নদীর আশ্রয়ে চললাম। স্থানটি প্রাকৃতিক ভাবে তখন অতি মনোরম ছিল। নদীর তীরে বেশ কিছু ঝাউ এবং সংগতি রেখে অন্যান্য বৃক্ষ মহীরূহাদি ছিল। তাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে চলতে চলতে একসময় নদীর কাছে পৌঁছোলাম। নদী তখন যথারীতি নির্বিকার চলমানতায় ছলচ্ছল শব্দে বয়ে চলছিল। আমি আমার বিধ্বস্ত দেহখানা তার কূলস্থ এক ঝাউ-এর শিকড়ে স্থাপন করে ভাবলাম, এপর্যন্ত যা হল তা তো জানলাম। এরপরে কী? 'এহবাহ্য আগে কহ আর।'

এই নদীর নাম কীর্তনখোলা। এর তীরে তীরে যত গ্রামগঞ্জ আছে, সেসব স্থানে প্রতিসন্ধ্যায় হিন্দু এবং মুসলমানদের কীর্তন শোনা যায়। সেইসব গ্রামগঞ্জের সাধারণ মানুষ সারাদিন কাজকাম করে সন্ধেবেলায় নিজ নিজ বিশ্বাস এবং আচার অনুযায়ী তাদের আরাধ্য গুরু, দরবেশ, ফকীর, মুর্শেদ বা সাঁইদের উদ্দেশে কীর্তন গায়। এরা প্রায় সবাই লোকায়তিক ধর্মাচরণে অভ্যস্ত। জগতসংসারের সব কিছুতেই তারা বিশ্বাসী। সেঁজগাছের মনসা যেমন তাদের কাছে জাগ্রত দেবী, তেমনই পীরস্থানের মাজারে যিনি অন্তিম শয়ানে আছেন, সেই পীরবাবাও। এরা গ্রহণ বর্জনের স্বাভাবিক নিয়মের ব্যত্যয়ে কদাপি যায় না।

সেইখানে নদীর তীরে, বৃক্ষমূলে বসে আমি আশপাশের কুটীরগুলো থেকে এইধরনের কীর্তন শুনছিলাম। নদীর তীরের বৃক্ষাবলির মধ্যে অনেক কুটীর এমত ছিল। সেইসব স্থান থেকে কীর্তন, আজান এবং নানান লোকায়তিক উপাসনার সঙ্গীত ভেসে আসছিল। আমি ক্লেদাক্ত ঐ অবস্থান থেকে বিযুক্ত হয়ে এখানে এসে এক অনুপম শান্ততায় নির্বেদযুক্ত হলাম। নদীও তার কলোচ্ছ্বাসে আমাকে অনেক শান্ত এবং স্নিগ্ধ করল। নদীকে তখন আমার প্রকৃতই পতিতোদ্ধারিণী বোধ হচ্ছিল। আবার এমনও মনে হচ্ছিল যে পৃথিবীতে কীর্তনখোলার সদৃশ মায়াবী নদী বোধহয় আর নেই। যেসব মানুষ

নদীর আশ্রয়ে বাল্যাবধি কাটিয়েছেন, একমাত্র তাঁরাই এর প্রসাদগুণ বুঝবেন। সে নদী ছোট হতে পারে, বড় হতে পারে কিংবা একটা সরু খাল বা নালাও হতে পারে প্রশ্নটা হচ্ছে সে চলমানা কিনা, তার স্রোতে ছলচ্ছল শব্দ জাগে কিনা। যদি জাগে, তবে মানুষ সেই শব্দে বড় শান্ততা পায়, গতি পায়, জীবন পায়। কীর্তনখোলার শব্দে আমি সেই জীবন পেলাম।

তখন অন্ধকার ঘনায়মান। নদীর দূরত্ব ঐ গৃহ থেকে খুব বেশি নয়। আমি সেই গাছটির তলায়, তার শিকড়ে ঠেসান দিয়ে বসে আছি। মনের মধ্যে ফেলে আসা জীবন এবং এক্ষণের সংঘট্টনের এক তীব্র সংঘর্ষ ক্রিয়াশীল। নদীর বুকের উপর দিয়ে নানারকমের জলযানগুলি নৈশ আলোয় সজ্জিত হয়ে আনাগোনা করছিল। আমার ঐ একাকীত্বে সামনের চলমানতা যেন এক সুস্পষ্ট অর্থবহতার সৃষ্টি করল। বহুদিন আগে মৌলবি সাহেবের বর্ণনায় কোরআন শরীফের তথা অনুবাদে পঠিত ওল্ড টেস্টামেন্টের কিছু কাহিনী মনের মধ্যে আলোড়িত হচ্ছিল। মৌলবি সাহেবের আয়াত আবৃত্তির মূলপাঠ আমার আজ আর স্মরণ নেই। তবে তার অনুবাদ কথাগুলি এরকম — 'আর আমি লুত্‌কে একটি বিশেষ জাতির প্রতি নবীরূপে প্রেরণ করিয়া ছিলাম। যখন তিনি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, তোমরা কী লিপ্ত থাকিবে এই কদর্য ও নির্লজ্জ কর্মে, যাহা তোমাদের পূর্বে বিশ্বজগতে আর কেহই করে নাই?' সদ্দাম নামক এক বস্তীর মানুষেরা সমকামী এবং অমিতাচারী ছিল। লুত তাদেরকে এই স্বভাব ছেড়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তারা তা শোনেনি। ফলে ঈশ্বরের অভিশাপ তাদের উপর আপতিত হয়েছিল। আমি ভাবছিলাম এইমাত্র যাদের কবল থেকে আমি পালিয়ে এলাম, সেই অভিসম্পাৎ এদের উপরও নেমে আসছে না কেন?

নদী কোনও সন্তাপের উত্তর সরাসরি দেয়না। কিন্তু তার কলধ্বনিতে, চলমানতার আচরণে মানুষ অবশ্যই কিছু উত্তর পেতে পারে যদি সে গভীর অভিনিবেশে তার কার্যাবলি অনুধাবন করে। তখন তার কলধ্বনিতে পরিষ্কার শোনা যায় যে সে বলছে— গ্রহণ কর। গ্রহণ করে জীর্ণ কর। জীর্ণ করে নীলকণ্ঠ হও। তারপর আবার এগিয়ে চল। আমিও একসময় বুঝলাম জগতে শুধু গ্রহণ করে করেই নীলকণ্ঠ হতে হবে। জীবন-জগত-রূপী সমুদ্র ক্রমান্বয়ে মথিত হতে হতে অমৃত উত্থানের পর্ব পার হয়ে এখন কেবল গরল উদ্‌গীরণ করছে। অমৃতের আস্বাদ হয়ত শুধু পূর্বজরাই গ্রহণ করে গেছেন। আমাদের অদৃষ্টে শুধুমাত্র গরলই জুটবে। ঐ গরল গ্রহণ করে যদি জীর্ণ করতে পারি মঙ্গল। নচেৎ তো বিষের আচ্ছন্নতায় সৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে যাবে। নদী যেন কানে কানে বলে দিল যে লুতের প্রতি পিছনে তাকানো নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তুমি আমার গতির দিকে তাকিয়ে নিদর্শন গ্রহণ কর। মৌলবি সাহেব বলেছিলেন—বাজান তুমি এট্টু বিচ্‌রাইয়া দেহছেন দেহি এ্যার মদ্যে কিছু পাওন যায় কিনা, বলে তিনি একটি আয়াত পাঠ করেছিলেন যায় অর্থ — প্রাকৃতিক নির্বন্ধগুলিতে নিদর্শন আছে। জিজ্ঞাসুরা উহা হইতে প্রত্যাদেশ বা অহির সংবাদ পাইয়া থাকে।

আমার মনে হতে লাগল জেঠামশাই যেন হযরত ইব্রাহিমের মতো আচরণ করলেন। তিনি আমাহেন ইসমাইলকে এক শূন্য মরুতে স্থাপন করে চলে গেলেন। এ স্থলে মাতা হাজেরাও উপস্থিত নেই। আমাকে আশ্রয় দানকারী সেই বৃক্ষটিকে নিজেই খুঁজে বের করতে হবে। আমাকেও ইসমাইলের মতোই সংরক্ষণ করা হবে, এরকম এক আশ্বাস নদী আমাকে নিদর্শনে জানালে আমি একজন অহীপ্রাপ্ত নবীর মতন সেই ঘরে ফিরে এলাম, সেখানে তখন নরকের ভোগের আগুন জ্বলছিল।

আমি যথাসময়ে খাওয়াদাওয়া সেরে নির্দিষ্ট ঘরের নির্দিষ্ট বিছানায় শুয়ে পড়লাম। সারাদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ঘুম আসতে দেরি হলনা। আমার নতুন মুরুব্বি কখন এসে শুয়ে পড়েছিল টের পাইনি। কিন্তু একসময় একটা প্রবল আকর্ষণে আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি অত্যন্ত আতঙ্কের সঙ্গে অনুভব করলাম যে এক জোড়া হাত আমাকে আকর্ষণ করছে। লোকটি অত্যধিক মদ্যপান করে এসেছে। এখন তার অন্য কিছুর প্রয়োজন। তাই এই টানাটানি। আমি মুহূর্তে ব্যাপারটি বুঝলাম এবং পাশ ফিরে খাটের কিনারা প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে ঘুমের ভান করে পড়ে রইলাম। লোকটা অনেকক্ষণ চেষ্টা চালিয়েও সুবিধা করতে না পেরে একসময় হতাশ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

আমার উপর সমকামীদের আক্রমণ অনেকবারই হয়েছিল। কিন্তু এই লোকটির মতো নির্লজ্জ কামুক আমি আর দেখিনি। অথচ তার স্বাভাবিক জীবনযাপন করার ক্ষেত্রে অর্থ সামর্থ্য ইত্যাদি কোনও কিছুরই অভাব ছিলনা। অতঃপর আর ঘুমোতে পাবলাম না। নানারকম আতঙ্ক আর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের চিন্তায় উজাগরই কাটাতে হল। স্বাভাবিক ভাবেই একটা সিদ্ধান্তে উপস্থিত হলাম যে এখানে থাকা চলবে না। সুতরাং রইল সাধের পড়াশোনা এবং মানুষ হওয়ার প্রচেষ্টা। কাল ভোরেই চুপিসারে কেটে পড়তে হবে।

— উনচল্লিশ —

পরদিন ভোর না হতেই সবার ওঠার আগে, চুপিচুপি টিনের বাক্সটি নিয়ে বের হয়ে পড়লাম। চাকরবাকরেরা উঠে গিয়েছিল। এবং দরজা খোলা ছিল। আমি কায়দা করে সবার অলক্ষ্যেই বেরিয়ে গেলাম। তখনও বেশ অন্ধকার। আগের রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। বর্ষা আসতে আর বিলম্ব নেই। ভোরের বৃষ্টি-ভেজা হাওয়া নদীর স্নিগ্ধতা মাখিয়ে আমার ক্লেদাক্ত অনুভূতিকে যেন নির্মল করে দিতে লাগল। আমি অনুমানে লঞ্চঘাট অভিমুখে চলতে লাগলাম। পকেটে ভর্তি হওয়ার পয়সাগুলি ছাড়া তিন চারটি অতিরিক্ত টাকা ছিল। ভাবলাম লঞ্চঘাটে গিয়ে প্রথমেই যে লঞ্চটি পাব তাতে চড়ে বাড়ি ফিরে যাব। যেখান থেকে বেরিয়ে এসেছি সেখানে কোনওক্রমেই আর যাবনা। যদি সেই লোকটি এসে আমাকে অনুরোধও করে তথাপি না।

লঞ্চঘাটে যখন পৌঁছোলাম তখন ভোরের আলো সবে ফুটেছে। আমি একটি লঞ্চ কোম্পানির অফিসের বারান্দায় একটি টুলের উপর বসে রইলাম। অফিসটি তখনও

খোলেনি। ফজরের আজান শুনে উঠে এসেছিলাম। গতরাত্রে ঘুমের খুবই ব্যাঘাত ঘটেছিল। তাই খানিকক্ষণ একা ও-ভাবে বসে থাকার পর খুব ঘুম পেল। টুলটির উপর শুয়ে পড়ে আমি অতল ঘুমে তলিয়ে গেলাম। গভীর ঘুমের মধ্যে একটা তাৎপর্যপূর্ণ স্বপ্ন দেখতে থাকলাম। দেখলাম ঐ শহরের সমস্ত লোক, তারা সবাই উলঙ্গ, তারা আমাকে তাড়া করে ধরতে আসছে। তারা সবাই বীভৎসদর্শন। আমি প্রাণপণে ছুটে পালাবার চেষ্টা করছি, কিন্তু পা চলছেনা। কখনও দেখলাম জেঠামশাই আমাকে দু হাতে তুলে চাকরদের দিকে নিক্ষেপ করছেন, বলছেন, এটাকে ভাল করে দুরুস্ত্ কর। এটা বাড়ির কুলাঙ্গার, সব মান, ইজ্জত আভিজাত্য ডুবিয়ে দিয়েছে, মার এটাকে। এটা জন মজুর খাটে, বাড়ির নারকেল সুপারি চুরি করে হাটে বিক্রি করে। এটা চোর, বদমাশ। আমি যেন হাত জোড় করে সবার কাছে মিনতি করছি, দেখ তোমরা আমাকে মেরো না। বড় ক্ষিদে পেয়েছে। আমাকে কিছু খেতে দাও। কিন্তু তথাপি প্রচণ্ড প্রহারে তারা আমাকে ছিন্ন ভিন্ন করছিল যেন।

হঠাৎ কে যেন আমাকে সজোরে এক ধাক্কা দিল। আমি ঘুমের ঘোরে নাআ, নাআ বলে চেঁচিয়ে উঠতে যে লোকটি ধাক্কা দিয়েছিল সে শুধোলো, কি মিএগ্র খোয়াব দ্যাখথে আছেলেন নাহি? তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। মুখের উপর রোদ্দুর পড়েছে। আমি ধড়মড় করে উঠে বসতে ধুতি সার্ট পরা এক ভদ্রলোক, সম্ভবত যে লোকটি আমায় ধাক্কা দিয়ে তুলে দিয়েছিল তার উপরওয়ালা, আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কৈথনে আইচ? যাইবা কৈ? আমার স্বপ্নের বিভীষিকা তখনও কাটেনি। দুইহাতে চোখ রগড়িয়ে কোনওমতে আমি গন্তব্যস্থলের কথা জানালাম। তিনি খুব অবাক হয়ে আমাকে আরও কিছু প্রশ্ন করে মোটামুটি ব্যাপারটা বুঝলেন। সাজিয়ে গুছিয়ে মিথ্যে কথা বলাটা তখনও রপ্ত হবার মতো বয়স হয়নি। তাই তাঁর প্রশ্নের উত্তরে সত্য কথাই জানালাম। যার কাছ থেকে পালিয়ে এসেছি, সেই লোকটিকে তিনি চিনলেন, জেঠামশাইকেও। খুব আশ্চর্য হয়ে আবার জিজ্ঞেস করলেন, কী কাণ্ড অ্যাঁ? ঐ হারামজাদারে এই শহরে কে না চিনে? একনম্বর মালউয়া। তোমার জেঠায় তার কাছে তোমারে রাখতে গেলেন ক্যান? ছিঃছিঃ! আমি ভদ্রলোককে লোকটির গতরাতের আচরণ বিষয়ে কিছুই বলিনি। শুধুমাত্র ঐখানে যে থাকা যাবেনা তাই বলেছিলাম। তাঁর প্রতিক্রিয়া দেখে বুঝলাম তিনি তাকে হাড়ে হাড়ে চেনেন এবং ঘৃণাও করেন।

এরপরে তিনি আমার পরীক্ষার ফল, বাড়ির অবস্থা ইত্যাদি বিষয় শুনে বললেন যে আমার বাড়ি ফিরে যাবার প্রয়োজন নেই। থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত তিনিই করে দেবেন। প্রতিদানে, তাঁর সন্তানদের আমি পড়াবো। প্রস্তাব শুনে আমি স্বর্গ হাতে পেলাম। তিনি আমাকে চা, রুটি, সন্দেশ ইত্যাদি খাইয়ে, তাঁর স্ত্রীর কাছে একটি চিরকুট লিখে দিয়ে বললেন, এই লও। রিকসা ঠিক কইরা দিতাছি স্যায় আমার বাসা চিনে। তোমারে পৌঁছাইয়া দিবঅনে। তোমার বৌদিরে গিয়া এই চিট্খান দিবা। সব ব্যবস্থা অইয়া যাইবঅনে। আইজ আর কলেজে যাইবার হ্যাপা কইর না। বাসায় গিয়া খাইয়া নইয়া

বিশ্রাম কর। কাইল যা অউক দেখন যাইব। তিনি ঢাকার টানে কথা বলছিলেন। শহরে আমার একটা আশ্রয় হল।

পরের দিন ভদ্রলোক তাঁর পাড়ার একটি ছেলেকে আমার সাথে দিয়ে বলে দিলেন যে আমি নিতান্তই গ্রামের ছেলে, সে যেন ভর্তির ব্যাপারে আমাকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করে। ছেলেটি আমার চাইতে বয়সে খানিকটা বড় হলেও কলেজের পথে যেতে যেতে তার সঙ্গে বেশ গাঢ় একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। ছেলেটি বেশ বুদ্ধিমান এবং পোড় খাওয়া। কলেজে ভর্তির কাজ সেরে ফেরার পথে একথা-সেকথার শেষে সে বলল, দেখ, দাদা মানুষটি এমনিতে ভালই কিন্তু খুব বদ্‌রাগী। তাঁর মেজাজ বুঝে চলবে। বৌদি সম্পর্কে দেখলাম, তার মনোভাব বেশ কঠিন। তাঁকে যে সে আদৌ পছন্দ করেনা, সে কথাটি বেশ পরিষ্কার ভাবেই জানালো। তবে কেন বা কী বৃত্তান্ত সেসব বিষয়ে সে কিছুই বললনা। ছেলেটির নাম অহীন, অহীন ঘোষ।

কলেজে যাতায়াত শুরু করতে প্রাথমিক অবস্থায় আমি খানিকটা হতভম্ব হয়ে পড়েছিলাম। বিরাট বিরাট বাড়ি, সেই সব বাড়িতে বিভিন্ন বিভাগের ক্লাশ রুম। বিস্তীর্ণ মাঠ। মাঠের একপ্রান্তে টানা হস্টেলের টিনের বাড়ি। ব্যারাকের মতো ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে জামা কাপড় পরা ছেলেমেয়েরা বইখাতা হাতে ক্লাশে যাচ্ছে। কেউ কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছে। বরিশাল ব্রজমোহন দত্ত কলেজ। আমার স্বপ্নের স্থান। কিন্তু আমার নিজের পোশাক আশাকে বড়ই দীনতা মাখানো। মনে হতে লাগল এদের কেউ কেউ হয়ত আমারও সহপাঠী কিংবা পাঠিনী হবে। আমার এই দীন আকৃতি দেখে হয়ত এরা কেউই আমার সাথে কথাবার্তা বলবে না। কারুর সঙ্গে বন্ধুত্ব হবারও সম্ভাবনা নেই। মনটা বড়ই দমে গেল। আমি সরলভাবে একদিন অহীনকে সব খুলে বললাম। সে বিষয়টিকে আদৌ গুরুত্বই দিলনা। সে জানাল, গ্রাম থেকে শহরে এলে প্রথম প্রথম এমনটা হয় বটে তবে কয়েকদিন গেলেই সব ঠিক হয়ে যায়। অহীনের পোশাক পরিচ্ছদও খুব একটা উঁচুমানের ছিলনা। কিন্তু সেজন্য তার কোনও দীনতা ছিলনা। ও বলল, দেখ এসব কিছুনা। আমারও প্রথম প্রথম এরকম হয়েছিল। কেটে গেছে। আমিও গ্রামেরই ছেলে এবং তোমার মতোই দুস্থ। ওর কথা শুনে আমার বেশ আরাম বোধ হল। অন্তত একজনকে পেয়েছি যার কাছে মন খুলে কথা বলতে পারব।

কথায় কথায় জানলাম তার বাড়ি জেলা সদরের কাছেই একটি গ্রামে। সেও শহরের কলেজে পড়তেই এসেছিল। হঠাৎ তার বাবা মারা যেতে পারিবারিক দুস্থতার কারণে পড়া ছেড়ে রোজগারের চেষ্টার নেমে পড়তে হয়। বাড়িতে বিধবা মা এবং তিনটি ছোট বোন আছে। অহীনের আয়েই তাঁদের কোনওক্রমে চলে। পড়া ছেড়ে দিয়ে ও সদর হাসপাতালে সামান্য একটা চাকরি করে, আর বাকি সময় ট্যুইশানি করে কিছু আয় করে। শহরে আমারই মতো একটি বাড়িতে ছেলে পড়িয়ে থাকা খাওয়ার সংস্থান। ওর কথা শুনে বড় কষ্ট হল। আমার তবু বাবা আছেন। ওর অবস্থা আমার থেকেও করুণ।

আমার আশ্রয়দাতার ছয়টি ছেলে এবং একটি মেয়ে। মেয়েটি সবার ছোট। তাঁর স্ত্রী অতগুলো সন্তানের জননী হওয়া সত্ত্বেও যথেষ্ট সুন্দরী এবং যৌবনবতী। সঙ্গীত শিক্ষা বিষয়ে বেশ অনুরাগিনী। সবসময়েই সেজেগুজে থাকতে ভালবাসেন। বাড়িতে একটি সর্বক্ষণের চাকর আছে। সব কাজ, রান্নাবান্না সেই করে। মহিলাকে কিছুই করতে হয়না। বেশ আরাম বিলাস এবং সঙ্গীতচর্চায়ই দিন কাটে। মাত্র এই কয়েকটি দিনেই দেখলাম তাঁর স্তাবক সংখ্যা অনেক। তাঁরা শহরের বেশ উচ্চবিত্ত। সাহিত্য, সঙ্গীত ইত্যাদি নিয়ে প্রায় প্রতি সন্ধ্যায়ই বাড়িতে আসর বসে। চলে প্রায় রাত দশটা সাড়ে দশটা পর্যন্ত। বড়ছেলেটিকে পড়াবার জন্য একজন আলাদা শিক্ষক। ছেলেরা আমার কাছে দুবেলা পড়ে। পড়া অবশ্য তাদের বিশেষ কিছুই হয়না। কারণ তারা প্রত্যেকেই এক‌েকটি মূর্তিমান বিভীষিকা। তারা এতজন না হয়ে একজন মাত্র হলেও, আমার পক্ষে সামলানো অসম্ভব ছিল। এখানে আসার পর দিন থেকেই ব্যাপারটি আমি বুঝতে পেরেছিলাম। মহিলা অবশ্য এসব বিষয়ে পুরোপুরি উদাসীন ছিলেন। নিজের জগত নিয়ে তিনি এতই মশগুল থাকতেন যে সন্তানদের বিষয়ে ব্যয় করার মতো কোনও সময়ই থাকত না তাঁর।

অহীন এসব জানত। একদিন বলল, তোমাকে ভয় দেখাচ্ছি না, তবে ওখানে থাকা তোমার পক্ষে সম্ভব হবে বলে বোধ হয়না। হলেও পড়াশোনা যে আদৌ করতে পারবে না, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। একেতো শ্রীমতী গানেশ্বরীর সারাদিনব্যাপী গলার ব্যায়াম করা, তার উপর ছেলেগুলো একেকটা হাড় বজ্জাত। দিনভর হুড়োহাঙ্গামা করে বেড়ায়, পাড়াপড়শিরা ওদের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ। আবার সন্ধেবেলা গান, সাহিত্য, শিল্প নিয়ে নিত্যকার মাইফেল। তুমি যে কদিন ওখানে টিকতে পারবে ঈশ্বর জানেন। কিন্তু আমি তখন তার এই দুশ্চিন্তাকে আমল দিইনি। কারণ, সদ্য সদ্য ঐ আশ্রয়টি আমার প্রায় অলৌকিক ভাবে জুটেছে। চেষ্টা তো করতেই হবে। তখনকার নিয়ম অনুযায়ী ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করলে আই.এ. আই.এস.সি. বা আই.কম. পড়তে হত। আমাদের বছর থেকে নিয়ম হল এগারো ক্লাশ / বারো ক্লাশ। বারো ক্লাশে পাশ করলে বি.এ ইত্যাদি। আমি সাইন্স নিয়ে এগারো ক্লাশে ভর্তি হয়েছিলাম। বিজ্ঞান বিষয় হিসেবে আমার কাছে আকর্ষণীয় ছিলনা। তদুপরি পড়াশোনা করার এই হাল। একারণে আমি আর্টসের বিভাগে চলে গেলাম। বিশ্বাস ছিল পরীক্ষার আগে দিন কয়েক কলেজ কামাই করে ঠেসে পড়তে পারলে উৎরে যাব। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অহীনের সাথে ব্যবস্থা করলাম যে, যতদিন পারি দুপুরে তার ঘরে গিয়ে গোপনে পড়াশোনাটা সেরে নেব। অহীন খুব সাগ্রহে সম্মতি জানাল। সেই ইতিমধ্যে একটি ছাত্রীও জুটিয়ে দিয়েছিল। কলেজের পর তাকে পড়িয়ে বাসায় ফিরতাম। মাইনে দশ টাকা। ষাট / বাষট্টির কালে দশটাকা বড় কম পয়সা ছিলনা। হাত খরচের জন্য তার প্রয়োজনও ছিল। সেসব দিনে আমার দৈনন্দিন রুটিন ছিল—ভোর চারটে / সাড়ে চারটে নাগাদ উঠে, রাস্তার কল থেকে বালতি করে জল এনে ড্রাম ভর্তি করা। দুবেলা রান্নার জন্য কয়লা ভাঙা। বৌদি সাড়ে চারটা পাঁচটা থেকে গলা সাধেন, চলে সাড়ে ছটা পর্যন্ত। তারপর চা জলখাবার

খাওয়া। সাতটা থেকে ছেলেদের পড়াশোনা নিয়ে বসা। মাঝে মাঝে বড়টিকেও নিয়ে বসতে হয়। নটা পর্যন্ত এই চলে। তারপর স্নান খাওয়া সেরে কলেজ। কলেজ, ট্যুইশানি ফেরৎ আবার সেই রুটিন। এর মধ্যে আবার বাজার করার দায়িত্বটাও দাদা আমাকে নিতে বললেন। ফলে পড়াশোনার জন্য কোনও সময়ই আর থাকল না। জল তোলা, কয়লা ভাঙা এবং বাজারের দায়িত্বটা আগে ছিল চাকরটির। এখন অন্য কাজ দুটির জন্য খুশি হলেও বাজারের ব্যাপারটা হাতছাড়া হওয়ায় সে আমার উপর বিলক্ষণ চটে গেল। সে ভাবল, এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই আমার হাত আছে। ভোর চারটে থেকেই দাদা বিছানার ভেতর থেকে হাঁক পারতেন জলটা তাড়াতাড়ি ধরার জন্য। দেরি হলে লাইন পড়ে যাবে। শীতের দিনে এই কাজটায় আমার বেশ কষ্ট হত। গরম জামা কাপড় বিশেষ ছিলনা বললেই চলে। এই শহরে অনধিক নয় / দশ মাস আমার স্থায়িত্ব ছিল। এখন তারই বৃত্তান্ত বলব।

ব্রজমোহন কলেজে আমার কলেজ জীবন খুব খারাপ কাটছিল না। অসামান্য কিছু অধ্যাপক অধ্যাপিকা সেখানে ছিলেন। সর্বজন শ্রদ্ধের অধ্যাপক কবীর চৌধুরী সাহেব ছিলেন আমাদের অধ্যক্ষ। তখন তাঁর যুবা বয়স, একটু হ্রস্ব দেহ হলেও অত্যন্ত সুদর্শন এবং নিজস্ব বিষয়ে অসামান্য জ্ঞানী এবং ছাত্রদের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল মানুষ ছিলেন তিনি। তাঁর কাছে বিভিন্ন ব্যাপারে যতবার গিয়েছি বুঝেছি তিনি প্রকৃতই একজন অধ্যাপক। তাঁর কোনও রকম সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি কোনওদিন আমার নজরে অন্তত পড়েনি। অন্য অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের মধ্যে যাঁদের কথা বিশেষ করে মনে আছে এবং যাঁদের সাহচর্যে এসেছি, তাঁরা হলেন মনোরমা গুহ ঠাকুরতা, রফিকুল ইসলাম এবং দ্বিজেন শর্মা। সবাই স্ব স্ব ক্ষেত্রে অসাধারণতার স্বাক্ষর রেখেছেন। দ্বিজেন শর্মা এখন প্রায় অশীতি ছুঁই ছুঁই। তাঁকে অবশ্য তখন বেশিদিন পাইনি। বোটানিব লোক। প্রথমে ছিলেন ডিমনস্ট্রেটর। পরে অধ্যাপক হন। কিছুদিন পরে তিনি ঢাকা চলে যান। বাংলাদেশ যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই তিনি মস্কো যান হায়াত্ মামুদ এবং আরও অনেকের সাথে এবং দীর্ঘকাল প্রগতি প্রকাশনায় অনুবাদকের কাজ করেন। আজ পর্যন্ত তাঁর সারস্বত সাধনা অব্যাহত। আমার সাথে অদ্যপি যোগাযোগ বর্তমান।

সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে রফিকুল ইসলাম সাহেবের কথা। তাঁর মঙ্গোলিয়ান ধাঁচের মুখাকৃতি, ছুঁচোলো গোঁফ এবং রসিক মেজাজটির কথা আজও মনে পড়ে। মতবাদের দিক দিয়ে কম্যুনিস্ট পন্থী ছিলেন। তিনি আমাদের বঙ্কিমের কমলাকান্তের দপ্তরের কিছু নির্বাচিত প্রবন্ধ পড়াতেন। তাঁর পড়ানোর রকমটি এমন চমৎকার ছিল যে একটু মনোযোগ সহকারে শুনলে বাড়িতে আর পড়তে হতনা। মানুষটি আমাদের কাছে খুবই প্রিয় ছিলেন, কিন্তু অধ্যাপক মহলে তাঁর সুখ্যাতি ছিলনা। শুনেছি তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ এর জন্য দায়ী ছিল। অবশ্য এ নিয়ে তাঁর কোনও নালিশ ছিলনা। ভদ্রলোক কবিতা লিখতেন একসময়। কী এক অজ্ঞাত কারণে ষাটের দশকের একেবারে শেষ নাগাদ তিনি নাকি আত্মহত্যা করেছিলেন বলে শুনেছি।

কবীর চৌধুরী সাহেব একসময়ে অধ্যাপনা ছেড়ে আমেরিকাতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হিসেবে কাজ করেছেন। পরে ঢাকা বাংলাদেশ একাডেমির মহাপ্রবন্ধকও হন। তিনি এখনও ঢাকায় আছেন এবং যতদূর জানি সুস্থই আছেন। অনুবাদক হিসেবেও তিনি যথেষ্ট সুখ্যাতির অধিকারী। আমার অতিস্বল্প কালের ওখানকার কলেজ জীবনে এঁরাই আজও স্মৃতির অধ্যাপক হিসেবে আছেন।

— চল্লিশ —

আমার আশ্রয়দাতার বাসায় পূর্বোক্ত সব কাজকর্ম করা, কলেজ করা এবং ছাত্রী পড়ানো সেরেও আমি শহরটিকে ভাল করে দেখার লোভও সংবরণ করতে পারিনি। শহরটি আমাকে ভীষণভাবে আকর্ষণ করেছিল। তার অলিগলি, অন্ধিসন্ধি সব জানবার এবং চিনবার এক উদগ্র আকাঙ্ক্ষা আমাকে পেয়ে বসেছিল। পকেটে প্রায় কিছুই তখনকার দিনে থাকত না। কিন্তু পায়ে হেঁটে শহরকে প্রদক্ষিণ করা বা মেপে নেওয়ার ব্যাপারে আমার কোনো ক্লান্তি ছিলনা। সময় সুযোগ পেলেই আমি ঘুরে ঘুরে শহরটিকে দেখতাম। আমার জীবনের প্রথম শহর। একারণে বহু বিশিষ্ট এবং অবিশিষ্ট সাধারণ জনের সাথে আমার পরিচয় ঘটেছিল। কচিৎ কদাচিৎ, সময় পেলে অহীন আমায় সঙ্গ দিত।

এ প্রসঙ্গে আমি বিস্তারে যাব না। বিশিষ্ট জনেদের বিষয়েও কিছুমাত্র জানাবার আকাঙ্ক্ষা আমার নেই। শুধুমাত্র একজন পতিতা নারীর জীবন সংগ্রাম এবং অপরিমাণ স্নেহের কিছু আখ্যান বলার চেষ্টা করব। এই শহর পরিক্রমাকালে, এক ছুটির দিনে দুপুরে অহীন আমাকে নিয়ে গেল সেই গলিতে, যে গলিটি শহরের হসপিটাল রোড ধরে ব্রজমোহন কলেজের দিকে যেতে বাঁ হাতে পড়ে। এটিই ছিল শহরের পতিতা পল্লী। সাধারণত এই গলি দিয়ে আমরা যাতায়াত করতাম না। অহীন গলির একেবারে প্রত্যন্তে একটি কুঁড়ে ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ডাকল, মাসিমা—দরজা খোল, আমি অহীন। দরজার ঝাঁপ খুলে যে বৃদ্ধা এসে দাঁড়ালেন, তাঁকে আমি চিনি। তিনি প্রায়ই আমার আশ্রয়দাতার বাড়ি যান। তাঁর মেজপুত্রটি এই মহিলার বিশেষ আদরের। সবাই সেখানে তাঁকে মাসিমা বলে ডাকে, আমিও। কিন্তু তিনি যে এই পাড়ায় থাকেন তা জানতাম না। বাসায় তাঁর সম্পর্কে বেশ একটু ছুঁৎমার্গীয় ভাব দেখেছি, বিশেষ করে বাসার গিন্নির ব্যবহারে। তাঁর এই মহিলার বিষয়ে বিরক্তি কখনওই গোপন থাকত না। শুনেছিলাম মহিলা আমার আশ্রয়দাতার কি রকমের যেন মাসিমা হন। তিনি তাঁর প্রতি খুব একটা অসদয় ছিলেন না। মাসিমা ঐ বাসায় সাধারণত দুপুরের দিকেই যেতেন এবং আমি থাকলে আমার সঙ্গে খানিকটা গল্পও করতেন। বাড়ির সবচেয়ে দুরন্ত মেজ ছেলেটি দেখতাম তাঁর কাছে খুব শান্ত থাকত। বৌদি সাধারণত এসময় বাসায় থাকতেন না। মেজ ছেলেটিকে যে তিনি একেবারে ছোট থেকে মানুষ করেছেন সেকথা তাঁর কাছেই শুনেছিলাম। অসম্ভব ভালবাসতেন তিনি এই ছেলেটিকে। যখন আসতেন তাকে

নিয়েই বেশিক্ষণ সময় কাটত তাঁর। এ নিয়ে দাদা বৌদির ভিতরে মাঝেমাঝে কথা কাটাকাটিও হত। কিন্তু তখনও ব্যাপারটির রহস্য আমার কাছে পরিষ্কার হয়নি। আজ এই পাড়ায় তাঁকে দেখে আমার সংস্কারে প্রচণ্ড আঘাত লাগল। কারণ, জানতাম যে ঐ এলেকায় কোনও ভদ্রগৃহস্থের বাসা নেই।

যাহোক ঝাঁপ খুলে আমাদের দেখে মাসিমা খুবই আন্তরিকতার সাথে 'এসো বাবা এসো বাবা' বলে আমাদের ভিতরে নিয়ে গেলেন। বাঁশের দরমার বেড়া এবং টালির চালার একখানি বেশ বড় ঘর। মেঝে মাটির। এক কোণে কিছু হাঁড়ি কড়াই বাসন এবং রান্নার উনুন। বাকি জায়গায় গুটিয়ে রাখা কয়েকটি কাঁথা কাপড়ের বিছানা। জনা দুয়েক বৃদ্ধা বসে আছেন। বিছানার সংখ্যা দেখে মনে হল আরও কয়েকজন সেখানে থাকেন। অহীন জানতে চাইল, আর সব কোথায়? 'ভিক্ষেয় গেছে। আজকে আর আমরা বেরোবো না। আজ ওদের পালা।'—বলে মাসিমা যেন খানিকটা অস্বস্তিভরে আমার দিকে চাইলেন। হয়ত ভাবছিলেন তাঁদের ভিক্ষেবৃত্তির কথা আমি জানি কিনা অথবা অন্য কিছু। খানিকক্ষণ নানা কথাবার্তা বলে অহীন পকেট থেকে দুটো টাকা বের করে মাসিমার হাতে দিয়ে বলল, ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়লাম। দুপুরবেলা, কিছু আনতে পারিনি। এইটা রাখ। বিকেলে যাহোক কিছু কিনে-কেটে খেও। এর বেশি কিছু করি এমনতো উপায় আমার নেই। মাসিমা বললেন, তুই আর কত করবি? মরণও হয়না। কত পাপ যে করেছি। অহীন বাধা দিয়ে বলল, ব্যাস্ ব্যাস্, এসব কথা বললে আর আসব না বলে দিচ্ছি। কিন্তু কী ব্যাপার, দুপুরবেলা এলাম, জল বাতাসা দিলেনা? তা ছাড়া ও আজ প্রথম এলো তোমার কাছে। —দাঁড়া। বলে মাসিমা বাইরে কোথায় গেলেন। খানিক বাদে ঝক্‌ঝকে একটা পেতলের ঘটিতে একঘটি জল আর একটা কাগজের মোড়কে কিছু বাতাসা এনে সামনে দিয়ে বললেন, ছিলনা। জবার ঘর থেকে আনলাম। মেয়েটা আমাকে খুব মানে। বিপদে আপদে যথাসাধ্য করে। কিন্তু করবে কি করে, ওর ঘরে বসে কজন আর? তার উপর পুলিশ, গুণ্ডা, মাতাল এরা তো পয়সাই দেয় না।

জল বাতাসা খেয়ে অহীন আর আমি বিদায় নিলাম। মাসিমা গলির মুখ অবধি এগিয়ে দিয়ে বললেন, আবার এসো বাবা। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি যে এখানে এলে একথাটা বাসায় বোলোনা। তোমার বৌদি রাগ করতে পারে।

মামিসা চলে গেলে অহীন জিজ্ঞেস করল, মাসিমার বাসায় এনেছি বলে রাগ করোনি তো?

: না তবে একটু অস্বস্তি বোধ করছি।

এঁর বিষয়ে তুমি কতটা জানো? আমার যে এতটা জানা ছিলনা এ কথা বলায় অহীন খুব অবাক হয়ে গেল। বলল, সেকি? এ নিয়ে বাসায় বিতণ্ডা শোনোনি কিছু? বললাম, শুনেছি তবে গোটা ব্যাপারটা বুঝিনি ঠিকমতো। আমি জানতাম উনি দাদার দূর সম্পর্কের মাসি, দুস্থ। মাঝে মাঝে দাদা দুদশ টাকা সাহায্য দেন তাই বৌদির

রাগ। অহীন বলল, তাহলে তুমি কিছুই জাননা। বলার মত কাহিনী এটা নয়, তবে পাছে এই মহিলাকে তুমি ভুল বোঝো বা অশ্রদ্ধা কর তাই গোটা বৃত্তান্ত তোমার জানা উচিৎ। চল আমরা সদর রোডে বিপিন মহল্লার ওখানে গিয়ে খানিক বসি।

বিপিন মহল্লা নামটি আসলে ভুল উচ্চারণের ফল। আসল নাম ছিল বিবির মহল্লা। এখন সেখানে সদর পৌরসভার অফিস। অফিসের সামনে সারি সারি বিশালকায় পাম গাছ সাহেব আমলের অহংকার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আছে কিছু অন্য গাছপালাও। চারদিকে বাঁধানো একটি সুন্দর পুকুর। বেশ মনোরম জায়গাটি। চার পয়সার বাদাম ভাজা কিনে দুজনে একটা গাছের ছায়ায় বসলাম। অহীন বাদাম ভাজা খেতে খেতে মাসিমার দুরদৃষ্টের কাহিনী বলতে লাগল। সে কাহিনী এদেশে কিছু নতুন নয়। আর পাঁচটা ঘটনার মতোই। তবু অহীন যেমন বলল তাই লিখছি।

মাসিমা আমার আশ্রয়দাতা দাদার দূরসম্পর্কের নন্, আপন মাসিমাই। অহীন, মাসিমা, দাদারা সবাই ঘোষ বংশীয়। শিক্ষায়, ধনে মানে না হলেও তাঁরা গাভার অধিবাসীই ছিলেন একদা। পরে এই শহরে এসে স্থায়ী হন। গাভার ঘোষেরা নানা কারণে খুবই বিখ্যাত। মাসিমার বাবা বিখ্যাত লোক না হলেও বেশ বনেদি গেরস্থ ছিলেন। যথাসময়ে মাসিমার বিয়ে থা'ও দিয়েছিলেন। একটি ছেলেও হয়েছিল তাঁর। স্বামী সদরে মোটামুটি ভাল ব্যবসা করতেন। পাটের ব্যবসা ছিল তাঁর। বেশ সচ্ছল সুখী সংসার ছিল মাসিমার। নথুল্লাবাদে নিজস্ব বাড়ি, পাকা মেজে, কাঠের ফ্রেমে টিনের ছাউনি। ব্যবসার কাজকর্ম সেরে, দোকান এবং গুদাম ঘরগুলোয় তালা বন্ধ করে বাড়ি ফিরতে প্রায়ই রাত হত ভদ্রলোকের। ছেলে তার মামার বাড়িতে থেকে গাভা হাইস্কুলে পড়ত। তখন ক্লাশ টেনে পড়ে সে। এই সময় কুখ্যাত বরিশাল রায়ট হয়। দাঙ্গার প্রথম দিনেই ভদ্রলোকের দোকান লুঠ হয় এবং গুদামগুলো পুড়িয়ে দেওয়া হয়। তিনি কোনওক্রমে পালিয়ে বাড়ি আসেন। কিন্তু গুণ্ডারা তাঁর পেছন ছাড়েনি। প্রায় দশ বারো জন গুণ্ডা দরজা ভেঙে ঢুকে ঘরের খুঁটির সাথে তাঁকে বেঁধে মাসিমার উপর চড়াও হয়। মাসিমার তখন বয়স তেমন কিছু কম নয়, আটতিরিশ / চল্লিশ হবে। তবে দেখতে সুন্দরী এবং স্বাস্থ্যবতী। গুণ্ডাদের মধ্যে অনেকেই ভদ্রলোকের পরিচিত ছিল। সে কারণেই হোক অথবা দাঙ্গা / লুঠের উৎসাহে তারা মাসিমাকে তুলে বাইরে নিয়ে ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। ভদ্রলোক আগুনে পুড়েই মারা যান। সাগরদির একজন বয়স্ক মুসলমান ভদ্রলোক এই ঘটনার তিন দিন পর কালিজিরা নদীর পাড়ের একটা ঝোপ থেকে মাসিমাকে উদ্ধার করেন। তখন তাঁর শরীরে একগাছা সুতোও ছিলনা। সমস্ত দেহে আঁচড় কামড়ের ক্ষত। সে এক বীভৎস রক্তাক্ত অবস্থা। তবু তাঁর প্রাণটুকু ছিল। মুসলমান ভদ্রলোক তাঁকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে এসে চিকিৎসাপত্তর করিয়ে সুস্থ করে তোলেন। খোঁজ খবর করে গাভায় তাঁর বাপের বাড়িতে খবর দেন। বাবা তখন বেঁচে নেই। মা ভাইয়েরা আছে কিন্তু দাঙ্গার প্রাবল্যে এককেজন একেক জায়গায় পালিয়ে বেড়াচ্ছে, শুধু মা বাড়িতে।

ভদ্রলোক খবর দেওয়ার বেশ কয়েকদিন পর দাঙ্গার প্রকোপ কমলেও বাড়ির কেউ এল না। তখন তিনি মাসিমাকে সাথে নিয়ে তাঁর বাপের বাড়ি গিয়ে পড়শিদের কাছে জানলেন যে তারা সবাই হিন্দুস্থান চলে গেছেন গোপনে। মাসিমা ততদিনে নিজের ভাগ্য মোটামুটি বুঝে গেছেন। কান্নাকাটি করতে করতে একসময় বুঝে গেছেন এতে কোনোই লাভ নেই। উল্টে আশ্রয়দাতার এবং তাঁর বাড়ির মানুষদের অশান্তি বাড়ানো। তাই একদিন তিনি ভদ্রলোককে বললেন, বাবা, আপনি আমাকে নিজের মেয়ের মতো আগলে বাঁচিয়ে রেখেছেন এতদিন। কিন্তু এভাবে তো সারা জীবন কাটবে না। আপনি বরং আমাকে আমার নথুল্লাবাদের বাড়িতে থাকার মতো ব্যবস্থা করে দিন। ঐ পোড়া টিন, কাঠ যা আছে তাই দিয়ে। আর্যলক্ষ্মী ব্যাংকে আমার স্বামীর কিছু টাকা পয়সা আছে আমি জানি। সেই টাকার ওয়ারিস আমি। আপনি যদি দাঁড়িয়ে থেকে একটু ব্যবস্থা করেন। মুসলমান ভদ্রলোক বলেছিলেন, মা আমি জানতাম তোমাদের সমাজ খুব নিষ্ঠুর, কিন্তু এতটা জানতাম না। আবার আমাদের সমাজও যে খুব উদার তাও নয়। কিন্তু সেসব যাউক, তুমি যেমন বললে, তাই হবে। তবে তোমার ছেলেকে যাতে কাছে এনে রাখতে পার সেই চেষ্টাও দেখতে হবে। ছেলে নিশ্চয় তার মামাদের সাথে কলকাতায় আছে। যাহোক্ দেখি কি করতে পারি।

অহীন বলেছিল, ব্যবস্থা সেরকমই করা হল। কিন্তু দুঃখ পাওয়া মাসিমার জন্য বরাদ্দ ছিল। সেই মুসলমান ভদ্রলোকই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ছেলের খোঁজও পেয়েছিলেন, কিন্তু সে আসতে রাজি হয়নি। ছেলে তখন ম্যাট্রিক পাশ করে বঙ্গবাসী কলেজে পড়ে। বেলেঘাটায় মামাদের কাছে থাকে। আমি জানতে চাইলাম, ছেলে আসতে চাইল না কেন? অহীন ম্লান হেসে উত্তর দিয়েছিল, তার মায়ের জাত গিয়েছে বলে। বহুদিন তিনি মুসলমানের বাড়িতে থেকে তাদের অন্ন জল খেয়েছেন—সুতরাং জাত তো গেছেই। তা ছাড়া দাঙ্গায় লুঠ হয়ে যাওয়া, ধর্ষিতা মেয়েমানুষকে আমাদের সমাজ কবেই বা ফেরৎ নেয়, সমাজ আছেনা?

দেশব্যাপী ঐ ঘোর তমসার কালেও সমাজ বড় জাগ্রত দৃষ্টি রেখেছিল যাতে জাত না যায়। সে যাহোক, তারপর থেকে মাসিমার একক জীবন সংগ্রাম। ব্যাংকের টাকা ফুরোতে সময় লাগেনি। মুসলমান ভদ্রলোক যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন যাহোক করে দুমুঠো খাবার জুটেছিল, তিনি মারা গেলে মাসিমা প্রকৃত অসহায় এবং অরক্ষিত হলেন। বাপের বাড়ির গ্রাম গাভা এবং আশেপাশে অনেক আত্মীয়স্বজন ছিল। কিন্তু তাদেরও সমাজ এড়িয়ে কিছু করার সাহস বা মানসিকতা ছিলনা। সুতরাং উপোস এবং উঞ্ছবৃত্তি। এই সময় এক বুড়ি প্রায়ই ভিক্ষে করতে আসত। মাসিমার কাছে ভিক্ষে পেতনা, তবু আসত। দুদণ্ড দুঃখের কথা বলত। সেইই বুদ্ধিটা দেয়। তার পরামর্শে বাড়িটা সামান্য দামে বিক্রি করে দিয়ে মাঝবয়সি মাসিমা নিষিদ্ধ এলাকার একটি খোপরি ঘরে উঠে আসেন। তখনও হয়ত ভাবেননি যে ঐ পাড়ারই কদর্য জীবন তাঁকে অবলম্বন করতে হবে। কিন্তু স্থান মাহাত্ম্য বলে একটা ব্যাপার তো আছে, আর বাড়ি বেচা

টাকাও একসময় শেষ, অতএব কুপি হাতে দরজার কাছে একদিন দাঁড়াতেই হল। মাসিমার গৃহস্থ জীবন পঙ্কিলতায় ডুবে গেল, যার জন্য তাঁর কোনও দায়িত্ব ছিল না। কিরকম যেন সহজ সরল অথচ পূর্বনির্ধারিত ভাবে গোটা ব্যাপারটা ঘটে গেল। আত্মীয় স্বজনেরা এ নিয়ে দূর দূর ছি ছি করল। নানারকম সরস গল্পগুজব ছড়াল, এমন কি তাঁর স্বামীকে পুড়িয়ে মারার ব্যাপারে যে তিনিও জড়িত ছিলেন একথা বলতেও তাদের আটকালো না। মাসিমা সবই শুনতে পেতেন, কিন্তু তাঁর কীই বা করার ছিল।

আমার আশ্রয়দাতা ভদ্রলোক একটা লঞ্চ কোম্পানির ম্যানেজারের চাকরি নিয়ে এ শহরে এসে আস্তানা গাড়ারও বেশ কিছুকাল পরে মাসিমার সন্ধান পান। তিনিও সবই জানতেন, কিন্তু তখন মাসিমা ভিক্ষেজীবী। মাঝ বয়সে দেহব্যবসা অবলম্বন করতে হয়েছিল বলে, বছর পাঁচ ছয়েকের মধ্যেই তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য এবং রোগগ্রস্থ। এই জীবন যাপনের প্রায় অনিবার্য রোগের জন্য মাশুল গুনতে হচ্ছে তাঁকে। দাদা খোঁজ পাবার পর অন্তত একটা বড় কাজ করেছিলেন তাঁর জন্য। ভাল ডাক্তার দেখিয়ে রোগটা সারিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু বৌদির জন্যই বিশেষত, মাসিমাকে বাসায় আশ্রয় দিতে পারেননি। নচেৎ খেয়ালি এবং দাপুটে স্বভাবের মানুষ তিনি, সমাজ টমাজ খুব একটা তোয়াক্কা করতেন না।

এর সবই অহীনের কাছে শোনা। অহীন আরও বলেছিল যে, মাসিমা একদিন দাদার বাসায় গেলে বৌদি নাকি চূড়ান্ত অপমান করেছিলেন তাঁকে। দাদা অনেক অনুরোধ জানিয়েও তাঁকে নিরস্ত করেত পারেননি। উল্টে বৌদি আরও ক্ষিপ্ত হয়ে দাদাকে বলেছিলেন, তোমার লজ্জা করে না একটা বুড়ি খান্‌কির হয়ে আমার সাথে ঝগড়া করছ। অহীন বলেছিল, সেই দিন প্রথম দাদার রাগ দেখেছিলাম। ক্রোধে দিশেহারা হয়ে সপাটে দুখানা চড় কষিয়ে দিয়েছিলেন বৌদির গালে এবং বলেছিলেন, এই রকম শব্দ যদি জীবনে আর উচ্চারণ করিস জ্যান্ত পুঁতে ফেলব। তাছাড়া তুই নিজে কী? তুই ভাবছিস তোর মতিগতি আমি বুঝিনা। মাসিমা অসহায় হয়ে অভাবে যা করেছেন, তুইতো স্বভাবের জন্য তাইই করছিস। অহীন বলল, কিন্তু আশ্চর্য কি জান? মাসিমা এজেন্য দাদাকেই তিরস্কার করলেন। বললেন, 'ছি ছি, তুই বৌয়ের গায়ে হাত তুললি। ওর কী দোষ? সবাই যা বলে ও তাইই বলেছে। মিথ্যে তো কিছু বলেনি।' আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম, কিন্তু করার কিছুই ছিলনা। আমিও অবশ্য দাদার আচরণ এবং তুই তুকারি করে স্ত্রীর সাথে বচসা করাটা মানতে পারিনি। কিন্তু তাঁর জায়গায় আমি হলেও হয়ত ওরকমই করতাম। এটা বছর দুয়েক আগের ঘটনা। তারপর মাসিমা বেশ কিছুদিন আসেননি। কিন্তু ছেলেটার টানে তাঁকে আসতেই হয়। তবে আগে জেনে শুনে নেন, বৌদি বাড়ি আছেন কিনা।

মাসিমার কথা শেষ হলে আমরা দুজনেই অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম। অসম্ভব বিষণ্ণ লাগছিল নিজেদের। তখন বেলা প্রায় গড়িয়ে গেছে। বয়স্ক সৌখিন মিঞা সাহেব ও বাবুরা সাজগোজ করে ছড়ি হাতে কীর্তন খোলার তীরে বেল পার্কের দিকে চলেছেন

হাওয়া খেতে। ঐ সময়েও বরিশাল শহরে হিন্দুবাবুদের উপস্থিতি নেহাৎ কম নয়। বেশির ভাগই উকিল নয়তো ডাক্তার। সবাই বেশ প্রতিপত্তিশালী। কিছু আছেন স্কুল কলেজের শিক্ষকতায়। সবাই খোশ গল্প করতে করতে চলেছেন। এঁদের দেখলে মনে হয় না সমাজে সমস্যা নামে কোনও কিছু আছে অথবা মাত্র সওয়া দশক আগে এই শহরে তথা জিলায় মাসিমার মতো হাজার হাজার মেয়ে বয়স নির্বিশেষে ধর্ষিতা হয়ে, এঁদেরই মতো বাপ ভাইয়ের অথবা কোনও কোনও ক্ষেত্রে স্বামীর সংসারে আশ্রয় না পেয়ে এই অন্ধকার জীবন অবলম্বন করেছিল। অহীনকে আমার এই চিন্তার কথা জানালে সে বলল, অথচ মজা দেখ, এঁদেরই যদি কেউ তোমাকে আমাকে মাসিমার ঘর থেকে বের হতে দেখেন তবে কী ছিছিক্কারই না করবেন। আমি বললাম, তাহলেও আমরা মাসিমার মতো মহিলাদের কাছে যাওয়া বন্ধ করতে পারব না। না, সেটা সম্ভব হবে না। আমি টের পাচ্ছিলাম আমার মধ্যে একটা যেন অন্য বোধের অঙ্কুরোদগম হচ্ছে। আমি ব্যক্তিক এবং পারিবারিক সুখ দুঃখের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে বৃহত্তর দুঃখের জগতে প্রবেশ করতে চলেছি, অহীন হাত ধরে আমায় নিয়ে যাচ্ছে। সেখানে ঘৃণা ব্যাপারটা নীচের থেকে উপর দিকে প্রধাবিত। এতদিন সেটাকে শুধু উপর থেকে নীচের দিকে প্রবহমান দেখতেই অভ্যস্ত ছিলাম। আমার এই নতুন বোধের প্রথম গুরু অহীন এবং তাত্ত্বিক গ্রন্থ মাসিমার অলিখিত জীবন সংগ্রামের কথা। সময়টা ১৯৬২ সালের শরত। তখনও বরিশাল শহরের প্রকৃত দৈন্য দশা শুরু হয়নি। তখনও শহরের সেই বিখ্যাত রুচিরা নামক রেস্তোঁরাটি আড্ডার একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র। অশ্বিনীকুমার দত্তের বাড়িটি তখনও ছাত্রাবাস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল। তার পার্শ্ববর্তী সতুসেন মশায়ের বাড়িটিও একটি জমজমাট সাংস্কৃতিক আড্ডার খোলামেলা স্থান হিসেবে শহরের মহিমা ঘোষণা করছিল। তখনও নারায়ণ সাহা নামক একজন অসাধারণ কণ্ঠের অধিকারী গানের মাস্টারমশাই তাঁর গানের স্কুলটি বড় নিপুণ ভাবে পরিচালনা করছিলেন, যার পাশ থেকে যাবার সময় আমরা শুনতে পেতাম তিনি শেখাচ্ছেন,—

আমি মারের সাগর পাড়ি দেব গো
এই বিষম ঝড়ের বায়ে-

অথবা—

মোর প্রথম মনের মুকুল
ঝরে গেল হায়—ইত্যাদি।

চিটাগাং রেস্টুরেন্টে তখনও চার আনায় কষা মাংস এবং পরোটা খেয়ে আমরা দুআনার টিকিটে সোনালি সিনেমা হলে 'শাপমোচন', 'পথে হল দেরী' ইত্যাদি বই (ছবি বা ফিল্ম কথাগুলি তখনও ব্যবহারে আসেনি) দেখতে পারতাম। যদিও এ সৌভাগ্য আমার বা অহীনের একবার কি দুবার বৈ হয়নি। হসপিটাল রোডের উপরে স্থিত সুদৃশ্য ইউ.এস.আই.এস লাইব্রেরিটিতে বিনে পয়সায় যতক্ষণ খুশি বইপত্তর নাড়াঘাঁটা বা পড়ার কোনও অসুবিধে তখনও ছিলনা। ডগ্‌লাস বোর্ডিং বা অক্সফোর্ড মিশন স্কুলের

ফাদারেরা তখনও সাইকেলে যেতে যেতে চেনা অচেনা সব ছেলেদেরই কুশল জিজ্ঞেস করতেন, কী ভালো আছি তো? খেলা করছিস না শুধু পড়ছিস? অ্যাঁ-হাঃ হাঃ।

এই রকম সময়ে একদিন শুনলাম জেনারেল প্রেসিডেন্ট শহরে আসছেন। খবরটি সমগ্র ছাত্র জনতার মধ্যে যেন স্ফুলিঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়ল। প্রেসিডেন্ট সাহেব তখন পর্যন্ত কোনও ব্যাপক গণ-আন্দোলনের মুখোমুখি হননি। বিগত চার বছর ধরে আস্তে আস্তে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে বেশ একটা স্থিতাবস্থার মধ্যে আছেন। তাঁর রাজপাট দিব্য চলছিল। শুধু মাঝে মাঝে বিরোধী পক্ষীয় নেতাদের শায়েস্তা রাখার জন্য খান সাহেব তাঁদের জেলে পাঠিয়ে দিতেন। যতদূর মনে পড়ে এইসময়ই মুজিবর রহমানকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জেলে পাঠানো হয়েছিল। এ কারণে ছাত্ররা তাঁর মুক্তির জন্য মিটিং মিছিল ধর্মঘট ইত্যাদি করছিল। অবশ্য ঢাকা এবং অন্যান্য বড় শহর গুলিতেই এই সব আন্দোলন বেশি হত। এদেশে যে কোনও আন্দোলনের মূল শক্তি ছিল ছাত্ররা। তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অনুগামী হয়ে আলাদা আলাদা ইউনিয়নে বিভক্ত ছিল। ফলে কলেজ ইউনিভার্সিটিগুলোতে মাঝে মাঝেই বিরোধ বিসংবাদ, মারামারি, লাঠালাঠি হত। তবে সরকার বিরোধী কোনো আন্দোলনের সময়, একমাত্র মুসলিম লিগ এবং জামাতি ইসলামের অনুগামী ছাত্ররা ছাড়া সবাই সংঘবদ্ধ ভাবে সাড়া জাগাত। এই শহরে এছাড়া অন্য কোনও বড় আন্দোলনের স্মৃতি আমার নেই। এখন জেনারেল প্রেসিডেন্টের আগমন উপলক্ষে একটা গরম হাওয়া বইতে শুরু করল। তার প্রত্যক্ষ কারণও ছিল। প্রেসিডেন্টের সফর নিরুপদ্রব করার জন্য স্থানীয় প্রশাসন কিছু রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেফতার করে। এঁদের মধ্যে যতদূর মনে পড়ে, প্রাণ কুমার সেন (কম্যুনিস্ট), দেবেন ঘোষ (আওয়ামীলিগ) ইত্যাদি বর্ষীয়ান নেতা এবং কিছু ছাত্র নেতাও ছিলেন। একারণে ছাত্ররা যার পর নাই ক্রুদ্ধ হল। তারা সিদ্ধান্ত নিল যে প্রেসিডেন্টকে তারা কালো পতাকা দেখাবে এবং 'গো ব্যাক' ধ্বনি তুলবে। এই রকম এক সংকল্প নিয়ে কলেজে জোর মিটিং, জমায়েত হতে লাগল। মুসলিম লিগপন্থী ছাত্ররা এর বিরোধিতা করলে বেশ কয়েকটা মারপিটও হয়ে গেল। জেনারেল প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখালে কী ভয়াবহ কাণ্ড ঘটতে পারে, অধ্যাপক মহোদয়েরা তা অনুমান কবে ছাত্রদের শান্ত থাকার জন্য উপদেশ করলেন। রফিকুল ইসলাম সাহেব বামপন্থী মানুষ, কিন্তু সর্বজনপ্রিয়, বিশেষত ছাত্র সমাজে। তিনি আন্দোলনের যাথার্থ্য স্বীকার করেও প্রস্তুতিবিহীন অবস্থায় এভাবে ছাত্রদের ঝাঁপিয়ে পড়া সঙ্গত মনে করলেন না, বরং ভবিষ্যতে বড় রকমের সংগ্রামের জন্য তাদের প্রস্তুতি নিতে বললেন। যাহোক্, শেষ পর্যন্ত ছাত্ররা এই আন্দোলন থেকে বিরত থাকবাব সিদ্ধান্ত নিল।

এইসব অভিজ্ঞতা আমার জীবনে এই প্রথম। গ্রামে থাকাকালীন একমাত্র নির্বাচনের সময় ছাড়া কোনওরকম রাজনৈতিক লড়াই বিষয়ে আদৌ কোনও উত্তেজনা দেখিনি। শহরে নগরে যা ঘটত কচিৎ কদাচিৎ বাসি খবরের কাগজ মারফত তার সংবাদ জানতাম। শহর জীবনে এসে এই প্রথম রাজনীতির তপ্ত বাতাবরণ সম্পর্কে ধারণা শুরু হল।

তবে এই ঘটনায় একটা জিনিস বুঝলাম জেনারেল প্রেসিডেন্টের নিরঙ্কুশ এবং নিরুপদ্রব শাসন আর বেশি দিন চলবে না। অচিরেই দেশে সংঘর্ষের বাতাবরণ তৈরি হবে। প্রসঙ্গ -ক্রমে এই সময়কার গ্রামীণ সাধারণ জনজীবনে রাজনৈতিক মনোভাব কিরকম ছিল সে বিষয়ে দু এক কথা বলে মূল প্রসঙ্গে ফিরব। মুসলিম লিগ তখনও সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দল। যেহেতু দেশের স্বাধীনতালাভের সময় এই দল কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে ছিল, সেকারণে এর গণভিত্তি তখনও অন্য দলগুলি থেকে স্বাভাবিকভাবে বেশি ছিল। অন্যান্য দলগুলির বিশেষ কোনও গণভিত্তি ছিলনা। ফজলুল হক সাহেবের কৃষক প্রজা পার্টির তখন প্রায় অস্তিত্বই নেই। তাছাড়া এই দল একটা সময়ে মুসলিম লিগের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। গ্রামীণ মানুষ একারণে সেই দলকে আর আলাদা ভাবত না। সাধারণ মুসলমান সমাজ যারা বেশির ভাগই গ্রামের অধিবাসী, তারা জানত মুসলিম লিগই আজাদি হাসিল করেছে এবং বর্তমান সরকার যখন মুসলিম লিগের সমর্থনে আছে তখন তার বিরোধিতা নিতান্ত নাজায়েজ। এই সময়েও গ্রামীণ কোনও জমায়েতে গান করা হত—

ফুটল পাকিস্তান গোলাপ ফুল
লিগের বাগিচায়
মিষ্টার জিন্না ফোটাইলেন ফুল
সারা দুনিয়ায়।

সুতরাং একমাত্র ভাষা আন্দোলন ছাড়া ঐ সময় ঐ মাপের ব্যাপক আন্দোলন দানা বাঁধতে পারেনি। জেনারেল প্রেসিডেন্টের দমননীতি সব বামপন্থী তথা বিরোধী দল গুলিকে প্রায় ছিন্নভিন্ন করে ফেলে চূড়ান্ত একনায়কত্বে বেশ দৃঢ়। সামান্যতম উত্তেজনার কারণ দেখলেও ফৌজি শাসকেরা তা দমন করার জন্য উদ্যত অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইতস্তত করত না। ফলে শহর অঞ্চলগুলিতে বহু ছাত্রই গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়ত। এই ছাত্রদের একটা ব্যাপক অংশ যেহেতু গ্রাম থেকে যেত সেহেতু আমরা গ্রামবাসীরা ফৌজি প্রতাপ বিষয়ে তথা রাজনৈতিক আন্দোলন বিষয়ে কিছুটা ওয়াকিবহাল ছিলাম। নচেৎ, দেশ, কে বা কারা শাসন করে, তারা ফৌজি না নির্বাচিত প্রতিনিধি তা নিয়ে সাধারণ গ্রামবাসীর কোনও শিরঃপীড়া ঘটত না। চাল, ডাল, তেল, নুনের দাম ঠিক থাকলে এবং দাঙ্গা-ফ্যাসাদ না থাকলেই সরকার ভাল। সোজা হিসেব। একমাত্র নির্বাচনের সময় ভোটের ক্যানভাস করতে দু এক জন বড় মাপের নেতা গ্রামে আসতেন। সব লোক তাঁদের সভায় গিয়ে গরম গরম কথা শুনে আসত এবং সেই নিয়ে কিছুদিন হাটে বাজারে উত্তেজক আলোচনা চলত। কোনও পার্টিরই কোনও কর্মী সাধারণ বা আজকের দিনে যাকে ক্যাডার বলে তা ছিলনা। অন্তত আমি আমাদের অঞ্চলে কোনও দিন তা দেখিনি। সুতরাং রাজনৈতিক আন্দোলন বিষয়ে প্রচার বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে উদ্ধার কর্ম এ সবের দায় নিতে আমি আমার অঞ্চলে কোনও দলকে কোনওদিন দেখিনি। আমাদের প্রত্যাশাও সেরকম ছিলনা, কারণ এ বিষয়ে কোনও ধারণাই জন্মেনি তখনও।

সাধারণ হিন্দু গ্রামবাসীদের আবার এর উপর অন্য একটা বদ্ধমূল ধারণা ছিল। তারা ভাবত সরকার যেই হোক কোনও মুসলমান তার অনুগামী না হয়েই পারেনা, কারণ দেশটা মুসলমানদের। সেখানে যে অন্যরকম মতাবলম্বী মুসলমানও থাকতে পারে তা তাদের বিশ্বাসে ছিলনা এবং তার কারণও ছিল। তবে যেহেতু তা সবাই জানেন, নতুন করে বলার প্রয়োজন দেখিনা।

যাহোক মূল প্রসঙ্গে আসি, প্রেসিডেন্ট বিরোধী বিক্ষোভ তো মুলতবি রইল। উল্টে ছাত্রদের যেটা করতে বাধ্য করা হল তা বড় অভিনব এবং লজ্জাকর। সেসময় আমাদের ইউ.সি.সির (ইউনির্ভাসিটি ক্যাডেট কোর) ট্রেনিং দেওয়া হত। এটা বাধ্যতামূলক ছিল। ট্রেনিং বলতে প্যারেড, কিছু হাল্কা অস্ত্রচালনা শিক্ষা, ক্যাম্প করা এইসব আর কি। আমরা এ জন্যে দুইপ্রস্থ ইউনিফর্ম, একজোড়া মিলিটারি বুট এবং একটা ক্যানভাসের বেল্ট পেতাম। সপ্তাহে তিন দিন এই ট্রেনিং দেওয়া হত। একজন ফৌজি ক্যাপ্টেন আর জনা দুই কর্পোরাল আমাদের এই প্রশিক্ষণ দিত। প্রশিক্ষণের দিনগুলোতে আমরা ফৌজি নিয়ম নিগড়ে বাধ্যতামূলক ভাবে থাকতাম। কেউ কোনও আদেশ অবহেলা করলে কোর্ট মার্শালে তার বিচার হত। এখন আমাদের উপর আদেশ হল জেনারেল প্রেসিডেন্টের আগমন উপলক্ষে আমাদের ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায় সারিবদ্ধভাবে তাঁকে অভ্যর্থনা করতে হবে। আদেশটি জারি হবার পর লিগপন্থী ছাত্র ইউনিয়নের ছেলেরা বেশ খানিকটা ফ্যাঁক্ ফ্যাঁক্ করে হেসে নিল। যথাসময়ে একটি বিশেষ হেলিকপ্টারে জেনারেল প্রেসিডেন্ট আগমন করলেন। খুব মোলায়েম উর্দুভাষায় ছাত্রদের কর্তব্য, ইসলাম এবং দেশের স্বার্থে আমাদের কী কী করণীয় ইত্যাদি বিষয়ে একটি সারগর্ভ ভাষণ দান করে আবার উড়ে চলে গেলেন। দেশের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে করমর্দন করে আমরা বিলক্ষণ ধন্য হলাম। অনেকের মনে অবশ্যই ক্রোধ, ক্ষোভ স্বাভাবিক ভাবে এসেছিল, তবে আমার মবলগ লাভ হয়েছিল একজোড়া আনকোরা পোশাক, হোকনা ফৌজি, আর অনেকদিন কিনতে তো হবেনা।

— একচল্লিশ —

এই ঘটনার দিন কয়েক পরেই একদিন কলেজে গিয়ে দেখলাম রফিকুল ইসলাম সাহেব, ছাত্র এবং অধ্যাপকদের নিয়ে একটি সভা ডেকেছেন। জেনারেল প্রেসিডেন্টের সফরের পর স্থানীয় প্রশাসন বেশ কিছুটা উন্মার্গগামী আচরণ শুরু করেছিল। কানাঘুষা শুনতে পাচ্ছিলাম বরিশাল টাউন হলটির নাম আইয়ুব খান টাউন হল রাখা হবে। এই প্রচেষ্টা কিছুকাল আগেও একবার হয়েছিল। তদানীন্তন জেলাশাসক ছিলেন তার উদ্যোক্তা। কিন্তু তখন ছাত্ররা পরিবর্তিত নামটি ভেঙে পুনরায় বরিশাল টাউন হল রাখে। সবাই জানেন এই টাউন হলটি বরিশালের স্বনামধন্য অশ্বিনী দত্ত মশাইয়ের অবদান, যেমন এই কলেজটি এবং শহরের আরও অনেককিছু। এখন আবার হুজুগ উঠেছে যে হলটির নাম অবশ্যই এ.কে. টাউন হল রাখতেই হবে।

কলেজে গিয়ে বুঝলাম অবস্থা বেশ ঘোরালো। দু একজন ছাড়া বেশির ভাগ অধ্যাপকই উপস্থিত হয়েছেন। একমাত্র লিগপন্থী দু একজন অধ্যাপক এবং লিগের অনুগামী ছাত্র ইউনিয়নের সভ্যেরা আসেননি। সভায় অনেকেই বক্তৃতা করলেন। তাঁরা জানালেন শিক্ষক এবং ছাত্রেরা সক্রিয় রাজনীতিতে থাকুন এটা তাঁদের পছন্দ নয়। তবে এই শহরের ঐতিহ্যের উপর যদি কেউ আঘাত হানতে চায় সে ক্ষেত্রে অবশ্য বিরোধিতা করতে হবে, ফল যাই হোক। তাছাড়া যে মনীষীর অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অর্থে এই শহরের স্কুল, কলেজ, টাউন হল ইত্যাদি তৈরি হয়েছিল, তাঁর স্মৃতির প্রতি এ ধরনের অসম্মান করা অন্যায় এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা আদৌ কোনও রাজনীতি করা নয়, বরং এই সংগ্রামকে নিজস্ব সংস্কৃতি রক্ষার সংগ্রাম বলা ভাল।

সর্বশেষ ভাষণ ছিল রফিকুল ইসলাম সাহেবের। তিনি বললেন, জঙ্গি সরকার ঐতিহ্যপূর্ণ টাউন হলের নাম আইয়ুব খাঁ হল বা এ.কে. টাউন হল রাখতে চায়। ইতিপূর্বে সে চেষ্টা একবার হয়েও ছিল এবং তার প্রতিকারও আমরা করেছিলাম। আজ আবার যদি আমরা এই চক্রান্ত ব্যর্থ না করতে পারি তবে হয়ত কালই দেখবেন, আমাদের এই কলেজের নামও ব্রজমোহন দত্ত কলেজের পরিবর্তে অমুক খান কলেজ রাখার উদ্যোগ হবে। ছাত্রদের কাছে আমার অনুরোধ আপনারা সর্বতোভাবে এর বিরোধিতা করুন, জবরদস্তি করা হলে আন্দোলন করুন। আমি আপনাদের সাথে আছি।

কিন্তু অত্যুৎসাহী মুসলিম লিগ এবং স্থানীয় প্রশাসন অতি দ্রুত টাউন হলের নাম পাল্টে এ.কে. টাউন হল রাখল। হলের প্রবেশ পথের মাথার উপর সিমেন্ট প্লাস্টার করে তা পাকা-ও করে ফেলল। সংবাদ ছড়িয়ে পড়তে ছাত্ররা এক বিশাল মিছিল করে জেলাশাসকের অফিসে তাদের প্রতিবাদ জানাতে গেল। কিন্তু তাতে কোনও ফল হল না। উল্টে পুলিশ তাড়া করল। ছাত্ররা তখন টাউন হলের সামনে জড়ো হয়ে হাতুড়ি বাটালি দিয়ে এ.কে. অক্ষর দুটি ভেঙে ফেলল। এই সময় পুলিশ এবং মুসলিম লিগ পন্থীদের সাথে আন্দোলনকারী ছাত্রদের বেশ একচোট মারপিট হল। আমিও আন্দোলনকারী ছাত্রদের মধ্যে ছিলাম। এইসব ব্যাপারে আমার বা আমার মতো ছেলেদের কোনও পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকায় আক্রমণের মুখে আমরা বেশ দিশেহারা হয়ে পড়লাম। বস্তুত আমার মতো রংরুটদের সংখ্যাই বেশি ছিল ঐ জমায়েতে। ফলে মারপিট শুরু হতেই আমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লাম। বস্তুত আমরা কেউই এরকম একটা আক্রমণ তথা মারপিটের কথা চিন্তাই করিনি। আমাদের মধ্যে নেতৃত্বে ছিলেন যাঁরা তাঁরাও না। আমাদের ছত্রভঙ্গতার সুযোগে সরকার পন্থীরা আবার লেখাটি মেরামত করে নিল। এই ঘটনা নিয়ে বেশ কয়েকদিন হাঙ্গামা চলল। একবার আমরা ভাঙি আবার ওরা সারিয়ে দেয়। সে এক চোর-পুলিশ খেলার মতো ব্যাপার। শুধু যখন উভয়পক্ষ সামনাসামনি তখন মারপিট লেগে যায় ধুন্ধুমার। প্রথমবার হঠাৎ আক্রমণে মার খেয়ে আমরাও মার দেবার কায়দাটা বুঝে গিয়েছিলাম বলে আর ব্যাপারটা একতরফা হয়না। যাহোক্, একসময় ব্যাপারটি স্তিমিত হয়ে গেল। টাউন হলের নাম এ.কে. টাউন হল

রাখা হল বটে, কিন্তু সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল এ.কে অর্থে আইয়ুব খান নয়, অশ্বিনী কুমার বুঝতে হবে।

দেখতে দেখতে টেস্ট পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল। আমি কয়েকদিন কলেজ কামাই করে অহীনের ঘরে বসে গোপনে পড়াশোনাটা করে যাচ্ছিলাম। যাহোক টেস্ট খারাপ হলনা। ফল বেরোনোর তখন বেশ কিছুদিন বাকি। ছাত্র ইউনিয়নের তরফ থেকে আমাদের বলে দেওয়া হয়েছিল যে টেস্টের পরই যেন আমরা গ্রামে ফিরে না যাই। এই সময় কলেজে কিছুদিন ছুটি থাকে। এরকম এক আবেদনের উদ্দেশ্য ভাষা আন্দোলনের শহিদ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিশেষ প্রস্তুতি। একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবস উপলক্ষে প্রতি বছর পালিত হয়। এবার যেহেতু টাউন হল সংক্রান্ত আন্দোলন সদ্য সদ্য সংঘটিত হয়েছে সে কারণে একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপন কমিটি একটি বিশেষ সভা ডেকেছিল, সভাটি টাউন হলে হবে এরকম সিদ্ধান্ত। টাউন হলের উপর আমাদের অধিকার কায়েম রাখার জন্যই এরকম স্থান নির্বাচন। নতুবা কলেজ প্রাঙ্গণেই সাধারণত এ ধরনের সভা আয়োজিত হয়। সিদ্ধান্ত হল সভার দিন কলেজ থেকে একটি মিছিল টাউন হল পর্যন্ত যাবে এবং সভা শেষ হলে মিছিলটি শহর পরিক্রমা করে আবার কলেজ প্রাঙ্গণেই এসে শেষ হবে। বিভিন্ন স্কুলের ছাত্ররাও এই মিছিলে যোগদানের জন্য আমন্ত্রিত হল। ভাষা আন্দোলন সমর্থনকারী কয়েকজন অধ্যাপকও এই সভায় যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। রফিকুল ইসলাম সাহেবও, বলাবাহুল্য অগ্রণী ভূমিকায় থাকলেন।

সিদ্ধান্ত মতো সেইদিন সকালে আমরা যখন মিছিল করে বের হবার জন্য কলেজ প্রাঙ্গণে সমবেত হচ্ছিলাম রফিকুল ইসলাম সাহেব দ্রুতবেগে একটি মোটর সাইকেলে এসে খবর দিলেন যে একটি বেশ বড়সড় পুলিশবাহিনী মিছিলে বাধা দেওয়ার জন্য কলেজের দিকে আসছে। আমরা যেন কৌশলে সামনাসামনি সংঘর্ষ এড়িয়ে অন্য পথে টাউন হলে যাই। আর যাই হোক টাউন হলের মধ্যে ঝামেলা করতে এরা সাহস পাবেনা। কিন্তু এইসব কথাবার্তা শেষ হতে-না-হতে পুলিশবাহিনী এসে অতর্কিতে আক্রমণ করে বসল। লিগ পন্থীরাও পুলিশের সহায়তায় হাজির। 'রাষ্ট্র ভাষা উর্দু চাই' পন্থী কিছু স্থানীয় গুণ্ডাও এদের সাথে এল এবং কোনওরকম প্ররোচনা ছাড়াই লাঠি চালাতে শুরু করল। জনৈক ছাত্রনেতা রফিকুল ইসলাম সাহেবকে কোনওক্রমে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হল। যাবার সময় তিনি বলে গেলেন, যে-করেই হোক সবাই যেন টাউন হলে পৌঁছোয়। তাঁকে ওখান থেকে সরানো নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। প্রথমত তিনি সরকারের সুনজরে ছিলেন না। গ্রেফতার হলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। সময়টা ১৯৬২ সালের হেমন্তকাল। ভারতীয় ভূখণ্ডে ভারত চীন যুদ্ধের জন্য চীনপন্থী কম্যুনিস্টদের উপর দমন নীতি চলছে জোরদার। পাকিস্তান চীনের মিত্ররাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও ওখানকার কম্যুনিস্টদের উপর কিছুমাত্র সদয় নয়। ফলে রফিকুল ইসলাম সাহেবের নিরাপত্তার বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

আমরা অর্থাৎ মিছিলগামী ছাত্ররা ময়দান ছেড়ে একসময় হস্টেলগুলোতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলাম। কিন্তু পুলিশ হস্টেলের দরজা ভেঙে ছাত্রদের গ্রেফতার করতে শুরু করলে ছাত্ররা প্রতি-আক্রমণ করতে বাধ্য হল। লাঠির জবাবে লাঠি এবং ইট পাটকেল পড়তে লাগল। ডিগ্রি ক্লাশের দাদারা পতাকা টানাবার বাঁশটি কোনওক্রমে এনে পাঁচিলের একটা জায়গায় রেখে পোলভল্টের সাহায্যে পাঁচিল টপকে যাবার নির্দেশ দিলেন। সেইমতো পুলিশের নজর এড়িয়ে অনেকেই পাঁচিল টপকে যেতে লাগল। কলেজের প্রধান ফটকটি পুলিশ দখল করে রেখেছিল। এখন ছাত্ররা প্রতি-আক্রমণ করায় পুলিশকে সেখান থেকে হটতে হল এবং সামনের দিকের ছাত্ররা ব্যাপকভাবে সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে লাগল। আমি পাঁচিলের দিকে ছিলাম। সেখান থেকে প্রধান ফটকের দূরত্ব অনেকটাই। ব্যূহ ভেদ করে অতদূর যাওয়া আদৌ সম্ভব ছিলনা। আবার পোলভল্ট ইত্যাদি ব্যাপারে আমার পটুত্ব প্রায় বিশ্বক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের মতো। তখন ব্যাপক হুড়োহুড়ি, মারপিট এবং শ্লোগান পাল্টা শ্লোগান চলছিল। সে এক ভয়ানক বিশৃঙ্খল অবস্থা। সাথিরা জানত যে-মুষ্টিমেয় হিন্দু ছাত্ররা এ ব্যাপারে অংশ নিয়েছে, তারা গ্রেফতার হলে সমস্যা গুরুতর হবে। সুতরাং তাদের সরে যেতে হবেই। অগত্যা আগুপিছু না ভেবেই আমি একটি ভল্টের প্রয়াস পেলাম। কিন্তু হা হতোস্মি! আমি পার হতে পারলাম না। আমার দুই ঠ্যাঙ দুই দিকে পড়ল। সে একেবারে ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা। একদিকে পুলিশ এসে আমার একটি ঠ্যাঙ ধরে ফেলেছে, অপর ঠ্যাঙটি ছাত্রদের দখলে। সে এক টাগ-অফ-ওয়ার। মাঝখানে আমার সাধারণ মার্কিন কাপড়ের পাজামা আমার নিম্নাঙ্গকে কিছুমাত্র নিরাপত্তা দিতে পারছিলনা। দুই উরুর চামড়া ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হবার উপক্রম। যাই হোক্, এই টানাটানিতে আমার সঙ্গীরাই জিতল, কেননা তারাই সংখ্যাধিক ছিল। কিন্তু আমার অবস্থা তখন সাংঘাতিক। দুই উরু বেয়ে রক্তের ধারা নেমেছে। অসম্ভব যন্ত্রণা হচ্ছে। ওদিকে পিঠেও বেশ কয়েক-ঘা লাঠি পড়ায় সেখানেও বেশ টন্‌টনে্ ব্যথা। অথচ থামার উপর নেই। টাউন হলে পৌঁছোতেই হবে।

প্রাচীরের উল্টোদিকে সাধারণ বসতির এলাকা। অতএব পেছনে তাড়া করার জন্য পুলিশ সেখানে নেই এই যা রক্ষে। তখন বেলা প্রায় দুপুর পেরিয়ে যায়-যায়। আমরা জনা চল্লিশেক 'ভাষাসৈনিক' টাউন হলের দিকে চলেছি। অন্যদের খবর কিছুই জানি না। তারা পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে না টাউন হলের দিকে পাড়ি দিয়েছে কিছুই জানা নেই।

টাউন হলের কাছে উপস্থিত হয়ে দেখলাম অনেকেই সেখানে পৌঁছে গেছে। একদল পুলিশও অস্ত্রবর্মে সজ্জিত হয়ে 'যুদ্ধং দেহি' ভঙ্গিতে উপস্থিত। মুহুর্মুহু শ্লোগান উঠছে, 'মাতৃভাষা বাংলা যখন রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।' 'নুরুল আমীন বেইমান নুরুল আমীনের রক্ত চাই।' নুরুল আমীন নামক একদার পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের রক্ত, ভাষা আন্দোলনের দিন থেকেই আকাঙ্ক্ষিত ছিল। কেননা সেই শয়তানজাদাই 'রাষ্ট্র ভাষা

উর্দু হোক' এমন এক না-পাক হিসেবকিতেব তার পশ্চিমি বুজুর্গদের সাথে করেছিল। তখন থেকেই তার রক্ত ভাষা সৈনিকদের এক দাবি হিসেবে 'নারায়' বাঁধা হয়েছিল। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনে তারই প্রত্যক্ষ প্ররোচনায় সালাম, বরকত ইত্যাদিদের ফ্যাসিস্টরা ঢাকার রাস্তায় গুলি করে মারে। সেই সময় থেকেই প্রতিবছর মাতৃভাষাপ্রেমী ছাত্ররা তার রক্তের দাবি জানিয়ে এই শহিদদের স্মৃতিতর্পণ করত। দীর্ঘ দশ বছর বাদেও সেই শ্লোগান আমরা উচ্চারণ করেছিলাম, কারণ তখনও সেই দুশমন সহিসলামৎ তথা সম্পূর্ণ বাদশাহীয়ানায় স্বীয় জিন্দিগীর তামাম রোশনী উপভোগ করার জন্য জিন্দা ছিল। আমি এক্ষেত্রে এতগুলো উর্দু শব্দ একারণেই ব্যবহার করলাম যে উর্দুকে ঐসমস্ত আন্দোলনের সময়ও আমরা অন্ত্যজ মনে করতাম না। ঐ ভাষা এবং ঐ ভাষাভাষি মানুষদের সাথে আন্দোলনকারীদের কোনও বিরোধ ছিল না। বিরোধ ছিল ঐ ভাষাটিকে যারা জবরদস্তি আমাদের উপব চাপিয়ে দিতে চায় তাদের সাথে।

শাসকেরা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠের একটি সুসমৃদ্ধ ভাষাকে উপভাষা হিসেবে চিহ্নিত করে একটি স্থানীয় ভাষাকে তার স্থলাভিষিক্ত করতে উদ্যোগী হলে আন্দোলনকারীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। এক্ষেত্রে উর্দু না হয়ে চাপিয়ে দেওয়া ভাষাটি যদি সংস্কৃত বা আরবিও হত তাহলেও পরিস্থিতি কিছু অন্য রকম হত না। একারণেই ঐ দুশমনের রক্ত চাওয়া হয়েছিল।

শ্লোগানের গতি ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হলে পুলিশ আবার লাঠি চার্জ শুরু করল এবং নির্বিচারে গ্রেফতার করতে লাগল। এর মধ্যে উত্তেজিত ছাত্ররা আবার টাউন হলের ঐ আগের শিরোনাম থেকে এ.কে. কথাটি ভেঙে দিয়ে জানাল যে কথাটি অতঃপর অশ্বিনী কুমার টাউন হলই থাকবে, এ.কে শিরোনাম থাকবেনা, যেহেতু তাতে আইয়ুব খানও বোঝানো হয়। যাহোক, সেই দিন আমরা পুলিশি তাণ্ডবের জন্য সভা করতে পারলাম না। আমাদের পর্যুদস্ত করে বেশির ভাগ ছাত্রকে গ্রেফতাব করে সদর থানায় স্থানাভাবের জন্য সদর জেলখানার চত্বরে নিয়ে যাওয়া হল। লাঠি চার্জের সময় ছাত্ররাও প্রতি আক্রমণ করেছিল, ফলে একসময় লাঠিবাজি বন্ধ করতে তারা বাধ্য হল। আমরা সংখ্যায় অনেক ছিলাম বলে জেলখানা চত্বরে তারা মারধর করতে সাহসী হয়নি। আমাদের বিষয়ে কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয়ে স্থানীয় প্রশাসন খুবই বিলম্ব করছিল। ইতিমধ্যে ছাত্ররা জেলের ঐ চত্বরে খানিকটা বাধ্য হয়ে এবং খানিকটা ইচ্ছাকৃত ভাবে পেচ্ছাব করে এক দুর্বিষহ অবস্থা তৈরি করল। দুর্গন্ধে গোটা জেলখানায় হুড়োহুড়ি পড়ে গেলে কর্তৃপক্ষ নিরুপায় হয়ে আমাদের তাড়িয়ে দিল, আমরাও যে-যার বাড়ি চলে গেলাম।

পায়খানা পেচ্ছাব করাটাও যে সময় বিশেষে অস্ত্র হতে পারে তারও একটা কিংবদন্তি অতঃপর তৈরি হয়ে গেল। বস্তুত এই লড়াইয়ে আমরাই জয়ী হয়েছিলাম। এইসময় ঢাকাও আন্দোলনের তুঙ্গে। মওলানা ভাসানী সদ্য কারামুক্ত হয়ে সারা দেশে সভা করে বেড়াচ্ছেন। ফলে দেশ জুড়ে খুবই তপ্ত আবহাওয়া। আমরা অনুভব করলাম, এ ভাবেই আইয়ুবশাহীর পতনের বীজ উপ্ত হল। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

— বেয়াল্লিশ —

এই সব ডামাডোল সাময়িকভাবে স্তিমিত হলে কয়েক দিনের জন্য বাড়িতে চলে এলাম। বিগত কয়েক মাসের মধ্যে মাত্র বার দুয়েক বাড়ি গিয়েছিলাম। এবারে এসে দেখলাম ছাত্র পড়ানোর ব্যবস্থাটি বন্ধ হয়ে গেছে। সংসারের হাল খুবই খারাপ। কিন্তু তখন কিছুই করার উপায় আমার ছিলনা। ভেবে দেখলাম, এখন যদি আমি সংসারের কথা ভাবতে বসি তবে দুইমাস বাদে যে পরীক্ষা দিতে হবে তার সমূহ বিঘ্ন ঘটবে। উপরন্তু, আমার পরীক্ষা প্রস্তুতিও আশানুরূপ হয়নি। টেস্টের ফলাফল দেখে আমাকে উদ্যোগ নিতে হবে। সংসারের হাল তো বরাবরই এরকম। এ ভাবেই চলুক। বরং আগামী বছরে কলেজ করার সময় শুরু থেকে কিছু ছাত্রছাত্রী জুটিয়ে যদি কিছু সহায়তা করা যায়, সেই চেষ্টা দেখতে হবে।

বাড়ি আসার সময় অহীনকে বলে এসেছিলাম যে ইতিমধ্যে টেস্টের ফল বের হলে সে যেন লিস্টটি দেখে আসে এবং ফাইনাল পরীক্ষার ফরমটিও তুলে রাখে। ফিরে গিয়ে দেখলাম টেস্টের ফল বের হয়েছে ঠিকই তবে লিস্টে আমার নাম তোলা হয়নি। ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য হলনা। পরিচিত কাউকে পেলামও না। সন্ধেবেলা অহীন অফিস ফেরৎ এসে আমাকে যা বলল তাতে প্রায় মূর্ছিত হয়ে পড়ার মতো অবস্থা। জীবনে আঘাত কিছু কম পাইনি, কিন্তু অহীনের দেওয়া সংবাদটি ছিল কঠিনতম আঘাত। এর জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না। পড়াশোনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা আমার বিধিলিপি। কিন্তু এক্ষেত্রে যে বিধিলিপিটি ছিল তার তুলনা হয়না। অহীন জানালো যে লিস্টে নাম না দেখে সে খোঁজ খবর করে জানতে পেরেছে আমার সারা বছরে মাইনে না দেওয়ার জন্য রেজাল্ট উইথহেল্ড রাখা হয়েছে। অহীন আমার scholarship প্রসঙ্গে কথা তুলেছিল, কিন্তু অফিস ক্লার্ক জানিয়েছেন যে তাঁর কাছে এরকম কোনও খবর নেই। অতএব মাইনে বাবদ একশ কুড়ি টাকা জমা দিলে তবেই ফলপ্রকাশ করা তথা ফরম ফিলাপ করার প্রশ্ন ওঠে। তার কথা শুনে আমার চোখের সামনে অন্ধকার নেমে আসল। একশ কুড়ি টাকা তখনকার দিনে অনেক টাকা। তারপর ফরম ফিলাপের সময় পরীক্ষার ফি হিসেবে নিশ্চয়ই আরও কিছু টাকা লাগবে। ফরম জমা দেবার শেষ তারিখ আর মাত্র দুদিন বাদে। এর মধ্যে বাড়ি গিয়ে যে কোনও উপায় করব তার সময় নেই। কারণ বাড়ি গেলেই যে টাকা জুটবে সেরকম সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। যথেষ্ট সময় থাকলে হয়ত কিছু বিক্রিবাটা করে বাবা দিতে পারতেন। কিন্তু আসল সমস্যা অত সময় নেই। এই শহরেও আমার এমন কোনও বন্ধুবান্ধব নেই যার ক্ষমতা আছে এতগুলো টাকা ধার দেওয়ার।

প্রকৃতপক্ষে এই ব্যাপারটার জন্য আমি কাউকেই দায়ী করতে পারিনা একমাত্র নিজের মূর্খামিকে ছাড়া। আমার নির্বুদ্ধিতা এ ব্যাপারে প্রায় পাহাড় প্রমাণ। ভর্তি হবার পর আমি কোনও দিন আর কলেজের অফিসে যাইনি। আমার ধারণা ছিল অফিস যথাসময়ে আমায় জানাবে। কিন্তু সেখানে অন্য কোনও স্বার্থান্বেষী অকারণে আমার ক্ষতি করতে পারে তা

আমার বিশ্বাসে ছিলনা। আমি যথাসময় ব্যাপারটির খবর নিইনি বলেই এই অঘটন ঘটল। আমি এই ঘটনায় যারপর নাই ভেঙে পড়লাম। অহীন বলল, এখনই অত হতাশ হচ্ছ কেন? এখনও তো সময় আছে। চল টাকা জোগাড়ের চেষ্টা দেখি। আমরা প্রথমে সেদিন সন্ধ্যাবেলায়ই ঘনিষ্ঠ সহপাঠীদের সাথে পরামর্শ করলাম। এদের মধ্যে আমাদের প্রসন্নকুমার বিদ্যালয়েরও দু একজন ছাত্র ছিল। তাদের মধ্যে একজন বলল, এব্যাপাবে একমাত্র বিনয়বাবুই সমস্যা মিটাতে পারেন। চল তাঁর কাছে যাই। বিনয় সেন মশাই কীর্তিপাশার ছোটহিস্যার জমিদারি দেখতেন। তখন জমিদারি নেই, তবু নানান বিষয় কর্মের খাতিরে তিনি ঐ শহরেই বাস করছেন। ছোটহিস্যার জনৈক কর্তার ভাগ্নে হবার সুবাদে সেই ভদ্রলোক মারা গেলে তিনি জমিদারির কর্ম দেখাশোনা করতেন। সবাই বলল, এটা তাঁর করা উচিতও বটে। কারণ একসময় তিনি স্কুলের একজন কর্মকর্তাও ছিলেন এবং আমি ঐ স্কুল থেকে ভাল ফল করেছিলাম। তখন জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হলেও আমরা এরকম ভাবনা চিন্তায় অভ্যস্ত ছিলাম। কিন্তু সমস্যা হল বিনয়বাবু আমার বাড়ির কর্তাদের বিলক্ষণ চিনতেন। একারণেই তাঁর কাছে গিয়ে যে হাত পাততে পারিনা এই কথাটা সবাইকে বললাম। এখানে ইজ্জত এবং আভিজাত্যের প্রশ্নের সাথে আরেকটি ব্যাপার ছিল, তা হল বিনয়বাবুর ব্যঙ্গোক্তির ভয় আর জেঠামশায়ের কাছে খবর গেলে তাঁর প্রতিক্রিয়া। তিনি যদি বাবা বা জেঠামশাইয়ের কথা এবং এব্যাপারে তাঁদের ঈদৃশ ঔদাসীন্যের বিষয় কিছু জিজ্ঞেস করেন আমি কি উত্তর দেব? বিনয়বাবুকে আমি যতদূর জানতাম তাতে বরাবর তাঁকে খুব দাম্ভিক বলেই মনে হয়েছে। অতএব আমি কখনওই তাঁর কাছে যেতে পারব না। এসব শুনে অহীন বলল, ঠিক আছে, তুমি নিজে নাই বা গেলে, আমরা কয়েকজন তো তাঁর কাছে গিয়ে আবেদন করতে পারি। সবাই একবাক্যে অহীনের প্রস্তাবে সায় দিল। আমি অহীনকে বলে দিলাম, দেখ ভাই, ব্যাপারটা কোনওক্রমেই যেন আমার জেঠামশায়েব কানে না ওঠে। অহীন আমাকে ভরসা দিয়ে বলল, ভয় নেই, আমি বিষয়টা কায়দা করেই তাঁর কাছে উত্থাপন করব। ঠিক হল পরের দিন সকালে তারা সবাই বিনয়বাবুর বাসায় যাবে।

এই সময়টায় বৌদি ওখানে ছিলেন না। তাঁর শিশু কন্যাটিকে নিয়ে তিনি পশ্চিম-বঙ্গের দুর্গাপুরে তাঁর ভাইয়ের কাছে গিয়েছেন। তাঁর পাসপোর্ট এবং অন্যান্য প্রয়োজনের জন্য দাদার বেশ খরচ হয়েছে। অতএব তাঁর কাছেও কোনো সাহায্য পাওয়া যাবেনা। আমি বাড়িতে থাকার সময়েই বৌদি চলে গেছেন। ছেলেরা সব বাড়িতেই আছে। সে আর এক চিন্তা। আমি এসেই এই ফ্যাসাদে পড়লাম. এখন তাদের দেখাশোনাই বা কিভাবে করব, বুঝে উঠতে পারছিলাম না। দাদার সাথে এখনও এসে পর্যন্ত দেখ হয়নি। চাকরটি এবং মাসিমা ছেলেদের দেখাশোনায় আছে। দাদার কাছে আমি কখনও পয়সাকড়ি চাইনি, বর্তমান অবস্থায় তা ভাবতেও পারলাম না।

রাতে খেতে বসে দাদা বললেন যে, বৌদি না আসা পর্যন্ত ছেলেদের দেখাশোনার ভার তিনি বিশেষ করে আমার উপর দিয়ে গেছেন। আমি যেন এর মধ্যে আর বাড়ি

না যাই। দাদাকে একটু গম্ভীর মনে হল। খাওয়া সেরে দাদা উপরে চলে গেলেন। আমি চাকরটিকে জিজ্ঞেস করলাম, দাদা গম্ভীর কেন? সে জানাল যে বৌদি যাবার পর থেকে ছেলেরা অসম্ভব দুষ্টুমি শুরু করেছে। আশেপাশের বাসা থেকে রোজ নালিশ আসে। এজন্য তাঁর মেজাজ খারাপ। দুপুরে খেতে এসে নাকি জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমি কখন এসেছি এবং কোথায় গিয়েছি। চাকরটি জানত আমি কলেজে গিয়েছি। সে তাঁকে তাই বলেছে। বাড়ি থেকে ফিরলে দাদা সাধারণত মা, বাবা, ভাইবোনদের খোঁজ নিতেন। এবার দেখলাম তা করলেন না। আমি একটু আতঙ্কিত হলাম।

পরদিন ভোরে দাদা আমাকে জল ধরার জন্য ডাকলেন না। রাঁধুনি চাকরটিই জল আনল। চা জলখাবার খেয়ে অফিসে যাবার সময় দাদাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আমার উপর কোনও কারণে রাগ করেছেন? দাদা আমার দিকে একবার কিরকম যেন এক কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন এবং চোখ ফিরিয়ে নিয়ে কিছুই না বলে চলে গেলেন। ব্যাপারটা আমার ভাল বোধ হল না। অথচ আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না আমার অপরাধটা কি। রাঁধুনি বলল, দাদা কিন্তু মনে হয় আপনার উপর রেগে আছেন। বৌদি বাড়ি নাই তো, তাই। কিন্তু আমি আমার কর্তব্যাকর্তব্য কিছুই ঠিক করতে পারছিলাম না। আমাকে আজকের এবং কালকের এই দুটো দিন হয়ত পুরোটাই নিজের প্রয়োজনে লাগাতে হবে। এই সব চিন্তা করে চাকরটিকে বললাম, ভাই আমি একটা অসুবিধেয় পড়েছি। আজ এবং কাল এই দুটো দিন তুমি একটু ছেলেদেরকে সামলাও। পরশু থেকে সব ভার আমার। সে বলল, ঠিক আছে। আপনি ভাববেন না। আমি দেখব।

দাদা যাবার খানিকক্ষণ বাদেই অহীন এল। বলল, এক কাজ কর। তুমি কলেজে গিয়ে scholarship-এর বিষয়টা নিয়ে খোঁজখবর করে দেখ। হয়ত এসে পড়ে আছে। একটু নরম হয়ে ক্লার্ককে বোলো, নিশ্চয়ই রেকর্ড খোঁজ করে পেয়ে যাবে। যদি পায় তবে তো সমস্যা নেই। যাই হোক, বারোটার মধ্যে সোনালি সিনেমা হলের সামনে এসো, আমরা ওখানে থাকব। দেখি বিনয়বাবু কী বলেন।

বিনয়বাবু আমাদের ও অঞ্চলে একজন ম্যানমান মানুষ। যদিও তাঁর জমিদারি এবং ঠাট বাট সবই মামাবাড়ির দৌলতে, তবু ছোটহিস্যার জমিদার হিসেবে বাল্যাবধি আমরা তাঁকেই জেনেছি। তিনি তাঁর স্ত্রী পুত্র ইত্যাদিদের অন্যত্র রেখে ছোটহিস্যার প্রাসাদেই থাকতেন এবং জমিদারি তথা তাঁর পিস্তুতো দাদার স্ত্রী, পুত্র, কন্যাকে দেখভাল করতেন। স্থানীয় লোকেরা তাঁকে খুব ভাল মানুষ বলে জানত না। অতএব অহীনেরা সেখানে কী ব্যবস্থা করতে পারবে, সে ব্যাপারে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ ছিল। শেষ পর্যন্ত আমাকে না একটা অসম্মানজনক পরিস্থিতিতে পড়তে হয়।

যাহোক দশটা বাজার আগেই আমি ব্রজমোহন কলেজে গেলাম। কলেজে তখন ক্লাশ বন্ধ। শুধু ফর্ম জমা নেওয়ার জন্য অফিস খোলা ছিল। খানিকক্ষণ বাদে ক্লার্ক এলে তাঁর কাছে গিয়ে বিস্তারিত সব বলার চেষ্টা করলাম। কিন্তু অচিরেই বুঝলাম

তিনি আমার কথা শুনতে আদৌ আগ্রহী নন। আমি তথাপি বললাম, দেখুন নিশ্চয়ই scholarship-এর টাকাটা এসেছে। আমি ভয়ানক বিপদে পড়েছি। ওটা না হলে যে পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপ করতে পারব না। লোকটি কি কারণে জানি না আমার সাথে অত্যন্ত যাচ্ছেতাই ব্যবহার শুরু করল। বলল, জামাকাপড়ের ছুরৎ দেখইয়া তো মালুম অয়না যে কলেজে পড়। হ্যার উপর আবার 'এস্কালরশিপ'? খোয়াব দ্যাখথে আছ নাহি? যাও যাও। আগে মায়নার টাহাডা লইয়া আও যাইয়া, হ্যার পর দেহুম হ্যানে। বুঝলাম আর কথা বলে কিছু লাভ হবে না। এখানে আমার এমন কেউই নেই যে আমার পাশে অন্তত দাঁড়ায়। অগত্যা কলেজ ছেড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। ক্লাশ বন্ধ থাকায় ইউনিয়নের কেউ আসেনি, সুতরাং প্রতিবাদের কোনও সুযোগই নেই। লোকটি একটু রেকর্ডটা খুলে পর্যন্ত দেখলনা।

সম্পূর্ণ উদ্‌ভ্রান্তের মতো হাঁটতে হাঁটতে কলেজ থেকে সোনালি হলের সামনে এসে অহীনদের পেলাম। তখন সাড়ে বারোটা বাজে। অহীন বলল, না বললেও বুঝতে পারছি সুবিধে করতে পারনি। আসলে ক্লার্ক লোকটাকে আমার সেদিনও খুব সুবিধের মনে হয়নি। ও কিছু একটা লুকোচ্ছে। Scholarship-এর ব্যাপারে ও কিছু বদমায়েশি করে থাকলেও আশ্চর্যের কিছু নেই। যাহোক্, তোমাকে বিনয়বাবু এক্ষুনি যেতে বলেছেন। উনি কাছারি ঘরেই আছেন। চলে যাও। মনে হয় হয়ে যাবে। তিনি আমাদের কথা দিয়েছেন। অহীন আরও বলল, আমার মনে হয় তোমার ব্যাপারটা আমি তাঁকে ঠিক ঠিক বুঝাতে পেরেছি। উনি বললেন, এ আর এমন কি কথা, ওকে আমার সাথে এক্ষুনি দেখা করতে বল। সুতরাং তুমি আর দেরি না করে যাও। ওখান থেকে সোজা বাসায় গিয়ে খাওয়াদাওয়া কর। আমি বাসায়ই থাকব। আজ আর অফিসে যাব না।

ওরা সবাই চলে গেলে আমিও বিনয়বাবুর কাছারির দিকে যাত্রা করলাম। মাথার মধ্যে ভালমন্দ কোনও কিছুই কাজ করছিল না। কিরকম এক অসহায় শূন্যতা যেন আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। এই সময় অশ্বিনীবাবুর কথা মনে পড়ল। যদি সময় হাতে থাকত তবে তাঁর কাছে গেলে সমস্যার অবশ্য সমাধান হয়ে যেত। কিন্তু তার আর উপায় নেই। এইভাবে চলতে চলতে একসময় বিনয়বাবুর কাছারিতে পৌঁছোলাম। কালো চশমা পরা, ফর্সা গায়ের রঙ গোলগাল বিনয়বাবু ততোধিক ফর্সা ধুতি পাঞ্জাবি পরা বসে রয়েছেন। গিয়ে প্রণাম করে দাঁড়াতে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার জন্যেই ছেলেরা সুপারিশ করতে এসেছিল বুঝি? প্রশ্নের সাথে সাথে আমাকে আপাদমস্তক একবার দেখে নিলেন। পরে একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করে বললেন, অমুকের ছেলে তুমি? তোমার এই দুর্দশা। আমি নিশ্চয় তোমার ব্যবস্থা করব। আচ্ছা তুমি এই টাকাটা ধর—বলে একটা কুড়ি টাকার নোট বাড়িয়ে দিলেন। বললেন, একশ কুড়ি টাকার মধ্যে কুড়ি টাকা হয়ে গেল, বাকি রইল একশ। আচ্ছা চল আমার সাথে—বলে একটি রিক্‌সা ডেকে তাতে আমাকে নিয়ে উঠলেন। রিক্‌সাওয়ালাকে নির্দেশ দিলেন জনৈক উকিলবাবুর বাসায় যেতে। আমি বুঝতে পারছিলাম না তিনি ঠিক কী করতে চলেছেন।

তাই একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলাম, ওখানে অমরা কেন যাচ্ছি? তিনি বললেন, বুঝলে না এত টাকা তো আমি একা দিতে পারব না, তাই সবার কাছ থেকে কিছু কিছু, মানে তোমার জন্য একাজ আমাকেই করতে হবে। সারা জীবনই তো দেশের কাজ করেছি। খদ্দর ছাড়া পরিনি, দিশি ছাড়া বিদেশি কিছু ব্যবহার করিনি। আমরা ছিলাম মহাত্মাজীর চেলা। এখন তো দিনকাল পাল্টে গেছে। সে এক দিন ছিল বুঝলে, বলে অনর্গল নিজ গৌরবগাথা গাইতে লাগলেন। ব্যাপারটা বুঝতে আমার সময় লাগলনা যে উনি আমাকে একজন ভিখিরির মতো ব্যবহার করে কিছু পয়সা তুলবেন এবং আমার প্রয়োজন মিটবার পর যদি বাড়তি কিছু থাকে তা নিজের পকেটে চালান করবেন। ভদ্রলোক কিন্তু অসামান্য বাগ্মী ছিলেন। সে যুগের ল' পাশ করা ধুরন্ধর মানুষ। এইসব মানুষদের আমি চিনেছিলাম জেঠামশাইকে আদ্যন্ত দেখে। এঁরা স্বার্থের জন্য না পারেন এমন কোনও কর্ম নেই, বিশেষত, যে সময়কার কথা আমি লিখছি সেই সময়।

আমি চলতে চলতে একসময় তাঁকে থামিয়েই বললাম, আজ্ঞে আমি তো টাকাটা ধার হিসেবেই চেয়েছি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শোধ দিয়ে দেব। বিনয়বাবু খুব অমায়িক হেসে বললেন, দেখ যার শোধ দেবার ক্ষমতা আছে সেই ধার নেয় বা ধার চাইলে পায়। আমি খোঁজখবর করে যতদূর জেনেছি তোমার পক্ষে তো দূরস্থান তোমার বাপ জেঠারও তো ধার শোধ করার ক্ষমতা নেই। সুতরাং এছাড়া আর কীভাবেই বা টাকাটার জোগাড় হতে পারে? আমি রিক্সাওয়ালাকে থামতে বললাম। সে থামলে, আমি নেমে পড়ে বললাম, মাপ করবেন, আমি ভিক্ষে করতে পারবনা। আর আপনার এ টাকাটাও আপনিই রাখুন। কথা কয়টি বলে আমি এক উন্মাদের মতো ছুটতে লাগলাম। মাথার মধ্যে এক অবর্ণনীয় যন্ত্রণা এবং ক্রোধ যেন গর্জন করছিল। অশ্বিনীবাবু বলতেন, যাচ্ঞা মোঘাবরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা। বাবাও বলতেন। কালিদাস উদ্ধৃত করতেন তাঁরা। কিন্তু এই শ্লোক উচ্চারণের প্রকৃতক্ষেত্র বোধহয় তাঁদের কাউকে কোনও দিন প্রত্যক্ষ করতে হয়নি।

আমি ছুটছি তো ছুটছি। আমার ফর্ম ফিলাপের প্রয়োজন নেই, পরীক্ষা আমি দেব না, আমার জীবনে মানুষ হয়ে ওঠারও কোনও প্রয়োজন নেই। জীবনবাবুর পাঠশালায় আমার যথেষ্ট শিক্ষালাভ হয়েছে। এবার সব কিছু থেকে বিদায় নেব। পড়াশোনা, সংসার, ভাইবোন, মা, বাবা, তাদের রক্ষণাবেক্ষণ কোনও কিছুই আর প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র লেখাপড়ার জন্য এত লাঞ্ছনা আর অপমান সহ্য করার কোনও হেতু নেই। অশ্বিনীবাবু আমাকে ভুল বলেছিলেন যে লেখাপড়ার জন্য যে-কোনও লাঞ্ছনা বা অপমানই গ্রহণ করা যায়। বাস্তবক্ষেত্রে আমি বুঝলাম, তা যায়না, আমি কোনও কারণেই নিজেকে ভিখিরি বা পরপদলেহী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে রাজি নই। অনেক শৈশবকাল থেকেই শ্রমকে পুঁজি করেছি। শুধুমাত্র বংশ কৌলীন্যের জন্য পড়াশোনাকে ভবিষ্যৎ পেশার উপকরণ করার স্বাভাবিক যে কার্যকারণ তাকে আমি আজ থেকে ত্যাগ করলাম। আমার শ্রমই আমার পুঁজি হোক্, শ্রমই ইষ্ট দেবতা হোক এবং সেই শ্রমের ফল আমি

একাই কেন ভোগ করব না, এরকম এক স্বার্থচিন্তাও আমার মধ্যে কার্যকরী হল অন্তত সেই সময়। শৈশবাবধি শ্রমকে আশ্রয় করে যদি এতদূর আসতে পেরে থাকি, অতঃপরের জীবন যাপনও সেই শ্রমের মাধ্যমেই করতে পারব। কিন্তু ভিক্ষা করতে পারবনা।

সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত অবস্থায় যখন বাসায় ফিরলাম তখন তিনটে বেজে গিয়েছে। খিদে, ক্লান্তি বা অনুরূপ কোনও শারীর বিকার বোধ করছিলাম না তখন। জানি না ঐ সময় আমাকে কেমন দেখাচ্ছিল। মনে হয় ঐ সময়ে যদি কাউকে, অর্থাৎ আমার এই লাঞ্ছনার জন্য যারা দায়ী তাদের কোনও একজনকে খুন করতে পারতাম তাহলে কিছু আরাম হত। শরীরের সমস্ত রক্ত যেন নিজ চলাচলের পথ পরিত্যাগ করে মাথায় এসে জড়ো হয়েছিল তখন।

দাদা তখনও দুপুরের খাওয়া খেতে আসেননি। ছেলেরা কে কোথায় আছে সে বিষয়ে খোঁজ নেওয়ার মতো মানসিকতা আমার ছিলনা তখন। চাকরটিকে বললাম— আমি অত্যন্ত ক্লান্ত, যদি সে তাদের খাওয়াদাওয়া ইত্যাদি বিষয়টা দেখে। সে জানাল যে তারা খাওয়াদাওয়া করে নিয়েছে। কিন্তু তাদের সংযত রাখা তার সাধ্যের অতীত। তারা এখন কে কোথায় আছে তা তার জানা নেই। সে আমার চেহারা দেখে খুবই আর্তভাবে জিজ্ঞেস করল, আপনাকে এরকম দেখাচ্ছে কেন? আপনার কি কিছু ঝঞ্ঝাট হয়েছে। বললাম, ভাই, আমার যা হয়েছে তা তোমাকে বলে কিছু লাভ নেই। আমার এতদিন এখানে এই কষ্টস্বীকার করে থাকা ব্যর্থ হল। সে সব কথা শুনে খুবই দুঃখিত হল। খুবই সরলভাবে বলল, আমিও আপনার উপর খুব অন্যায় করেছি। আমি ভেবেছিলাম আমি এবাড়িতে যেমন, আপনিও তেমনই। একারণে মনে একটা ঈর্ষা ছিল। কিন্তু আহা। আপনার ভাগ্য যে এত খারাপ তা যদি জানতাম। যদি সে তা জানত তাহলে কি হত তা নিয়ে ভাববার মানসিকতা তখন আমার ছিলনা। আগামী কালের মধ্যে ফরম ফিলআপ করতে পারব কিনা সেই চিন্তাই মনের মধ্যে প্রকট ছিল তখন।

লোকটি ছেলেদের খোঁজ করে ধরে বেঁধে কোনওরকমে খাইয়েদাইয়ে ওপরতলায় ঘুম পাড়িয়ে রাখল। একটু পরেই দাদা আসলেন। খেতে বসে দাদাকে একটু স্বাভাবিক দেখে বললাম, দাদা আমার অবস্থা তো এই। আপনি কি কিছু ব্যবস্থা করতে পারেন। দাদা বললেন, আর্যলক্ষ্মী ব্যাংকে তর জেঠার কত ডিপোজিট আছে জানস্? লাখ টাকার উপর। আমার হাতে এখন এমন পয়সা নাই যে তোমারে দাতব্য করতে পারি। এ্যামনেই এই সংসার চালাইতে আমার মাগগো ফাইট্যা লহু ঝরে। দাদা খুব পরিষ্কার ভাবেই তাঁর অবস্থার কথা আমায় বললেন। আবার বলি, দাদা মানুষটা লোক হিসেবে খুব খারাপ ছিলেন না। যথেষ্ট শিক্ষিত মার্জিত রুচির মানুষ তিনি হয়ত-ছিলেন না। পড়াশোনার ব্যাপারেও তাঁর খুব একটা উৎসাহ ছিলনা। তাঁর একটাই দোষ ছিল, অসম্ভব ক্রোধ। যাহোক তাঁর উপদেশ হল, পড়াশোনা চুলোয় যাক, আমার প্রয়োজন একটা

চাকরির। তাতে পরিবারের অবস্থা যদি কিছু পাল্টানো যায়। প্রসঙ্গত তিনি লঞ্চ কোম্পানিতে একটা চাকরির সম্ভাবনার কথা বললেন। বললেন, তুই যদি লঞ্চে কাম করতে চাওস আমি চেষ্টা করতে পারি। বললাম, তাই দেখুন, আমার আর ভাল লাগছেনা। দাদা সন্ধের সময় লঞ্চঘাটে তাঁর অফিসে একবার যেতে আদেশ করলেন। বললেন, একটু ফিটফাট হয়ে যেন যাই। ভাবলাম দেখি কী হয়। যদি কালকের মধ্যে কোনো ভাবেই ফর্ম ফিলআপ না হয় তবে দাদার ব্যবস্থাই মানতে হবে। একদিক অন্তত বাঁচুক।

দাদা অফিসে চলে গেলে অহীন এল। সে আমারই জন্য আজ অফিস কামাই করেছে। তার ঠিকে চাকরি, 'নো ওয়র্ক নো পে।' আমার জন্য তার একদিনের রোজ মার খেল। তার চেহারা দেখে মনে হল সে খুব অসুস্থ। কারণ জিজ্ঞেস করতে বলল, পরে বলছি, আগে তোমার খবর বল। বিনয়বাবু কি বললেন? আমি সব কথা বলতে অহীন কেঁদে ফেলল। তার মতো শক্ত ছেলেকে কাঁদতে দেখে আমিও অস্থির হয়ে পড়লাম। দুই বন্ধু মিলে অনেকক্ষণ কাঁদলাম। আমার বয়স তখন ষোলো, অহীন উনিশ কুড়ির এক যুবক। দাদার চাকরি বিষয়ক সংবাদ জানাতে সে বলল, ধরে নেও হবে না। কারণ তুমি এখনও মাইনর। তবু চেষ্টা করে দেখ। আমার একটা সেট পোশাকি সার্টপ্যান্ট আছে। কোনও মতে তাই দিয়ে চালিয়ে নাও। আমি জানতে চাইলাম, ভাই, তোমার চেহারাটা আমার কেমন যেন বোধ হচ্ছে। মনে হচ্ছে, আমার বর্তমান পরিস্থিতির দুশ্চিন্তা ছাড়াও অন্য কোনও দুরূহ সমস্যা তোমার কাঁধে চেপেছে। তুমি কিছু কিন্তু করোনা। সব আমাকে বল। বাড়ির সবাই ভাল আছেন তো? অহীন বলল, আমরা দুজনেই এক ভীষণ দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। সব কথা সবসময় বলা যায়না, উচিত নয়। তুমি লঞ্চ ঘাটের কাজ সেরে বেল পার্কে এসো। ইলেকট্রিক অফিসের সামনে আমি থাকব। কালীদাকে চেনো তো? সেও থাকবে। একটা বিষয়ের ফয়সালা আজই করতে হবে। বেশি চিন্তা করোনা। তবে ব্যাপারটা খুবই জরুরি। এখন তোমাকে কিছুই বলব না। তুমি আগে তোমার কাজ সেরে এসো।

কালীদা মানুষটি ভোলার। তাঁর ছোট ভাই ভুলুদা আমার খুব নিকটজন। থাকেন শহরের দুনম্বর ঝাউতলা লেনে। বাসাটি আমার দাদার শ্বশুরমশায়ের বাসা। আমি কখনও সখনও সেখানে যাই। এক আধ রাত থাকিও। ভুলুদা শহরে এসেছিলেন পড়াশোনার উদ্দেশ্যে। তা হয়নি। এখন ইলেকট্রিকাল করপোরেশানে একটি চাকরিতে আছেন। সেই সূত্রে কালীদা মাঝে মাঝে এই শহরে আসেন এবং আমার দাদার শ্বশুরবাড়িতেই আশ্রয় নেন। ভোলার মানুষ। তাই তাঁদের স্বরসংগতি আমাদের চাইতে আলাদা। কালীদা মানুষ খারাপ না, তবে একটু উগ্র। কথায় কথায় হাতচালনো অভ্যেস। দ্বৈপায়ন মানুষেরা এরকম নিয়মেই অভ্যস্ত। তাই তাঁর উপস্থিতিতে কোনো বিষয়ের ফয়সালা করার সংবাদে আমার উৎকণ্ঠা গভীর হল। আমি অহীনকে অনুনয় করে বললাম, তুমি আমার সব সমস্যার কথা ভুলে যাও। শুধু বল, কালীদাকে কেন প্রয়োজন

হয়েছে? অহীন বলল, সন্ধের আগে বলা যাবে না—বলে সে চলে গেল। আমি এক অন্য অসম্ভব বিপদের গন্ধ পেলাম তার আচরণে।

সন্ধেবেলা অহীনের সার্টপ্যান্ট পরে, যেন একটু ভার ভারিক্কি দেখায় এরকম চুলটা আঁচড়িয়ে নির্ধারিত সময়ে লঞ্চ ঘাটে পৌঁছোলাম। দাদা বললেন, সব কথা কওয়া আছে। আইজঐ ইন্টারভিউ লইয়া তরে appointment দিব। কেনো চিন্তা নাই। রেজাল্ট তো ভাল আছে। কিন্তু আমি যখন ইন্টারভিউ হলে ঢুকলাম, কর্তারা সমস্বরে বলে উঠলেন। আরে তুমি তো প্রায় একজন দুগ্ধ পোষ্য শিশু। খোকা তুমি এখানে চাকরি করবে কেন? আমার খুব আত্মসম্মানে লাগল। বললাম, দেখুন আপনাদের চাহিদা অনুযায়ী আমার রেজাল্ট ভালই আছে। তাঁরা বললেন, তা আছে, তবে তোমার বয়সটা সমস্যা করেছে। অন্তত আরো দুবছর যোগ না হলে তুমি চাকরি পাবেনা। অতএব immature বলে তাঁরা আমাকে প্রত্যাখ্যান করলেন। অস্বীকার করার উপায় নেই, ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র। তখনও আমার গোঁফের রেখা স্পষ্ট হয়নি। চেহারায় কিশোর কোমল ছাপ। অতএব আমাকে মনোনীত না করার জন্য কর্তৃপক্ষকে দোষ দিতে পারিনা। কিন্তু দাদার মনে হল আমি তাঁদের প্রশ্নের উত্তর ঠিক ঠিক ভাবে দিতে পারিনি বলেই তাঁরা আমায় সিলেক্ট করেননি। বয়সের ব্যাপারটাকে তিনি আদৌ গুরুত্ব দিলেন না। বললেন, ক্যান্? আমি কি ষোলো/সতেরো বছরে কামে ঢুকি নাই? কিন্তু আজকের নিয়ম যে কাল পাল্টায়, এ বিষয়ে দাদার ধারণা পরিষ্কার ছিলনা।

পরদিন, ফরম ফিলআপের শেষ দিন। দুপুর অবধি সারা শহর উদ্‌ভ্রান্তের মতো চষে বেড়ালাম। না, কোনও বন্ধু, আপনজন কেউ নেই এই সমস্যা থেকে আমাকে উদ্ধার করার। গতকাল সন্ধেয় বেল পার্কে অহীন এবং কালীদাকে পাইনি। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে চলে এসেছিলাম। তার সমস্যার কথাটাও মাথার মধ্যে চেপে বসেছিল। ভেবে পাচ্ছিলাম না তার এমন কী সমস্যা এসময় হতে পারে। রাত্রে বাসায় এসে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। ওর বাসায় গিয়ে আর খোঁজ নেওয়া হয়ে ওঠেনি। সম্ভাব্য অসম্ভাব্য সব স্থানে ঐ কয়টা টাকার জন্য ঘুরে বেড়ালাম। কিন্তু কোনও সুরাহা হল না। ঘুম আসছিল না। আমার এই ছোট্ট জীবনটুকু ভালবাসার মতো যদিও কোনও অনুষঙ্গ ছিল না, তবুও তার প্রেম যেন আষ্টেপৃষ্টে জড়ানো। উঠে আলো জ্বেলে একটা পদ্য মতন লিখলাম—

তবুও নিশীথ নিরন্ধ্র আঁধারে
যখন ডুবে গিয়েছে ক্ষীণ চাঁদ
তখনও আমি তোমার জন্যে বাঁচি
তোমার প্রেম ঘুচায় অবসাদ।
তুমি তো এক আদিম অনুষঙ্গ
কখনও দেখাও বিকট ভ্রূভঙ্গ
তবুও আমি তোমারি নামে বাঁচি
কালভৈরব দেখায় কত রঙ্গ

সারা রাত ধরে কেন জানি না আমাদের বড় খালপারের—ঐ বৃক্ষ দম্পতির পরিপার্শ্ব নিয়ে স্বপ্ন দেখে গেলাম। সর্বশেষ দেখলাম, আমি যেন একটা বৃহৎ সরীসৃপ শিকড়ের উপর ঘুমিয়ে পড়ে আছি।

— তেতাল্লিশ —

পরদিন সকালে অহীনের বাসায় গিয়ে দেখলাম সে অফিসে যায়নি। অত্যন্ত বিধ্বস্ত চেহারা। চোখমুখ দেখলে বোধ হয় সারারাত ঘুমোয় নি। আমার দুরবস্থায় সে অত্যন্ত কাতর ছিল বটে, কিন্তু তাকে দেখে মনে হল আরও কিছু মারাত্মক ঘটনা ঘটেছে, না হলে এতটা বিধ্বস্ত তাকে দেখাবে কেন? তাছাড়া সে এবং কালীদা কাল বেল পার্কে যায়নি কেন তাও একটা চিন্তার ব্যাপার। অহীন চুপচাপ বসে ছিল। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে বলল, 'আমি বাধ্য হয়ে কাল যেতে পারিনি। কালীদাকে নিয়ে অন্যত্র যেতে হয়েছিল। সেকথা পরে বলছি। তোমার চাকরির খবর নিশ্চয়ই নৈরাশ্যজনক? সব বললাম। সে বলল, আমি অনুমান করেছিলাম। যাহোক্, এদিকে আমি চূড়ান্ত বিপদে পড়েছি। কাল বাড়ি থেকে সংবাদ এসেছে, মাধুরী, আমার বোন, অন্তঃসত্ত্বা। ও অত্যন্ত কষ্টের সাথে কথাগুলি উচ্চারণ করল। আমার পায়ের নীচে পৃথিবীটা যেন দুলে উঠল। কোনও কথাই মুখে জোগাচ্ছিল না। কোনওরকম চিন্তাও করতে পারছিলাম না। তখনকার দিনে এ এমন একটা সমস্যা যে আমার তখনকার সমস্যা এর কাছে কিছুই নয়। মাধুরীর তখন বয়স বছর পনেরো। তখনকার দিনে গর্ভপাতের ব্যবস্থা না আইনসিদ্ধ না সরল। পুরো ঘটনাটা শুনে আমি তাজ্জব বনে গেলাম। লোকটিকে আমি চিনি। আমাদের এক মাস্টারমশাইয়ের ছেলে। শহরে তার জেঠতুতো দাদার বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করতে এসেছিল। তার দিদিও কাছাকাছি থাকত। পড়াশোনা অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছে। কী একটা চাকরি করে। কালীদা এবং অহীন কাল তার দিদির কাছেই গিয়েছিল। ঘটনার নায়ক ব্যাপারটা আগেই জেনে সপ্তাহখানেক আগে অফিসে ছুটি নিয়ে গ্রামের বাড়িতে গা-ঢাকা দিয়েছে। অহীন এবং কালীদা দিদিকে অনুরোধ জানিয়েছিল যাতে তার ভাই মাধুরীকে বিয়ে করে একটা সম্মানজনক নিষ্পত্তি করে। দিদি রাজি হয়নি, কারণ তারা ব্রাহ্মণ এবং অহীনেরা কায়স্থ। সে অহীনকে পরামর্শ দিয়েছে যেন গোপনে গর্ভপাত করিয়ে ব্যাপারটার সমাধান করা হয়। সেক্ষেত্রে পয়সাকড়ি যা লাগবে তার ব্যবস্থা করা যাবে।

বিষয়টার আকস্মিকতা, অহীনের অসহায়তা, দিদির নির্লজ্জ আচরণ এবং ছেলেটার কাপুরুষতায় আমি একেবারে দিশেহারা বোধ করতে লাগলাম। অহীনকে জিজ্ঞেস করলাম, সে কি করতে চায়। যে বলল, ভাবতে পারছিনা। তুমি বাসায় গিয়ে খেয়েদেয়ে এসো, তারপর কালীদার সাথে আলোচনা করে দেখি।

মনে একরাশ দুঃখ এবং দুশ্চিন্তা নিয়ে বাসার দিকে রওনা হলাম। বেলা প্রায় আড়াইটে তিনটে বাজে। পরীক্ষা দেওয়া যে হবেনা সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ ছিলনা। এখন অহীনের বিপদে কি করা যায় সেটাই বড় দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াল। বাসার কাছাকাছি

এসেছি। গলিতে ঢোকার মুখেই এক তীব্র আর্তনাদ এবং তার সাথে ততোধিক চিৎকারে তর্জন গর্জন শুনতে পেলাম, দ্রুত ঘরে ঢুকতেই বুঝতে পারলাম দাদা তাঁর দ্বিতীয় পুত্রটিকে অমানুষিক প্রহার করছেন। দোতলার কাঠের মেঝেতে দুমদাম দাপাদাপির শব্দ, চিৎকার এবং গালিগালাজে বাড়ির সামনে আশপাশে পড়শিরা সব জড়ো হয়ে প্রমাদ গুনছে। ছেলেটা একটা জানোয়ারের মতো চেঁচিয়ে যাচ্ছে। মারের বিরাম নেই। বড় ছেলেটি এসময় ইস্কুলে থাকে। ছোটগুলি ভয়ে আশপাশের বাড়িগুলিতে লুকিয়ে থাকবে। চাকরটারও পাত্তা নেই। ছেলেটার কান্না এবং চিৎকার সহ্য করতে না পেরে দোতলায় উঠলাম। গিয়ে দেখি তিনি ছেলেটাকে মেরে একেবারে রক্তাক্ত করে ফেলেছেন। মার তখনও চলছে। আমি ছুটে গিয়ে ছেলেটাকে আড়াল করে দাঁড়ালে দাদা খুব তীব্র স্বরে বললেন, আমি যদি ওকে তক্ষুনি ছেড়ে না দিই এবং নিজের ভাল চাই তবে যেন সরে যাই, নচেৎ সাংঘাতিক অবস্থা ঘটবে। তিনি কোনওদিন আমায় এরকম ভাবে কথা বলেননি। তিনি বদরাগী, রাগলে জ্ঞান থাকে না সে কথা শুনেছি, কিন্তু তার নমুনা যে এই এবকম ধারণা ছিলনা। তিনি ক্রুদ্ধভাবে আমাকে আরও অনেক কিছুই বললেন। আমাকে পালন পোষণ করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হবেনা এবং আমি যেন অচিরেই ওখান থেকে বিদায় হই—এসবও তিনি বললেন। আমি তাঁর কথায় কান না দিয়ে মিনতি করে বললাম যে, ছেলেটাকে এবার ছেড়ে দেওয়া হোক। ছেলেটা কোনওরকমে তার বাবার কবল থেকে মুক্ত হয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল। সে তখন শারীরিক আক্ষেপ এবং বেদনায় কাঁপছে। আমি তাকে নিয়ে নীচে নামার জন্য এগোতে দাদা উন্মত্তের মতো আমাকে ছেলেটার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বেধড়ক কীল, চড়, লাথির বৃষ্টি বইয়ে দিতে লাগলেন, তার সাথে সমানে গালি গালাজ এবং কটূক্তি। তিনি তখন যেসব কথা বলছিলেন তা ঠিক রাগের মুহূর্তের প্রলাপ মাত্র নয়। কথাগুলো পূর্বচিন্তিত। তিনি আমাকে তাঁর অন্নধ্বংসকারী একটা পরগাছা, নিমকহারাম, অপদার্থ এবং অকর্মণ্য বলে গাল পাড়তে লাগলেন এবং তৎসহ প্রহার। সর্বশেষ যে কাজটি তিনি করলেন তার তুল্য লাঞ্ছনা এবং আঘাত জীবনে আর পাইনি। মারতে মারতে সিঁড়ির মুখের কাছে এনে একটা প্রচণ্ড লাথি মেরে বললেন, যা তোর মুখ যেন এই বাসায় আর না দেখি। আমি লাথির আঘাতে সিঁড়ির বিপরীত দিকের টিনের বেড়ার উপর আছড়ে পড়লাম। খানিক নীচের একটা কাঠের আড়ার সাথে থুতনির সাহায্যে খানিকটা দোল খেয়ে, প্রায় দশপনেরো ফুট নীচের শানের মেঝেতে দড়াম করে পড়ে গেলাম। যতটুকু মনে আছে প্রায় সাথে সাথেই আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। মাথার পিছন দিকে জোর আঘাত লেগেছিল। তারপর কী হল না হল তা আর আমার মনে নেই।

শানের মেঝেতে কতক্ষণ অজ্ঞান হয়েছিলাম জানিনা। জ্ঞান হলে দেখি আমি অহীনের কোলের উপর মাথা দিয়ে শুয়ে আছি। তখনও ভূ-শয্যায় শায়িত। একমাত্র রাঁধুনি চাকরটি আর মাসিমা ছাড়া ঘরে আর কেউ তখন ছিলনা। চাকরটি বোধহয় অহীনের নির্দেশমতো কখনও ঠাণ্ডা জল কখনও বা গরম জল এনে দিচ্ছিল। মার আমি জীবনে ঘরে-পরে অনেক খেয়েছি তবে জ্ঞান হারাবার অভিজ্ঞতা এই প্রথম।

চেতনা পুরোপুরি ফিরে আসতে যে কথাটি প্রথম কানে গেল তা মাসিমার উক্তি। তিনি মাথাকুটে বলে যাচ্ছিলেন, হে বাবা ষড়ানন, হে বাবা কার্তিক, তুমি আমার এই ছেলেটাকে বাঁচিয়ে দাও বাবা, ওকে সুস্থ করে দিও। ষড়ানন বা কার্তিক বারবনিতাদের দেবতা। আমি উঠে বসলে অহীন বলল, তোমার নিশ্চয় খাওয়াদাওয়া কিছু হয়নি? চাকরটি বলল, না তার আর সুযোগ হয়নি। সেই সকালে সামান্য চা রুটি খেয়ে বেরিয়ে ছিলেন, তারপর বাসায় ফিরেই তো এই হুজ্জোত। সে আমাকে অনুরোধ করে বলল, আপনি একটু হাতমুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নিন। আমার সারা শরীর ব্যথায় অসাড়, মাথাটা অসম্ভব ভারি বোধ হচ্ছে। যেন একটা বিশাল ওজনের পাথর কেউ ঝুলিয়ে দিয়েছে। খাওয়ার ইচ্ছে বা ক্ষুধাবোধ কিছুই নেই। অহীনকে সে কথা বলতে বলল, মাথার পিছনে আঘাত লেগেছে, সুতরাং এখন ভারি কিছু খাওয়া উচিত হবেনা। কোনও বমির ভাব নেই তো? সেরকম কিছু বোধ করছিলাম না। অহীনকে জিজ্ঞেস করলাম, বেলা তো শেষ হতে চলল, কালীদার কাছে যাবার ছিলনা? সে বলল, হ্যাঁ, কিন্তু তুমি কি যেতে পারবে? আমি বললাম, পারতে হবেই। তুমি একটু বসো। আমি আমার বইপত্রগুলি গুছিয়েনি। এখানে আর নয়। আজ রাতটা অন্যত্র থাকব। কাল দেখি কী করা যায়। অহীন বলল, আমিও তাই ভাবছিলাম। এরপর এখানে থাকার কথা ভাবা যায়না। বেলা শেষ হয়ে গিয়েছিল। মাসিমা চোখের জল মুছতে মুছতে চলে গেলেন। আমি হাতে মুখে জল দিয়ে, বইপত্তর গুছিয়ে নিলাম। চাকরটির কাছে জানলাম ছেলেদের সে পাশের বাড়ির এক ভদ্রমহিলার কাছে রেখে এসেছে। দাদার কিরকম যেন আত্মীয়া। দোতলায় গিয়ে একটি চিরকুটে লিখলাম, বৌদি অনিবার্য কারণে আমাকে চলে যেতে হচ্ছে। আপনি যে দায়িত্ব আমাকে দিয়ে গিয়েছেন তা পালন করতে না পারায় ক্ষমাপ্রার্থী। চিরকুটটি তার হারমোনিয়ামের উপর রাখা একখানি স্বরলিপির বইয়ের মধ্যে এমনভাবে রাখলাম যেন সহজেই নজরে পড়ে। মহিলা নতুবা আমার সহসা অন্তর্ধানের কার্যকারণ খুঁজে পাবেন না, নীচে এসে টিনের সুটকেসটি হাতে নিয়ে চাকরটিকে বললাম, দাদা ফিরলে বোলো আমি চলে গেছি। চাকরটি প্রকৃতই খুব দুঃখিত হল। অহীনের সাথে আমি রাস্তায় নেমে এলাম।

রাস্তায় চলতে চলতে অহীনকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার তো শিক্ষাদীক্ষা এবং মানুষ হবার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধিলাভ হয়েছে, তোমার বর্তমান সমস্যার কী সমাধান চিন্তা করেছ? অহীন বলল, চিন্তা করে কিছুই কুল পাচ্ছিনা ভাই। তাই একটা জিনিসই শুধু ভাবছি আর আতঙ্কিত হচ্ছি, মাধুরী হঠাৎ কোনো অঘটন ঘটিয়ে না ফেলে। সবচেয়ে আপশোসের বিষয় কি জানো, লোকটাকে আমিই বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলাম। একসময়ে প্রায় ঘরের ছেলের মতো হয়ে গিয়েছিল। এ রকম একটা বিশ্বাসঘাতকতার কাজ যে করবে, স্বপ্নেও ভাবিনি। কিন্তু এখন সেসব কথা ভেবে লাভ নেই। দেখি কালীদা কী বলে।

আমি বুঝতে পারছিলাম, কালীদা কোনও সমাধান বাৎলাতে পারবেনা। সে বড়জোর মারধর দেবার কথা বলতে পারে। কিন্তু তাতে কেলেংকারি বাড়বে বৈ কমবে না, প্রচলিত

প্রথা এক্ষেত্রে ধরেবেঁধে জবরদস্তি বিয়ে দিয়ে দেওয়া, তাতে ইজ্জত খানিকটা বাঁচলেও আখেরে ভাল হয়না। তখনকার সমাজে এবং আইনে গর্ভপাত করানো নিন্দনীয় এবং অন্যায়। এ এক বিষম সমস্যা। কালীদার সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত হল লোকটিকে তার বাড়ি গিয়ে ধরতে হবে এবং তাকে এই ঘটনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেওয়ার জন্য চাপ দিতে হবে। এই মর্মে তার দিদির বাসায় কথা বলতে গিয়ে জানা গেল লোকটি বাড়ি যায়নি, সে গেছে চাঁদপুরে। কায়দাকানুন করে এখানকার অফিস থেকে সে বদলি করিয়ে নিয়েছে। অতএব সে ধরাছোঁয়ার বাইরে ঠিক না হলেও আমাদের পক্ষে তার নাগাল পাওয়া শক্ত। সুতরাং গর্ভপাত করানো ছাড়া আর কোনও গত্যন্তর নেই। খরচের দায়িত্ব অবশ্য দিদি স্বীকার করে নিলেন। অসম্মানের চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে আমাদেরও এরকম সিদ্ধান্তই নিতে হল।

রাতটা কালীদার সাথে কাটালাম। শরীর অত্যন্ত অসুস্থ। সর্বাঙ্গে ব্যথা। মনে গভীর হতাশা এবং বিষণ্ণতা। অহীন এবং কালীদা পরামর্শ দিল আমি যেন পরদিনই বাড়ি চলে যাই। কেননা শহরে থেকে অসুস্থ হয়ে পড়লে দেখার কেউ নেই। তাছাড়া অনির্দিষ্টকাল থাকার মতো কোনও জায়গাও নেই। আমিও ভেবে দেখলাম শহরে থাকার আর কোনও অর্থও হয়না। পড়াশোনাই যখন হবে না তখন এখানে লাথি ঝাঁটা খেয়ে থাকার প্রয়োজন কী? বরং বাড়ি গিয়ে আবার টিউশানি, এটাওটা করে সংসারের যদি কিছু সাহায্য করতে পারি, তাতে ভাইবোনগুলোর খানিকটা সুবিধে হবে। অহীনের বর্তমান সমস্যা যত জটিলই হোক, আমার সেখানে কিছুই করার সামর্থ্য নেই। তবুও তাকে এই অবস্থায় রেখে চলে যাওয়া নিতান্তই স্বার্থপরের কাজ বলে আমার মনে হল। অহীনকে সেকথা বলতে সে বলল, তুমি যদি সুস্থ থাকতে তাহলে দুচারদিন থেকে যেতে বলতাম এবং তাতে আমিও খানিকটা মানসিক বল পেতাম। কিন্তু তুমি আদৌ সুস্থ নও। আমার মনে হয় তোমার সুস্থ হতে বেশ কয়েকদিন সময় লাগবে। বরং সুস্থ হয়ে একবার এসো।

যে অহীন তার অপরিসীম দারিদ্রের মধ্যে থেকেও আমার জন্য প্রাণপাত করেছে, তার এই চরম বিপদের সময় ছেড়ে আসতে হবে ভেবে গ্লানির আর শেষ রইলনা। কিন্তু উপায়ও কিছু নেই। অহীনকে বললাম, ভাই, যাই ঘটুক একটা চিঠি দিয়ে সব খবরাখবর জানিও। আর কিছু করতে পারি-বা-না-পারি অন্তত তোমার দুঃখের সমব্যথী হতে তো পারব।

— চুয়াল্লিশ —

গ্রামে থাকাকালীন সমস্যা ছিল একরকম। এখন শহরের জীবনের তামাশাটাও দেখা হল ভালভাবেই। দুরাচারী শত্রুর বিরুদ্ধে সাবধানতা অবলম্বন করার কায়দাটা গ্রামের তদানীন্তন পরিবস্থায় রপ্ত করতে পেরেছিলাম। কিন্তু বন্ধুবেশী দুরাচারীর সুযোগ নেওয়ার বিরুদ্ধে কী করা যায় সে শিক্ষা ছিলনা। অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মন নিয়ে পরের দিন বাড়ি ফিরে আসলাম।

বাড়ি আসার পথে লঞ্চেই ধুম জ্বর হল। বাবা মা সব শুনে খুবই দুঃখিত হলেন। বাবার যদিও পড়াশোনার ব্যাপারে বিশেষ মোহ আগে ছিলনা। কিন্তু আমার বাল্যাবধি আকাঙক্ষা এবং সবরকম প্রচেষ্টার এই পরিণতি দেখে তিনি যারপর নাই দুঃখিত হলেন। পড়াশোনা করার আকাঙক্ষায়, জ্ঞান হওয়ার পর থেকে আমি অনেক ক্লেশ, লাঞ্ছনা এবং অপমান সহ্য করেছি। জ্বরতপ্ত মস্তিষ্কে সেইসব স্মৃতি আমাকে আরও আকুল করে তুলল। ভাবলাম, এই নিরর্থক চেষ্টা করে আর লাভ নেই। তার চেয়ে যদি কিছু রোজগার করতে পারি তবে হয়ত ভাইবোনগুলোকে মানুষ করতে পারব। কিন্তু এতবড় সংসার তার বিশাল হা-মুখ ব্যাদান করে রয়েছে। তার সহস্র অভাব। আমার সামান্য ক্ষমতার রোজগারে কতটুকু সমস্যারই বা সমাধান হবে?

প্রায় কুড়ি দিন ভোগার পর আপনা থেকেই জ্বর নিরাময় হল। ওষুধ পথ্যের সামর্থ্য ছিলনা। বিনিপয়সার জড়িবুটি গিলে একসময় সুস্থ হলাম। আমি সুস্থ হলাম তো বাবা অসুখে পড়লেন। তখনকার দিনে জ্বর হওয়া মানে পনেবো বিশ দিনের ধাক্কা। মাঝে একদিন ইস্কুলের মাস্টারমশাইদের সঙ্গে দেখা করতে গেলে, তাঁরা আমার অবস্থা শুনে খুবই দুঃখিত হলেন। সময়মতো তাঁদের সাথে যোগাযোগ করিনি বলে আমার নির্বুদ্ধিতা নিয়ে নিন্দাবাদও করলেন। যাহোক, হেডমাস্টারমশাই বাবার অসুস্থতাজনিত কারণে অনুপস্থিতির জন্য তাঁর জায়গায় আমাকে ক্লাশ করতে আদেশ করলেন। মাইনে দিনে একটাকা। বাবা সর্বসমেত আঠেরোদিন শয্যাশায়ী ছিলেন। সর্বমোট আঠেরো টাকা পেলাম। আমার এত কালের রোজগারে এতবেশি টাকা একসাথে কখনও পাইনি। আমার ঐ দুঃখের সময়ে সেই কয়দিনের কাজটা এবং তার রোজগার এক সঞ্জীবনীর কাজ করল। তখনকার দিনে আঠেরো টাকা অনেক টাকা। তখন পয়সা কম ছিল বলে জিনিসপত্রের দামও কম ছিল। চাল তখন আট আনা বারো আনা সের। ডাল, মুসুরি দুআনা, খেসারি এক আনা। চা পাঁচ আনায় একছটাক। দুটাকা একটাকার বাজার করলে দু তিন দিনের ডাল ভাত জোগাড় করা কষ্টকর ছিলনা। তেলের প্রয়োজন বাড়ির নারকেল অথবা সস্তা তিল তেলেই মিটে যেত। চিনির ব্যবহার ছিলনা বললেই চলে। গুড়ই ছিল একমাত্র মিষ্টির উপকরণ।

আগে ট্যুইশানি করে যা রোজগার হত তার সবটাই সংসারে দিয়ে দিতাম। শহরে বাস করার ফলে নিজের খরচ বলে একটা রোগ জন্মে ছিল। তাই এবারের রোজগার থেকে মাকে দশ টাকা দিয়ে, বাকি আট টাকা নিজের প্রয়োজনের জন্য রেখে দিলাম। কারণ কবে আবার রোজগারের সুযোগ হবে কে জানে? ট্যুইশানিগুলো তো অনেকদিন হাতছাড়া। বাবা আবার অসুস্থ হয়ে আমাকে রোজগারের সুযোগ দিন এমনটাও কাম্য ছিলনা।

এই সময় ভাগ্য আরেকবার পরিহাস করল। বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে একদিন একটি চিঠি পেলাম। আমার সময়ের অধ্যক্ষ কবীর চৌধুরী সাহেব তখন বদলি হয়ে অন্য কোথাও গিয়েছেন। তাঁর জায়গায় যিনি এসেছেন, তাঁর নাম মেজবাহারুলবার

চৌধুরী। কবীর সাহেব, আমি থাকাকালীনই বদলি হয়ে চলে গিয়েছিলেন। উপাধ্যক্ষ গোলাম মোস্তাফা সাহেব নামে একজন তাঁর জায়গায় কাজ দেখছিলেন। তাঁর সাথে আমার বিশেষ পরিচয় ছিল না। আমি চলে আসার সময় কবীর সাহেব থাকলে, আমার অত দুর্ভোগ হতনা। তাঁর সাথে দেখা করলে একটা ব্যবস্থা তিনি অবশ্যই করতেন। সে যাহোক, এখন যে চিঠিটা পেলাম তাতে স্বাক্ষর ছিল মেজ্‌বাহারুল বার চৌধুরী সাহেবের। যতদূর স্মরণ আছে চিঠিখানা ছিল নিম্নরূপ—

It is learnt from the office record that a Scholarship for Rs.15/-p.m and a Stipend for Rs.10/-p.m remained unpaid which were to be paid to you. It is not understood as to why you have not availed of those advantages which the state has provided for the meritorious students in order to ease the burden of their educational expenditure. I also like to intimate you that non acceptance of national scholarship is a gross misconduct on the part of a student.

আরও কিসব কথা যেন ছিল সেই চিঠিতে। যা হোক, চিঠির শেষে তিনি জানিয়েছেন, আমি যেন অচিরেই কলেজ অফিসে গিয়ে কলেজের প্রাপ্য বাদে বাকি টাকা নিয়ে আসি। চিঠিটি পেয়ে আমি তো হতবাক ! যে টাকার জন্য ক্লার্কের দাঁত খিচুনি এবং গালমন্দ খেয়ে, পড়াশোনায় ইস্তফা দিয়ে চলে আসতে বাধ্য হলাম, সেই টাকাই না নেবার জন্য এখন আমাকে উল্টে তিরস্কার শুনতে হচ্ছে। মানুষ যে অদৃষ্ট বা অলৌকিকত্বে বিশ্বাসী হয় তার কারণ বোধহয় এই ধরনের আকস্মিক সংঘটন। এইসব অভিনব ঘটনার ব্যাখ্যা হঠাৎ করে পাওয়া যায় না বলে মানুষ ভাগ্যবাদী, ঈশ্বরবাদী হয়ে পড়ে। আমারও সেইসব দিনে, ঈশ্বরে বিশ্বাস বেশ গাঢ় হয়ে দেখা দিয়েছিল।

পরদিন ভোরের লঞ্চেই সদরে যাত্রা করলাম। কলেজে গিয়ে প্রথমেই অফিসে না গিয়ে অধ্যক্ষ সাহেবের সাথে দেখা করলাম। সেইদিন থেকেই আমাদের পরীক্ষা শুরু। সহপাঠী, সহপাঠিনীরা সবাই তখন পরীক্ষা দিতে ব্যস্ত। আমার পরিচয় পাবার সাথে সাথেই অধ্যক্ষ সাহেব আমাকে তীব্র ভাষায় তিরস্কার করতে শুরু করলেন। ভদ্রলোক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার আপাদমস্তক দেখলেন। আমার দীন দরিদ্র চেহারা এবং পোশাক আশাক দেখে সম্ভবত তাঁর বিরক্তি কিছু প্রশমিত হয়ে থাকবে। জিজ্ঞেস করলেন, আমি পরীক্ষায় বসিনি কেন? আমি যথাসম্ভব সংক্ষেপে কিন্তু কিছুই গোপন না করে সব ঘটনা তাঁকে বললাম। শুনে তিনি পুনর্বার ক্রুদ্ধ ভাবে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, Why didn't you come to me then? আমি বিনীত ভাবে বললাম, you were not here at that time sir, and the previous principal had already left for his new assignment. জনাব চৌধুরী আরও কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে প্রশ্ন করলেন, Are you a hindoo? বললাম, yes sir. তিনি হতাশ একটা মুখভঙ্গি করে

বললেন, That's the reason. These people here in this office are awefully communal, I understand that idiot clerk must have done this mischief. But ha! how sad I am. তখনকার দিনের পূর্ব পাকিস্তানে, কোনও অপিস বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই রকম ইংরেজিতেই বার্তালাপ করার রীতি ছিল। ব্রিটিশ আমলের অভ্যেস তখনও যায়নি। সে যাহোক্ — ঐ মাপের একজন মানুষ যে আমা-হেন একজন অভাগার সাথে এইসব কথা বলতে পারেন সেটাই সেদিন আমার কাছে পরম আশ্চর্য বলে বোধ হয়েছিল। তিনি সেদিন আরও নানান কথার মধ্যে বলেছিলেন যে, তাঁর পরামর্শ হল ঐ জাহান্নামে না থেকে ভারতে গিয়ে আমার ভাগ্য-পরীক্ষা করে দেখা। অন্যথায় আমার ভবিষ্যৎ ঝরঝরে হতে বাধ্য। অবশ্য তিনি আমাকে এও জানাতে ভুললেন না যে এরকম দোজখ্ সেখানেও আছে, এটাও যেন আমি না ভুলি।

তারপর একটি চিরকুটে কিছু নির্দেশ লিখে আমাকে দিয়ে বললেন সেটি ক্লার্কের কাছে দিতে। অফিসে পৌঁছে পরিচয় দিতে-না-দিতেই লোকটি তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। বলল, অ তুমিই বুজি হেই এস্কলার? আমারে বাশ দেওনের চক্কর করতাছ? আমার চাকরি খাবা? আগে ভাল করইয়া কও নায় ক্যান? অ্যাঁ? আমি কিছু না বলে শুধু চিরকুটখানা তার হাতে দিলাম। চিরকুটটি আমি পড়িনি। ভেবেছিলাম তাতে শুধু আমার টাকা পয়সা মিটিয়ে দেবার নির্দেশই ছিল। কিন্তু সে চিরকুটটি পড়ে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ল। তখন কোথায় বা তার সেই তেজ, কোথায় বা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ। সে তখন ভয়ে, আতঙ্কে একেবারে অন্য মানুষ। বলতে লাগল, এডা তুমি করলা কি? এহন আমি কি করি কওছেন দেহি? তুমি আগেই ছারের কাছে কমপ্লেইন করলা? আমি এহন বিবি বাচ্চা লইয়া কোথায় যামু? আমি তার এরকম আচরণের কারণ বুঝতে পারছিলাম না। বললাম, দেখুন আমি তো কোনও কমপ্লেইন করিনি। আমি স্যারের চিঠি পেয়ে তাঁর সাথে আজ দেখা করতে তিনি ঐ চিরকুটটি আপনাকে দিতে বললেন। কিন্তু আপনার তাতে এত নার্ভাস হওয়ায় কী আছে বুঝতে পারছিনা। কী আছে ঐ চিরকুটে? লোকটি চিরকুটটি আমার হাতে দিয়ে বলল, কী আছে নিজেই পড়ইয়া দ্যাহ। হায় আল্লা, আমি অহন কী করি? চিরকুটটি সত্যিই তার পক্ষে আতঙ্কজনক ছিল। তাতে লেখা ছিল - pay the boy his entire dues after adjusting his tution fees for the period of his tenure in this college and call on me immediately along with him for explaining the entire mischief done on him by you. নীচে প্রিন্সিপ্যালের সই। এ যেন আকাশ ফুঁড়ে নেমে আসা আল্লার গজব। লোকটি এখন রীতিমতো আমার অনুগত হয়ে পড়ল যেন। বলতে লাগল, আসলে দোষটা আমার না বোজলা? টাকাডা আইছেই দেরিতে। কিন্তু হে কতা তো ছারে মানবে না। আমার যে কী অইবে, —হা আল্লা ! বললাম, অত ঘাবড়াচ্ছেন কেন, কাজ করতে গেলে ভুল তো হতেই পারে। একটু বুঝিয়ে বললে উনি নিশ্চয়ই বুঝবেন। —না, হেরকম সম্ভাবনা নাই। এ মানুষটা আলাদা কেসেমের। একছের আড়বুজ

আদমী। হেয়া ছাড়া কেইসটা লইয়া ইউনিয়নের ছ্যামড়ারা হ্যারে কইছে যে আমি নাকি ইচ্ছা করইয়া ব্যাপারডা চাপা দিছি, যাতে তুমি পরীক্ষা দিতে না পার। আচ্ছা কওছেন দেহি আমি একজোন নেক্‌দার ইমানদার মানুষ, জিন্দিগীতে কোনোদিন হিন্দু মোছলমান জুদা দেহি নাই, আমি কি পারি এরহম এট্টা না-পাক কাম করতে?

ব্যাপার তাহলে সত্যি গুরুতর। কিন্তু লোকটি এক আশ্চর্য চরিত্র। সে একবারও আমার সর্বনাশের বিষয়টা উল্লেখ করছিল না। অথবা সে যে একটা জঘন্য অন্যায় করেছে তার জন্য কোনও অনুতাপও তার আচরণে প্রকাশ পাচ্ছিলনা। সে শুধু নিজে কি ভাবে বর্তমান বিপদ থেকে মুক্ত হবে তাই ভাবছিল এবং সেই বিষয় নিয়েই কথা বলে যাচ্ছিল। অবশ্য এই কথা বলার সাথে সাথে সে আমার হিসেব নিকেশও করে যাচ্ছিল, তারপর একসময় সে আমাকে একটা খাতায় সই করিয়ে একগুচ্ছ নোট হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, নেও গুনইয়া দেইখ্যা লও। তারপর তোমার লগে এট্টু পেলান করইয়া ছারের ধারে যাই। কলেজ আমার কাছে পাবে আশি টাকা, যেহেতু আমি মাত্র আটমাস ক্লাশ করেছি এবং পরীক্ষায় বসতে পারিনি সেজন্য পুরো বছরের মাইনে দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। আবার সেই কারণেই আমিও পুরো সেশানের টাকা পাবনা। মাইনে দশ টাকা মাসে এবং স্টাইপেন্ডও দশটাকাই, তাই আশি টাকায় কলেজের দেনা মিটবে। পনেরো টাকা হিসেবে আটমাসের স্কলারশিপের টাকাটা আমি পাব। সেক্ষেত্রে আমার পাওনা একশ কুড়ি টাকা। এই কয়টা টাকা জোগাড় হয়নি বলহে আমি পরীক্ষায় বসতে পারিনি। কিন্তু টাকাটা গুনে দেখলাম ক্লার্ক সাহেব আমাকে দিয়েছে পাঁচশ কুড়ি টাকা। বুঝলাম হিসেবে ভুল করেছে। তখন আমার যা অবস্থা তাতে গোটা টাকাটা নিয়ে কিছু না বলে চলে আসলে এর কোনও হদিসই থাকতনা। কারণ খাতায় আমি একশ কুড়ি টাকা লেখা দেখেই সই করেছিলাম। সেটা লোকটার কুকর্মের একটা জবাবও হত। কিন্তু পারলাম না। সম্ভবত সে অতিরিক্ত ঘাবড়ে যাওয়ার জন্য ভুল করেছে। টাকাটা তার হাতে দিয়ে বললাম, বোধহয় গুনতে ভুল করেছেন। অনেক বেশিই দিয়ে ফেলেছেন। দেখুন তো। বেশি দিয়ে দেওয়ার কথায় সে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে টাকাটা ছিনিয়ে নিল এবং আবার গুনে ভুলটা বুঝতে পারল। কিন্তু কয়লা ধুলেও কি ময়লা যায়? সে আমাকে একশ কুড়ি টাকা দিয়ে বাকি টাকাটা জায়গামতো রেখে বলতে লাগল, দ্যাহছেন দেহি, অ্যাঁ? টাকাডা যদি বাইর অইয়া যাইত? তুমি যদি লইয়া চল্‌ইয়া যাইতে? ইস্‌ আল্লায় আমারে বাচাইছে। বললাম, নিয়ে চলে যাবার ইচ্ছে থাকলে তো বলতামই না। যাহোক্‌, কী প্ল্যান করবেন বললেন করুন। আমাকে আবার অনেক দূর যেতে হবে। লোকটি প্রকৃতই নির্লজ্জ। আমার সাথে এতসব দুর্ব্যবহার করার পরও, এমন কি আমার অতবড় একটা ক্ষতি করার পরও সে কিনা এখন আমারই সহায়তা চাইছে। সে বলল, পেলান আর কি করুম। আমি কই কি, তুমি তো আমার ছোড ভাইর ল্যাহান, তুমি এট্টু ছারেরে বুঝাইয়া কইয়া দেহছেন যদি কিছু অয়। আসলে তুমিতো এট্টা এস্কলার ইস্টুডেন্ট, বোজলা না? বুঝেছি সবই, কিন্তু ইনি আমাকে দিয়ে

ঠিক কী বলাতে চান সেটা বুঝতে পারছিলাম না। জিজ্ঞেস করলাম ঠিক আছে, কিন্তু কী বলতে হবে বলে দিন। লোকটিও সেই ব্যাপারটাই বুঝে উঠতে পারছিলনা। আসলে সে যতটা বদ্‌মায়েশ ততটা বুদ্ধির অধিকারী ছিলনা। একেবারেই বোকা বজ্জাত চরিত্রের লোক। তাই আমার প্রশ্নের উত্তরে সে কী বলবে না বলবে, প্রিন্সিপ্যাল তাকে কী অবস্থায় ফেলবেন, সেই বা কী জবাব দেবে, তার কোনও সমাধান তার মাথায় আসছিলনা। বলল, বলবা এব্যাপারে আমার কোনও কসুর নাই। আমি নিদ্দোষ। এর জবাবে আমার অনেক কিছু জিজ্ঞাসার এবং বলার ছিল। কিন্তু হাতে যথেষ্ট সময় না থাকায় বললাম, আচ্ছা চলুন আগে দেখি উনি কী বলেন।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের ঘরে তখন তিনি একাই ছিলেন। আমি গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে দাঁড়াতে তিনি ইশারায় আমাকে সামনের চেয়ারে বসতে বললেন। লোকটি তাঁকে আদাব জানালেও তিনি প্রত্যুত্তর করলেন না। বুঝলাম ভদ্রলোক ভীষণ চটে আছেন। লোকটি দাঁড়িয়েই রইল। প্রিন্সিপ্যাল টেবিলের উপর ঝুঁকে কি একটা ফাইল দেখছিলেন। আমি আমার তৎকালীন লব্ধ ইংরেজিতে যা বলতে প্রয়াস পেলাম, তা এরকম, স্যার, আমি আপনার প্রতি যার পর নাই কৃতজ্ঞ। বস্তুত এটা আমারই দুর্ভাগ্য যে এরকম একটা অনভিপ্রেত ত্রুটি ঘটে গেছে। এজন্যে এই লোকটিকে দায়ী করে লাভ নেই। ভদ্রলোক হাত তুলে আমাকে থামিয়ে জানতে চাইলেন যে আমি সত্যিই এই ভুলটাকে অনভিপ্রেত বা আকস্মিক বলে মনে করি কিনা। তাঁর বিশ্বাস ঘটনাটি একেবারেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। যাহোক্, সে আমি যাই মনে করি না কেন, তিনি লোকটির বিরুদ্ধে আমাকে একটি কমপ্লেন লেটার জমা দিতে আদেশ করলেন। আরও বললেন, Thereafter, I will show him what begets what. লোকটির ইংরেজি জ্ঞান বোধহয় আদৌ পাকা ছিলনা, নইলে সে এতক্ষণে তার 'ছারের' পায়ে লুটিয়ে পড়ত। লোকটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেলেন, আর তুমি? তোমার কৈফিয়ৎ কী? No, I Will not listen to any argumnet from you. Be off from my eye-sight, go to your own place. I hate talking to you. লোকটি কাঁপতে কাঁপতে চলে গেল। যাবার আগে আমার দিকে কাতর ভাবে একবার তাকিয়ে যেন তার ইতিপূর্বের আব্দারের কথাটা স্মরণ করিয়ে গেল। স্যার আবার আমাকে complain letter-টা দিতে বললে, আমি বললাম স্যার, আমি জানি, এ ব্যাপারে কম্‌প্লেন লেটার দিলে এর কী হাল হবে। কিন্তু তাতে আমার কী লাভ হবে বলুন? আমি কি আমার নষ্টদিনগুলো ফেরৎ পাব, না আমার ক্ষতির কিছু সুরাহা হবে? আমার অবাধ্যতা মাফ করুন, খুব আন্তরিক ভাবেই বলছি, এর বিরুদ্ধে আমার কোনও নালিশ নেই। আপনি রাগ করবেন না। এর কৃতকর্মের জন্য কোনও শাস্তি হলে, এর পরিবার কষ্ট পাবে, ক্ষতিগ্রস্ত হবে। স্যার খানিকক্ষণ আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বললেন যে তিনি বুঝতে পারছেন, ঐ হতচ্ছাড়া আমার নম্র স্বভাবের জন্য পার পেয়ে যাচ্ছে। এই সুযোগ তাকে দেওয়াটা ঠিক হল না। এই ধরনের মানুষেরা দয়া বা ক্ষমার অযোগ্য।

তিনি এও বললেন, দেখ, তোমার এই আবেগপ্রবণতার জন্য, শঙ্কা হয়, যে তোমাকে জীবনভর দুর্ভোগ পোহাতে না হয়। It seems to be your basic nature. আমি আবার তাঁকে বললাম, I believe you will kindly forgive him and no harm will be done to him on my accounts. স্যার একটু হেসে বললেন, I apperciate your outlook and will remember your request, but I have to look after the adminstration of the college as well, you know. ভদ্রলোক আমাকে অনেক আশীর্বাদ করলেন। দুঃখও করলেন অনেক যে, আমার একটা বছর নষ্ট হয়ে গেল, এই বলে। টেস্টের ফলাফলটা জানতে পারিনি, যদিও জানার আর কোনও প্রয়োজনও ছিলনা। তবু কৌতূহলটা তো ছিলই। স্যারকে জিজ্ঞেস করতে, তিনি খুব বিষণ্নভাবে বললেন, That is the main reason, my dear boy, that's why I can't think of pardoning the clerk. You had stood first in your section, securing marvellous marks, specially in Bengali and English. But what is in that, it only brings more frustration for a victim like you. O.K. good bye and good luck for the days ahead. আমি অত্যন্ত বিষণ্ন মনে তাঁকে প্রণাম করে চলে এলাম, কিন্তু তাঁর মতো একজন মানুষের সংস্পর্শে আসতে পারার জন্য একটা গভীর আনন্দও অনুভব করছিলাম তখন।

ফেরার পথে অফিসে গিয়ে ক্লার্কটিকে জানালাম যে তার বেশি দুশ্চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। আমি স্যারকে যথাসাধ্য তার হয়ে বলেছি এবং তিনি কী বলেছেন সব তাকে জানানোয় সে খুব উৎসাহ সহকারে চা খাও, নাস্তা কর, বলে আমাকে আপ্যায়নের জন্য পীড়াপীড়ি করতে শুরু করল। লোকটার স্থূলতা তাতে এত বেশি প্রকট হয়ে পড়ল, যে আমি ধৈর্য রাখতে পারলাম না। বললাম, আপনার মতো একটা জঘন্য ইতরের চা-নাস্তা আমার গলা দিয়ে নামবে না। আপনার কপাল ভাল যে কমপ্লেইনের দরখাস্তটা আমি দিইনি। তবে মনে রাখবেন, তৎসত্ত্বেও কিছু হ্যাপা আপনার পোহাতে হবে। স্যার মানুষ কিন্তু খুবই খাঁটি এবং সেটা আপনার মতো জালিমদের জন্য আদৌ সুসংবাদ নয়। এখন থেকে সাবধানে থাকবেন। অকারণে কারুর ক্ষতি করবেন না। চলি, খোদা হাফেজ।

রাস্তায় নেমে প্রথম যে কথাটা বুকের মধ্যে ব্যথার কুণ্ডলীর মতো পাক খাচ্ছিল, তা হল এই কলেজে আমি আর কোনওদিনই হয়ত ঢুকতে পারবনা। মাত্র আট ন' মাস আগে যেদিন প্রথম এখানে এসেছিলাম, সেদিন মনে যে অসামান্য উত্তেজনা অনুভব করেছিলাম আজকের মনের অবস্থা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। কলেজের গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ সেই ঘন লাল রঙের বিশালাকার বাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে নিজেকে বড় ভাগ্যহত বলে মনে হচ্ছিল। তখন আমার সহপাঠী, সহপাঠিনীরা পরীক্ষায় ব্যস্ত, আর আমি স্কলারশিপের একশ কুড়ি টাকার নোটগুলো পকেটে নিয়ে রাস্তায়, যে টাকাটা সময়মতো পেলে আমিও এখন তাদের সাথে পরীক্ষা দিতে পারতাম।

কোথায় যাব, কী করব, আজই বাড়ি ফিরব কিনা, আজ চলে গেলে কবে আবার আমার এই স্বপ্নের শহরে ফিরে আসতে পারব, এইসব চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। তখন দুপুর পেরিয়ে বেলা বিকেলের দিকে গড়িয়ে পড়েছে। অসম্ভব ক্ষিদে পেয়েছিল। একটা রেস্তোঁরায় ঢুকে পেট পুরে নানা সুভোজ্য খেলাম। এই শহরে এতদিন আছি, কিন্তু এরকম ভাল করে একদিনও এই ধরনের রেস্তোঁরায় খাইনি। এটাই আমার প্রথম এবং শেষ ইচ্ছেমতো খাওয়া, এধরনের নামী রেস্তোঁরায়। দাম হল পুরো দু টাকা। তখনকার দিনে আমার প্রায় পাঁচ দিনের খরচ। কিন্তু আজ আমাকে আরও খরচ করতে হবে। গত একবছরে মায়ের হাতে তৈরি মার্কিন কাপড়ের জামা এবং পাজামার অবস্থা রিফুকর্মের আধিক্যে বড়ই করুণ। পূজার সময় এখানকার দাদা আমাকে একটি পপলিনের হাফশার্ট দিয়েছিলেন, সেটিই একমাত্র ভদ্রস্থ পোশাক। একটা কাপড় জামার দোকানে ঢুকে মায়ের জন্য একখানা লালা-পেড়ে মিলের কোরা শাড়ি, আমার জন্য একটা পাজামা এবং শার্ট আর যে বোনটি স্কুলে যায়, তার জন্য একটা ফ্রক কিনলাম। বাবার জন্য একজোড়া ক্যাম্বিসের জুতোও কিনলাম। সর্বসমেত খরচ হল পনেরো টাকা। এখানে সেখানে যেতে, জামাকাপড়, বইপত্র নেওয়ার জন্য একটা ঝোলার প্রয়োজন ছিল খুবই, তাই একটা ঝোলাও কিনে নিলাম।

সব মালপত্র ঝোলাটায় পুরে দাদার বাসার দিকে চললাম। যখন এসেছি, একবার দেখা না করে যাওয়া উচিত হবেনা। তাছাড়া যখন এখান থেকে চলে গিয়েছিলাম তখন বৌদি বাড়ি ছিলনা। ছেলেগুলোর সাথেও দেখা করে যাইনি। যাই ঘটুক এবং ছেলেরা যেমনই হোক, তাদের আমি ভালই বাসতাম। সবচেয়ে বড় কথা, আমার অত্যন্ত দুর্দিনে দাদা আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। আর কোনওদিন এঁদের সাথে দেখা হবে কিনা কে জানে? সুতরাং দেখা করে যাওয়াই সঙ্গত মনে হল।

দাদা তখনও দুপুরের খাওয়া বিশ্রাম সেরে অফিসে যান নি। বৌদিও বাসায় ছিলেন। ছেলেরা আমাকে পেয়ে খুব আনন্দ করতে লাগল। আমারও বেশ ভালই লাগছিল। মামুলি কথাবার্তা শেষ হলে দাদা জিজ্ঞেস করলেন আমি সেদিন ওখানে রাত্রিবাস করব কিনা। যদিও সেদিন ফেরা সম্ভব ছিলনা এবং কোথায় রাত কাটাব তারও কিছু ঠিক ছিলনা, তবু ঐ বাসায় থাকার কথা ভাবতে পারছিলাম না। কারণ অন্য কিছু নয়, যে ঘটনা ঘটে গিয়েছিল তার বিষয়ে কোনও বার্তালাপ পাছে উঠে পড়ে এবং এঁরা বিব্রত হন এজন্যেই দাদাকে জানালাম যে রাতে থাকা হবেনা, কারণ আমার এক আত্মীয়ের বাসায় নেমন্তন্ন আছে। আমার বড়দার শ্বশুরবাড়ি ঐ শহরেই দাদা তা জানতেন। দাদা কিছু ভালমন্দ বললেন না। বৌদি বললেন ব্যাপারটা তিনি বুঝেছেন। তা বুঝুন, আমার কিছু করার ছিলনা। এখানে রাতে থাকতে হলে আমার শয্যাকন্টকি হবে। সহজভাবে আগের মতো থাকতে পারবনা।

বেরোবার মুখে দাদা বললেন, তর লগে একটু কথা আছে। চল যাইতে যাইতে কই। পরে আইয়া তর বৌদির লগে কথা কইস্। তাঁর সাথে রাস্তায় এলে তিনি আমার

কাঁধের উপর একখানা হাত রেখে বললেন, আমি জানি তুই আমার ওপর রাগ করছস। কিন্তু তর নিজের দাদায় শাসন করলেও কি তুই রাগ করতিস? আমার আপছোস্ তরে আমি সেদিন ভুল কইরা মারছি। মানুষটি, আবার বলছি খুব খারাপ ছিলেননা। সহজ সরল। মনে কোনও ঘোরপ্যাঁচ ছিলনা। শুধু রেগে গেলেই যা বিভ্রাট ঘটত। বললাম, আপনার শাসনের জন্য আমার কোনও রাগ নেই। আপনাকে আমি নিজের দাদা বলেই মনে করি। আমারও সেদিন আপনাকে কিছু না জানিয়ে চলে যাওয়া উচিত হয়নি। কিন্তু কলেজের ব্যাপারে সেদিন আমার মনমেজাজ ভাল ছিল না। যাহোক, এসব কথা আপনি ভুলে যান। দাদা, 'আবার আসিস', বলে চলে গেলেন। আমিও একটা অনাবশ্যক অস্বস্তির হাত থেকে বাঁচলাম।

কিন্তু আমার সেদিনের কথাগুলো সব সত্যি ছিলনা। কারণ তাঁকে নিজের দাদা ভাবার মতো মানসিকতায় ঐ ঘটনার পর আর আমি ছিলাম না। আমার দাদাদের অতি ছোটবেলায় দেখেছি। তাঁদের সাহচর্য কিরকম আমার অভিজ্ঞতায় তা ছিলনা। দীর্ঘকাল তাঁদের সঙ্গছাড়া থাকায়, তাঁদের একটা কল্পিত আদর্শমূর্তিই মনের মধ্যে গড়ে নিয়েছিলাম। তখন তাঁরা অন্য দেশে, অন্য ক্লেশে ভেসে বেড়াচ্ছেন। তাঁদের সম্পর্কে আমার তখন এক বিরাট ধারণা, যা কাউকেই বলা যায়না। তাঁদের স্থানে অন্য কাউকেই বসাবার কথা ভাবতে পারতাম না। তথাপি এই দাদার কথাগুলো যে খুবই আন্তরিক ছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। বোধহয় কোনও একটা ব্যাপারে তাঁর কিছু ভুল ধারণা জন্মেছিল। সেটা বৌদি সংক্রান্ত বলেই আমার মনে হয়েছে। আগেই বলেছি বৌদির অনেক স্তাবক ছিল। দাদার বোধহয় ধারণা হয়েছিল যে বৌদির এইসব ব্যাপারের মাধ্যম হিসেবে আমার কিছু ভূমিকা আছে।

যাহোক দাদা চলে গেলে বৌদির কাছে আর ফিরে গেলাম না। আবার এই সমস্ত কথার উত্থাপন হোক তা আমার প্রীতিকর বোধ হলনা। এই শহরে আবার আসব কিনা জানা নেই। সবার সাথেই দেখাসাক্ষাৎ করার ইচ্ছে থাকলেও অত সময় নেই। সন্ধে ঘনিয়ে এসেছে। ক্লাশের বন্ধুরা নিশ্চয় এতক্ষণে পরীক্ষার পড়া নিয়ে বসেছে। সুতরাং তাদের কাছে যাওয়া চলেনা। হঠাৎ অহীনের কথা মনে পড়ল। সাথে সাথে তার সেই সময়কার বিপদের কথা, অসহায় অবস্থার কথা, আমার দুর্দিনে তার প্রাণপাত সহায়তার কথাও মনের মধ্যে এসে ভিড় করে দাঁড়াল। কী অসম্ভব স্বার্থপর মানুষই না আমি। এই শহরে সারাদিন কাটিয়ে শুধু নিজের সমস্যা নিয়েই ব্যস্ত থাকলাম। আমার সবচেয়ে বড় বন্ধুর কথাই মনে পড়লনা। নিজের উপর বড় ঘৃণা বোধ হল। অহীন যে বাসায় থাকত সেখানে পায়ে পায়ে চলে গেলাম। বাড়ির কর্ত্রী ভদ্রমহিলাকে আমি চিনতাম। তিনি জানালেন যে অহীন আর ওখানে থাকে না। আমি চলে আসার কয়েকদিন পরেই সে কোথায় চলে গেছে। খবরটা শুনে আমার ভীষণ দুশ্চিন্তা হল। তার যে বিপদ দেখে গিয়েছিলাম তাতে কত কীই না ঘটতে পারে। কিন্তু সে কথা কাকে জিজ্ঞেস করব? কালীদার কথা মনে হল। একমাত্র সেই এবিষয়ে কিছু বলতে

পারবে। কিন্তু সেকি শহরে এখনও আছে? তারই বা কী খবর? এইসব ভাবতে ভাবতে বড়দার শ্বশুরের বাসায় গেলাম। কালীদা শহরে এলে এখানেই থাকে। সে শহরে ছিল, কিন্তু বাসায় ছিল না তখন। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলনা খুশি কালীদা এসে গেল। আমাকে দেখে খুব খুশি হয়ে বলল, কী ব্যাপার, তুমি সেই যে গেলে আর খবর নেই? বললাম, সেসব কথা পরে হবে। অহীন কোথায় আগে বল। কালীদা বলল, অহীনের কথা পরে বলছি। আগে বল উঠেছ কোথায়? তোমার ঠ্যাঙ্গাড়ে দাদার বাসায় নাকি? চল বাইরে গিয়ে কথা বলি। অনেক কথা আছে।

বড়দার শ্বশুরের বাসা যে গলিটিতে তার নাম ঝাউতলা দ্বিতীয় গলি। গলিটি গিয়ে শেষে হয়েছে একটি ছোট ব্রিজের গায়ে। ব্রিজটি একটি অতি প্রাচীন খালের উপর এবং সেটি গিয়ে সরাসরি পড়েছে কীর্তনখোলায়। আমরা ঐ বাসা থেকে বেরিয়ে ব্রিজটির উপরে দাঁড়ালাম। কালীদা বলল, মাধুরীর গর্ভপাত করানো সম্ভব হয়নি। ডাক্তাররা সাহস করেনি। ব্যাপারটা তো বেআইনি। জানাজানি হয়ে গেলে সবারই বিপদ। অহীনের চাকরির অবস্থা তো জানোই। খুবই সামান্য মাইনে। একদিন এসে বলল, কালীদা, একটা উপায় ঠাউরেছি। চাকরি ছেড়ে দিয়ে সবাইকে নিয়ে আমি কলকাতায় চলে যাব। এখানে আর নয়। মাধুরীকে দেখলে আর দুদিন পর সবাই ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। তখন কী অবস্থা দাঁড়াবে বুঝতেই পাবছ। আমি বললাম, সেখানেও কি এ নিয়ে সমস্যা হবেনা? ও বলল, না, ওখানে যাদবপুরে আমার এক মামা আছেন। তাঁকে সব লিখেছিলাম। মামার অবস্থা সচ্ছল নয়, তবে তিনি একটা পরামর্শ দিয়েছেন, ভেবে দেখলাম সেটা করাই ঠিক হবে। আমরা প্রথমে গিয়ে সেখানেই উঠব। মামিমা নেই, মারা গেছেন। একটি ছেলে, আমারই বয়সি। কিসের যেন ব্যবসাট্যাবসা করে। সেও আমাকে ওখানে যেতে লিখেছে। চোরাপথে বর্ডার পার হয়ে মাধুরীকে বিধবা সাজিয়ে নিয়ে যাব। মামাই এরকম পরামর্শ দিয়েছেন।

কালীদা যেন এক ঘোরের মধ্যে কথাগুলো বলে যাচ্ছিল, আমিও সেরকমইভাবেই শুনে যাচ্ছিলাম। কালীদা আবার বলতে লাগল, মামা লিখেছিলেন, অনেক মেয়ে তো পেটে বাচ্চা নিয়ে বিধবা হয়ই। ওরটাও আমরা সেরকমই ধরে নেব। পরের ব্যাপার পরে। অহীনেরা তার কয়েকদিন পরেই চলে গেল রে।—বলতে বলতে কালীদার গলাটা ধরে আসছিল। আমিও নিজেকে সংযত রাখতে পারছিলাম না। কার অন্যায়ের বোঝা কে বয় ! কোথায় বরিশালের কাশীপুর গ্রাম, আর কোথায় পশ্চিমবঙ্গের যাদবপুর। অহীন হয়ত মামা এবং মামাতো ভাইয়ের সহায়তায় একদিন দাঁড়িয়ে যাবে। কিন্তু মাধুরীর কী হবে? অবিবাহিতা মেয়ে, একটা অসভ্য বয়স্ক লোকের জন্য সারাজীবন বিধবা থাকবে? তার সন্তান যদি বেঁচে থাকে, কী পিতৃপরিচয় নিয়ে বাঁচবে সে? যখনকার কথা তখন এইসব সমস্যার কোনও সহজ সমাধান ছিলনা। তবু বলব, মিথ্যাচারের পরামর্শ দিলেও মামা তবু একটা পথ বাৎলে দিতে পেরেছিলেন। এইসব কথা কালীদাকে

বলতে, সে বলল, একথার আরও একটুখানি বাকি আছে। ব্যাপারটা তুই কীভাবে নিবি এ জন্যেই বলিনি। কিন্তু না বলেও উপায় নেই। ওখানে গিয়ে মাধুরীর অ্যাবরশ্যান করানো সম্ভব হয়েছে। ওকে আর বিধবা সেজে থাকতে হবেনা। অহীনের চিঠি পেয়েছি গত সপ্তাহেই। লিখেছে, এটা একটা পাপ করলাম কালীদা। কিন্তু তোমরা তো সবই জানো, আর কী উপায় ছিল? মামা বলেছেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাধুরীর বিয়ে দিয়ে দেবেন। অহীন এখন ওর মামাতো ভাইয়ের সাথে ব্যবসা করছে। সবাই একসাথেই থাকে। ভালই আছে মনে হয়।

পাপের কথাটা আমার মনের মধ্যেও ঘুরপাক খাচ্ছিল। কিন্তু অন্য কোনও সমাধানের কথাও মনে আসছিলনা। যাহোক্, মনে মনে প্রার্থনা করলাম, ওরা ভাল থাকুক শান্তিতে থাকুক। তখনকার দিনে ভ্রূণ হত্যা হত না এমন নয়, কিন্তু সাধারণ্যে তা মহাপাপ বলেই গণ্য হত। আইনগত দিক দিয়েও তা গ্রাহ্য হত না। একটা গ্লানি তাই মনের মধ্যে কাঁটার মতো খচ্‌খচ্ করছিল। দুজনে আরও বেশ খানিকক্ষণ ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে রইলাম। একসময় কালীদা জিজ্ঞেস করল, এখন বল রাতটা কোথায় কাটাবে? আমি বলি আজ ঝাউলাতেই থাক। তোমার তো কুটুম ওঁরা, অসুবিধে কি? বললাম, অসুবিধে এমন কিছু নেই, তবে আমার যা অবস্থা, কুটুম বাড়ি, সঙ্কোচ লাগে। কালীদা পিঠের উপর একটা থাব্‌ড়া মেরে বলল, ঘোড়ার ডিম লাগে। তোমার আমার মতো অবস্থার মানুষদের আবার সঙ্কোচ কিসের? চল চল, তোমার কাহিনী তো শোনা হয়নি এখনও। সেই যে ঠ্যাঙ্গানি খেয়ে গেলে, তারপর কতটা কি উন্নতি করেছ, তা শুনতে হবেনা? আজ সারারাত দুজনে গল্প করব, চল।

অগত্যা তার সাথে গেলাম। বড়দার শাশুড়ি আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। প্রায়ই ডেকে পাঠাতেন যখন কলেজে ছিলাম। কিন্তু সেখানে নিয়মিত থাকা খাওয়ার অসুবিধে ছিল। প্রথমত তাঁদের আর্থিক স্থিতি আদৌ ভাল ছিলনা। কালীদা এবং তার ছোট ভাই ওখানেই থাকত, পেয়িং গেস্ট হিসেবে। ফলে স্থানের অসংকুলানও ছিল। যাহোক সেদিন সে বাসায়ই থাকলাম। সারারাতই প্রায় কালীদার সাথে নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে কাটল। আমার সব কথা শুনে কালীদা বলল, শোনো আমারও মনে হচ্ছে তোমার প্রিন্সিপ্যাল ঠিক পরামর্শই দিয়েছেন। একটা বছর নষ্ট হয়েছে বলে অমন মুষড়ে পড়লে চলবেনা। তুমি বরং তোমার দাদাদের কাছে কোলকাতায়ই চলে চাও। এদেশে আমাদের সত্যিই কিছু হবেনা।

কালীদার পরামর্শ বাস্তবানুগ হলেও আমি ভাবছিলাম বাড়ির জনেদের কথা। আমি যদি ওদেশে চলে যাই, তবে কি তা একটা নিতান্ত স্বার্থপরের মতো কাজ হবে না? ছোট ভাইবোনগুলোর কী দশা হবে? ওদের কে দেখবে? দেশের গাঁয়ের যা অবস্থা, তাতে ওরা তো ভেসে যাবে। আবার সবাইকে নিয়ে যে ওদেশে যাব, সেখানে দাদারা চালাবে কি করে? কিন্তু এতসব কথা কালীদাকে বলা যায়না। এইসব আলোচনা এবং চিন্তায় রাতটা কাটল। কোনও নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে পারলামনা।

— পঁয়তাল্লিশ —

পরদিন সকালেই বাড়ি ফেরার তোড়জোড় করছি, মাঐমা অর্থাৎ বড়দার শাশুড়ি বললেন, কাল রাতে তো কিছু খাওয়াতে পারলামনা, এ বেলাটা থেকে দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরে যাও। আবার কবে দেখা হবে-না-হবে। কথাটা ফেলতে পারলাম না। এতদিন আত্মজন বিবর্জিত এই শহরে তাঁর স্নেহচ্ছায়াই আমার অবলম্বন ছিল। তাঁর সাথে আরও একটি সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, সেটা বিভিন্ন গল্প, কবিতা পঠন পাঠনের। মহিলার পড়ার অভ্যেসটি ছিল অসম্ভব ঈর্ষণীয়। আমি তাঁকে প্রায়শই লাইব্রেরি থেকে বই পুস্তক এনে দিতাম। অনেক আলোচনা, সমালোচনার আনন্দ তাঁর সাথে উপভোগ করেছি। সেইসব মধুর স্মৃতি আজ মনে পড়ছে। সুতরাং থেকে গেলাম। দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরে বাসে চলে যাব।

সেদিন শুক্রবার। এখানে শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটির দিন। ভাবলাম একটু ঘুরে আসি বন্ধুদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে। প্রথমেই মনে পড়ল ইসমাইলের কথা। আমার সহপাঠী। অসম্ভব ভালবাসত আমাকে। আলেকান্দা রোডে একটা বাড়িতে থাকে পেয়িং গেস্ট হিসেবে। বাড়ি সন্দ্বীপে। তবে ওর কথা প্রথমেই মনে পড়ার একটা বিশেষ হেতু ছিল গত বছর (১৯৬২ সাল) ভারতের জব্বলপুর না কোথায় দাঙ্গা হয়েছিল হিন্দু- মুসলমানে। কি কারণে মনে নেই। তার পাল্টা হিসেব এদেশের বিভিন্ন স্থানে তখন দাঙ্গা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। বরিশালেও তখন হাওয়া বেশ গরম। আমি তখন এখানকার দাদার বাসায়। সেই সময় একদিন দাদা অফিস থেকে ফিরতে অসম্ভব দেরি করায় বৌদি খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। দাদার অফিস বাসা থেকে বেশ দূরে কীর্তনখোলার পারে, লঞ্চ ঘাটে। ঐ এলাকাটাই সবচেয়ে গোলমালের জায়গা ছিল, কারণ, ওখানে বেশ কিছু সংখ্যক বিহারী মুসলমানদের ব্যবসা এবং বসবাস। এখানকার দাঙ্গায় সাধারণত বিহারী মুসলমানরাই নেতৃত্ব দিত। বৌদির উদ্বেগে আমি একটা হ্যারিকেন নিয়ে দাদার সন্ধানে লঞ্চঘাটের দিকে চলেছি। রাস্তায় আলো নেই, দাঙ্গাবাজরাই সম্ভবত বাল্‌বগুলোকে নষ্ট করে দিয়েছিল। আবার বড় রাস্তাগুলোতে কারফিউ জারি করা হয়েছে। তাই ভেতরের অলিগলি দিয়ে এগোচ্ছিলাম। তখন রাত প্রায় দশটা সাড়ে দশটা। চারদিক শুন্‌শান। কাঠপট্টির গলি ধরে এগোচ্ছি। মনে বেশ আতঙ্ক। হঠাৎ কে একজন আমার বাঁ হাতটা ধরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে ধমকের স্বরে বলল, কোথায় যাচ্ছিস? ঘটনার আকস্মিকতায় আমার প্রায় বাহ্যজ্ঞানলুপ্ত। হ্যারিকেনের আলোয় লোকটার মুখও দেখতে পারছিনা। সে আবার বলল, এই রাস্তায়, এত রাত্রে কোথায় যাচ্ছিস? জানিস না লঞ্চঘাটে এই সন্ধের সময় তিন তিনটে লোককে স্ট্যাব করা হয়েছে? একথায় একটু বাহ্যজ্ঞান হল। দেখলাম ইসমাইল। বললাম, ওঃ যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলি। আসলে দাদা এখনও ফেরেনি কিনা, তাই বৌদি বললেন—। বাঃ চমৎকার! দাদা ফেরেননি বলে বৌদি তাঁর ভাইকে ছোরা খেতে পাঠালেন এই দুপুর রাত্রে। চল্ তোকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসি। শহরের অবস্থা খুব খারাপ। এতক্ষণে

যে তুই ছোরা খাস্‌নি তা একমাত্র আল্লা মাবুদের দোয়ায়। তোর দাদা ঠিক ফিরবে। চল্‌। সে আমাকে একরকম জোর করেই ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সেদিন। বাসায় পৌঁছে দেখি দাদা ফিরেছেন এবং বৌদিকে খুব বকাঝকা করছেন আমাকে ঐ অবস্থায় পাঠিয়েছেন বলে এবং তিনি যথেষ্ট দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। ইসমাইলের সাথে আমাকে ফিরতে দেখে তাঁরা আশ্বস্ত হলেন। ইসমাইল এ বাসায় আমার সূত্রে পরিচিত ছিল। মাঝে মাঝে আসত। দাদা ওর খুব প্রশংসা করছিলেন। কিন্তু ইসমাইল সেদিন যারপর নাই বিরক্ত হয়েছিল। বৌদির দিকে তাকিয়ে ও বলেছিল, এখন আমার প্রশংসা করছেন কিন্তু যদি কিছু ঘটত তখন কিন্তু জাত তুলে গাল দিতেন। বলে আমাকে বলল, অবস্থা স্বাভাবিক না হলে একদম বেরোবিনা। বলে সে অন্ধকারের মধ্যেই চলে গেল আলেকান্দার দিকে। সে জায়গাটা এখান থেকে বেশ দূর।

পরে ইসমাইলের সাথে এ নিয়ে আমার আরও কথা হয়েছিল। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, সে ওই দিন বৌদিকে ওরকম একটা কথা বলেছিল কেন। ইসমাইল খুবই স্পষ্টবাক্‌। ও উত্তরে বলেছিল, না বলার কি আছে? তোরা হিন্দুরা সুযোগ পেলেই কি 'মোছলার জাত এরকমই হয়' বলে আমাদের গাল দিস্‌না? ধর সেদিন যদি তোকে ওখানে আমি আহত অবস্থায় নিয়ে যেতাম, তুই কি ভাবছিস তোর ঐ দাদা বৌদি আমাকে কিছুমাত্র বিশ্বাস করত? কিন্তু যাই বলিস সেদিন ভাগ্যিস আমি বাড়ি থেকে লঞ্চে ফিরছিলাম এবং ঐ পথেই আসছিলাম। আর লঞ্চঘাটে আমি যা দেখে এসেছিলাম, তাতে সেখানে গেলে তোকে আর আস্ত ফিরতে হতনা। ওর কথায় কিছুমাত্র মিথ্যে ছিলনা এবং ওর সেদিনকার বিরক্তিও খুবই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তখন আমরা ওখানে তো মুসলমানমাত্রকে অবিশ্বাস করতাম। আমাদের জন্মাবধি শিক্ষাটাই ওরকম ছিল। তাই ইসমাইলের কথায় একটু আঘাত পেলেও তার সত্যতা অস্বীকার করতে পারিনি।

ইসমাইলের বাসায় গিয়ে ওকে পেলাম। ও আমাকে দেখে প্রথমে খুবই উল্লসিত হলেও পরে বিষণ্ণ হয়ে গেল। কলেজের ব্যাপার, আমার পরীক্ষা দিতে না পারার কারণ সবই ও জেনেছিল। সেই নিয়ে কিছুক্ষণ হা-হুতাশ করে বলল, যাক্‌, যা হবার তো হয়েছে। দমে যাসনা। একটা বছর এমন কিছু বিরাট ব্যাপার নয়। আগামীবারের জন্য এখন থেকে ব্যবস্থা কর। একটু বোস, আমি দেখি চা পাওয়া যায় কিনা। বলে ও বাইরের দোকান থেকে কিছুক্ষণের মধ্যেই পরোটা, ডিমভাজা, চা এইসব নিয়ে এল। চা নাস্তা করে প্রায় ঘন্টা দুয়েক ওর সাথে গল্প করে উঠলাম। ফেরার সময় বললাম, জানিনা আর দেখা হবে কিনা। তবে তোর কথা চিরদিন আমার মনে থাকবে। ওর চোখে জল এসে গিয়েছিল, আমারও। কী যে সেই আত্মীয়তা ! আজও বুকের মধ্যে যেন তা গুম্‌রে ওঠে।

ওর ওখান থেকে ফিরে আর কোথাও গেলাম না। ভাল লাগছিল না। যেখানেই যাব সেই তো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমার দুর্ভাগ্যর কথাই আসবে। তার থেকে খেয়ে দেয়ে বাড়ি ফিরে যাই।

খাওয়াদাওয়া সেরে, কালীদা এবং অন্য সবার কাছে বিদায় নিয়ে যখন বড় রাস্তায় এসে পড়লাম তখন দুপুর একটা-দেড়টা। হস্‌পিটাল রোড। দুপুর আড়াইটেয় একটা লঞ্চ আছে। ভাবলাম সেই লঞ্চেই ফিরব। দাদার দেওয়া একটা পরিচয়পত্র ছিল। তিনি লঞ্চ কোম্পানিতে কাজ করতেন। এজন্য আমাদের দিকের কোনও লঞ্চেই আমার ভাড়া লাগতনা। হস্‌পিটাল রোড ধরে যেতে যেতে মনে হল মাসিমার সাথেও কেন না একটু দেখা করে যাই। হাতে যথেষ্ট সময় ছিল। মাসিমার ঝোপরিতে তিনি এবং আরও যাঁরা বাস করতেন সবাই সমান অসহায়া। প্রায় দু আড়াই মাস আগে এই শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম। জানিনা কে কেমন আছেন। ঝোপড়িতে গিয়ে দেখি তাঁরা দুপুরের খাওয়া শেষ করে সামনের ছোট্ট দাওয়ায় সবাই বসে আছেন। আমাকে দেখে মাসিমার সে কী আনন্দ! আমি নির্দ্বিধায় তাঁর দাওয়ায় বসে তাঁদের খবরাখবর নিতে লাগলাম। অনেক কথা, অনেক গল্প হতে লাগল। মাসিমা জিজ্ঞেস করলেন, আজ থাকবি না চলে যাবি? আমি যদিও যাবার জন্যই বেরিয়েছি কিন্তু কী মনে হল, বললাম, থাকব। তোমার এখানে থাকব আজকে। মাসিমা বললেন, তুই এখানে থাকবি, তোর ভয় করবে না?

: কিসের ভয়?

: কেউ যদি কিছু বলে?

: মাসিমার বাসায় থাকলে কেউ কিছু বলে তো বলুক। আমার কোনো ভয় নেই।

: খাবি কি? বললাম দাঁড়াও, বাজার করব। তুমি রান্না করতে পারবে না? মাসিমা একগাল হেসে বললেন, পারব না কেন? আমরা কি না খেয়ে থাকি নাকি? আমি বললাম, না সেসব না, আজকে আমরা সবাই ভালমন্দ খাব। যাই বাজার করে আনি, একটা থলি দাও। মাসিমা একটা থলি এনে দিলে আমি বাজার থেকে কাছিমের মাংস নিলাম দুই সের। আট আনা করে সের তখন। অন্যান্য নানা রকম তরিতরকারিও নিলাম। আমার তখন পকেট গরম। সুতরাং কোনও কিছুতেই কার্পণ্য করলাম না। বাজার থেকে ফিরতে ফিরতে বেলা গড়িয়া সন্ধ্যা। মাসিমা খুব চমৎকার রান্না করলেন। ঐ বুড়িদের সাথে আমি একটি চমৎকার সন্ধে কাটালাম। সেই রকম আনন্দের স্বাদ মানুষ কদাচিৎ পায়। অবহেলিত লাঞ্ছিত মানুষের ক্ষণিক সুখ, তাদের সাথে একত্রে উপভোগ করার যে এক প্রগাঢ়তা তা কজনের ভাগ্যেই বা ঘটে? তাঁরা অনেক রাত পর্যন্ত কীর্তন গেয়ে গল্প করে কাটালেন।

পরদিন কাক-ভোরে মাসিমা আমাকে তুলে দিয়ে বললেন, তুমি এখনই যাও। বেলা হলে নিন্দা। মানুষ তো সব বুঝবে না। মানুষের বোঝার বিষয়টা যে আমার বিচারে আর নেই, সেকথা মাসিমাকে বোঝাতে যাওয়া বৃথা। তাঁরা তাঁদের আর আমাদের সমাজগত বিভেদটা বেশ ভালই বোঝেন। আমি যে বেশ্যাপল্লিতে একটি রাত অতিবাহিত করেছি তা তাঁর পরিণত বুদ্ধিতে যেরকম ক্রিয়া করেছিল, তিনি সেরকমই আমাকে বোঝালেন। আমিও তাঁকে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়লাম। তখনও বেশ অন্ধকার, আলো তেমন ফুটে ওঠেনি। রাতের রসিক অতিথিরা তখনও দুএকজন ঐ পল্লিতে

আনাগোনা করছিল। আমি ঝোপ্‌ড়ি থেকে বের হয়ে বেশ নিরুত্তাপ চিত্তে এবং অবলীলায় বড় রাস্তায় এসে পড়লাম। একটি রিক্সায় চড়ে বললাম, বাস স্ট্যান্ড চল। রিক্সাআলা একটু মুচকি হেসে প্যাডেলে একটি ইংগিতপূর্ণ ঠেলা মেরে বলল, এ্যাতো বেয়ানেই আইলেন।

রিক্‌সায় বসে সারাটা রাস্তা মাসিমাদের কথা ভাবতে ভাবতে চললাম। আমার জীবনের সমস্যা এক আর এঁদেরটা অন্য রকম। কিন্তু একটি স্থানে সবারই মিল আছে, সেটা পেট এবং তার জ্বালা। সবাই পেটের জ্বালায় জ্বলে, আমিও পেটের জ্বালায়ই নানান রাস্তা হাঁটছি। শুধুমাত্র রাস্তার তফাৎ। মূলধন একই, তা দৈহিক শ্রম। দেহই আমাদের অগতির গতি। এই জায়গায় আমাদের কোনও তফাৎ ছিলনা বলেই তাঁদের সাথে এক কামারাদারী অনুভব করলাম।

— ছেচল্লিশ —

বাড়ি ফিরে এসে কিছুদিন বড় অবসাদ আর বিষণ্নতার মধ্যে কাটল। কিছুই আর ভাল লাগছিল না। পিছারার খালের জগতে তখন কোনও সঙ্গীসাথিই আর নেই। যাদের কোনও গতিই নেই তারাই শুধু আছে। সে কী ভীষণ নিঃসঙ্গতা এবং নৈরাশ ! সহপাঠী, সহপাঠিনীদের পরীক্ষা তখনও শেষ হয়নি। তারা হস্টেলে থেকে পরীক্ষা দিচ্ছে। পরীক্ষার পর বাড়ি আসবে। তখন হয়ত তাদের সাহচর্য পাব। আপাতত আমি নির্বান্ধব, নিষ্কর্মা। বইপত্তর পর্যন্ত নেড়ে দেখতে ইচ্ছে করে না। সবচেয়ে অসহনীয় হল দুপুর বেলাটা। বাড়ির বিশালকায় থামগুলির খিলানের খাঁজে জালালি কবুতরগুলো সারা দুপুর হুম্ হুম্ করে ডেকে আমার শূন্যতাবোধ যেন আরও বাড়িয়ে দেয়। বুকের মধ্যে সবসময় হু হু করে। প্রকাণ্ড আকারের প্রাচীন ঘরগুলো যেন গিলে খেতে আসে।

বিকেলে খাল-পারের দিকে একটু ঘুরতে যাই। তখন দু একজন মুসলমান বন্ধুবান্ধবদের সাথে সাক্ষাৎ হয়। দু চারটে কথা বলি। নচেৎ সমস্ত দিনে কথা বলার সুযোগ বা ইচ্ছে হয়ই না। এইসব মুসলমান বন্ধুবান্ধব কেউই পড়াশোনা করার মধ্যে নেই। চাষবাস গেরস্থালি নিয়েই তাদের জগত। একটা সময়, যখন আমি ইস্কুলে যাওয়া শুরু করিনি, তারাই আমার দোসর ছিল। তাদের সাথেই তখন মেলামেশা, খেলাধুলো, গোরুচরানো। কিন্তু মাঝখানের এই ইস্কুল এবং কলেজ জীবন আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে । আগে তাদের সাহচর্যে যে অনাবিল আনন্দ পেতাম, এখন আর তা পাই না। ব্যাপারটা এরকম না হলেই হয়ত ভাল ছিল। তাহলে অন্তত আমার বৌদ্ধিক অভাব বোধটা গড়ে উঠত না। আমিও তাদের মতো সহজ সরল জীবনে অভ্যস্ত হয়ে, তাদের সাথে একাত্ম থাকতে পারতাম। এখন না ঘরকা না ঘাটকা।

এই রকম কিছুদিন নিঃঝুম অকর্মা থাকার পর ভাবলাম, যখন কোনও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আমার নেই, তখন কিছু রোজগার করার চেষ্টা করিনা কেন? ইস্কুলের

ছাত্রছাত্রীদের পড়িয়ে দু পয়সা রোজগার করতে পারলে সময়ও কাটে, সংসারের উপকারও হয়। কীর্তিপাশা, তারপাশা ইত্যাদি আশপাশের গ্রামের কয়েকজন ছাত্রছাত্রী জুটিয়ে নিলাম। এক ছাত্রের বাড়িতে পড়ানোর বিনিময়ে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে সকাল সন্ধে ঐ কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকলাম। ইতিমধ্যে সহপাঠী / সহপাঠিনীদের পরীক্ষা শেষ হয়ে গিয়েছিল। তারা সব গ্রামে ফিরে এসেছে। মাঝে মাঝেই তাদের কারো কারো বাড়িতে পড়াশোনার আড্ডা জমতে লাগল। কীর্তিপাশা ইস্কুলের একজন নবীন মাস্টারমশাই এইসময় আমাদের নিয়ে খুব উৎসাহের সাথে আধুনিক বাংলা কবিতার একটি পাঠচক্র গড়ে তোলেন। আমরা তখনও পর্যন্ত ওখানে আধুনিক কবিতা পড়া দূরস্থান, কোনও আধুনিক কবির নামও শুনিনি। সাহিত্যের প্রতি ভদ্রলোকের বিলক্ষণ ভালবাসা ছিল। তিনি প্রায়শই ঢাকা যেতেন এবং সেখান থেকে জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, অজিত দত্ত তথা কল্লোলযুগীয় কবিদের রচনা নিয়ে আসতেন। কবি বলতে আমরা তখনও রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, কায়কোবাদ, সুফিয়া কামাল, জসীমউদ্দীন ইত্যাদিদের জানতাম এবং তাঁদের রচনাই পাঠ করেছি। নতুন আঙ্গিক এবং ভাবধারার কবিদের সাথে আমাদের পরিচয় এই প্রথম। এইসব কবিদের কবিতা এবং তার আলোচনা আমাদের খুব গভীর ভাবে নাড়া দিল। আমরা সবাই রাতারাতি কবি হবার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু সে চেষ্টা খুব একটা ফলপ্রসূ হয়নি। আমাদের মধ্যে কেউই কোনও দিন কবি হতে পারেনি।

এইসব নিয়ে যত মাতামাতিই করিনা কেন, উদ্দেশ্যহীন জীবন যাপনের গ্লানি এবং বিষণ্ণতার হাত থেকে অব্যাহতি পাচ্ছিলাম না। গোটা জীবন সামনে পড়ে রয়েছে। মাথার উপর বিরাট এক সংসার জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে আছে। এই দেশে সামান্য শিক্ষাটুকু, যা অর্জন করেছি, তা অবলম্বন করে কোনওদিন আর্থিক সমস্যার অবসান হবে এরকম সম্ভাবনা আদৌ ছিলনা। তাই ছাত্র পড়ানো আর কাব্যচর্চা আমার দুর্ভাবনাকে কিছুমাত্র দূর করতে পারলনা। বন্ধুবান্ধবেরা আমার বিষয়ে আদৌ উদাসীন ছিলনা। তারা প্রায়ই আমাকে কলকাতায় দাদাদের কাছে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিত। কিন্তু আমি কিছুতেই মনস্থির করতে পারছিলাম না। সম্পূর্ণ নির্বান্ধব দেশে এতগুলি ভাইবোন এবং মা বাবাকে অসহায় রেখে যাবার কথা ভাবতে পারছিলাম না। ভারত পাকিস্তান দুদেশের পারস্পরিক সম্পর্ক দিন দিন আরও খারাপ হচ্ছিল। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে ভারতের তরফ থেকে কোনও অপছন্দের কাজ হলেই তার জন্য সংখ্যালঘুদের উপর একটা অকারণ রাষ্ট্রীয় এবং সাম্প্রদায়িক চাপ সৃষ্টি হত। এই ব্যাপারটা ঐ প্রত্যন্ত গ্রামসমাজেও আমরা বেশ অনুভব করতাম। কারণে অকারণে আমাদের উত্ত্যক্ত করা হত এবং ফলে আমাদের আতঙ্ক বেড়েই চলত। এমন কি খেলার মাঠে, কোনো যাত্রাপালার আসরে বা সামাজিক মিলনের যে কোনও স্থানেই আমরা এই সময়গুলিতে ভয়ে জুজু হয়ে থাকতাম। কোনও রকম মৌলিক অধিকার বা স্বাধীনতা আমাদের ছিল না।

কিছু পড়াশোনা করার জন্য এবং কিছুদিন শহরের জীবন যাপন করার জন্য আগের চাইতে অনেক বেশি করেই এই সময়টাতে আমি সংখ্যালঘু জীবনের তিক্ততা আগের চাইতে অনেক বেশি ভাবে উপলব্ধি করতে পারছিলাম। একদিকে নিজস্ব সমাজের চূড়ান্ত অবক্ষয়, আর্থিক দৈন্য এবং সাংস্কৃতিক অবনতি, অন্য দিকে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের অবহেলা, অসম্মান এবং চাপা ক্রোধ—এই উভয়প্রকার পরিস্থিতির যাঁতাকলে যতই নিষ্পিষ্ট হচ্ছিলাম ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ততই হতাশা পেয়ে বসছিল। ক্রমশ এই অবস্থা সহ্যের অতীত হয়ে গেলে একদিন স্থির করলাম বাড়ি ছেড়ে, সবকিছু ছেড়ে চলে যাব। মাকে শুধু জানালাম আমি কিছুদিনের জন্য বরিশাল যাচ্ছি। আসলে আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলাম।

এই সময়টিতে বরিশালের দাদার দেওয়া পরিচয়পত্রটি আমার বেশ কাজে লেগেছিল। বরিশাল গিয়ে দু একদিন এখানে-ওখানে থেকে ঠিক করলাম কিছু দিন লঞ্চে লঞ্চে ঘুরে বেড়াই না কেন? কিছুইতো কাজ নেই। গোটা বরিশাল জেলা নদীময়। কোথাও যেতে হলে জলপথ ছাড়া পথ প্রায় নেই। হাতে ট্যুইশানির মাইনে বাবদ কিছু পয়সা ছিল। দু একদিন লঞ্চে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে খালাসি, সারেংদের সাথে দিব্য একটা সম্পর্ক হল। তাদের সাথে এটা ওটা কাজকর্ম করে দুবেলাব খাবার সংস্থানটা করে নিতে পেরেছিলাম। বাড়ি থেকে আসার সময় ঝোলাটার মধ্যে জামাকাপড় এবং খান দু তিন বইপত্তর নিয়ে এসেছিলাম। একেবারে তোফা ব্যবস্থা। সারাদিন ভেসে বেড়ানো। রাতে লঞ্চেই থাকা খাওয়া, যেন লঞ্চেই চাকরি করি। খালাসিদের নানারকম কাজ। আবার টিকিট চেকারদেরও কাজ আছে। কয়েকদিনের মধ্যেই খালাসিদের ফাইফরমাস খাটা থেকে টিকিট চেকারদের শাগরেদি করার পদোন্নতিটা হয়ে গেল। এবার সারেং সাহেব নিজের থেকে আমার একটা হাত খরচি মজুরি ঠিক করে দিলেন। ফলে দিনে দু' পাঁচ টাকা মবলগ রোজগার হতে লাগল। আমাকে আর পায় কে? এ একেবারে রীতিমতো চাকরি। জলে জলে বেড়ানোর একটা আলাদা মজা আছে। মাঝে মাঝে লঞ্চ বদল করি, নতুন গঞ্জ শহর দেখে বেড়াই। এভাবেই নানা নদীপথ, বন্দর আমার দেখা হয়ে গেল।

কিন্তু জলে বেশিদিন বাস করা ডাঙ্গার মানুষদের ধাতে সয়না। একসময় ডাঙ্গার জন্য প্রাণ আঁকু পাঁকু করে। লঞ্চে দু একবার গাভা, বানারিপাড়া, স্বরূপকাঠি এসব জায়গায় গিয়েছিলাম। বানারিপাড়া যেতে একধরনের বিশালকায় লম্বা নৌকো দেখে ছিলাম। তাতে পঞ্চাশ / একশ যাত্রী যাতায়াত করে। মাঝিরা দাঁড় বেয়ে চালায়। এই নৌকোর নাম গয়নার নৌকো। ইচ্ছে হল এই নৌকোয় চেপে বরিশালের উত্তর অঞ্চলটা একটু বেড়াব। সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যবিহীন এই ভ্রমণ। পকেটে কিছু পয়সা জমেছে। অতএব চিন্তা নেই।

লঞ্চের বন্ধুদের কাছ থেকে কয়েকদিনের জন্য বিদায় নিয়ে দিন কয়েক বড়দার শ্বশুরমশায়ের বাসায় থাকলাম। ভাবছিলাম কোথায় যাই। গয়না তো এক ঘাটে নিশ্চয়

আমাকে পৌঁছে দেবে। সেখানের ঠিকানা কী? গয়না নৌকোটির সর্বশেষ ঘাট বানারিপাড়া। হঠাৎ মনে পড়ল সেখানে আমাদের ইস্কুলের এক মাস্টারমশাইয়ের কে যেন আত্মীয় থাকে। তাঁর নামটাও জানা ছিল। মাস্টারমশাইয়ের আত্মীয়ের আমার আত্মীয় হতে বাধা নেই। তাই এক সন্ধেয় খাওয়াদাওয়া সেরে গয়নায় উঠে পড়লাম।

এর আগে এ ধরনের নৌকোয় চাপিনি। আট দশজন দাঁড়ি নৌকোটি চালিয়ে থাকে। গতি যান্ত্রিক জলযানের তুলনায় একান্তই মন্থর। মাথার ছাউনিটি বেশ নিচু। উঠে দাঁড়াবার উপায় নেই। বসে বা শুয়ে যাতায়াত করতে হয়। আজকাল আর এ ধরনের নৌকোর প্রচলন নেই।

গয়নায় শুয়ে ঘুম আসছিল না। দুই প্রান্তে দুটি ম্লান হ্যারিকেন জ্বলছিল। মাঝে মধ্যে আরোহীদের কথাবার্তা, এর সাথেই তাল রেখে দাঁড়ের ছপাৎ ছপ শব্দ। গলুয়ের ফাঁকটুকু দিয়ে দুরের লক্ষ যোজন আলোকবর্ষ পার হয়ে অজানা নক্ষত্রের দ্যুতি দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে কিস্‌সাদার বুড়ো এবং দাঁড়িরা হুঁশিয়ার বলে চিৎকার করে উঠছে। দেশের পরিস্থিতি প্রায় অরাজক। কখন ডাকাতদল এসে চড়াও হবে বলা যায় না। কখনও আবার কিস্‌সাদার বুড়ো দাঁড়িদের এবং যাত্রীদেরও একঘেয়েমি কাটানোর জন্য চড়া গলায় 'রহিম বাশ্বার' কিস্‌সা বা 'আন্ধা বন্ধুর' কথা গান করছে। গলুয়ের কাছে একটি লোক অন্য জলযানকে সতর্ক করার জন্য ডিমডিম্ শব্দে নাগাড়া টিকাড়া বাজাচ্ছে। সব মিলিয়ে নিজের অস্তিত্বকে কেমন যেন অলীক বলে বোধ হচ্ছিল। শহর জীবনের যে স্বাদ কিছুকালের অভ্যেসের কারণে আমার মধ্যে বাসা বেঁধে ছিল তার তীব্রতা কাটিয়ে কিস্‌সাদার বুড়ার গান, কাহিনী এবং এই প্রায় আদিম মানুষের মতো ভ্রমণ কি আমাকে আবার পিছনের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে? অথবা আমি আমার শিকড়ের সাথেই আরও ক্রমশ সম্পৃক্ত হচ্ছি? এই নদী, যার বুকের উপর দিয়ে আমি এখন যাচ্ছি সে কী আমাকে অন্যরূপে জীবনের অন্য কোনও উপকূলে নিয়ে যাবে? সবাই আমাকে এ দেশ ছেড়ে ভাগ্যের সন্ধানে অন্য এক দেশে চলে যেতে বলছে, আমি কি সেখানে যাব? এই দেশ, এই নদী, এর গাছপালা, এর প্রান্তর আমি বড় ভালবাসি। এখানে সহস্র অপমান সত্ত্বেও, একে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হয়না। যদি ছেড়ে যেতেই হয়, পিছারার খালের স্মৃতির মতো এর সব নদী, সব খাল এবং সব আয়োজনই একসময় আমার স্মৃতিই হয়ে থাকবে। আমি আর এই ভূমি, নদী, বৃক্ষ বা আকাশের কেউই থাকব না। আমি বা আমরা, যারা একদিন এইসব আয়োজন ভালবেসে, ধানঘরে, নবান্ন, পৌষ পার্বণ ইত্যাকার হাজারো উৎসবের মহিমান্যতায় নিজেদের শিকড়ের সাথে ওতপ্রোত ভাবে বেঁচে বর্তে, সুখে দুঃখে কলহে, বিষাদে বা শান্তি অশান্তিতে 'সর্বে লোকা সুখীনো ভবন্তু' বোধে একাত্ম ছিলাম, অতঃপর আমরা আর তা থাকব না।

এইসব চিন্তনের প্রগাঢ়তায় শেষ নিশীথের নদীর শান্ত বাতাস আমাকে আলিঙ্গন করে যেন অলৌকিক এক তন্দ্রামগ্নতায় নিমজ্জিত করল। ঠিক ঘুম নয়, জাগরণ

এবং তন্দ্রার মাঝামাঝি এক অবস্থান। আমার মনে হচ্ছিল আকাশের মেঘের আড়াল থেকে এক্ষুনি একটা ঘোর নাদ ধ্বনিত হবে, আমি শুনতে পাব, হে মুসা, ভীত হবার হেতু নেই। তোমার সামনে যে বিস্তীর্ণ পাথার, তা তোমার পথরোধ করতে পারবে না। তুমি তোমার দণ্ডের সাহায্যে সমুদ্রকে আঘাত কর। সে তোমাকে পথ করে দেবে। তোমার পেছনে ফেরাউন তার সৈন্যসামন্ত নিয়ে তাড়া করছে। তারা অচিরেই জলমগ্ন হবে।

আমি মুসা এবং আমার হাতে একটি অলৌকিক দণ্ড আছে, এরকম এক বোধ আমার মস্তিষ্ক অধিকার করলে, আমি পরম প্রশান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লাম। নৌকো চলতেই থাকল।

ঘুমের গভীর থেকে মাথা তুলে দাঁড়ায় এক বিশালকায় দেবোপম বৃক্ষ। সময়ের খালের জলে তাঁরই বিষণ্ণ প্রচ্ছায়া। ঝুরঝুর করে বৃক্ষ তাঁর পাতা ঝরিয়ে যাচ্ছেন, যেন অঝোরে কাঁদছেন। যেন অসহায় এক প্রাচীন কুলপতি তাঁর অবাধ্য দুঃশাসনীয় গোষ্ঠীর আত্মঘাতী মাৎস্যন্যায়ী আচরণে মুহ্যমান। খালের দিকে বাড়ানো তাঁর শিকড়ের সাথে সার সার নৌকো বাঁধা, নাকি বৃক্ষই তাদের আঁকড়ে ধরে আছেন এখনও। তীরে আশপাশ গ্রামবাসী মেয়ে, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ। এই জনপদে তারা আর থাকবে না। থাকবে না এই কুলপতির ছত্রছায়ে। এই জনপদ আর তাদের নয়, এরকম এক বার্তা আশে পাশের এইসব ধানক্ষেত গোপাট, আমজাম, নারকোল সুপারি তালের বাগিচা। এই নদীখাল আর তার কিনারের হোগল, কাশ, ছৈলা অথবা কেয়ার ঝাড় এইসব ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পুকুর দিঘি, পরম্পরাগত তাবৎ এই আত্মীয় আয়োজনের কিছুই আর নাকি তাদের নয়।

কখনও এই হাহাকারের জলছবি। আবার মুহূর্তে পটপরিবর্তন। অন্তরের বিষণ্ণতার বাষ্প কোথায় উধাও ! সেখানে তখন তাবৎ উজ্জ্বল উৎসবের উজাগরী উল্লাস। জরিণা, গুণাবিবি, রয়ানি কীর্তনের আসর অথবা পৌষ সংক্রান্তির 'নইল্লার ডাক' বা বারো বাঘের ছড়ায় রমেন নট্টের ঢোলে বোলে সেই সুস্থিত প্রাচুর্যের প্রতিশ্রুতি। আর হর্ষোৎফুল্ল সেই কুলপতি মহাবৃক্ষের আন্দোলিত শাখা প্রশাখার সুনিশ্চিত আশ্বাস—

'ঠাকুর কুলায় ধোল
ও গিরি ও ও গিরি
বাইর করইয়া দেও সোনার পীড়ি
সোনার পীড়িতে বইবে কেডা
বাস্তুঠাকুর আবার কেডা
বাস্তুঠাকুর দিবেন বর
ধানে চাউলে ভরবে ঘর
ধান দিবেন না দিবেন কড়ি
মাঝ খাডালে সোনার লড়ি . . ।'

বাস্তুঠাকুর দুহাত উজার করে বর দিচ্ছেন। ঊষা ঠাকরুন নগেন জেঠিমাকে যেন বলছেন, কি বৌ, কইছিলাম না আবার সব ঠিক অইয়া যাইবে? এহ্নে দেখলিতো? ঐ তে বকসিরা, চট্কিরা, উকিল বাড়ইয়ারা বেবাকে আইয়া পড়ছে। যুগীপাড়া, নাপিত পাড়া, ভুঁইমালিরা, ধোপারা বেবাকে আইছে। যাউক আর কোনো উদ্বাগ নাই। যারা যারা গ্রাম শূন্য করে চলে গিয়েছিল, সবাই ফিরে এসেছে। আবার সব ভরপুর। বাস্তু দেবতা যেন জাগ্রত মহিমায় ভাস্বর এবং নবসজ্জায় সুস্থিত।

গয়নার নৌকোখানা যেন ছোট্ট একটা ডিঙি হয়ে পিছারার খালে গিয়ে ঢুকে পড়েছে। দুপারের লোকেরা বলাবলি করছে, ভাবছিলো যাইবে গিয়া, ফিরইয়া আইছে। আইবে না, আইতেই অইবে। খালটির চেহারা সেই আগের মতোই। জোয়ারের ঘোলাজল, কর্কিনা মলাণ্ডি আর ভাঁটা মাছগুলোর উজান ঠেলে চলা, শুক্‌নো পাতাগুলোর ভেসে যাওয়া আর আমাদের হুটোপুটি। নগেন মশায়ের কামরাঙা বাগানটিও তেমনি বাহারিই আছে। পিছারার খাল পাড়ের বাঁশ ঝাড়, পাশের ঢোল কল্‌মির জঙ্গল, আশ পাশের বন বাঁটালির জটলা, শটির বন আর তাদের অন্দর থেকে উঁকি মারা বিচিত্রবর্ণের ডাটো শটি ফুল -- সবাই যে যার জায়গায় হৃষ্টমনে আসন বিছিয়ে বসে গেছে যেন। এমন কী সেই অতিকায় বুড়ো থুথুরে যজ্ঞি ডুমুরের গাছটা তার সারা গায়ে লাল লাল পাকা পুরুষ্টু ফলগুলো নিয়ে গোলা ঘরের পিছন দিকটায় খালের কিনার ঘেঁষে যেমনটি ছিল তেমটিই পাহারাদারি করছে। এক ঝাঁক শালিখ আর চন্দনা মহাভোজ লাগিয়ে দিয়েছে সেখানে।

বুকের মধ্যে শৈশবের উৎসবি উচ্ছ্বাসগুলো কল্‌কল্ করে উঠছে, যেন আনন্দের ঢাক ডগর বাজাচ্ছে মগ্ন চৈতন্যে।

এই বিভিন্নমুখী অভিঘাতের বহুমাত্রিক কোলাজ কখনও ব্যথা কখনও উল্লাসে যেন আরও গভীরে নিমগ্ন করছে আমাকে। এইরকম আরও আরও গভীর ঘুমে তলিয়ে যেতে যেতে, আর কোনওদিন এই জঙ্গম বোধ থেকে জেগে না ওঠার এক আকুল প্রার্থনা বুকের অত্যন্ত গোপন তল থেকে স্বতোৎসারে উদগীথ হতে থাকলে আমি যেন কালরহিত, দেশরহিত এক অনির্বচনীয় সত্ত্বায় বিলীন হতে থাকি এবং তা যেন এক অনুপম সত্যে প্রতিষ্ঠা পায়।

তথাপি যেহেতু সেই গয়নার নৌকাখানা চলতেই থাকে, তাই মগ্নতায়ও অনুভূত হয় এই কাঙ্ক্ষণীয় বোধের ক্ষণিকত্ব। অমনি আবার বুকের মধ্যে ঠেলে জেগে ওঠা এক হাহাকারে জানতে পারি যে ঐ মহাবৃক্ষ তাঁর অনন্ত বিবিক্তি নিয়ে অতঃপর আমাদের ধ্বস্ত করেই চলবেন, কারণ তাঁর নিষেধ আমরা গ্রাহ্য করিনি। তাঁর পাতা ঝরানোর দ্যোতনা, ছড়িয়ে দেওযা, জড়িয়ে ধরা শেকড়ের আর্তি আমাদের পরস্পর অসহিষ্ণু দুই সম্প্রদায়ের মানুষদের কিছুমাত্র বিবেকে বিবস্বান্ করেনি। তাঁর আচরণ থেকে আমরা কিছুমাত্র নিদর্শন গ্রহণ করিনি, যেমন করিনি পিছারার খালের প্রবহণ থেকে। না, প্রকৃতির আচরণ থেকে কোনও প্রত্যাদেশ বা 'অহি' কেউই গ্রহণ করতে সক্ষম হইনি।

এই বিষণ্ণ ব্রতকথা যদিও ব্যক্তিক উত্থান পতনের কথায় অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু এই বিষাদ বৃক্ষ এবং বিষাদিনী নদীর সন্তানেরা সবাই তার অংশী। আমি শুধু কথক মাত্র। এই ব্রতকথা শেষ হয়েও শেষ হবে না যতদিন না এই মহাবিষাদ বৃক্ষের অভিশাপকাল শেষ হয়।

হয়ত একদিন আমাদের এই জনপদের কারুর কোনো উত্তর পুরুষ, কোনওদিন এই মহাবৃক্ষের যে শিকড়ে নৌকোর কাছিগুলো বাঁধা ছিল, তার সন্ধান পাবার জন্য আকুল হয়ে, খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে পৌঁছোবে, যেমন সগর রাজার উত্তর পুরুষেরা যুগ যুগ প্রচেষ্টার পর পৌঁছোতে পেরে শাপমুক্ত করেছিল তাদের পূর্বপুরুষদের, তেমনি। আর সেদিনই হয়ত এই অভিশাপের কাল শেষ হয়ে বুড়ি পিসিমায়েদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে, বাস্তুঠাকুর আবার আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবেন এক জ্যোতির্ময় বিকাশে।